প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোন বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

(অধ্যাপিকা) ড. সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়
উপাচার্য

দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ : জুন, 2008

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Council, Government of India

পরিচিতি

বিষয় : ভূগোল সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম : পর্যায়

EGR : 05 : 01-02

রচনা		সম্পাদনা
একক 1	ড. জয়দেব কুমার কোলে	ড. আশীষ কুমার সরকার
একক 2	ঐ	ঐ
একক 3	ঐ	ঐ
একক 4	ঐ	ঐ
একক 5	ঐ	ঐ
একক 6	ড. পরমার্থ ঘোষ	ড. নিখিলকৃষ্ণ দে
একক 7	ঐ	ঐ
একক 8	ঐ	ঐ
একক 9	ঐ	ঐ
একক 10	ঐ	ঐ

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

ঘোষণা

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

জয়দীপ শীল

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EGR 05

মৃত্তিকা ভূবিদ্যা এবং জীব ভূগোল বিদ্যা

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
1

পৃষ্ঠা

একক 1 ❑	মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়া ও নিয়ন্ত্রকসমূহ	1-36
একক 2 ❑	আঞ্চলিক মৃত্তিকার প্রোফাইল গঠন	37-58
একক 3 ❑	মৃত্তিকার ভৌত গুণাবলী	59-98
একক 4 ❑	মৃত্তিকার রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য	99-135
একক 5 ❑	মৃত্তিকার শ্রেণি বিভাগ	136-160

[Biogeochemical cycles-Bio Couservation]

পর্যায় 2

পৃষ্ঠা

একক 6 ❑ জীব ভূগোলের ধারণা, বায়োম-ক্রান্তীয় তৃণভূমি তৈগা-তুন্দ্রা 161-202

একক 7 ❑ বাস্তুতন্ত্র ; বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহ ; জীব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর জীবদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক 203-229

একক 8 ❑ খাদ্যস্তর—খাদ্যশৃঙ্খল, শক্তিপ্রবাহ, ইকোলজিকাল পিরামিড 230-252

একক 9 ❑ উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানসমূহ 253-280

একক 10 ❑ জৈব ভূরাসায়নিক চক্রসমূহ—জীব সংরক্ষণ 281-320

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক 1 ❒ মৃত্তিকার গঠন ও নিয়ন্ত্রকসমূহ (Soil Formation-Process and factors)

গঠন

1.1 প্রস্তাবনা

1.2 উদ্দেশ্য

1.3 মৃত্তিকার গুরুত্ব, সংজ্ঞা, উপাদান

1.3.1 মৃত্তিকার গুরুত্ব

1.3.2 মৃত্তিকার সংজ্ঞা

1.3.3 মৃত্তিকার উপাদান

কঠিন উপাদান

তরল উপাদান

গ্যাসীয় উপাদান

1.3.4 মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়া

1.3.4.1 আবহবিকার :—যান্ত্রিক আবহবিকার, রাসায়নিক আবহবিকার, জৈব আবহবিকার

1.3.4.2 প্রোফাইল বা পরিলেখ গঠন প্রক্রিয়া :—

পরিলেখ বা প্রোফাইলের বর্ণনা, জৈবস্তরের গঠন প্রক্রিয়া, এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া : যান্ত্রিক ও রাসায়নিক ইলুভিয়েশান প্রক্রিয়া

1.3.5 মৃত্তিকা সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক :

জলবায়ু, মূল শিলাখণ্ড, জীবজগৎ ভূ-প্রকৃতি, মানুষ, সময়

1.4 সারাংশ

1.5 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1.6 উত্তরমালা

1.1 প্রস্তাবনা

মৃত্তিকা ভূবিদ্যা প্রাকৃতিক ভূবিদ্যার একটি অন্যতম বিষয়। মৃত্তিকা শুধু পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানই নহে ইহা অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদও বটে। এই প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপরে মানব সভ্যতা, অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। সুতরাং প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদের সামগ্রিক পরিচিতি

অনেক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্তিকা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য যে যে বিষয়গুলি জানা প্রয়োজন সেগুলি হল মৃত্তিকার উপাদান, মৃত্তিকার সৃষ্টি বা গঠন প্রক্রিয়া, এর ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এর শ্রেণিবিভাগ ও বিন্যাস প্রকৃতি, মৃত্তিকার ব্যবহার উৎপাদিকা ও উর্বরতা শক্তি মৃত্তিকার অবনমন ও ইহার প্রতিকার, মৃত্তিকা পুনরুদ্ধার ও সংশোধন প্রভৃতি। মৃত্তিকা বিজ্ঞানে মৃত্তিকা সংশ্লিষ্ট উপরিউক্ত বিষয়গুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় ইহার ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য, উৎপাদিকা উর্বরা শক্তি এবং মৃত্তিকা গঠন প্রক্রিয়া ও ইহার নিয়ন্ত্রকের উপর। কিন্তু মৃত্তিকার স্থানগত বিন্যাস বৈচিত্র্যের উপর সেরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। প্রাকৃতিক পরিবেশের তারতম্যের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা গঠন প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়। এর ফলেই সৃষ্টি হয় বিভিন্নপ্রকার মৃত্তিকা। মৃত্তিকা ভূবিদ্যায় মৃত্তিকার অন্যান্য বিষয়গুলি যেমন আলোচিত হয় তেমনি বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত মৃত্তিকার ভৌগোলিক বন্টনের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

1.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- মৃত্তিকা বিজ্ঞানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন।
- মৃত্তিকার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারবেন।
- মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়া ও তার নিয়ন্ত্রক বিষয়ে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

1.3 মৃত্তিকার গুরুত্ব, সংজ্ঞা, উপাদান

প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি অন্যতম উপাদান হল মৃত্তিকা। অন্যান্য সম্পদের ন্যায় মৃত্তিকা সম্পদেরও গুরুত্ব অপরিসীম। সমস্ত প্রকার জীব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৃত্তিকার উপর নির্ভরশীল। মৃত্তিকা বাস্তুতন্ত্রের ধারক ও বাহক। বাস্তুতন্ত্রের সর্বনিম্ন পুষ্টিস্তরে রয়েছে উদ্ভিদ। মৃত্তিকা উদ্ভিদের আবাসস্থল। মৃত্তিকা ছাড়া উদ্ভিদের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। উদ্ভিদ ইহার প্রয়োজনীয় খাদ্য মৌল মাটি থেকেই গ্রহণ করে এবং সূর্যালোক, সবুজকণা ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের সহায়তায় নিজের খাদ্য তৈরী করে। পুষ্টিস্তরের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পরভোজী জীব স্বভোজী উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় পরোক্ষভাবে মৃত্তিকার উপরই নির্ভরশীল। বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন কঠিন, গ্যাসীয় ও তরল উপাদানগুলির নিরবচ্ছিন্ন যোগান সংরক্ষিত হয় কতকগুলি আবাস চক্র বা তন্ত্রে (Close system of cycle) মাধ্যমে। কার্বন চক্র, অক্সিজেন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, উদ্‌কচক্র প্রভৃতি এরূপ এক একটি বদ্ধচক্র বা ভূজৈব রাসায়নিক চক্র (Bio-gochemical Cycle) সংঘটিত হয় বায়ুমণ্ডল, শিলামণ্ডল, বারিমণ্ডল এবং জীবমণ্ডলের এবং জীবমণ্ডলের মধ্যে মৌল উপাদানগুলির আদান প্রদানের মাধ্যমে। মৌল উপাদানগুলির উক্ত আধারগুলির মধ্যে শিলামণ্ডল

(Lithosphere) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিলামণ্ডলের অন্যতম উপাদান হল মৃত্তিকা যা পুনরায় সমস্ত জীবের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল। এদিক থেকেও মৃত্তিকার গুরুত্ব অপরিসীম।

বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত পুষ্টিস্তরের সর্বোচ্চে অবস্থিত মানবজাতি। এই মানবজাতি খাদ্যের উৎস হল মৃত্তিকা। ক্রমবর্ধমান মানবজাতির বর্ধিত খাদ্যের যোগানের নিশ্চয়তা সম্ভব হয় উর্বর মৃত্তিকার কৃষিকার্যে সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে। এজন্যই উন্নত সিন্ধু সভ্যতা ও মিশরীয় সভ্যতার ন্যায় সুপ্রাচীন মানব সভ্যতা উর্বর পলিমৃত্তিকা ও পর্যাপ্ত জল সমৃদ্ধ সিন্ধু ও নীলনদীর সমভূমিতে বিকাশলাভ করে। আবার বিপরীতক্রমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মৃত্তিকার অবনমন হেতু উন্নত মানবসভ্যতার পতন হয়। বর্তমান মানব সভ্যতাও বিচ্ছিন্নভাবে মৃত্তিকার উপর নির্ভরশীল কৃষিকার্যের সফলতা ও উন্নতি নির্ভর করে মৃত্তিকার গুণগত মানের উপর। মৃত্তিকার এরূপ বৈশিষ্ট্যগুলি আবার নির্ভর করে মৃত্তিকা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার উপর যাহা আবার বিভিন্ন উপকরণ বা নিয়ন্ত্রকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং কৃষিকার্যের সফলতা একদিন থেকে মৃত্তিকা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। মৃত্তিকা বিজ্ঞানের মাধ্যমেই মৃত্তিকা সম্পর্কে এরূপ সম্যক জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। শুধু কৃষিকার্যই নহে মৃত্তিকার অন্যান্য সুষ্ঠু ব্যবহারও মৃত্তিকার প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্যের ধারণার উপর নির্ভরশীল। কৃষিকার্য ছাড়াও জনসংখ্যার বেশ কিছু অংশ পরোক্ষভাবে মৃত্তিকার উপর নির্ভরশীল। কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প যথা সূতীবস্ত্র, পাটবস্ত্র, চা, রবার, পশম প্রভৃতি শিল্প সংশ্লিষ্ট কৃষিপণ্যের উপর নির্ভরশীল যেগুলি প্রকারান্তরে মৃত্তিকারই অবদান। উপরিউক্ত কারণে মৃত্তিকা বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

1.3.2 মৃত্তিকার সংজ্ঞা

মৃত্তিকা বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে মৃত্তিকার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। এবিষয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞানের জনক রুশদেশীয় বিজ্ঞানী ভি. ভি. ডকুচায়েভের সংজ্ঞাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁর সংজ্ঞা অনুসারে মৃত্তিকা হল এমন একটি বস্তু যা প্রকৃতিতে শিলাস্তরের আবহবিকার, জলবায়ু, জীবমণ্ডল, ভূপ্রকৃতি এবং মানুষের উৎপাদনশীল কর্মপ্রণালীর জটিল প্রভাবে স্বাভাবিকভাবে বহুবৎসর ধরে সৃষ্টি হয়েছে এবং ক্রমশ বিবর্তিত হয়েছে।

(Soil is a body subjected to natural and historical development which come into being on the earth's surface as a result of a complex combination of interactions of rock, the organic world [macro and micro organisms of vegetable and animal origin] the climate the local relief and production activities of man.)

অনেকের মতে মৃত্তিকা হল সদা পরিবর্তনশীল একটি মিশ্র পদার্থ যাহাতে সর্বদাই নানা প্রকার প্রাকৃতিক, রাসায়নিক ও জৈবিক পরিবর্তন ঘটে চলছে এবং যার ফলে বিভিন্ন স্তরের উদ্ভব হচ্ছে।

কোন কোন মৃত্তিকা বিজ্ঞানীর মতে মৃত্তিকা হল ভূত্বকের উপরে আচ্ছাদনকারী সুগভীর সূক্ষ্ম শিথিল বস্তুকণা যথা উদ্ভিদ বৃদ্ধির মাধ্যম বা উদ্ভিদ মূলের অবাসস্থল।

1.3.3 মৃত্তিকার উপাদান

মৃত্তিকা একটি ত্রিমাধ্যম যুক্ত পদার্থ বিশেষ। কারণ ইহা কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। অবশ্য সকল অবস্থাতেই ওই তিন উপাদানের উপস্থিতি নাও থাকতে পারে। যখন মৃত্তিকা সম্পর্ণরূপে শুষ্ক হয় বা মৃত্তিকাস্থিত জল জমে বরফে পরিণত হয় তখন ইহার মধ্যে তরল উপাদান অনুপস্থিত থাকে। মৃত্তিকা জলে পরিপৃক্ত হলেও গ্যাসীয় উপাদানের বিলুপ্তি ঘটে।

(1) কঠিন উপাদান (Solid Phase) : মৃত্তিকার অন্যতম উপাদান হল কঠিন বস্তুকণা। উৎপত্তি অনুসারে কঠিন বস্তুকণা সাধারণত দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত যথা (A) খনিজ কণা এবং (B) জৈব কণা। প্রায় সমস্ত প্রকার মৃত্তিকাই এই দুই বস্তুকণার দ্বারা গঠিত। অবশ্য বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকায় ইহাদের পরিমাণগত তারতম্য দেখা যায়। আবদ্ধ জলাশয়ে যে 'পিট' মৃত্তিকার সৃষ্টি হয় তাহার মধ্যে জৈব কণিকার প্রাধান্য দেখা যায়। জৈব কণিকার প্রাধান্যযুক্ত এরূপ মৃত্তিকাকে জৈব মৃত্তিকা (organic soil) বলে। অনুরূপভাবে যে সমস্ত মৃত্তিকায় খনিজ কণার প্রাধান্য দেখা যায় তাহাকে খনিজ মৃত্তিকা (Mineral soil) বলে।

(A) অজৈব বা খনিজ উপাদান (Inorganic or Mineral component) : মৃত্তিকার কঠিন বস্তুকণার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিভিন্ন প্রকার খনিজ কণা। মৃত্তিকার কঠিন উপাদানের সিংহভাগ এই উপাদানে গঠিত। মৃত্তিকার অন্যতম খনিজ কণা হল নির্দিষ্ট রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এবং কেলাস গঠন যুক্ত শিলা গঠনকারী সিলিকেট খনিজ যাহা মূল বা প্রাথমিক খনিজ (Primary mineral) এবং পরিবর্তিত খনিজ (Secondary mineral) এই দুইভাগে বিভক্ত। এছাড়াও মৃত্তিকার মধ্যে রয়েছে অন্যান্য বহুবিধ খনিজ যথা কার্বোনেট দ্রবণীয় লবণ (Soluble salts) এবং মুক্ত লৌহ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড।

(i) প্রাথমিক বা মূল খনিজ : আবহবিকারের ফলে মূল শিলাস্তর ক্রমশঃ চূর্ণীভূত ও শিথিল হয়ে পড়লে শিলার বিভিন্ন খনিজগুলির মধ্যে কোন কোনটি অপরিবর্তিত হয়ে মূল খনিজরূপে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। এরূপ খনিজে শিলায় মূল খনিজের মূলগত বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। মৃত্তিকার এই শ্রেণিভুক্ত খনিজকণাগুলির অন্যতম হল কোয়ার্টজ এবং ফেলস্পার। এছাড়াও রয়েছে পাইরক্সিন (Pryroxene) এ্যাম্ফিবোলস্ (Amphiboles) অলিভিন্ (Olivinis) এবং অভ্র।

(ii) পরিবর্তিত খনিজ : রাসায়নিক আবহবিকারের ফলে শিলাগঠনকারী বিভিন্ন খনিজ বিশেষত সিলিকা, অ্যালুমিনা ও লৌহ অক্সাইড পরিবর্তিত হয়ে স্বতন্ত্র পারমাণবিক গঠনযুক্ত খনিজ কেলাস সৃষ্টি হয়। এপ্রকার খনিজ কণাগুলির আয়তন 2 মাইক্রন 0.002 মিলিমিটার অপেক্ষা ক্ষুদ্র। এ প্রকার খনিজের মধ্যে অন্যতম হল কাদা খনিজ (Clay mineral) যাহা সাধারণত ক্লে ফ্র্যাকশন (Clay fraction) নামে পরিচিত। মৃত্তিকার কাদা কণা সাধারণত পরিবর্তিত খনিজ দ্বারা গঠিত। কাদা খনিজ রাসায়নিক গঠন দিক থেকে সিলিকেট অ্যালুমিনা যৌগ এবংকেলাস গঠনযুক্ত। নির্দিষ্ট পারমাণবিক গঠন বিহীন ধূলি সদৃশ্য লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ও সিলিকন অক্সাইড এবং হাইড্রাক্সাইড পরিবর্তিত খনিজ না হলেও এগুলিকে

কাদা খনিজরূপে গণ্য করা হয়। এ্যালোফেন (Allophane) এ জাতীয় কাদা খনিজ। আগ্নেয় শিলা থেকে উদ্ভূত মৃত্তিকায় এ জাতীয় খনিজের প্রাধান্য দেখা যায়।

(iii) ক্যালশিয়াম কার্বোনেট : কার্বোনেট খনিজ কণার মধ্যে অন্যতম হল ক্যালশিয়াম কার্বোনেট ও ডলোমাইট। এপ্রকার খনিজ জলে সহজে দেখা যায়। সাধারণত 7 এর কম P^H যুক্ত মৃত্তিকায় এই খনিজ দেখা যায় না। যে মাটিতে ক্যালশিয়াম কার্বোনেটের প্রাধান্য দেখা যায় তাকে চুনমাটি (Calcareous soil) বলে।

(iv) দ্রবণীয় লবণ (Soluble salts) : শিলাস্তরের আবহবিকারজনিত কারণে বিভিন্ন প্রকার লবণ বিশ্লিষ্ট হয় এবং ইহার খনিজ কণারূপে পরিগণিত হয়। অধিক জলবায়ু অঞ্চলে এ প্রকার লবণ ধৌত প্রক্রিয়ায় মাটি থেকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চল, নিম্নভূমিতে বা নিকাশীহীন সেচ সেবিত অঞ্চলে ধৌত প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ায় মৃত্তিকাস্থিত বিভিন্নপ্রকার লবণ অপসারিত হতে পারে না। খনিজ লবণগুলি ধনাত্মক আয়নযুক্ত লবণগুলির মধ্যে অন্যতম হল ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম অপরদিকে ঋণাত্মক আয়নযুক্ত লবণগুলির উল্লেখযোগ্য হল ক্লোরাইড, সালফেট, কার্বোনেট ও বাইকার্বোনেট।

(v) মুক্ত লৌহ ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড : শিলাস্তরের আবহবিকারের ফলে বিভিন্ন প্রকার লৌহ ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড সৃষ্টি হয় এবং মুক্ত অবস্থায় অবস্থান করে। কখনও কখনও এই উপাদান মৃত্তিকা কণার উপরে আবরণী সৃষ্টি করে।

(B) জৈব উপাদান (Organic component) : মৃত্তিকার কঠিন বস্তু কণার সমুদয় অংশের মধ্যে অতি নগণ্য জৈব উপাদান দ্বারা গঠিত। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়ে ধূলি সদৃশ্য কালো রঙের অপরিবর্তনীয় পদার্থের সৃষ্টি হয় যাহা হিউমাসরূপে পরিচিতি। ইহাই জৈবাংশের মূল উপাদান। আংশিক বিশ্লিষ্ট জৈবাংশ ও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

হিউমাসের ন্যায় জড় উপাদান ছাড়াও জৈব উপাদানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মৃত্তিকায় বসবাসকারী অতিক্ষুদ্র প্রাণী বা উদ্ভিদ। ইহাদের সংখ্যা অগুনিত। এক গ্রাম ওজনের মৃত্তিকার মধ্যে এইরূপ জীবের সংখ্যা কয়েক লক্ষ জৈব উপাদানের পরিমাণ মাটির মোট আয়তনের শতকরা 5 ভাগ।

(2) তরল উপাদান (Liquid Phase) : কোন নির্দ্দিষ্ট আয়তনের মৃত্তিকার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অধিকার করে থাকে মৃত্তিকা রন্ধ্র (Pore space) যাহা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে জল বা বায়ুতে পূর্ণ থাকে। জলই মৃত্তিকা তরল উপাদানের অন্যতম। মৃত্তিকার ক্ষুদ্র রন্ধ্রগুলি সাধারণত জলে পূর্ণ থাকে। বৃষ্টিপাত তুষারপাত ও জলসেচ মাটির জলের প্রধান উৎস। এই সমস্ত উৎস থেকে মাটির জলের যোগান পর্যাপ্ত হলে মাটির রন্ধ্রগুলি সম্পূর্ণরূপে জলে পূর্ণ থাকে। এই অবস্থাকে মাটির পরিপৃক্ত অবস্থা বলে। উক্ত উৎস থেকে জলের যোগান না থাকলে মাটি বায়ুমণ্ডল থেকে জলীয় বাষ্প অধিশোষণ করে এবং কলয়েড কণার চতুর্দিকে পাতলা আস্তরণ সৃষ্টি করে। এপ্রকার জলকে হাইগ্রোস্কপিক জল (Hygroscopic

water) বলে। মাটিতে বিভিন্ন উৎস থেকে জলের যোগ ফল অব্যাহত থাকলে কলয়েড কণার চতুর্দিকে জলের পাতলা আস্তরণ আরও গভীর হতে থাকে এবং মৃত্তিকার ক্ষুদ্র রন্ধ্র বা ক্যাপিলারিও রন্ধ্র (Calillary pore space) জলে পূর্ণ হয়। এপ্রকার জলকে ক্যাপিলারি জল (Calpillary water) বলে। আরও জল সরবরাহে মৃত্তিকার কলয়েড কণার উপরে জলস্তরের গভীরতা এতই বৃদ্ধি পায় যে ঐ কণাগুলি অতিরিক্ত জল অধিশোষণ ক্ষমতার দ্বারা ধরে রাখতে পারে না। এর ফলে ঐ অতিরিক্ত জলের উপর মহাকর্ষ বলের চাপ বৃদ্ধিজনিত কারণে জল নীচের দিকে মাটির মধ্য দিয়ে নিঃসৃত হয়। এরূপ জলকে মহাকর্ষ জল (Gravitation water) বলে।

মাটির বিভিন্ন লবণ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যে মিশ্র উপাদান সৃষ্টি করে তাকে মাটির দ্রবণ (Soil solution) বলে। মাটির জলীয় দ্রবণের রাসায়নিক বিক্রিয়া বিভিন্ন প্রকার হয়। যথা—নিরপেক্ষ, অম্ল ও ক্ষারকীয়। মৃত্তিকার বিভিন্নস্তরে খনিজ উপাদানগুলির পরিবহনে মাটির দ্রবণ অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করে। উদ্ভিদ দ্রবণের মাধ্যমেই পুষ্টি মৌল মাটি থেকে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

গ্যাসীয় উপাদান (Gaseous phase) : মৃত্তিকার গ্যাসীয় উপাদান বলতে মাটির বায়ুকে বোঝায়। শুষ্ক অবস্থায় মৃত্তিকা রন্ধ্র বায়ুর দ্বারা পূর্ণ থাকে। মৃত্তিকার তরল ও গ্যাসীয় উপাদান একত্রে ইহার শতকরা 50 ভাগ অধিকার করে থাকে। মৃত্তিকায় রন্ধ্রগুলি জলে পূর্ণ থাকলে গ্যাসীয় উপাদান বিলুপ্ত হয়। বায়ুস্তরের বায়ু এবং মৃত্তিকার বায়ুর মধ্যে স্বাভাবিক মিল থাকলেও উপাদানগত দিক থেকে পার্থক্য বিদ্যমান। মাটির বায়ুর মধ্যে বায়ুমণ্ডলের তুলনায় বেশী কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে কিন্তু নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণে কোন তারতম্য থাকে না।

1.3.4 মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়া বা উৎপত্তি :

মাটির উৎপত্তির সঙ্গে দুটি প্রক্রিয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িত যথা—(a) আবহবিকার ও (b) মৃত্তিকার স্তরায়ন পদ্ধতি। আবহবিকারের ফলে শিলাস্তরে যান্ত্রিক উপায়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয় বা রাসায়নিক পরিবর্তনে ক্রমশ শিথিল বা বিয়োজিত হয়। এর ফলে শিলাস্তরের উপর অসংলগ্ন শিলাখণ্ডের উৎপত্তি হয় যাকে বলা হয় মূল শিলাখণ্ড (Parent material) পরবর্তী পর্যায়ে ঐ মূল শিলাখণ্ড আবহবিকারের ফলে আরও চূর্ণীভূত বা বিয়োজিত হয়ে সূক্ষ্ম কোমল বস্তুকণা সৃষ্টি হয় যাকে বলে মৃত্তিকা। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ ক্রমশঃ পচে গিয়ে সূক্ষ্ম জৈব কণিকারা হিউমাসের সৃষ্টি হয় এবং ঐ শিলাচূর্ণের সঙ্গে মিশে যায়। মূল শিলাখণ্ড থেকে সূক্ষ্ম কোমল মৃত্তিকা কণা সৃষ্টি ও হিউমাস গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকার মধ্য দিয়ে বৃষ্টির জল প্রবেশ করার ফলে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিভিন্ন রঙের মৃত্তিকাস্তর সৃষ্টি হয়। যদিও এই দুটি পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক তথাপি দুইটি পদ্ধতি একই সঙ্গে চলতে থাকে এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে আবহবিকার মৃত্তিকা সৃষ্টির প্রথম পর্যায় রূপে গণ্য হলেও ইহার অর্থ এই নয় যে এই পর্যায় শেষ হলেই মৃত্তিকা উৎপত্তির পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ স্তরায়ন পদ্ধতি শুরু হবে। সাধারণভাবে

দুই পদ্ধতিই একই সঙ্গে চলতে থাকে। অবশ্য বলা যেতে পারে মূলশিলাখণ্ড সৃষ্টি পর্যন্ত স্তরায়ন পদ্ধতির শুরু হয় না, তখন আবহবিকারেই প্রাধান্য থাকে। আবহবিকার ততক্ষণ পর্যন্তই চলতে থাকে যতক্ষণ মৃত্তিকার আবহবিকারযোগ্য পদার্থের উপস্থিতি থাকে।

1.3.4.1 আবহবিকার :

বিচূর্ণীভবন বা আবহবিকার শব্দটি আবহাওয়া শব্দটি থেকে উৎপত্তি হয়েছে। আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান যথা—উত্তাপ, বৃষ্টিপাত বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা প্রভৃতির তারতম্যের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের শিলাসমূহের বিচূর্ণীকরণ বা রাসায়নিক পরিবর্তনে ক্রমশ শিথিল হয়ে যাওয়াকে আবহবিকার বলে। এই প্রক্রিয়ায় ভূত্বকের শিলা চূর্ণ বিচূর্ণ বা শিথিল হয় বটে কিন্তু উদ্ভূত শিলাখণ্ড স্থানান্তরিত না হয়ে মূল শিলাস্তরের উপরে জমে থাকে। প্রখ্যাত ভূমিরূপ বিশেষজ্ঞ রিচির (Reichi) মতে আবহবিকার হল এমন একটি প্রক্রিয়া যাহার দ্বারা শিলাস্তর বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল এবং জীবজগতের প্রভাবে চূর্ণীভূত বা বিয়োজিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় শিলাস্তর ভেঙে গিয়ে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয় এবং ঐরূপ খণ্ডের মধ্যে মূল খনিজের অস্তিত্ব বজায় থাকে সেইরূপ জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মূল খনিজ পরিবর্তিত হয়ে নূতন খনিজের উদ্ভব ঘটে। (Weathering is the response of materials which were in equilibrium within the lithosphere to conditions at or near its contact with the atmosphere, the lithosphere and perhaps still more important the biosphere. Weathering is not simply the reduction of mineral to fundamental particles, the formation of new minerals in a weathering profile is accepted as a part of weathering.)

বিখ্যাত ভূবিজ্ঞানী ষ্ট্রেলারের মতে "ভূপৃষ্ঠের উপরে বা সন্নিকটে অনাবৃত শিলা যেসব প্রক্রিয়ায় যান্ত্রিকভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে এবং রাসায়নিকভাবে বিয়োজিত হচ্ছে তাদের সম্মিলিত কাজকেই আবহবিকার বলে।"

● **আবহবিকারের প্রক্রিয়াসমূহ (Process of Weathering) :** আবহবিকার সাধারণত দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয় যথা—(ক) যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত আবহবিকার এবং (খ) রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত আবহবিকার। এছাড়াও প্রাণী ও উদ্ভিদ যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পদ্ধতিতে শিলার আবহবিকার ঘটায়। এই প্রকার আবহবিকার (গ) জৈব আবহবিকার নামে পরিচিত। যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংগঠিত আবহবিকারকে যান্ত্রিক আবহবিকার (Mechanical weathering) এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত আবহবিকারকে রাসায়নিক আবহবিকার (Chemical Weathering) বলে।

(A) যান্ত্রিক আবহবিকার : আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান যথা উষ্ণতা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, প্রভৃতির প্রভাবে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শিলাসমূহের চূর্ণবিচূর্ণ হওয়াকে যান্ত্রিক আবহবিকার বলে। এই প্রকার আবহবিকারের ফলে শিলাসমূহের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন বা বিয়োজন ঘটে না কেবলমাত্র উহার চূর্ণীকরণ হয়। এজন্য শিলাখণ্ডের মধ্যে মূল খনিজের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে।

- **যান্ত্রিক আবহবিকারের বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়া :**

যান্ত্রিক আবহবিকার সংঘটনের মূলে রয়েছে যান্ত্রিক শক্তি। শিলাস্তরের মধ্যে এরূপ যান্ত্রিক শক্তি বিভিন্নভাবে সৃষ্টি হতে পারে। তদানুসারে যান্ত্রিক আবহবিকার রিচির মতে নিম্নলিখিত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

I. শিলাস্তরের মধ্যেই বিভিন্নকারণে উদ্ভূত যান্ত্রিক শক্তির প্রভাবে সংঘটিত আবহবিকার (Stress applied from internal Condition)-কে এ প্রকার যান্ত্রিক শক্তি নিম্নলিখিত দুটি কারণে উৎপন্ন হতে পারে।

(a) শিলাস্তরের উপরিভাগের চাপ মোচন (Release of overburden pressure)

(b) তাপের হ্রাসবৃদ্ধিজনিত শিলাস্তরের সঙ্কোচন ও প্রসারণ। (Thermal expansion and contruction of insolation weathering)

II. শিলাস্তরের বহির্ভাগ থেকে প্রযুক্ত কোন যান্ত্রিক শক্তি (Stress applied from external condition)

(a) তুষার কেলাস সৃষ্টির ফলে উদ্ভূত যান্ত্রিক শক্তি। (Growth of ice crystal)

(b) লবণ কেলাস সৃষ্টিজনিত যান্ত্রিক শক্তি। (Growth of Salt Crystal)

III. শিলাস্তরের মধ্যেই উদ্ভূত যান্ত্রিক শক্তির প্রভাবে সংঘটিত আবহবিকার।

(a) শিলাস্তরের উপরিভাগের চাপ মোচন :

আবহবিকারের ফলে ভূত্বকের উপরিভাগের শিলাস্তর চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে পড়ার পর বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি যথা বায়ুপ্রবাহ, নদী, হিমবাহ প্রভৃতির মাধ্যমে জমে থাকা শিলাখণ্ড অপসারিত হয়। এভাবে শিলাখণ্ড, অপসারিত হওয়ার ফলে নীচের বিভিন্ন প্রকার উদ্ভেদী আগ্নেয়শিলা ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত হয়। ফলে ঐরূপ শিলাস্তরে সঞ্চিত চাপের মোচন হয়। এজন্য উদ্ভেদী শিলাস্তর প্রসারিত হয় বলে উহার মধ্যে ফাটলের সৃষ্টি হয়। এভাবে সৃষ্ট ফাটলগুলি সাধারণত ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সমান্তরালে অবস্থান করে এবং ক্রমশ দুর্বল হয়ে স্তরে স্তরে শিলাখণ্ড মূল শিলাস্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শিলাস্তরের উপরিভাগের চাপের মোচনের ফলে সংঘটিত যান্ত্রিক আবহবিকারকে প্রধানত নিম্নলিখিত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় যথা (i) স্পলিং (Spalling) এবং (ii) সিটিং (Sheeting)

(i) স্পলিং (Spalling) : শিলাস্তরের উপরের চাপ মোচন জনিত কারণে শিলাস্তরের প্লেটের ন্যায় বিচ্ছিন্নকরণকে স্পলিং বলে।

(ii) সিটিং (Sheeting) : শিলাস্তরের উপরের চাপ মোচনজনিত কারণে শিলাস্তরের চাদরের ন্যায় বা সিটের আকারে পাতলা স্তরে বিচ্ছিন্নকরণকে সিটিং বলে।

(b) তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি জনিত কারণে শিলাস্তরের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে সংঘটিত যান্ত্রিক আবহবিকার : শিলাস্তর দিনের বেলায় উত্তাপ গ্রহণ করে প্রসারিত হয় এবং রাত্রে তাপ ছেড়ে দেওয়ার ফলে সংকুচিত হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি জনিত শিলাস্তরের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে শিলা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। সাধারণভাবে শিলা তাপের কুপরিবাহী স্বভাবতই শিলাস্তরের পৃষ্ঠতল এবং মধ্যভাগের মধ্যে উষ্মতার পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এর ফলে শিলাস্তরের উপরিভাগ নিম্নভাগ অপেক্ষা বেশী প্রসারিত হয় বা সংকুচিত হয় এবং উদ্ভুত টানে শিলাস্তরে ফাটলের সৃষ্টি হয় ও ক্রমে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট যান্ত্রিক শক্তি শিলাস্তরকে বিভিন্নভাবে চূর্ণ বিচুর্ণ করে। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি উল্লেখযোগ্য।

(i) ক্ষুদ্র কণা বিশরণ (Granular disintegration) : শিলাগঠনকারী বিভিন্ন খনিজের তাপগ্রহণ ও ধরে রাখার ক্ষমতা বিভিন্ন হওয়ায় দিনে এদের প্রসারণ ও রাত্রে সংকোচন অসমভাবে ঘটে। এজন্য শিলাস্তরের বিভিন্ন স্থানে টানের ফলে ফাটলের সৃষ্টি হয়। এভাবে খনিজের সংযোগসাধক পদার্থের মধ্য দিয়ে ফাটলের সৃষ্টি হলে খনিজগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। শিলার এরূপ চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ার প্রক্রিয়াকে ক্ষুদ্রকণা বিশরণ বলে।

(ii) শল্ক মোচন (Exfoliation) : শিলাস্তরের কুপরিবাহিতার জন্য ইহার ওপরের স্তর সূর্য তাপ গ্রহণ করে অন্তঃস্তরের তুলনায় অধিক উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয়। অনুরূপভাবে রাত্রে উপরের স্তর অধিকতর শীতল হওয়ায় বেশী সংকুচিত হয়। এভাবে সংকোচন ও প্রসারণের পার্থক্যের জন্য উদ্ভুত টানে শিলার ওপরের স্তর অন্তঃস্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পেঁয়াজের খোসার ন্যায় খুলে যায় এবং শিলার আকার অনেকটা গোলাকার দেখায়। একে শল্কমোচন বলে। শিলাস্তরের গোলাকার রূপ ধারণ করার জন্য এরূপ আবহবিকারকে গোলাকৃতি আবহবিকার (Spheroidal weathering) বলে। গ্রানাইট জাতীয় শিলায় এ প্রকার আবহবিকার অধিক পরিলক্ষিত হয়।

(iii) প্রস্তর চাঁই বিচ্ছিন্নকরণ বা পিণ্ড বিশরণ (Block Disintegration) : শিলাস্তরের উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধিজনিত কারণে সংকোচন ও প্রসারণের ফলে শিলাস্তরে শিলাস্তরে টানের সৃষ্টি হয় যা শিলাস্তরের মধ্যে সমান্তরাল ও উল্লম্বভাবে ফাটলের সৃষ্টি করে। এর ফলে শিলাস্তর বড় বড় খণ্ডে বা ব্লকের আকারে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। ইহাকে পিণ্ড বিশরণ বা খণ্ডীকরণ বলে।

II. শিলাস্তরে বহির্জগত থেকে প্রযুক্ত যান্ত্রিক শক্তি :

শিলাস্তরের ফাটলের মধ্যে বা রন্ধ্রে প্রাকৃতিক ভাবে তুষার কেলাস (Ice crystal) বা লবণ কেলাস (Salt crystal) গঠিত হলে উহাদের আয়তন বৃদ্ধিজনিতবলে শিলাস্তর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। এপ্রকার আবহবিকার নিম্নলিখিত দুটি পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়।

(a) তুষার কেলাসন প্রক্রিয়া (Frost Shattering) : শীতল জলবায়ু অঞ্চলে উচ্চ অক্ষাংশে অথবা উচ্চ পর্বতগাত্রে দিনের বেলায় বা গ্রীষ্মকালে বরফ গলা জল বা বৃষ্টির জল শিলাস্তরের ফাটলের মধ্যে

সঞ্চিত হলে তাহা শীতকালে বা রাত্রিকালে অত্যধিক ঠান্ডায় জমে বরফে পরিণত হয়। জল বরফে পরিণত হলে এর আয়তন শতকরা 10 ভাগ বৃদ্ধি পায়। ফলে ফাটলের মধ্যস্থিত জল বরফে পরিণত হলে ফাটলের দুপাশের দেওয়ালে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয় (প্রতি বর্গ সে: মিটারে প্রায় 14 গ্রাম) এই চাপের ফলে শিলাস্তর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। এপ্রকার আবহবিকারকে তুহিনখণ্ডীকরণ বলে।

(b) লবণ কেলাস গঠন জনিত আবহবিকার (Salt Weathering) : শিলাস্তরের ফাটলের মধ্যে বরফ কেলাস গঠন জনিত আবহবিকারের ন্যায় বিশেষত শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে লবণকেলাস গঠনের মাধ্যমে শিলাস্তর খণ্ড বিখণ্ড হয়। শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে শিলাস্তরের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে লবণাক্ত ভৌম জল বা ভূপৃষ্ঠের উপর উঠে আসে এবং ঐ জল সৌরতাপে বাষ্পীভূত হলে শিলার ছিদ্রের মধ্যে লবণ কণিকা সৃষ্টি হয়। শিলাস্তরের মধ্যে ঐরূপ লবণ কেলাস গঠিত হলে উহাদের প্রসারণজনিত বলে শিলাস্তর ফাটলের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। মরুভূমির প্লায়া অধ্যুষিত অঞ্চলে বা সমুদ্র উপকূলের শিলাস্তরে এরূপ আবহবিকার প্রায়ই সংঘটিত হতে দেখা যায়।

III. যান্ত্রিক আবহবিকারের অন্যান্য পদ্ধতি : যান্ত্রিক আবহবিকারের উপরোক্ত প্রক্রিয়া ছাড়াও নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলিও যান্ত্রিক আবহবিকার সংঘটিত করতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(a) স্লেকিং (Slaking) : বৃষ্টির জল কোমল পাললিক শিলা এবং ছিদ্রযুক্ত রূপান্তরিত শিলার মধ্যে প্রবেশ করলে শিলাস্তর জল শোষণ করে আয়তনে প্রসারিত হয়। সূর্যের উত্তাপে ঐ জল বাষ্পে পরিণত হলে শিলাস্তর পুনরায় শুষ্ক হয় বলে সংকুচিত হয়। শিলাস্তরের অভ্যন্তরভাগ এভাবে ক্রমাগত সংকুচিত ও প্রসারিত হওয়ার ফলে ইহা বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়। এইপ্রকার যান্ত্রিক আবহবিকারকে স্লেকিং বলে।

(b) কলয়ডাল প্লাকিং (Colloidal Plucking) : মৃত্তিকার কর্দম কণিকা কোন শিলাস্তরে সংস্পর্শে এলে ঐ শিলাগাত্র থেকে সামান্য অংশ শিথিল বা আলগা হয়ে মূল শিলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কর্দম কণিকার মধ্যে আঠাল বা চটচটে ভাগ বেশী থাকার জন্য এরূপ ঘটে থাকে। এপ্রকার আবহবিকারকে Colloidial Plucking বলে।

(c) যান্ত্রিকভাবে সৃষ্ট ধ্বংসজনিত আবহবিকার (Mechanical Collapse) : পাহাড়ের খাড়া ঢাল বা ভৃগু তলদেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষয়কার্যের ফলে শিলাস্তর ক্ষয়ের গেলে উপরের অংশ ঝুলন্ত অবস্থায় অবস্থান করে এবং পরে ভার না রাখতে পেরে নীচে ধ্বসে পড়ে এরূপ ধ্বসজনিত কারণেই শিলাস্তর বিভিন্ন খণ্ডে বিভিক্ত হয়।

(d) ঘর্ষণজনিত আবহবিকার (Abrasion) : ভূপৃষ্ঠের বিভিন্নপ্রকার ক্ষয়কারী শক্তি যথা—নদী, হিমবাহ প্রভৃতির দ্বারা বাহিত ছোট বড় শিলাখণ্ডের আঘাতে বা ঘর্ষণে নীচের শিলাস্তর চূর্ণবিচূর্ণ হতে দেখা যায়। তাছাড়া ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা বাহিত শিলাখণ্ডের পরস্পর ঘর্ষণে উহারা খণ্ডবিখণ্ড হয়।

(e) বোল্ডার ক্লিভিং (Boulder Cleaving) : সৌরতাপজনিত আবহবিকারের আর একটি পদ্ধতি হল বোল্ডার ক্লিভিং। এ প্রকার আবহবিকার মধ্য অস্ট্রেলিয়ার ওল্গা পর্বতে লক্ষ্য করা গেছে। অনেক সময় বেলেপাথরের মধ্যে গ্রানাইট ও ব্যাসল্ট শিলার খণ্ড বিশেষ বা বোল্ডার সংযুক্ত ঐ সমস্ত বোল্ডারের উপরিভাগ ক্ষয়কার্যের ফলে অনাবৃত হয়ে পড়লে ঐ অনাবৃত অংশ বেলেপাথরের মধ্যে ঢুকে থাকা অংশ অপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত হয়ে আয়তনে প্রসারিত হয়। এর ফলে বোল্ডারের অনাবৃত অংশ ক্রমশ দুর্বল হয়ে মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হয়।

(f) ডার্ট ক্র্যাকিং (Dirt cracking) : এই প্রকার যান্ত্রিক আবহবিকার অস্ট্রেলিয়ার কবার পেডি প্রস্তরময় মরু অঞ্চলে লক্ষ্য করা গেছে। এই অঞ্চলে শিলাস্তরের ফাটলের মধ্যে অনেক সময় ছোট বড় প্রস্তর খণ্ড উদ্ভিদের পাতা ও অন্যান্য আবর্জনা জমে যাবার ফলে এপ্রকার আবহবিকার সংঘটিত হয়। দিনের বেলায় শিলাস্তর উত্তপ্ত হয়ে প্রসারিত হয় কিন্তু রাত্রে তাপ বিকিরণ করে সম্পূর্ণরূপে সংকুচিত হতে পারে না। কারণ ফাটলের মধ্যে অবস্থিত ছোট বড় প্রস্তর খণ্ড ও আবর্জনা ওইরূপ সংকোচনে বাধাপ্রদান করে। এর ফলে শিলাস্তরের মধ্যে প্রবল চাপের সৃষ্টি হয় যা শিলাখণ্ডকে ভেঙে যেতে সাহায্য করে।

(B) রাসায়নিক আবহবিকার : যে আবহবিকার রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সংঘটিত হয় তাহাকে রাসায়নিক আবহবিকার বলে। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদান যথা অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি জলের সঙ্গে যুক্ত হলে ঐ জলের সাথে শিলাস্থিত খনিজের রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় এবং শিলাস্তরের আবহবিকার হয়। এরূপ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শিলা বিয়োজিত হয় এবং শিলাস্থিত কোন কোন খনিজ গঠন খনিজে পরিণত হয়। রাসায়নিক আবহবিকার নিম্নলিখিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়।

I. অঙ্গার-যোজন বা কার্বোনেশন (Carbonation) : বিভিন্ন প্রকার খনিজের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইডের রাসায়নিক সংযোগের কার্বোনেশন বলে। বৃষ্টির জলের সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড মিশ্রিত হয়ে মৃদু অ্যাসিডে পরিণত হয় ($H_2O + CO_2 = H_2CO_3$)। ঐ মৃদু অ্যাসিড মিশ্রিত জল চুনাপাথর অঞ্চল রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। এই বিক্রিয়ার ফলে ক্যালশিয়াম কার্বোনেট ক্যালিশিয়াস বাইকার্বনেটে পরিণত হয় এবং তাহা সহজেই দ্রবীভূত হয় ও অপসৃত হয়।

$$CaCO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow Ca(HCO_3)_2$$

চুনাপাথর + জল + কার্বন ডাইঅক্সাইড → ক্যালশিয়াম বাই কার্বোনেট

II. আর্দ্র বিশ্লেষণ বা হাইড্রোলিসিস (Hydrolysis) : শিলাস্থিত খনিজ জলের সঙ্গে মিশে একই সঙ্গে বিয়োজিত হয় এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নতুন যৌগ গঠন করে। ইহাকে আর্দ্র বিশ্লেষণ বা হাইড্রোলিসিস বলে। উদাহরণ স্বরূপ—

(i) $KALSi_3O_8$ + HOH ⇒ $HAISiO_3O_8$ + KOH

অর্থক্লেজ ফেল্ডসফার + হাইড্রফিল = অ্যালুমিনোসিলিস অ্যাসিড + পটাশিয়াম হাইড্রাক্সাইড

(ii) $2KOH + H_2CO_3 = K_2CO_3 + 2H_2O$

পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড + কার্বনিক অ্যাসিড = জল মিশ্রিত পটাসিয়াম কার্বনেট।

(iii) $MgFeSiO_4 + 2HOH = Mg(OH)_2 + H_2SiO_3 + FeO$

অলিভাইন + আয়নাইজড জল = ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড + কলয়েডাল সিলিকা + ফেরাস অক্সাইড (সিলিসিক অ্যাসিড)

III. জল যোজন বা হাইড্রেশান (Hydration) : এইরূপ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শিলার বিভিন্ন খনিজ জলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিবর্তিত হয়। এইরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খনিজের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং বিয়োজিত হয়ে শিথিল হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ—

(i) $CaSO_4 + 2H_2O = CaSO_42H_2O$

ক্যালশিয়াম সালফেট + জল = জিপসাম

(ii) $2FeO_3 + 3H_2O = 2Fe_2O_33H_2O$

ফেরাল অক্সাইড + জল = জলমিশ্রিত ফেরাস অক্সাইড

IV. জারণ বা অক্সিডেশান (Oxidation) : খনিজের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটলে অক্সিডেশান সংঘটিত হয়। অক্সিজেন মিশ্রিত জল ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম , পটাশিয়াম এবং বিশেষত লৌহের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নূতন যৌগ গঠন করে। উদাহরণস্বরূপ শিলাস্থিত ফেরাস অক্সাইডের সহিত অক্সিজেন যুক্ত হয়ে ফেরিক অক্সাইড গঠিত হয়।

$$FeO + 3H_2O = 2Fe_2O_33H_2O$$

ফেরাস অক্সাইড + জল + অক্সিজেন = লিমোনাইট।

V. দ্রবণ : কতকগুলি খনিজ যেমন জিপসাম, সৈন্ধব লবণ প্রভৃতি জলে দ্রবীভূত হয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। এই প্রক্রিয়াকে দ্রবণ বলে।

C. জৈব আবহবিকার (Biological or Organic Weathering) : রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছাড়াও উদ্ভিদ ও প্রাণীমণ্ডল বিভিন্নভাবে শিলার বিচূর্ণীভবন বা বিয়োজনকে প্রভাবিত করে। এইরূপ আবহবিকার জৈব আবহবিকার নামে পরিচিত। এইরূপ আবহবিকার যান্ত্রিক বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়। তাই জৈব আবহবিকারকে দুটি উপভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(i) জৈবযান্ত্রিক আবহবিকার (Bio-Mechanical Weathering) এবং (ii) জৈব-রাসায়নিক আবহবিকার (Bio-Chemical Weathering)।

(i) জৈব যান্ত্রিক আবহবিকার : শিলাস্তরের ওপর কোন কক্ষ জন্মালে তার শিকড় ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করে। শিকড়ের বৃদ্ধির ফলে চারপাশের শিলাস্তরে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয় এবং শিলাস্তর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। প্রেইরী কুকুর, খরগোস, ছুঁচো, কেঁচো প্রভৃতি প্রাণী ভূপৃষ্ঠে গর্ত করার সময় শিলাস্তরের চূর্ণ বিচূর্ণ করতে সাহায্য করে।

(ii) জৈব রাসায়নিক আবহবিকার : উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ শিলার উপরে জমে থাকলে ঐ সমস্ত উপাদান পচে গিয়ে জৈব অ্যাসিড বৃষ্টি হয়। এইরূপ অ্যাসিডের সংস্পর্শে শিলা গঠনকারী বিভিন্ন খনিজ যথা—ম্যাগনেশিয়াম ফেলস্ফার ও সালফারের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে। এর ফলে শিলাস্তর বিয়োজিত হয়।

1.3.4.2 মৃত্তিকার প্রোফাইল বা পরিলেখ গঠন প্রক্রিয়া বা স্তরায়ন পদ্ধতি :

মৃত্তিকা গঠনের আর একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যুক্ত মৃত্তিকা স্তরের সৃষ্টি। বিভিন্ন উৎসের জল মাটির মধ্যদিয়ে চুঁইয়ে পড়ার মাধ্যমেই বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রথম মৃত্তিকাস্তর সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকার পৃষ্ঠতল থেকে নিম্নে শিলা মৃত্তিকা পর্যন্ত উল্লম্ব প্রস্থচ্ছেদকে মৃত্তিকার প্রোফাইল বা পরিলেখ বলে। মৃত্তিকার পরিলেখ পরিণত ও অপরিণত দুইই হতে পারে। যে সমস্ত মৃত্তিকা স্থানান্তরিত মূল শিলাখণ্ড (Parent material) থেকে সৃষ্টি হয়েছে সেই সমস্ত মৃত্তিকায় সুনির্দিষ্ট স্তরায়ন উপস্থিত লক্ষ্য করা যায় না। কারণ সময়াভাবে ঐ মৃত্তিকার প্রোফাইল বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠতে পারে না। নদীর দ্বারা বাহিত ও সঞ্চিত পলি থেকে যে পলি মৃত্তিকার সৃষ্টি হয় তাহার মধ্যে নির্দিষ্ট পরিলেখ দেখা যায় না। সেইরূপ লোয়েস মৃত্তিকায় বা হিমবাহ সঞ্চিত বস্তু পুঞ্জ থেকে উদ্ভুত মৃত্তিকায় প্রোফাইল সম্পূর্ণরূপে গড়ে ওঠে না। কেবলমাত্র পরিণত মৃত্তিকাতেই পরিলেখ বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে গড়ে ওঠে। সাধারণত স্বল্প বন্ধুর বা প্রায় সমতল ও সমতল ভূমিতে নির্দিষ্ট জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রভাবে দীর্ঘ সময় ধরে শিলামাতৃকার উপর জমে থাকা মূল শিলাখণ্ড থেকে যে আঞ্চলিক মৃত্তিকার উদ্ভব হয় তার মধ্যেই সুনির্দিষ্ট প্রোফাইল বা পরিলেখ গড়ে ওঠে। এইরূপ মৃত্তিকার নির্দিষ্ট কয়েকটি স্তর লক্ষ্য করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট একই শ্রেণিভুক্ত মৃত্তিকার পরিলেখ একই রকমের হয়। অধিক ঢালযুক্ত বৃষ্টিবহুল পর্বতগাত্র ভূমিধ্বস বা ভূমি ক্ষয়ের প্রাবল্য হেতু পরিলেখ গঠন প্রক্রিয়া বাধা পায় বলে পরিলেখ পরিণত বা সম্পূর্ণ হতে পারে না। ভূমি ক্ষয়ের ফলে এরূপ মৃত্তিকা থেকে কোন কোন স্তর সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়।

I. পরিলেখ বা প্রোফাইল বর্ণনা—কোন পরিণত মৃত্তিকায় সাধারণত প্রধান চারিটি স্তর লক্ষ্য করা যায় যথা—O বা A_0, A, B এবং C স্তর। স্তরগুলির মধ্যে O বা A_0 স্তরকে জৈব পদার্থের সঞ্চয় স্তর রূপে পরিগণিত করা হয়। A স্তরকে এ্যলুভিয়াল স্তর (Eluviated Horizon) বলে কারণ এই স্তর থেকে ধৌত প্রক্রিয়ায় (Leaching) মৃত্তিকার বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ চুঁইয়ে পড়া জলের সঙ্গে অপসারিত হয় বা B স্তরে সঞ্চিত হয়। B স্তরটি ইল্যুভিয়াল স্তর (Illuviated Horizon) বলে। কারণ A স্তর

থেকে অপসারিত বিভিন্ন মৌলিক ও জৈব পদার্থ এই স্তরে সঞ্চিত হয়। C স্তর প্রকৃতপক্ষে মূল শিলাখণ্ড বা আবহবিকারের ফলে সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকার এই চারটি স্তরের মধ্যে C স্তর ছাড়া অন্যান্য স্তরগুলি কয়েকটি উপস্তরে বিভক্ত যাহা নিম্নে আলোচিত হল।

(i) জৈব পদার্থের সঞ্চয় স্তর বা O/A_0 স্তর : মৃত্তিকার সর্বোচ্চ অবস্থিত অজৈব পদার্থে সমৃদ্ধ স্তরটি O বা A_0 স্তর নামে পরিচিত। এই স্তর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিম্নলিখিত উপস্তরে বিভক্ত।

O_1 বা A_{00} স্তর : এই স্তরে প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহাবশেষ প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় জমে থাকে। এজন্য জৈব পদার্থের মূল প্রকৃতি বা উৎস সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এই স্তরের গভীরতা 1 ইঞ্চি থেকে 2 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। এই স্তরের প্রকৃতি নির্ভর করে স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের উপরে। বনাঞ্চলে এই স্তরের মধ্যে সঞ্চিত থাকে শুকনো পাতা ও উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ। তৃণাঞ্চলে মরে যাওয়া ঘাসের আচ্ছাদন।

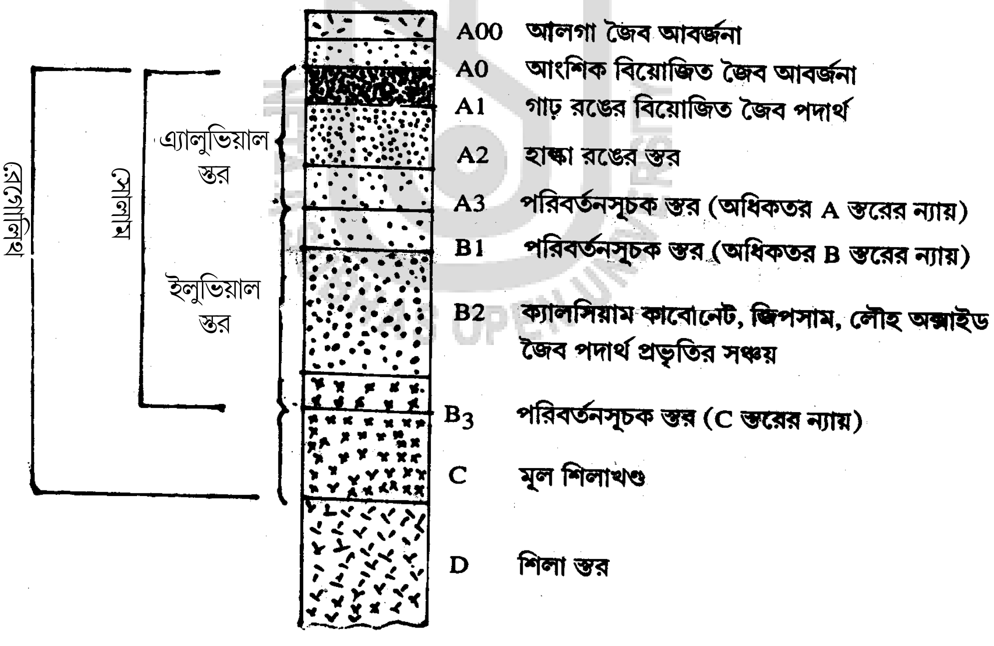

ছবি : 1.1 মৃত্তিকা পরিলেখ

O_2 বা A_0 স্তর : O_1 বা A_{00} স্তরের ঠিক নীচেই এই স্তর দেখা যায়। এই স্তরে জৈব উপাদান কিছুটা পচে যাওয়া অবস্থায় দেখা যায়। এজন্য জৈব পদার্থের মূল প্রকৃতি বা উৎস সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায় না। এই স্তরের সর্বনিম্ন অংশে পচে যাওয়া জৈব পদার্থ বা বিশ্লেষিত জৈব পদার্থের (যাহাকে হিউমাস বলে) সঞ্চয় দেখা যায়। বনাঞ্চলের মৃত্তিকায় এই স্তরটিকে 'H' স্তর রূপেও অবিভিন্ন

করা হয়। কারণ জৈব পদার্থ বিশ্লেষিত হয়ে কাল রঙের হিউমাসে পরিণত হয়। বিশ্লেষিত জৈব পদার্থ (Humified organic substance) জন্যই ইহাকে এই নামে অভিহিত করা হয়। 'H' স্তরের উপরেই অবস্থান করে 'F' স্তর যাহা জৈব পদার্থের আবর্জনার (Leaf litter) দ্বারা গঠিত। সরলবর্গীয় অরণ্য অঞ্চলের মাটির জৈব পদার্থের বিশ্লেষিত স্তরকে ডাফ (Duff) এবং পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য অঞ্চলের অনুরূপ মৃত্তিকা স্তরকে মুল (Mull) নামে অভিহিত করা হয়।

(ii) A বা খনিজ স্তর (Mineral Horizon) : A স্তরগোষ্ঠী মূলত খনিজ পদার্থের স্তর। এই স্তর থেকে ধৌত প্রক্রিয়ায় মাটির সূক্ষ্ম কাদা কণা ও অন্যান্য খনিজ উপাদান অপরিচিত হয় বলে ইহাকে এ্যালুভিয়াল স্তরও বলে। এই স্তর নিম্নলিখিত উপস্তরে বিভক্ত। এই স্তরে গভীরতা জলবায়ু ভেদে বিভিন্ন হয়, মরু প্রায় অঞ্চলে 6-8 ইঞ্চি, আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে 15-16 ইঞ্চি।

A_1 স্তর : খনিজ স্তর বা A স্তর গোষ্ঠীর সর্বোচ্চে অবস্থিত A_1 স্তর। এই স্তরের উপরিতলে হিউমাসের প্রভাবে গাঢ় রঙের হয়।

A_2 স্তর : এই স্তর থেকে বেশিরভাগ কাদা, কণা, অ্যালুমিনিয়াম ও আয়রন অক্সাইড অপসারিত হয়। এই স্তরে সিলিকার প্রাধান্য দেখা যায়। এই স্তর থেকে হিউমাস ও আয়রন অক্সাইড অপসারিত হয় বলে ইহার রঙ ধূসর বা ছাই রঙের হয়।

A_3 স্তর : A ও B স্তরের মধ্যবর্তী এই স্তর সমস্ত প্রোফাইলে দেখা যায় না। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য অনেকটা A_1 ও A_2-র ন্যায় কিন্তু B স্তর থেকে যথেষ্ট আলাদা। এজন্য ইহা একটি পরিবর্তনসূচক স্তর হিসাবে পরিগণিত হয়।

B স্তর : এই স্তরকে ইলুভিয়াল বা সঞ্চয় স্তর বলে। A স্তর থেকে ধৌত প্রক্রিয়া যে সমস্ত পদার্থ অপসারিত হয় সেগুলির অধিকাংশ B স্তরে সঞ্চিত হতে দেখা যায়, এই স্তরে কাদা কণা, আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ক্যালশিয়াম সালফেট ও অন্যান্য লবণ সঞ্চয় হতে দেখা যায়। এই স্তর কয়েকটি উপস্তরে বিভক্ত। যথা—B_1, B_2, B_3।

B_1 স্তর : A ও B স্তরের মধ্যবর্তী এই স্তরের বৈশিষ্ট্য B স্তরগুলির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু A স্তর থেকে অনেক আলাদা।

B_2 স্তর : এই স্তরেই B স্তর থেকে অপসারিত কাদাকণা আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, ক্যালশিয়াম কার্বনেট ও ক্যালশিয়াম সালফেটের সঞ্চয় দেখা যায়। হিউমাসও এই স্তরে সঞ্চিত হয়।

B_3 স্তর : ইহা একটি পরিবর্তনসূচক স্তর (Transitional layer)। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য ও B স্তরের অনেক কাছাকাছি কিন্তু C স্তর থেকে আলাদা।

C স্তর : এই স্তরটির মূল উপাদান হল আবহবিকার সৃষ্ট শিলাখণ্ড যা থেকে মৃত্তিকার উদ্ভব হয়েছে।

এজন্য এই স্তরকে মূল শিলাখণ্ডের (Parent material) স্তরও বলে। এই স্তরের ঠিক নীচেই অবস্থান করে শিলামাতৃকা যা থেকে মৃত্তিকার উদ্ভব হয়।

মৃত্তিকা প্রোফাইলের A, B ও C স্তরকে একত্রে রেগোলিথ (Regolith) বলে। এই স্তরগুলি আবহবিকারের ফলে সৃষ্টি হয়। এই স্তরগুলির উপাদান সূক্ষ্ম খনিজ ও অজৈবকণা এবং ছোট বড় প্রস্তর খণ্ড। A ও B স্তরকে একত্রে সোলাম (Solum) বলে। এই স্তরের উপাদান হল সূক্ষ্ম কোমল খনিজ ও জৈব কণা যাহা প্রস্তুত অর্থে মৃত্তিকা।

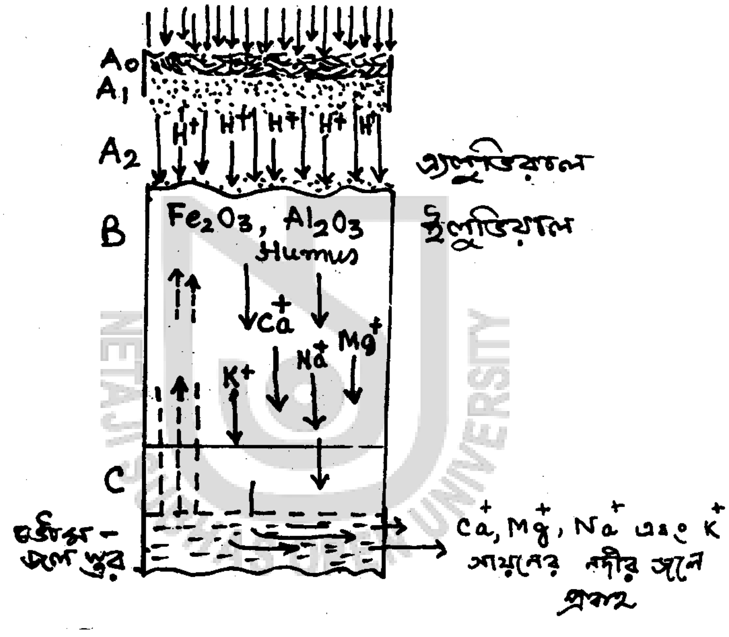

চিত্র : 1.2 পডজলাইজেশান প্রক্রিয়া

II. পরিলেখ গঠন প্রক্রিয়া : উপরিউক্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যুক্ত মৃত্তিকার O, A এবং B স্তর বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। উহারা সামগ্রিকভাবে পরিলেখ গঠন প্রক্রিয়ারূপে পরিগণিত।

(a) O বা জৈবস্তর গঠন প্রক্রিয়া : প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহাবশেষ মাটিতে সংযুক্ত হবার পর জারণ প্রক্রিয়া জীবাণুর দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়ে কাল রঙের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী উপাদান সৃষ্টি হয় থাকে হিউমাস বলে। হিউমাস গঠনে দুটি প্রক্রিয়া কার্যকরী হয় যথা হিউমিফিকেশন (Humification) এবং খনিজকরণ (Minerallization)। হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়ায় প্রাণীও উদ্ভিদের দেহাবশেষ জীবাণুর দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়ে হিউমাসে পরিণত হয়। খনিজকরণ প্রক্রিয়ায় জৈব পদার্থ বিয়োজিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড জল এবং অন্যান্য খনিজ সৃষ্টি করে।

নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ প্রোটিন জীবাণুর দ্বারা বিয়োজিত হয়ে প্রথমে অ্যামাইড উৎপন্ন হয় এবং তা থেকে অ্যামোনিয়া সৃষ্টি হয়। অ্যামোনিয়া থেকে প্রথমে নাইট্রাইট ও পরে নাইট্রেট সৃষ্টি হয়। অ্যামোনিফাইং ব্যাকটেরিয়ার (মাইক্রোকক্কাস) সহায়তায় নাইট্রোজেন যৌগের অ্যামোনিয়ায় পরিণত হওয়াকে অ্যামোনিফিকেশন বলা হয় এবং নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার (নাইট্রিসোমোনাস) সহায়তায় অ্যামোনিয়া নাইট্রাইটে পরিণত হওয়াকে অ্যামোনিফিকেশন বলা হয় এবং নাইট্রাইট নাইট্রোব্যাকটর এর সহায়তায় নাইট্রেটে পরিণত হওয়াকে নাইট্রিফিকেশন বলে। প্রোটিনের কার্বোনেশিয়াস অংশ বিয়োজিত হয়ে নানা প্রকার জৈব অ্যাসিড সৃষ্টি হয়। যথা—ফরমিক, অ্যাসেটিক, সাইট্রিক, ল্যাকট্রিক, অক্সালিক, বাট্রিক প্রভৃতি। প্রোটিনের সালফার অংশ সালফার অক্সিডাইজিং ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা বিয়োজিত হয়ে সালফিউরিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে। জৈব পদার্থের যে কোন অংশ বিয়োজিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় যাহার কিছু অংশ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণ করে। বাকি অংশ জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে।

জীবের দেহাবশেষ ও রেচন পদার্থ বিয়োজিত হয়ে যে সমস্ত উপাদান সৃষ্টি হয় তাহার প্রকৃতি নির্ভর করে জলবায়ু ও উদ্ভিদের প্রকৃতির উপর। আর্দ্র শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে জৈব পদার্থ বিয়োজিত হয়ে যে জৈব অ্যাসিড সৃষ্টি হয় তার বেশীর ভাগ অংশই মাটিতে সঞ্চিত হয়। জলে সহজে দ্রবণীয় জৈব অ্যাসিড চুঁইয়ে যাওয়া জলের সঙ্গে A স্তরে পৌঁছায়। কিন্তু বেশীরভাগ দ্রাব্য ও অদ্রাব্য জৈব অ্যাসিড হিউমাসের দ্বারা শোধিত হয়। এজন্য হিউমাসের রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় অম্লপ্রকৃতির এবং ইহা 'র' হিউমাস (Raw Humus) নামে পরিচিত। হিউমাসের অম্লতা ও অতিরিক্ত শীতের জন্য ব্যাকটেরিয়া জৈব পদার্থের বিয়োজন ঘটাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেপারে না বলে মাটির A0 বা O স্তরে না পচে যাওয়া বা অর্ধ পচে যাওয়া পদার্থের স্তর সঞ্চিত হয়। এপ্রকার স্তরকে humus-decay-accumulative layer বলে।

আর্দ্র ক্রান্তীয় বা উপক্রান্তীয় অঞ্চলে অধিক উষ্ণতা ও আর্দ্রতা হেতু জৈব পদার্থের পচন বা বিয়োজন অতিদ্রুত সংঘটিত হয় বলে জৈব অ্যাসিডের বেশীরভাগ অংশই ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা নিঃশেষিত হয়। জৈব পদার্থের দ্রুত হিউমিফিকেশন ও খনিজকরণ প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইডের সিংহভাগ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। বাকি অংশ জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে কার্বনিক অ্যাসিড জৈব পদার্থের খনিজ করণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন ক্ষারকীয় পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বাইকার্বোনেট যৌগ গঠন করে। এর ফলে মাটিতে হাইড্রক্সিল যৌগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এজন্য A_0 স্তরের রাসায়নিক বিক্রিয়া বেশী অম্লপ্রকৃতির না হয়ে অপেক্ষাকৃত কম অম্লপ্রকৃতির হয়। A_0 স্তরের এরূপ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ও বেশী উষ্ণতার জন্য ব্যাকটেরিয়া জৈব পদার্থের দ্রুত বিয়োজন ঘটায় বলে ইহার গভীরতা বেশী হয় না।

উষ্ণ আর্দ্র বা মরুপ্রায় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের প্রধান স্বাভাবিক উদ্ভিদ হল ঘাস। প্রতি বৎসর মরে যাওয়া ঘাসের বিভিন্ন অংশ মাটিতে সংযুক্ত হয় বলে মাটিতে হিউমাসের যোগান খুব বেশী থাকে। জৈব পদার্থ পচে গিয়ে যে হিউমাস তৈরী হয় তাহাতে ক্ষারকীয় মৌল বেশী থাকে। তাছাড়া ধৌত প্রক্রিয়া সেরূপ কার্যকরী না হওয়ায় মাটির ক্ষারকীয় মৌল অপসারিত হয় না। এজন্যও মাটির বিক্রিয়া হয় অল্প মাত্রায় ক্ষারকীয় বা নিরপেক্ষ প্রকৃতির। মাটির এরূপ রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং শীতের উষ্ণতা শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের তুলনায় বেশী হওয়ায় এবং গ্রীষ্মে বৃষ্টি হয় না বলে ব্যাকটেরিয়ার কর্মক্ষমতা ক্রান্তীয় অঞ্চলের ন্যায় সেরূপ বেশী এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ন্যায় কম হতে পারে না। এজন্য মাটিতে হিউমাসের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী হয় এবং A_0 স্তরের গভীরতা সবথেকে বেশী হয়।

(b) 'A' স্তরের সৃষ্টি : এই স্তর যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্টি হয়, তাকে এ্যালুভিয়েশান (Eluviation) বলে। A স্তর গোষ্ঠী মূলত খনিজ পদার্থের স্তর। এই স্তর থেকে বিভিন্ন প্রকার খনিজ উপাদান রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দ্রবণের মাধ্যমে নীচের স্তরে স্থানান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে এ্যালুভিয়েশান বলে। এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া প্রধানত দুই প্রকার। (i) রাসায়নিক ও (ii) যান্ত্রিক।

(i) রাসায়নিক এ্যালুভিয়েশান : বৃষ্টির জল মাটিতে প্রবেশ করলে প্রথমেই সহজে দ্রবণীয় খনিজ লবণ Na দ্রবীভূত হয় এবং সোডিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম সালফেট, সোডিয়াম বাই কার্বনেট এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড রূপে রূপান্তরিত হয়ে ভৌমজলের সঙ্গে মিশে যায় ও পরে অনুভূমিক প্রবাহরূপে প্রথমে নদী ও পরে নদীর মাধ্যমে সমুদ্রে মিলিত হয়। এই জন্য সমুদ্রের জল লবণাক্ত এবং ঐ দ্রবণ ক্লোরাইডধর্মী। রাসায়নিক এ্যালুভিয়েশানের পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষতঃ বৃষ্টিপাত বেশী হলে K, Ca, Mg, Mn, Al, Fe প্রভৃতি মৌল A স্তর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে নীচের B স্তরে নেমে আসে। উপরিউক্ত উপাদানগুলি জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার অ্যাসিডের উপস্থিতিতে সহজেই দ্রবীভূত হয়ে উপরের স্তর থেকে নীচে চলে যায়। মৃত্তিকার অম্লত্বের পরিমাণের উপর উপরিউক্ত পদার্থগুলির দ্রবণীয়তা নির্ভরশীল। ক্যালশিয়াম সালফেট ও ক্যালশিয়াম কার্বনেট সোডিয়ামের পরে দ্রবীভূত হয়। এই দুই উপাদানের মধ্যে ক্যালশিয়াম সালফেট সহজেই দ্রবীভূত হয় এবং এইজন্য নীচের স্তরে সহজেই উপরের স্তর থেকে ধৌত হয়ে চলে যায়। এইজন্য যে সমস্ত মৃত্তিকায় বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার জন্য ধৌত প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কম কিংবা সমস্ত মৃত্তিকায় ধৌত প্রক্রিয়া কোন কারণে ব্যাহত হয়। সেই সমস্ত মাটিতে ক্যালশিয়াম সালফেটের তুলনায় ক্যালশিয়াম কার্বনেট সহজেই দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু বৃষ্টির জলে CO_2 থাকায় উহার দ্রবণ মৃদু অ্যাসিডের ন্যায় কাজ করে ফলে বৃষ্টির জল ক্যালশিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) দ্রবীভূত হয়ে উপরের A স্তর থেকে নীচে চলে যায়। বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার হার কোন কারণে বিঘ্নিত হলে ক্যালশিয়াম কার্বনেট দ্রবীভূত হয় না যে সমস্ত মৃত্তিকায় ধৌত প্রক্রিয়ার পরিমাণ কম সেই সমস্ত মৃত্তিকায় উপরের স্তর থেকে $CaCO_3$ দ্রবীভূত অবস্থায় নীচের স্তরে চলে যায় এবং

B স্তরে জমা হয়। স্বল্প আর্দ্র জলবায়ুতে ক্যালশিয়াম কার্বনেটের সঞ্চয় দেখা যায়। অধিক বৃষ্টিপাত যুক্ত জলবায়ু অঞ্চলে যদিও সাধারণ অবস্থায় ধৌত প্রক্রিয়া বেশী হওয়ায় মৃত্তিকার কোন স্তরে ক্যালশিয়াম সালফেট ও ক্যালশিয়াম কার্বনেট সঞ্চিত হয় না। অর্থাৎ ধৌত প্রক্রিয়ায় এই দুই উপাদান সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয় তথাপি কোন কারণে ধৌত প্রক্রিয়া প্রতিহত হলে মৃত্তিকার A স্তর থেকে অপসারিত হয়ে B স্তরে জমা হয়।

মৃত্তিকার ধৌত প্রক্রিয়া খুব বেশী হলে মাটিতে অবস্থিত সহজে দ্রবণীয় উপাদানগুলি যথা সোডিয়াম ক্যালশিয়াম ও সোডিয়াম সালফেট ও ক্যালশিয়াম কার্বনেট মাটি থেকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয় এবং মাটি ক্রমশ অম্নধর্মী হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত অম্লতায় মাটির পলিগুলি ভেঙে গিয়ে যান্ত্রিক এ্যালুভিয়েশন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এবং কর্মদ কণিকার রাসায়নিক স্থায়িত্ব বিনষ্ট হয় অর্থাৎ কর্দম কণিকা বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে, যার ফলস্বরূপ সেসকুই অক্সাইড (Sesqui Oxide) R_2O_3 হাইড্রেটেড ফেরিক অক্সাইডের সৃষ্টি হয়। যা মৃত্তিকার উপরিস্তরে জমা হয়ে মাটির রঙকে লাল করে। মৃত্তিকা আরও বেশী অম্লধর্মী হলে উপরিস্তর থেকে লৌহ যৌগ মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশকারী জলের সঙ্গে অপসারিত হয়ে নীচের স্তরে জমা হয় যার ফলে মাটির উপরের A স্তরের উপস্তর A_2 স্তরের রঙ ধূসর হয়ে পড়ে। এরূপ অতিরিক্ত অম্ল অবস্থায় হিউমাস দ্রবীভূত হয়ে উপর থেকে নীচের স্তরে স্থানান্তরিত হয়। (এরূপ অবস্থা পডসল মাটিতে দেখা যায় কারণ পডসল মৃত্তিকার অম্লতার পরিমাণ অন্যান্য আবহগুলি মৃত্তিকার তুলনায় সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। এর কারণ একদিকে যেমন অতিরিক্ত ধৌত প্রক্রিয়া অন্যদিকে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অবস্থান) ক্রান্তীয় অঞ্চলের মৃত্তিকায় ধৌত প্রক্রিয়া বেশী হলেও এখানকার অরণ্য বা স্বাভাবিক উদ্ভিদ অম্লত্ব পছন্দ করে না। স্বভাবতই উদ্ভিদের দেহাবশেষ পচে গিয়ে যে হিউমাস সৃষ্টি হয় তার মধ্যে অম্লত্ব কম থাকে। পরন্তু কিছু পরিমাণে ক্ষারধর্মী পদার্থ সংযুক্ত হয়।

যান্ত্রিক এ্যালুভিয়েশান :—এই প্রকার এ্যালুভিয়েশানের ফলে মৃত্তিকার B এবং A স্তরের মধ্যে গ্রথনগত পার্থক্যের সৃষ্টি হয় মৃত্তিকার উপরিস্তর থেকে সূক্ষ্ম কর্দম কণিকা যান্ত্রিক উপায়ে দ্রবীভূত অবস্থায় নীচের স্তরে স্থানান্তরিত হয়। ফলে A স্তর হাল্কা গ্রথনযুক্ত হয়ে পড়ে এবং B স্তরে এর বিপরীত অবস্থা লক্ষ্য করা যায় এই প্রকার এ্যালুভিয়েশানের আধিক্য প্রধানত মৃত্তিকার পলি ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে যে সমস্ত মৃত্তিকায় বালির ভাগ বেশী থাকে যে সমস্ত মৃত্তিকায় যান্ত্রিক এ্যালুভিয়েশান বেশী কাজ করে। ফলে ঐরূপ মাটিতে রন্ধ্রগুলি বৃহত্তর হয়। যার মধ্য দিয়ে জল সহজেই প্রবেশ করতে পারে।

মাটি অতিরিক্ত মাত্রায় গঠনযুক্ত হলে যান্ত্রিক এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া প্রতিহত হয়। কারণ মৃত্তিকার কণাগুলি বিশেষত কার্যে কণিকাও অন্যান্য কণাগুলির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে বলে তা যান্ত্রিক উপায়ে উপরের স্তর থেকে নীচের স্তরে নেমে আসতে পারে না। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী হলে মাটিতে ধৌত প্রক্রিয়া খুব বেশী করে হয়। ফলে সূক্ষ্মকণাগুলি উপরের স্তর থেকে নীচের দিকে নেমে আসে।

এই দুই বিষয় ছাড়াও যান্ত্রিক এ্যালুভিয়েশান মৃত্তিকার কর্দম যৌগের প্রকৃতি এবং ক্ষারকীয় অবস্থায় উপরেও নির্ভর করে। এই প্রকার এ্যালুভিয়েশনের ফলে কখনও কখনও মৃত্তিকার নীচের স্তরে কঠিন প্যানের (Hard pan) সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকার কলয়েড কণিকা বা কর্দম কণিকা বিশ্লিষ্ট হয়ে সহজেই উপরের স্তর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে নীচের B স্তরে জমা হয় কারণ B স্তরের মৃত্তিকার কণাগুলি ইলেকট্রোলাইটের উপস্থিতিতে জোটবন্ধ হয় এবং উপরের থেকে অপসারিত কর্মদ কণিকাকে সঞ্চিত হতে বাধ্য করে।

(c) B স্তরের গঠন প্রক্রিয়া : যে প্রক্রিয়া B স্তর গঠিত হয় তাহাকে ইল্যুভিয়েশান (Illuviation) বলে। এই প্রক্রিয়া এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইল্যুভিয়েশান প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকার A স্তর থেকে স্থানান্তরিত বিভিন্ন পদার্থ B স্তরে সঞ্চিত হয়। B স্তরে বিভিন্ন পদার্থের সঞ্চয় প্রকৃতি অর্থাৎ ইল্যুভিয়েশান প্রক্রিয়া জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীল।

আর্দ্র শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের A স্তরে উৎপন্ন অ্যাসিড অল্প পরিমাণে এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়ায় B স্তরে পৌঁছলেও এই স্তরের রাসায়নিক বিক্রিয়া A স্তরের ন্যায় সেরূপ অম্লপ্রকৃতির হয় না। এই স্তরে সঞ্চিত কাদাকণা উপরের A স্তর থেকে স্থানান্তরিত ক্ষারকীয় পদার্থ অধিশোষণ করে বলে ইহার রাসায়নিক বিক্রিয়া A স্তরের ন্যায় সেরূপ অম্ল প্রকৃতির হয় না। A স্তরে অতিরিক্ত অম্লতা হেতু আয়রন (Fe) ও অ্যালুমিনিয়াম (Al) দ্রবীভূত হয়ে এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়ায় স্থানান্তরিত হয়ে B হয়ে হাইড্রক্সাইজ জেল রূপে সঞ্চিত হয়। তাছাড়া কর্দম ও হিউমাস A স্তর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে জেল রূপে B স্তরে সঞ্চিত হয়। এই সমস্ত পদার্থ B স্তরের মৃত্তিকা রন্ধ্রের মধ্যে ঢুকে গিয়ে রন্ধ্রগুলিকে বন্ধ করে দেয় ও জলের অপ্রবেশ্যতা সৃষ্টি হয়। আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম জেল এবং হিউমাস বারংবার আর্দ্র ও শুষ্ক হওয়ার ফলে বিভিন্ন খনিজকণা ওই জেলের সহায়তায় দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয় এবং বৃহদাকার পাথরের ন্যায় শক্ত পিণ্ড গঠন করে যাহাকে বলা হয় কংক্রিশান (Concretions)। কোন কোন ক্ষেত্রে B স্তরের উপরের দিকে আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম জেল এবং হিউমাস জমাট বেঁধে পাথরের ন্যায় শক্ত স্তর গঠন করে যাকে বলা হয় হার্ডপ্যান (Hardpan)।

আর্দ্র ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে মৃত্তিকার B স্তরে আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের ন্যায় আয়রন অ্যালুমিনিয়াম জেল এবং হিউমাসের সঞ্চয় দেখা যায় না। মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া অম্ল প্রকৃতির হওয়ার কোন প্রকার কার্বোনেটও B স্তরে সঞ্চিত হয় না। ঐ সমস্ত পদার্থের অনুপস্থিতির জন্য B স্তর নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলের ন্যায় সেরূপ দৃঢ় সংঘবন্ধ হয় না। অবশ্য কিছু পরিমাণ সিলিসিক অ্যাসিড, জৈব যৌগ, আয়রন কার্বোনেট অথবা আয়রন হাইড্রক্সাইড B স্তরে সঞ্চিত হয়ে সংযোগকারী পদার্থরূপে কাজ করে এবং এর ফলে ঐ স্তরে আয়রন স্টেশনের হার্ডপ্যান গঠিত হয়।

উপআর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলের মাটিতে B স্তরে সোডিয়ামের কোন সঞ্চয় দেখা যায় না বটে কিন্তু ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট সঞ্চিত হয়। এই প্রকার জলবায়ু অঞ্চলে আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম

নামমাত্র মুক্ত অবস্থায় থাকে। এর ফলে B স্তরে সংযোগকারী পদার্থের (Cementing Material) অভাবে ইহা সেরূপভাবে দৃঢ় হয় না।

শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে বৃষ্টির অভাবে এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া সেরূপ কার্যকর না হওয়ায় B স্তরে সোডিয়াম লবণের আধিক্য দেখা যায়। তাছাড়া অন্যান্য ক্ষারকীয় উপাদানও এই স্তরে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

(d) C স্তর গঠন প্রক্রিয়া : এই স্তর শিলামাতৃকার (Parent rock) আবহবিকারের ফলে উদ্ভুত হয়।

1.3.5 মৃত্তিকা সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক (Soil Forming Factors) :

আবহবিকার এবং প্রোফাইল বা পরিলেখ গঠনের মধ্য দিয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত নির্দিষ্ট মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। বিশেষত প্রোফাইল গঠনের বিভিন্ন পদ্ধতির তারতম্যের ফলে মৃত্তিকার গুণাগুণও বিভিন্ন হয়। মৃত্তিকার এরূপ ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য কতকগুলি নিয়ন্ত্রকের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং সামগ্রিকভাবে মৃত্তিকার উৎপত্তি এই সমস্ত নিয়ন্ত্রকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রখ্যাত মৃত্তিকা বিজ্ঞানী H. Jenny মৃত্তিকার বিভিন্ন গুণাগুণ ও তাদের নিয়ন্ত্রকের মধ্যে সম্পর্ক নিম্নলিখিত সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

S = (Cl, O, r, p, t................)

S = মৃত্তিকা, বিশেষত মৃত্তিকার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যথা—

(i) জৈব পদার্থের পরিমাণ, (ii) মৃত্তিকার গঠন (Structure) (iii) বুনন (texture) প্রভৃতি।

Cl = (Climate) জলবায়ু

O = (Organism) জীবজগৎ (প্রাণী ও উদ্ভিদ)

r = ভূপ্রকৃতি (Relief)

P = শিলাস্তর আবহবিকারের মাধ্যমে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যে পদার্থ গঠন করে (Parent material) অর্থাৎ মূল শিলাখণ্ড

t = সময় (time)

H. Jenny উপরিউক্ত সমীকরণটিকে কিছুটা পরিবর্তন করে নিম্নলিখিত সমীকরণ প্রকাশ করেন

S = f (Cl, O, r, p, t......)

f = কার্যকারিতা (function)

এই সমীকরণটির মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, কোন একটি নিয়ন্ত্রক ছাড়া অন্যান্যগুলির কোন পরিবর্তন না হলে মৃত্তিকার গুণাগুণ ঐ নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রকের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করবে।

উদাহরণস্বরূপ :— জীবজগৎ, ভূ-প্রকৃতি, পেরেন্ট মেটেরিয়াল ও সময়ের কোন তারতম্য না হলে মৃত্তিকার গুণাগুণ নির্ভর করে জলবায়ুর উপর। জলবায়ুর প্রকৃতিগত তারতম্যের উপর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত মৃত্তিকার উৎপত্তি হবে।

(a) জলবায়ু :— জলবায়ু মৃত্তিকা গঠনের উপাদানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিশেষত বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতার প্রভাব এ নিয়ে উল্লেখযোগ্য সামগ্রিকভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মৃত্তিকার জলের যোগানকে নিয়ন্ত্রিত করে যার উপর নির্ভর করে ধৌত প্রক্রিয়ার পরিমাণ। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পরোক্ষভাবে মৃত্তিকার বাতাসের উপস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অপরদিকে উষ্ণতা প্রত্যক্ষভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গতিকে প্রভাবিত করে। লক্ষ্য করা গেছে মৃত্তিকার ওরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গতি প্রতি 10° সে. উষ্ণতার বৃদ্ধিতে দ্বিগুণ হয়।

উষ্ণতার উপর মৃত্তিকার ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী অর্থাৎ জীবাণুর ক্রিয়াকলাপ (Micro biological activity) বিশেষভাবে নির্ভর করে। পরিশেষে উষ্ণতা বৃষ্টিপাতের কার্যকারিতাকেও নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ বৃষ্টিপাতের কার্যকারিতা নির্ভর করে মৃত্তিকা থেকে বাষ্পীভবনের পরিমাণ এবং উদ্ভিদ থেকে বাষ্পমোচনের উপর। এই দুটি বিষয়ই উষ্ণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

(b) বৃষ্টিপাত :— বৃষ্টিপাতের পরিমাণগত তারতম্য হেতু মৃত্তিকার ধৌত প্রক্রিয়ার পরিমাণ বিভিন্ন হয়। ফলে বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। ক্রান্তীয় আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলের বৃষ্টিপাত বেশী হওয়ার জন্য মৃত্তিকার ধৌত প্রক্রিয়া খুব বেশী হয় যার ফলে মৃত্তিকায় অবস্থিত সহজে দ্রবণীয় খনিজ পদার্থগুলি যেমন— সোডিয়াম, ক্যালশিয়াম ও পটাশিয়াম (Na, Ca, K প্রভৃতি মৃত্তিকা থেকে অপসারিত হয় এবং মৃত্তিকা অম্লধর্মী হয়ে পড়ে। স্বল্প আর্দ্র অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 20″ মত সেখানে মৃত্তিকার ধৌত প্রক্রিয়া বেশী না হওয়ায় অতি সহজে দ্রবণীয় ধাতব মৌল যেমন Na সহজেই দ্রবীভূত হয়ে অপসারিত হয়ে যায়। কিন্তু Ca উপরের স্তর থেকে ধৌত হয়ে নীচের B স্তরে জমা হয়। এর ফলস্বরূপ এরূপ মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক মরুপ্রায় জলবায়ু অঞ্চলের মৃত্তিকায় অবস্থিত সহজে দ্রবীভূত কোন খনিজ পদার্থ ধৌত প্রক্রিয়ায় অপসারিত হতে পারে না বিশেষত এরূপ বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে Na অথবা Mg মৌলের আধিক্য হেতু মাটি লবণাক্ত হয় শুধুমাত্র বৃষ্টিপাতের সর্বমোট পরিমাণই নয় মৃত্তিকার আর্দ্রতা মৃত্তিকার গুণাগুণকে প্রভাবিত করে। স্বল্প আর্দ্র অঞ্চলে মৃত্তিকায় জলের পরিমাণ (Soil moisture) কাম্য অবস্থায় থাকায় ক্ষুদ্র প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রিয়াকলাপ খুব বেশী হয় এবং উর্বর Charnazem (সারনোজোম) মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে আরো স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে উদ্ভিদের পরিমাণ কম হওয়ায় এবং মাটি শুষ্ক থাকায়

অপেক্ষাকৃত স্বল্প হিউমাস যুক্ত অনুর্বর মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়, যে সমস্ত অঞ্চলে তুষারপাত হয় এবং মৃত্তিকার উপর বরফের স্তর জমে থাকে সে সমস্ত স্থানে মৃত্তিকার অভ্যন্তর ভাগ থেকে বেরিয়ে যাওয়া তাপকে বাধা দেওয়ায় মৃত্তিকা উষ্ণ থাকে। জলের উপস্থিতি মৃত্তিকার মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। মৃত্তিকা আর্দ্র হলে রাসায়নিক বিক্রিয়া বেশী হওয়ার জন্য কর্দম কণিকার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলের মৃত্তিকা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলের মৃত্তিকা শিলাস্তরের যান্ত্রিক আবহবিকারের প্রাধান্যের জন্য মৃত্তিকায় বালুকণা পরিলক্ষিত হয়।

উষ্ণতা :— উষ্ণতা বিভিন্নভাবে মৃত্তিকার গুণাগুণকে প্রভাবিত করে। মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়া সামগ্রিকভাবে উষ্ণতার পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। স্বল্প উষ্ণতাযুক্ত মেরু অঞ্চলে মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়া অতি ধীর হতে দেখা যায়। যদিও হিমাঙ্কের নীচের উষ্ণতা মৃত্তিকা গঠন পুরোপুরিভাবে থেমে যায় না তথাপি গঠন প্রক্রিয়া অতি ধীরভাবে চলে। 30° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে সীমিত অতি উষ্ণ মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে অতি দ্রুত চলতে থাকে। এই অঞ্চলের উত্তর বা দক্ষিণ দিকে স্বল্প উষ্ণতাযুক্ত দীর্ঘ শীত ঋতুতে মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়া অতি ধীর গতিতে চলে।

স্বল্প উষ্ণতাযুক্ত অঞ্চলে সেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী সেখানে জলাভূমিতে বায়ুহীন (anaerobic) হিউমিফিকেশান প্রক্রিয়ার জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ পচে গিয়ে পিট বা বোদ মাটি (Bogesoil) উৎপন্ন হয়।

উষ্ণতার কম হওয়ার জন্য এরূপ জলাভূমিতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর অংশবিশেষ পুরোপুরি পচে না গিয়ে প্রায় অর্ধ পচনশীল অবস্থায় থেকে যায় অপরদিকে অতি উষ্ণতাযুক্ত অঞ্চলে অতিরিক্ত বাষ্পীভবনের ফলে মৃত্তিকা প্রায় শুষ্ক হয়ে যায়। উষ্ণ অঞ্চলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ বেশীরভাগ অংশ পচে গিয়ে বিনষ্ট হয়। ফলে মৃত্তিকার জৈব পদার্থের পরিমাণ একেবারেই কমে যায়। সামগ্রিকভাবে উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে মৃত্তিকার জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়।

(b) মূল শিলাখণ্ড (Parent Material)—আবহবিকারের ফলে উদ্ভূত উপাদান Parent Material মৃত্তিকার প্রকৃতি নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই উপাদান প্রধাননঃ দুভাবে মৃত্তিকা গঠনকে প্রভাবিত করে। যথা :— (i) উক্ত উপাদানের ভৌত প্রকৃতি (Physical Properties), (ii) রাসায়নিক প্রকৃতি।

(i) ভৌত প্রকৃত :— ভৌত প্রকৃতির মধ্যে মৃত্তিকার বুনন (texture) বিশেষভাবে মূল শিলাখণ্ড (Parent material) এর উপর নির্ভর করে। মূল শিলাখণ্ড যদি অম্লধর্মী আগ্নেয়শিলা থেকে উদ্ভুত হয় তাহলে তা থেকে যে মৃত্তিকার উদ্ভব হয় তার বুনন হয় বালুকাময়। গ্রিট, বেলেপাথর বা সাধারণভাবে বেলেপাথর থেকে সৃষ্ট শিলাখণ্ড থেকে যে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয় তার বুনন হয় বালুকাময়। অপরদিকে ক্ষারধর্মী শিলা সূক্ষ্মদানাযুক্ত পাললিকশিলা যথা—

কাদাপাথর থেকে উদ্ভূত শিলাখণ্ড থেকে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয় তাতে কর্দম কণিকার ভাগ বেশী থাকে। অর্থাৎ তার বুনন হয় চুনাপাথর থেকে উদ্ভূত শিলাখণ্ড ভিন্ন প্রকৃতির মৃত্তিকা সৃষ্টি করে যা নির্ভর করে বিভিন্ন অবস্থার উপর। কঠিন এবং বিশুদ্ধ চুনাপাথর থেকে যে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয় তার বুনন হয় স্থূল (Course texture) এবং মৃত্তিকাগত হয় অগভীর। অপরদিকে অন্য উপাদান মিশ্রিত চুনাপাথর (Impure Limestone) থেকে যে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয় তার বুনন হয় সূক্ষ্ম এবং গভীরতাও বেশী হয়। চুনাপাথর থেকে উঁচুতে যে কোন মৃত্তিকাই প্রধানত শুষ্ক হয় কারণ এই মৃত্তিকায় ছিদ্রতা অনেক বেশী থাকে এবং চুনাপাথর বিশেষত ফাটল যুক্ত হয়।

(ii) রাসায়নিক প্রকৃতি : মৃত্তিকার রাসায়নিক গুণাগুণ মূল শিলাখণ্ডের প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে কোন অম্লধর্মী মূল শিলাখণ্ড থেকে সৃষ্ট মৃত্তিকাতে অম্লতার পরিমাণ বেশী হওয়ায় মৃত্তিকা অম্লধর্মী হয়। বিপরীতক্রমে ক্ষারযুক্ত মূল শিলাখণ্ড থেকে উদ্ভূত মৃত্তিকায় ক্ষারের ভাগ বেশী হওয়ায় মৃত্তিকা ক্ষারধর্মী হয়। মূল শিলাখণ্ডে ক্ষারের পরিমাণ বেশী বা কম থাকার জন্য আবহবিকারের প্রকৃতির ও তারতম্য ঘটে বেশী ক্ষারযুক্ত মূল শিলাখণ্ডে আবহবিকারের ফলে মন্টমরিলো নাইট (Mont morillanite) কর্দম কণিকার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে কম ক্ষার যুক্ত আদি শিলাখণ্ড থেকে কেয়োলিননাইট (Kaolinite) প্রভৃতির কর্দম কণিকার সৃষ্টি হয়।

মৃত্তিকায় বা মূল শিলাখণ্ডে ক্ষারের পরিমাণ বেশী বা কমের জন্য মৃত্তিকা গঠনের ধৌত প্রক্রিয়ার (leaching) ও প্রকৃতিগত তারতম্যের হয়। স্বল্পক্ষারযুক্ত মূল শিলাখণ্ড থেকে ধৌত প্রক্রিয়ায় সহজেই ক্ষারকীয় পদার্থের অপসারণ ঘটায় মাটি অম্লধর্মী হয়ে পড়ে। এভাবে অম্লধর্মী অনুর্বর পডসল মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়, কিন্তু একই জলবায়ু যুক্ত অঞ্চলে (নাতিশীতোষ্ণ ও আর্দ্র) যদি মূল শিলাখণ্ডে ক্ষারের ভাগ বেশী থাকে মাটি পডসলের ন্যায় অম্লধর্মী হয় না। এজন্য ইংল্যান্ডের দক্ষিণ প্রান্তে অম্ল কোয়ার্জযুক্ত বেলে পাথরের উপর (Acid-Quartose sand) অনুর্বর পডসল মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে ঐ একই জলবায়ু অঞ্চলে ক্ষারধর্মী আগ্নেয়শিলার উপর অন্য প্রকৃতির মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়েছে।

(iii) মৃত্তিকার বর্ণ : মৃত্তিকার বর্ণ অনেকসময় মূলশিলাখণ্ডের রঙের উপর নির্ভরশীল। ইংল্যান্ডের লাল বেলেপাথর যুক্ত শিলাস্তর অঞ্চলে এজন্য লাল মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়েছে। অনেকসময় চুনাপাথর যুক্ত অঞ্চলে যে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয় তার বর্ণ নির্ভর করে চুনা পাথরের প্রকৃতির উপর। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে একপ্রকার মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। তাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় টেরারোসা (terra rossa) ব্রিটেনে সৃষ্ট কোন লাল রঙের মৃত্তিকা টেরারোসার অন্তর্গত। কোন কোন সময় চুনাপাথর থেকে উদ্ভূত মৃত্তিকার রং হয় ধূসর, যাকে বলা হয় রেঞ্জিনা। (Rendzina)।

(C) জীবজগৎ (Organism) : জীবজগৎ ও মৃত্তিকার গুণাগুণ নির্ধারণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যদিও এ সম্পর্কে মৃত্তিকা বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। তথাপি সাধারণভাবে বলা যায়,

জীবজগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল উদ্ভিজ্জের। প্রখ্যাত মৃত্তিকা বিজ্ঞানী নিকিফোরফ (Nikiforff) মারবার্ট (Marbut) এবং আরও অনেকের মতে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জও মৃত্তিকা। গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে যফের (Joffe) মতে উদ্ভিদ ছাড়া মৃত্তিকা সৃষ্টি হতে পারে না।

(i) জীবাণু : জীবজগতের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে উদ্ভিদ ছাড়াও মৃত্তিকার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীসমূহ (Micro organisms) এবং অন্যান্য বৃহৎ প্রাণীও মৃত্তিকা গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মৃত্তিকার মধ্যে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র প্রাণী সমূহ (Micro organisms) মৃত্তিকার রাসায়নিক ও ভৌত বৈশিষ্ট্যকে কিছু পরিমাণে নিরুপিত করে। মাটির মধ্যেই প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহাবশেষ সংযুক্ত হলে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া মূলত বায়বীয় ব্যাকটেরিয়া (aerobic) ঐ সমস্ত পদার্থের পচন ঘটাতে সহায়তা করে এবং ক্রমশঃ ঐ সমস্ত জৈবিক পদার্থ পচে গিয়ে কালো রঙের স্থায়ী পদার্থের সৃষ্টি হয়। যা হিউমাস (Humus) নামে পরিচিত। যে সমস্ত মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নিরপেক্ষ (Neutral) বা উহার কাছাকাছি সেই সমস্ত মাটিতেই উক্ত ব্যাকটেরিয়া ঐরূপ পচন ঘটাতে সাহায্য করে। যেসব ক্ষেত্রে মাটি অম্লধর্মী, সেখানে ব্যাকটেরিয়ার পরিবর্তে ছত্রাকের (Fungus) সাহায্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষের পচন ঘটাতে সহায়তা করে। জলাভূমি বা মৃত্তিকার নীচের স্তরে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে আর এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া যাহা অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়া (Anaerobic) নামে পরিচিত। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষের পচন ঘটায়। বায়ুর অনুপস্থিতিতে এইরূপ পচন ঘটে বলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষের বেশীর ভাগ অংশ পচে যায় এবং খুব বেশী পরিমাণে হিউমাস সৃষ্টি হয়।

মৃত্তিকার নাইট্রোজেনের পরিমাণ নির্ধারণ করতেও ব্যাকটেরিয়ার অবদান উল্লেখযোগ্য। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা অ্যামোনিয়াম লবণ তৈরী হলে তা থেকে প্রথমে নাইট্রাইট ও পরে নাইট্রেট তৈরী হয়। বিশেষ দু-ধরনের ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা যথা নাইট্রোমোনাস (Nitromonous) এবং (Nitrobactor) নাইট্রোব্যাকটর।

বাতাসের নাইট্রোজেনও অনেক সময় উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া বিশেষতঃ Azotobactor শোষণ করে এবং উদ্ভিদের কোষে সংযুক্ত করে। ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে বাতাস থেকে এইরূপ N_2 গ্রহণ বিশেষতঃ ভাল জাতীয় বা শিম জাতীয় উদ্ভিদে লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত ব্যাকটেরিয়া পূর্ব উক্ত উদ্ভিদগুলির মূলে অবুর্দ তৈরী করে সেখানে বসবাস করে। হিসাব করে দেখা গেছে এইভাবে মাটির মধ্যে 1 বছরে প্রতি হেক্টর জমিতে 160-300 কেজি নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ প্রোটিন ও সালফার ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা জারিত হয়ে সালফার তৈরী হয় এবং পরে সালফার থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরী হয়।

আয়রন ব্যাকটেরিয়া ফোরাস লবণকে (Ferrous salts) জারিক করে ফেরিক অক্সাইডে পরিণত করে। হ্রদ ও অন্যান্য জলাভূমির মাটিতে এইভাবে ফেরিক অক্সাইডের সৃষ্টি হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ও উদ্ভিদ ছাড়াও কয়েকটি অমেরুদণ্ডী বৃহৎ প্রাণী মৃত্তিকা গঠনে স্থান বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কেঁচো বা অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণী মৃত্তিকার মিশ্রণ ঘটিয়ে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি করে। মৃত্তিকার মধ্যে দিয়ে গর্ত তৈরী করে কেঁচো মাটিকে আলগা করতে সাহায্য করে। কেঁচোর বিষ্টা. ক্যালশিয়াম ও নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ। স্বভাবতই যেসব মৃত্তিকায় কেঁচো বেশী থাকে সে সমস্ত মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন ও ক্যালশিয়ামের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে বেশী হয়। এইরূপ মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতাও বেশী হয়।

(ii) স্বাভাবিক উদ্ভিদ :— মৃত্তিকার গঠনের বিভিন্ন উপাদানগুলির (factor) মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং মৃত্তিকার মধ্যে এরূপ নিবিড় সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় যে স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রকৃতিগত তারতম্যের জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদ অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভিদের দেহাবশেষ মাটিতে সংযুক্ত হওয়ার পর বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া (Bio-chemical processes) পচে গিয়ে জৈব পদার্থ বা হিউমাসের সৃষ্টি করে।

হিউমাসের প্রকৃতি ও পরিমাণ স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বনাঞ্চলের মৃত্তিকার তুলনায় তৃণাঞ্চলে জৈবিক পদার্থের পরিমাণ বেশী হয়। বনাঞ্চলের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি অঞ্চলে ভূমির উপর স্বল্প পরিমাণে নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ অবস্থান করায় হিউমাস গঠনের মূল উপাদান হল গাছের পাতা সমূহ। ফলে মৃত্তিকায় স্বল্প পরিমাণে হিউমাস সংযুক্ত হয়। এখানে মৃত্তিকা অম্লধর্মী পডসল প্রকৃতির বলে পাইন, ফার প্রভৃতি বৃক্ষগুলির বিভিন্ন অংশে অ্যাসিডের পরিমাণ বেশী থাকে। স্বভাবতই এরূপ উদ্ভিদের পাতা ও অন্যান্য অংশ পচে গিয়ে অ্যাসিড হিউমাসের সৃষ্টি করে। মৃত্তিকায় অ্যাসিডের পরিমাণ বেশী থাকায় ধৌত প্রক্রিয়ার হিউমাস ও দ্রবীভূত হয়ে নীচে নেমে যায়, ফলে হিউমাসের পরিমাণ কমে যায়। অপরদিকে পর্ণমোচী অরণ্যের বৃক্ষসমূহ সরলবর্গীয় অরণ্য অঞ্চলের বৃক্ষের ন্যায় অ্যাসিড সমৃদ্ধ হয় না, পর্ণমোচী অরণ্য অঞ্চলে বৃক্ষের পত্ররাজি এবং অন্যান্য অংশে অ্যাসিডের পরিবর্তে অন্যান্য ক্ষারধর্মী খনিজ উপাদানের প্রাধান্য বেশী। স্বভাবতই গাছের পাতা ও অন্যান্য অংশ পচে গিয়ে অপেক্ষাকৃত উর্বর হিউমাসের সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ ও তুলনামূলকভাবে বেশী নীচে কারণ অম্লতা কম থাকায় ধৌত প্রক্রিয়ায় হিউমাস দ্রবীভূত হয়ে নীচে অপসারিত হতে পারে না, তাছাড়া ভূমির উপরিভাগের বিভিন্ন প্রকার নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের পরিমাণ ও তুলনামূলকভাবে বেশী থাকে, যেগুলি এক বছরের মধ্যেই মরে যায় এবং তাদের দেহাবশেষ পচে গিয়ে প্রতি বছরই হিউমাসের উৎপত্তি হয় এবং মৃত্তিকায় সংযুক্ত হয়।

অরণ্যাঞ্চলের তুলনায় তৃণভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকায় হিউমাসের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। এর কারণগুলি হল বনাঞ্চলে কেবলমাত্র গাছের পাতা পচে গিয়ে হিউমাস সৃষ্টি হয়, স্বভাবতই এখানে হিউমাসের যোগান কম। তাছাড়া গাছের পাতা মৃত্তিকার উপরিভাগে সংযুক্ত হয় এবং পচে গিয়ে হিউমাস

সৃষ্টি করে বলে সংযুক্ত পত্ররাশির বেশিরভাগ অংশ, বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া নিঃশেষ করে, ফলে অপরদিকে তৃণভূমি অঞ্চলে হিউমাসের যোগান আসে দুইভাবে যথা :—(a) ঘাসের পাতা ও কাণ্ড সংযুক্ত হয়ে এবং (b) ঘাসের শিকড় মাটির অভ্যন্তরে অবস্থানের মাধ্যমে।

প্রতিবছর মরে যাওয়া ঘাসের শিকড় মাটির মধ্যে পচে যায় বলে এর বেশীরভাগ অংশ ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা নিঃশেষিত হয় না।

তাছাড়া প্রতি বছরই পুরানো ঘাস মরে যায় এবং নতুন ঘাস জন্মায় বলে মাটিতে হিউমাসের যোগান অনেক বেশী হয়, এছাড়া নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে গ্রীষ্ম শুষ্ক হওয়ায় বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া তৃণের বিভিন্ন অংশ পচন ঘটিয়ে নিঃশেষ করতে পারে না।

শুধুমাত্র হিউমাসের পরিমাণই নয় উহার ভৌত ও রাসায়নিক প্রকৃতিও উদ্ভিদের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। তৃণভূমি অঞ্চলে মৃত্তিকায় কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত (C : N) বেশী থাকে অর্থাৎ এরূপ মৃত্তিকায় হিউমাসের মধ্যে কার্বন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণে অধিক থাকে কিন্তু বনাঞ্চলের মৃত্তিকায় এদের অনুপাত হয় অপেক্ষাকৃত কম। সিলিকা, অ্যালুমিনিয়ামের অনুপাত (SiO_2 : Al_2) কিন্তু বনাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশী হয় এবং তৃণভূমি অঞ্চলে কম হয়। অপরদিকে ক্যালশিয়াম অক্সাইড ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের অনুপাত (Ca_0:Al_2O_3) প্রেইরী বা স্টেপ অঞ্চলের তুলনায় বনাঞ্চলের মৃত্তিকায় কম থাকে। মৃত্তিকার P^H ও উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। সাধারণভাবে বনাঞ্চলের মৃত্তিকায় P^H মাত্রা কম হয়, কিন্তু তৃণভূমি অঞ্চলে P^H এর পরিমাণ হয় বেশী। এছাড়াও মৃত্তিকার ধনাত্মক আয়ন বিনিময় (Cation exchange) প্রক্রিয়া স্বাভাবিক উদ্ভিদের উপর সবিশেষ নির্ভরশীল। তৃণভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকার হিউমাসে ক্ষার জাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকায় এখানে মৃত্তিকার ধনাত্মক আয়ন বিনিময় ক্ষমতা অনেক বেশী হয়, অপরদিকে বনাঞ্চলের সৃষ্ট হিউমাসে ক্ষার জাতীয় পদার্থের পরিমাণ অনেক কম হওয়ায় এইরূপ বিক্রিয়া অনেকাংশে কম হয়।

(d) ভূ-প্রকৃতি (Relief) :—কোন স্থানের ভূ-প্রকৃতি মৃত্তিকা গঠনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। ভূ-প্রাকৃতিক প্রত্যক্ষ প্রভাব সেই স্থানেই পরিলক্ষিত হয় যেখানে ভূমির ঢাল মৃত্তিকা ক্ষয়ের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। অধিক ঢালযুক্ত ভূমিতে দ্রুত মৃত্তিকা ক্ষয়ের মাধ্যমে কোন কোন সময় মৃত্তিকার উপরিভাগের বেশ কিছু অংশ অপসারিত হয়ে মৃত্তিকার বর্তিত প্রতিমূর্তি সৃষ্টি করে।

মৃত্তিকা গঠনে ভূ-প্রকৃতির নিম্নলিখিত পরোক্ষ প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(i) উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের পার্থক্য হেতু মৃত্তিকার আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রক হিসাবে ভূমিরূপের প্রভাব :— উচ্চতা, ভূমির ঢাল এবং বন্ধুরতার মাধ্যমে ভূ-প্রকৃতি উষ্ণতাকে প্রভাবিত করে। উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উষ্ণতা হ্রাসের জন্য ক্রমাগত উচ্চস্থানে বাষ্পীভবনের হার কমে আসায় মৃত্তিকার

ধৌত প্রক্রিয়া ঘটাতে বৃষ্টিপাতের কার্যকারিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এজন্য স্বল্পউচ্চতা সম্পন্ন সমভূমিতে উচ্চভূমির তুলনায় জলবায়ু হয় অপেক্ষাকৃত উষ্ণ প্রকৃতির এবং মৃত্তিকায় ধৌত প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কম হয়। উচ্চতার তারতম্যের জন্য উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের পার্থক্যের ফলে। ভিন্ন প্রকৃতির জলবায়ু বিভিন্ন উচ্চতায় দেখা যায়। এবং (মৃত্তিকাও হয় বিভিন্ন প্রকৃতির Soil forming processes) প্রাধান্য লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত উচ্চ পর্বতে অধিক উচ্চতায় নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু দেখা যায় এবং এইরূপ উচ্চতায় পডজল প্রকৃতির অনুর্বর মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়। অপরদিকে উচ্চভূমির পাদদেশে বা সমভূমিতে অপেক্ষাকৃত উষ্ণতা বেশী হওয়ায় ল্যাটেরাইট প্রকৃতির মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়।

(ii) ভূমির ঢালের প্রভাব :— (Aspect of slope) শুধুমাত্র উচ্চতা নয়, ভূমির ঢালও পরোক্ষভাবে উষ্ণতা ও স্বাভাবিক উদ্ভিদকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মৃত্তিকা গঠনকে প্রভাবিত করে। মালভূমি বা পর্বতের ঢালে অবস্থানগত তারতম্যের জন্য উষ্ণতার পার্থক্য দেখা যায়। উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত উচ্চভূমি দক্ষিণঢালে উত্তর ঢাল অপেক্ষা বেশি উষ্ণতা পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই দক্ষিণ ঢালে মৃত্তিকার প্রতিমূর্তি গঠনে বিশেষ প্রক্রিয়া কার্যকরী হয় এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। উত্তর ঢালে উষ্ণতা কম হওয়ার জন্য অনুর্বর পডজল মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। H. Pollman সুইজারল্যান্ডের অরণ্য অঞ্চলে মৃত্তিকা গঠনে ভূমিরূপের উচ্চতা এবং ঢালের পার্থক্যের জন্য উষ্ণতার তারতম্য হেতু নিম্নলিখিত প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।

উচ্চতা	**ঢাল**	**Aspect**	**মৃত্তিকার 10 সে: মি: গভীরতায় উত্তাপ 0° সে:**			
(মিটারে)			**শীত**	**বসন্ত**	**গ্রীষ্ম**	**শরৎ**
1910	30°	S	3.2°	12.6°	17.4°	17.7°
1900	32°	N,NE	-0.8°	6.2°	9.7°	9.3°

উপরিউক্ত বনাঞ্চলে ভূমিরূপের উত্তর ঢালে অম্লধর্মী পডজল মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু উষ্ণ দক্ষিণ ঢালে ক্ষার প্রকৃতির চুন সমৃদ্ধ মৃত্তিকার (Calcareous Soil) সৃষ্টি হয়েছে।

(iii) মৃত্তিকার আর্দ্রতার নিয়ন্ত্রণে ভূমিরূপের প্রভাব :—

ভূ-প্রকৃতি কোনস্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং জলনিকাশি ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ ওয়েলসর অঞ্চলে স্লো ডাউন পর্বতে 3570 ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট অঞ্চলে 200° মত বৃষ্টিপাত ঘটে। কিন্তু সমুদ্র উপকূলের সমভূমিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র 25″ শুধুমাত্র বৃষ্টিপাতই নয় উচ্চতা জলনিকাশি ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। উচ্চ পর্বতে বা মালভূমিতে উপত্যকা এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চ অংশের

মধ্যে ভৌমজলের গভীরতায় বিস্তার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ভৌমজলের এরূপ অবস্থানগত তারতম্য কোন স্থানের মৃত্তিকার আর্দ্রতা এবং বাতাসের উপস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে বা নদী উপত্যকায় ভৌমজল ভূ-পৃষ্ঠ থেকে একটু নীচেই অবস্থান করায় ধৌত প্রক্রিয়া নীচের দিকে গভীরতা পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে না। ফলে মৃত্তিকার প্রতিমূর্তির গভীরতাও বেশী হয় না। কিন্তু সুনিকাশি যুক্ত স্থানে অর্থাৎ পাহাড় বা মালভূমির উপরিভাগে অথবা দুই উপত্যকার মধ্যবর্তী উচ্চ অংশে জল সহজেই নিকাশ হওয়ায় মাটির মধ্যে বাতাসের পরিমাণ বেশী থাকে এবং ধৌত প্রক্রিয়াও নীচে অধিক গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ফলে মৃত্তিকার প্রতিমূর্তি গভীরতা অনেক বেশী হয় ভূ-প্রকৃতি পরোক্ষভাবে মৃত্তিকার আর্দ্রতা এবং বাতাসের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে মৃত্তিকার অন্যান্য ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে নিম্নভূমিতে বিশেষত জলাভূমিতে উদ্ভিদ ও জীবদেহের পচনে ব্যাকটেরিয়ার কাজ পরিমিত বা স্বল্প হওয়ায় মৃত্তিকায় জৈবিক পদার্থের পরিমাণ বেশী হয়। নাইট্রোজেন ফলে (N_2) পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে মৃত্তিকায় বাতাসের পরিমাণ বেশী হওয়ায় ব্যাকটেরিয়া বেশী প্রাধান্য পায় ফলে স্বল্ব পরিমাণ জৈবিক পদার্থের সৃষ্টি হয় ও নাইট্রোজেনের পরিমাণও কম হয়।

মরু অঞ্চলে নিম্নভূমিতে বা প্লায়া অঞ্চলে ভৌমজল ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকায় শুষ্ক ঋতুতে লবণ মিশ্রিত ভৌমজল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে (Capilary pore space) জল ভূপৃষ্ঠে উঠে আসে পরে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে জল অপসারিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে লবণ স্তর জমে থাকে। কিন্তু আর্দ্র ঋতুতে মৃত্তিকার পৃষ্ঠস্তরে লবণস্তর জমে থাকে। কিন্তু আর্দ্র ঋতুতে মৃত্তিকার পৃষ্ঠ স্তরে জমে থাকা লবণ ধৌত হয়ে পুনরায় ভৌমজলে অপসারিত হয়। এজন্য মরু অঞ্চলের মৃত্তিকা লবণাক্ত বা ক্ষারকীয়।

মৃত্তিকার উপর ভূ-প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়ের (উচ্চতা, ঢাল প্রভৃতি) উপরিউক্ত প্রভাব হেতু একই স্থানে ভূ-প্রকৃতির পার্থক্যের জন্য পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় মৃত্তিকা অবস্থান করে। ভূমির বিভিন্ন ঢালে মৃত্তিকা পরিলেখ'র এরূপ ক্রম পর্যায়কে সয়েল ক্যাটেনা (Soil Catena) বলে।

(c) মানুষের প্রভাব :— মৃত্তিকার গুণাগুণ পরিবর্তিত করতে মানুষের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। মানুষের বিভিন্ন কর্মধারা যথা : কৃষিকার্য, কাষ্ঠ আহরণ, সেচকার্য, পশুপালন, কৃষিজমিতে সার প্রয়োগ প্রভৃতি মৃত্তিকার গুণাগুণ পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। মানুষের এই সব কর্মধারা বিশেষত ধর্মাঞ্চলের বিনাশ অথবা নতুন জমিকে কৃষিকার্যের আওতায় আনার ফলে মৃত্তিকার ক্ষয় বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। কোন কোন সময় মৃত্তিকার ক্ষয় এত বেশী হয় যে, মৃত্তিকার কর্তিত প্রতিমূর্তি সৃষ্টি হয়।

পূর্বে অরণ্যচ্ছাদিত বা তৃণাঞ্চলকে কৃষিকার্যের আওতায় আনা হলে মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বহুল পরিমাণে কমে যায়। বিপরীতক্রমে যখন কোন স্থানে বনসৃজনের প্রকৃতির উপরে মৃত্তিকার গুণাগুণ পরিবর্তিত হয়। যদি পর্ণমোচী অরণ্য অঞ্চল নিঃশেষ করে সরলবর্গীয় বনভূমি সৃষ্টি

করা যায় তাহলে সে স্থানে অম্লধর্মী পডজল মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে সরলবর্গীয় বনভূমির স্থানে পর্ণমোচী বৃক্ষের সৃষ্টি করা হলে পডজল মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে সরলবর্গীয় বনভূমির স্থানে পর্ণমোচী বৃক্ষের সৃষ্টি করা হলে পডজল মৃত্তিকার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত উর্বর বাদামি রঙের মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়।

জমিতে সার প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি যেমন পরিবর্তন ঘটায় সেরুপ একই কর্মধারার ফলে মৃত্তিকার অবনমনও ঘটতে দেখা যায়। মৃত্তিকার বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক ও জৈবিক সার প্রয়োগে মৃত্তিকার মূল উর্বরতা অনেকাংশে বৃদ্ধি হতে পারে। মৃত্তিকার রাসায়ানিক ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ ব্যবহারে বিশেষত : (জিপসাম এবং চুন) পরিবর্তিত হয়, অম্লধর্মী মৃত্তিকায় অম্ল বিক্রিয়া চুন সহযোগে অপসারিত করা যায়। অনুরূপভাবে অধিক ক্ষার যুক্ত মৃত্তিকায় পরিমিত জিপসাম প্রয়োগে মৃত্তিকার ক্ষতিকারক ক্ষারকীয়তা বহুল পরিমাণে দূর হয়।

কেবলমাত্র রাসায়নিক গুণাগুণই নয় মৃত্তিকার ভৌত গুণাগুণ ও মানুষের কর্মধারায় পরিবর্তিত হতে পারে। স্থূল কণিকাযুক্ত মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ প্রয়োগ করলে মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতা, মৃত্তিকার গঠনগত গুণাগুণ (structure), বাতাসের উপস্থিতি (Soil air) প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। এইরূপ মৃত্তিকায় সূক্ষ্ম কর্দম কণিকা প্রয়োগে মৃত্তিকার গ্রথণ, (texture) হয় সূক্ষ্ম এবং ইহার জলধারণ ক্ষমতা স্থিতিস্থাপকতা প্রভৃতি ভৌত গুণাগুণ এবং মৃত্তিকার ধনাত্মক আয়ন বিনিময় ক্ষমতা (Cation exchange) বৃদ্ধি পায়। মরুভূমি অধ্যুষিত নীলনদী অববাহিকা অঞ্চলে কর্দম কণিকার প্রয়োগের ফলে মৃত্তিকার উপরিউক্ত গুণাগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে এখানে বিভিন্ন শস্যের চাষ করা সম্ভব হয়েছে।

সেচ কার্যের ফলে অনেক সময় উর্বব মৃত্তিকার অবনয়ন ঘটার ফলে অনুর্বর মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। সেচ সেবিত অঞ্চলে নিকাশি ব্যবস্থা ভাল না হলে সেচের জলের সঙ্গে মৃত্তিকার লবণ ধুয়ে গিয়ে নীচের ভৌমজলকে সমৃদ্ধ করে। শুষ্ক ঋতুতে লবণাক্ত ভৌমজল মৃত্তিকার ক্ষুযদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে উপরে উঠে আসে এবং জল বাষ্পীভূত হয়ে মৃত্তিকার লবণের স্তর সৃষ্টি করে, ফলে মৃত্তিকা ক্রমাগত লবণাক্ত হয়ে পড়ে এবং কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত হয়, যেমন—ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের সেচ সেবিত বিভিন্ন উর্বর কৃষিভূমির মৃত্তিকা লবণাক্ত হওয়ায়, কৃষিকার্যের অনুপযোগী হয়ে উঠেছি।

পশুচারণের ফলে একদিকে যেমন মৃত্তিকা ক্ষয় বৃদ্ধি পায় অপরদিকে বিভিন্ন গবাদি পশুর বিষ্ঠা মাটিতে সংযুক্ত হয়ে, জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

(f) সময় :—(Time) মৃত্তিকা গঠন সময়ের উপর নির্ভরশীল। মৃত্তিকা আবহবিকার এবং মৃত্তিকার প্রতিমূর্তি গঠন প্রক্রিয়া (Soil profile development process) দ্বারা সৃষ্টি হয়। এই দুই প্রক্রিয়া অতি ধীর স্বভাবতই মৃত্তিকার প্রতিমূর্তির বৈশিষ্ট্যযুক্ত সম্পূর্ণ মৃত্তিকা প্রতিমূর্তি সৃষ্টি হয়।

বহু শত সহস্র এমনকি লক্ষ বৎসর ধরে মৃত্তিকা গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিণত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকা গঠনে সময়ের তারতম্যও দেখা যায়। সময়ের এরূপ তারতম্য নির্ভর করে মৃত্তিকা গঠনে প্রভাব বিস্তারকারী অন্যান্য নিয়ন্ত্রক যথা জলবায়ু, জীবমণ্ডল, ভূ-প্রকৃতি, মূল শিলাখণ্ড প্রভৃতির পারস্পরিক ক্রিয়ার উপরে। উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুর বনভূমি অধ্যুষিত অঞ্চলে রাসায়নিক আবহবিকার দ্রুততার সঙ্গে সংঘটিত হয় বলে মৃত্তিকা গঠনও দ্রুততর হয়। নাতি উচ্চ, বন্ধুর ভূমিতে অপেক্ষাকৃত মৃদু ঢালে অম্লধর্মী বেলে দোআঁশ মাটির উপর প্রোফাইল গঠন দ্রুত সম্পন্ন হয়। শুষ্ক অঞ্চল বা শীতল মেরু অঞ্চলে রাসায়নিক আবহবিকার বিশেষভাবে প্রতিহত হওয়ার জন্য মৃত্তিকা গঠন অতি ধীরে চলতে থাকে। অনুকূল অবস্থায় নির্দিষ্ট পরিলেখ বৈশিষ্ট্যযুক্ত মৃত্তিকা সৃষ্টি হতে সময় লাগে মাত্র দুইশত বর্ষ। অপরদিকে প্রতিকূল অবস্থায় পরিণত মৃত্তিকা সৃষ্টি হতে সময় লাগে শত সহস্র বৎসর। সদ্য সঞ্চিত ক্ষয়জাত পদার্থ থেকে যে, মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়েছে তাহার সুনির্দিষ্ট প্রোফাইল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না কারণ সময়ের অভাবে প্রোফাইল গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে পারেনি। নদীর দ্বারা সঞ্চিত পলি বা হিমবাহের দ্বারা বাহিত মোরেন বা লোয়েস থেকে যে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলিতেও সুনির্দিষ্ট কোন পরিলেখ বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে না কারণ উহাদের বয়স কয়েক শত বৎসর মাত্র।

1.4 সারাংশ :

মৃত্তিকার গুরুত্ব : প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি অন্যতম উপাদান হল মৃত্তিকা। মৃত্তিকা বাস্তুতন্ত্রের ধারক ও বাহক বাস্তুতন্ত্রের সর্বনিম্নস্তরে রয়েছে উদ্ভিদ। মৃত্তিকা সেই উদ্ভিদের আবাসস্থল। মৃত্তিকা একটি অন্যতম সম্পদ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অন্ন বস্ত্রের সংস্থান অনেকাংশেই মৃত্তিকার সুষ্ঠু ও বৈজ্ঞানিকসম্মত ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল এজন্য প্রয়োজন হয় মৃত্তিকা সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞান বা তথ্যের। শষ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম সোপান হল মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি। এজন্য প্রয়োজন হয় মৃত্তিকার উর্বরতাবৃদ্ধিকারী বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক যথা মৃত্তিকার গ্রথন, গঠন, আর্দ্রতা প্রভৃতি ভৌত গুণাগুণ এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া, জৈব পদার্থের পরিমাণ, নাইট্রোজেন, ফসফরাস পটাশ প্রভৃতি মুখ্য পুষ্টি মৌলের পরিমাণ, আয়ন বিনিময় ক্ষমতা প্রভৃতি রাসায়নিক গুণাগুণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। তাছাড়া মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কেও বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

মৃত্তিকার সংজ্ঞা : ভি. ভি. ডকুচায়েভের সংজ্ঞা অনুসারে মৃত্তিকা হল এমন একটি বস্তু যা প্রকৃতিতে শিলাস্তরের আবহবিকার, জলবায়ু, জীবনযাত্রা, ভূপ্রকৃতি এবং মানুষের উৎপাদনশীল কর্মপ্রণালীর জটিল প্রভাবে স্বাভাবিকভাবে বহুবৎসর ধরে সৃষ্টি হয়েছে এবং ক্রমশ বিবর্তিত হয়েছে।

মৃত্তিকার উপাদান : মৃত্তিকা একটি ত্রিমাধ্যযুক্ত পদার্থ বিশেষ। কারণ ইহা কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। মৃত্তিকার কঠিন উপাদান হল ইহার খনিজ ও জৈব কণা, মৃত্তিকার বালি কাদা

ও পলি খনিজকণার অন্তর্গত। খনিজ কণাগুলি প্রাথমিক এবং পরিবর্তিত এই দুইভাগে বিভক্ত। বালি কণা, প্রাথমিক খনিজ কণার অন্তর্ভুক্ত। ইহার পরিবর্তিত খনিজ কণা হল কাদা কণা। তাছাড়া গঠন বিহীন ধূলি সদৃশ্য লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ও সিলিকন অক্সাইড, ক্যালশিয়াম কার্বোনেট ও বিভিন্ন দ্রবণীয় লবণ যথা ক্যালশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম প্রভৃতিও পরিবর্তিত খনিজের অন্তর্ভুক্ত। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ পচে গিয়ে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকার তরল উপাদান হল বিভিন্নপ্রকার মৃত্তিকার জল। মৃত্তিকার বায়ু হল ইহার গ্যাসীয় উপাদান।

মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়া : মৃত্তিকার উৎপত্তির সঙ্গে দুটি প্রক্রিয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িত যথা (i) আবহবিকার ও (ii) স্তরায়ন পদ্ধতি।

(i) আবহাওয়ায় বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে শিলাসমূহের বিচুর্ণীকরণ বা রাসায়নিক পরিবর্তনে ক্রমশ শিথিল হয়ে যাওয়াকে আবহবিকার বলে। ইহার ফলে শিলা ক্রমশ শিথিল ও সূক্ষ্ম পদার্থ বা মৃত্তিকাকণার সৃষ্টি করে। আবহবিকার যান্ত্রিক বা রাসায়নিক দুই পদ্ধতিতে সংঘটিত হয় এবং উহারা যথাক্রমে যান্ত্রিক ও রাসায়নিক আবহবিকার নামে পরিচিত। যান্ত্রিক ও রাসায়নিক আবহবিকার বিভিন্ন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

(ii) মৃত্তিকার প্রোফাইল বা পরিলেখ গঠন প্রক্রিয়া : মৃত্তিকা গঠনের আর একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত মৃত্তিকাস্তরের সৃষ্টি। মৃত্তিকার পৃষ্ঠস্তর থেকে মূল শিলাখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত উলম্ব প্রস্থচ্ছেদকে মৃত্তিকার প্রোফাইল বা পরিলেখ বলে পরিণত মৃত্তিকার প্রধানত চারটি স্তর লক্ষ্য করা যায় যথা O বা A_0, A, B এবং C স্তর। O বা A_0 স্তরকে জৈবপদার্থের সঞ্চয়স্তর রূপে পরিগণিত। A স্তরকে এ্যালুভিয়াল স্তর বলে কারণ এই স্তর থেকে ধৌত প্রক্রিয়া মৃত্তিকার বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ চুঁইয়ে পড়া জলের সঙ্গে অপসারিত হয় বা B স্তরে সঞ্চিত হয়। B স্তরটি ইল্যুভিয়াল স্তর বলে কারণ এই স্তরে A স্তর থেকে অপসারিত উপাদান সঞ্চিত হয়। C স্তর মূল শিলাখণ্ড দ্বারা গঠিত। উক্ত স্তরগুলির বিভিন্ন উপভাগে বিভক্ত যথা A_{00}, A_0, A_1, A_2, A_3, B_1, B_2 ও B_3 স্তর।

মৃত্তিকার A_0 স্তর হিউমিফিকেশন ও খনিজকরণ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। খনিজকরণ প্রক্রিয়া, জৈব পদার্থ বিয়োজিত হয়ে কার্বনডাইঅক্সাইড, জল, অন্যান্য গ্যাস এবং খনিজের সৃষ্টি হয়। হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়ায় জীবের দেহাবশেষ নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ প্রোটিন বিয়োজিত হয়ে কাল রঙের হিউমাস সৃষ্টি হয়।

A স্তরের সৃষ্টি হয় অ্যালুভিয়েশান (Eluviation) প্রক্রিয়ায়। A স্তর থেকে বিভিন্ন প্রকার খনিজ উপাদান বা জৈব পদার্থ চুঁইয়ে পড়া জলের সঙ্গে অপসারিত হয়ে নীচের B স্তরে সঞ্চিত হয় বা নিকাশি ব্যবস্থার মাধ্যমে মাটি থেকে সম্পূর্ণরূপে অবসারিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া বলে। ইহা দুইটি ভাগে বিভক্ত যথা—(a) রাসায়নিক এ্যালুভিয়েশান ও (b) যান্ত্রিক এ্যালুভিয়েশান। যান্ত্রিক

এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া চুঁইয়ে পড়া জলের সঙ্গে কাদা বা পলি কণা অপসারিত হয়ে মাটির গ্রথনযুক্ত স্তরের সৃষ্টি করে। রাসায়নিক এ্যালুভিয়েশানে রাসায়নিক প্রক্রিয়া জলের সঙ্গে বিভিন্ন খনিজ দ্রবীভূত হয়ে A স্তর থেকে অপসারিত হয়।

B স্তরের সৃষ্টি হয় ইল্যুভিয়েশান প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়া মৃত্তিকার A স্তর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে B স্তরে সঞ্চিত হয়। উপআর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে B স্তরে ক্যালশিয়াম কার্বোনেটের সঞ্চয় দেখা যায়। আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের পডজল মৃত্তিকার B স্তরে অ্যালুমিনিয়াম ও লৌহ অক্সাইড এবং হিউমাসের সঞ্চয় দেখা যায় এগুলি সঞ্চিত হয় ঐ স্তরে শক্তি পিণ্ড বা প্যালন গঠন করে।

মৃত্তিকা সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক : মৃত্তিকা সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক হল জলবায়ু, জীবজগৎ মূল শিলাখণ্ড, ভূমিরূপ, মানুষ ও সময়।

(a) জলবায়ু : জলবায়ুর প্রকৃতি বিশেষত বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতার তারতম্যে মৃত্তিকার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুতে অম্লধর্মী ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা. নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুতে পডজল মৃত্তিকা এবং উপআর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে চারনোজেম মৃত্তিকা, শুষ্ক মরু অঞ্চলে ক্ষারধর্মী লবণাক্ত বা ক্ষারকীয় মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়। জলবায়ুর তারতম্য হেতু এ্যালুভিয়েশান ও ইল্যুভিয়েশান প্রক্রিয়া পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে এইরূপ বিভিন্ন মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়।

(b) জীবজগৎ : স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও জীবাণুর উপর মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়া অনেকাংশে নির্ভরশীল। মাটি জৈব পদার্থ তথা হিউমাসের পরিমাণ এই দুই উপাদনের উপর নির্ভর করে। অরণ্য অঞ্চলের তুলনায় তৃণভূমি অঞ্চলের মাটিতে হিউমাসের পরিমান বেশী থাকে। নাতিশীতোষ্ণ বনভূমি বা সরলবর্গীয় অরণ্য অঞ্চলে পডজল মৃত্তিকা, ক্রান্তীয় ্রণ্য অঞ্চলের ল্যাটেরাইট এবং নাতিশীতোষ্ম তৃণভূমি অঞ্চলে চারনোজেম মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়। অরণ্য অঞ্চলের তুলনায় তৃণভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকায় কার্বন ও নাইট্রোজেন অনুপাত বেশী থাকে। তৃণভূমি অঞ্চলে মৃত্তিকার অরণ্য অঞ্চলের মৃত্তিকার তুলনায় P^H বেশী হয়। মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রে জীবাণুর দ্বারা নির্ধারিত হয়।

(c) ভূ-প্রকৃতি : উচ্চতার পার্থক্য হেতু, বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের পার্থক্য হয় বলে মৃত্তিকার আর্দ্রতা ও উষ্ণতার সম্পর্কে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভূমির ঢালের পার্থক্যের জন্য মৃত্তিকার উষ্ণতার তারতম্য হয়। ভূমির বিভিন্ন ঢালে এ্যালুভিয়েশানের পার্থক্যের জন্য PH এর ও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া জৈব পদার্থের পরিমাণেও পার্থক্য দেখা যায়। একই স্থানে বিভিন্ন ঢালে ভিন্ন প্রকৃতির মৃত্তিকার অবস্থানকে সয়েল ক্যাটেনা বলে।

(d) মূল শিলাখণ্ড : মূল শিলাখণ্ড তথা শিলা মাতৃকা মৃত্তিকার বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে। মৃত্তিকার গ্রথন, রঙ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া শিলার উপর নির্ভর করে। লাল বর্ণের স্থূল গ্রথনযুক্ত বেলে মাটির সৃষ্টি হয়। গ্রানাইট শিলা থেকে অম্লধর্মী মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়।

(e) সময় :—দীর্ঘ সময়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত পরিপূর্ণ মৃত্তিকা পরিলেখ সৃষ্টি হয়। স্বল্প সময়ে মৃত্তিকা স্তরায়ন সৃষ্টি হতে পারে না।

মানুষ : মাটিতে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ, জলা জমির পুনরুদ্ধার, জমি কর্ষণ, পশুচারণ, প্রভৃতি মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে মৃত্তিকার প্রকৃতি প্রভাবিত হয়।

1.5 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

A. (প্রতিটি প্রশ্নের মান— 10)

1. মৃত্তিকা সৃষ্টিতে আবহবিকারের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
2. চিত্র সহ মৃত্তিকা প্রোফাইল বা পরিলেখর বর্ণনা কর।
3. মৃত্তিকার পরিলেখ বলতে কি বুঝায়? ইহার গঠন প্রণালী বর্ণনা কর।
4. মৃত্তিকার গঠন প্রণালী কিভাবে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রকের দ্বারা প্রভাবিত হয়?
5. মৃত্তিকা গঠনে জলবায়ু ও জীবজগতের প্রভাব বর্ণনা কর?
6. মৃত্তিকার গঠনে মূল শিলাখণ্ড, ভূ-প্রকৃতি ও সময়ের প্রভাব উল্লেখ কর।

B. (প্রতিটি প্রশ্নের মান— 4)

7. মৃত্তিকার গুরুত্ব উল্লেখ কর।
8. মৃত্তিকার উপাদান কি কি?
9. মৃত্তিকার অ্যালুভিয়াল স্তরগুলির বৈশিষ্ট্যে উল্লেখ কর।
10. মৃত্তিকা গঠনে যান্ত্রিক আবহবিকারের প্রভাব উল্লেখ কর।
11. রাসায়নিক আবহবিকার কীভাবে মৃত্তিকা গঠনকে প্রভাবিত করে?
12. বিভিন্ন প্রকার কেলাস গঠনের মাধ্যমে কিভাবে যান্ত্রিক আবহবিকার সংঘটিত হয়?
13. উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধিজনিত কারণে যান্ত্রিক আবহবিকারের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর।
14. আর্দ্রবিশ্লেষণ বা হাইড্রোলিসিস বলতে কি বুঝায়?
15. মৃত্তিকার জৈব স্তর কি ভাবে সৃষ্টি হয়?
16. এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া বলতে কি বোঝায়?
17. ইলুভিয়েশান প্রক্রিয়া বলতে কি বুঝায়?
18. মৃত্তিকা গঠনে জলবায়ুর প্রভাব উল্লেখ কর।

19. বৃষ্টিপাত কিভাবে মৃত্তিকা গঠনকে প্রভাবিত করে?

20. মৃত্তিকা গঠনে উষ্ণতার প্রভাব কি?

21. মূল শিলাখন্ডে কিভাবে মৃত্তিকার রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে?

22. মূল শিলাখণ্ডে কিভাবে মৃত্তিকার বর্ণ ও গ্রথনকে নিয়ন্ত্রণ করে?

23. স্বাভাবিক উদ্ভিদ কিভাবে মৃত্তিকা গঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে?

24. মানুষ কিভাবে মৃত্তিকা সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে?

25. সয়েল ক্যাটেনা কিভাবে সৃষ্টি হয়?

C. (প্রত্যেক প্রশ্নের মান— 2)

26. আবহবিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর।

27. কার্বোনেশন প্রক্রিয়া বলতে কি বুঝায়?

28. জারণ প্রক্রিয়া কি?

29. জৈব যান্ত্রিক আবহবিকার কি?

30. মৃত্তিকার A_0 স্তরের বৈশিষ্ট্য কি?

31. A_2 স্তরের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

32. ইলুভিয়েশান ও এ্যালুভিয়েশান বলতে কি বুঝায়?

33. হার্ড প্যান ও কংক্রিশান কিভাবে সৃষ্টি হয়?

34. মৃত্তিকা সৃষ্টির নিয়ন্ত্রকগুলি কি কি?

35. ভূমির ঢাল কিভাবে মৃত্তিকা গঠনকে প্রভাবিত করে?

36. সয়েল ক্যাটেনা কি?

1.6 উত্তরমালা

A.

1. 1.3.4.1 অংশ	2. 1.3.4.2 এর I অংশ
3. 1.3.4.2 এর II অংশ	4. 1.3.5 অংশ
5. 1.3.5 এর (a) (b) অংশ	6. 1.3.5 এর (b), (d) (f) অংশ

B.

7. 1.3.1 অংশ
8. 1.3.3 অংশ
9. 1.3.4 এর I অন্তর্গত (ii) অংশ
10. 1.3.4.1 এর (A) অংশ
11. 1.3.4.1 এর B অংশ
11. 1.3.4.1 এর II অংশ
13. 1.3.4.1 এর B অংশ এবং1.3.4.2 এর I এবং II অংশ
14. 1.3.4.1 এর B(II) অংশ
15. 1.3.4.2 এর II অংশ
16. 1.3.4.2 এর IIb অংশ
17. 1.3. 4.2 এর IIc
18. 1.3.5 এর a(ii) অংশ
19. 1.3.5 এর a (i) অংশ
20. 1.3.5 এর a (ii) অংশ
21. 1.3.5 এর b(ii) (iii) অংশ
22. 1.3.5 এর b(ii) (iii) অংশ
23. 1.3.5 এর c (ii) অংশ
24. 1.3.5 এর (e) অংশ
25. 1.3.5 এর (d) অংশ

C.

26. 1.3.4.1 অংশ
27. 1.3.4.1 এর B(I) অংশ
28. 1.3.4.1 এর B(iv) অংশ
29. 1.3.4.1 এর C অংশ
30. 1.3.4.2 এর I (i) অংশ
31. 1.3.4.2 এর II(c) অংশ
32. 1.3.4.2 এর II (b) (c)
33. 1.3.4 এর II (c)
34. 1.3.5 অংশ
35. 1.3.5 এর d (ii) অংশ
36. 1.3.5 (d) এর শেষ অংশ

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক 2 ❑ আঞ্চলিক মৃত্তিকার প্রোফাইল গঠন

গঠন

2.1 প্রস্তাবনা

2.2 উদ্দেশ্য

2.3 উৎপত্তি অনুসারে মৃত্তিকার মূল শ্রেণীবিভাগ : আঞ্চলিক, অনাঞ্চলিক ও অর্ন্তআঞ্চলিক মৃত্তিকা

2.3.1 পডজল মৃত্তিকা

2.3.2 চারনোজেম মৃত্তিকা

2.3.3 ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা

2.4 সারাংশ

2.5 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

2.6 উত্তরমালা

2.1 প্রস্তাবনা

শিলাস্তর আবহবিকারের ফলে যান্ত্রিকভাবে চূর্ণবিচূর্ণ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ক্রমশ শিথিল বা বিয়োজিত হয়ে সূক্ষ্ম কোমল মৃত্তিকা কণা সৃষ্টি হয়। আবহবিকারের সঙ্গে সঙ্গে এ্যালুভিয়েশান ও ইলুভিয়েশান প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকার মধ্যে বিভিন্ন স্তর বা প্রোফাইল সৃষ্টি হয়। সামগ্রিকভাবে এই দুই প্রক্রিয়াকে মৃত্তিকা গঠন প্রক্রিয়া বলে। মৃত্তিকা গঠন বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক যথা জলবায়ু, জীবজগৎ, মূল শিলাখণ্ড, ভূপ্রকৃতি, সময় প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রথম এককে করা হয়েছে। মৃত্তিকা গঠনের নিয়ন্ত্রকগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল জলবায়ু, জীবজগৎ বিশেষত স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং মূল শিলাখণ্ড। এগুলি মৃত্তিকা গঠনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রক রূপে পরিগণিত হয়। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক হল জলবায়ু। কোন স্থানের স্বাভাবিক উদ্ভিদ জলবায়ুর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আবহবিকারের প্রকৃতিও জলবায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্য জলবায়ু ভেদে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রোফাইল গঠনের মুখ্য দুই প্রক্রিয়া এ্যালুভিয়েশান ইলুভিয়েশানর প্রকৃতির বিভিন্ন হওয়ার নির্দিষ্ট প্রোফাইল বৈশিষ্ট্য যুক্ত পৃথক পৃথক মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়। মূল শিলাখণ্ড পৃথক হলেও একই জলবায়ু অঞ্চলে নির্দিষ্ট প্রকৃতির মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় এবং উহার প্রোফাইল বৈশিষ্ট্যও নির্দিষ্ট প্রকৃতির হয়। নির্দিষ্ট জলবায়ুও স্বাভাবিক উদ্ভিদ অঞ্চলে সৃষ্টি এরূপ মৃত্তিকাকে আঞ্চলিক মৃত্তিকা বলে।

2.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- কয়েকটি আঞ্চলিক মৃত্তিকার প্রোফাইল বা পরিলেখ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে সক্ষম হবেন।
- কিভাবে এধরনের প্রোফাইল সৃষ্টি হয় তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পডজল, চারনোজেম ও ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার প্রোফাইল বৈশিষ্ট্য, প্রোফাইল গঠনের অনুকূল অবস্থা, গঠন প্রক্রিয়া, এদের ব্যবহার—এইসব বিষয় বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

2.3 আঞ্চলিক মৃত্তিকার প্রোফাইল গঠন

উৎপত্তি অনুসারে মৃত্তিকার প্রধানত তিনটি মূল শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়, যথা—(a) আঞ্চলিক (b) অনাঞ্চলিক এবং (c) অর্ন্তআঞ্চলিক।

(a) আঞ্চলিক (Zonal soil) মৃত্তিকা : যে মৃত্তিকা উত্তম জলনিকাশিযুক্ত স্থানে নির্দিষ্ট জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রভাবে দীর্ঘসময় ধরে নির্দিষ্ট শিলামাতৃকা (Parent rock) থেকে উৎপন্ন হয়ে ঐ শিলাস্তরের উপরেই অবস্থান করে তাহাকে আঞ্চলিক মৃত্তিকা বলে। চারনোজেম, ল্যাটেরাইট ও পডজল এইরূপ আঞ্চলিক মৃত্তিকার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এরূপ মৃত্তিকার সুনির্দিষ্ট প্রোফাইল থাকে মৃত্তিকার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এরূপ মৃত্তিকার সুনির্দিষ্ট প্রোফাইল থাকে।

(b) অনাঞ্চলিক মৃত্তিকা (Azonal soil) : ভূপৃষ্ঠের উপর ক্ষয়কার্যের বিভিন্ন মাধ্যম যথা নদী, হিমবাহ বা বাতাসের দ্বারা সঞ্চিত ক্ষয়জাত পদার্থ থেকে যে মৃত্তিকার উৎপত্তি হয় তাহাকে অনাঞ্চলিক মৃত্তিকা বলে। আবহবিকারের ফলে উদ্ভূত শিলাখণ্ড এ ক্ষেত্রে উৎস শিলার স্থল থেকে উক্ত ক্ষয়কার্যকারী মাধ্যমে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হয়। নদীর দ্বারা সঞ্চিত পলি থেকে উৎপন্ন পলি মৃত্তিকা বা বাতাসের দ্বারা সঞ্চিত সূক্ষ্ম বালি থেকে উৎপন্ন লোয়েস মৃত্তিকা এই প্রকার অনাঞ্চলিক মৃত্তিকার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এইরূপ মৃত্তিকার কোন সুনির্দিষ্ট প্রোফাইল বা পরিলেখ দেখা যায় না।

(c) আর্ন্তআঞ্চলিক মৃত্তিকা (Intrazonal soil) : জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রভাব ব্যতীত ভূপ্রকৃতি বা মূল শিলাখণ্ডের প্রভাবে যে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয় তাহাকে অর্ন্তআঞ্চলিক মৃত্তিকা বলে। বন্ধ জলাভূমিতে, মরু অঞ্চলের প্লায়া হ্রদে অথবা চুনাপাথর অঞ্চলে এ প্রকার মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়। নির্দিষ্ট জলবায়ু বা স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রভাব না থাকলেও এরূপ মৃত্তিকার সুনির্দিষ্ট প্রোফাইল গড়ে উঠতে দেখা যায়।

পিট মৃত্তিকা (Peat soil), জলাভূমির মাটি (Bog soil) বা লবণাক্ত ও ক্ষারকীয় মৃত্তিকা এরূপ মৃত্তিকার উদাহরণ।

নির্দিষ্ট জলবায়ু অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট উদ্ভিদের প্রভাবে বিশেষ ধরনের প্রোফাইল গঠন প্রক্রিয়া কার্যকরী হয় বলে বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে ভিন্ন প্রকৃতির প্রোফাইল বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। কারণ প্রোফাইল গঠন প্রক্রিয়া অর্থাৎ এ্যালুভিয়েশান ও ইল্যুভিয়েশানের প্রকৃতি নির্ভর করে জলবায়ুর ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের উপর। কয়েকটি আঞ্চলিক মৃত্তিকার প্রোফাইল গঠন প্রক্রিয়া নিম্নে আলোচিত হয়।

2.3.1 পডজল মৃত্তিকা

সংজ্ঞা পডজল শব্দটি রুশ পরিভাষা 'জোলা' (zola) শব্দটি থেকে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ ছাই বা ধূসর বর্ণ। সেই অর্থে পডজল হল এমন এক প্রকারের মৃত্তিকা যার A_2 স্তরের বর্ণ ধূসর বা ছাই।

পডজল মৃত্তিকার বিন্যাস বা অবস্থান (Location) : এপ্রকার মৃত্তিকা আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অধ্যুষিত সরলবর্গীয় বা তাইগা বনভূমি অঞ্চলে দেখা যায়। এই অঞ্চলটি উত্তর গোলার্ধে 50° উঃ অক্ষাংশ থেকে 70° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার বিস্তীর্ণ উত্তর অংশে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। উত্তর আমেরিকা এই অঞ্চলটি প্রশান্ত মহাসাগরের তীরভূমি থেকে অলাস্কাও কানাডার মধ্যদিয়ে সেন্ট লরেন্স নদীর মোহনা ও নিউফাইন্ডল্যান্স পর্যন্ত বিস্তৃত। ইউরেশিয়া মহাদেশের এই অঞ্চল স্ক্যান্ডেনেভিয়ার উচ্চভূমি, সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যদিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ গোলার্ধের কেবলমাত্র নিউজিল্যান্ডে এপ্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। ক্রান্তীয় বা উপক্রান্তীয় অঞ্চলের সুউচ্চ পর্বতেও এরূপ মৃত্তিকা পরিলক্ষিত হয়।

পডজল মৃত্তিকা অনুকূল পরিবেশ : এরূপ মৃত্তিকা গঠনের সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা হল নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু। প্রখ্যাত মৃত্তিকা বিজ্ঞানী গ্লিকাঁর (Glinka) মতানুসারে পডজল মৃত্তিকা গঠনের জন্য 500-700 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত এবং বাৎসরিক গড় উষ্ণতা 3.6° সে: হওয়া প্রয়োজন। বৃষ্টিপাতের আধিক্য ও উষ্ণতার স্বল্পতার জন্য বৃষ্টিপাতের কার্যকারিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে এ্যালুভিয়েশন ও ইল্যুভিয়েশান প্রক্রিয়ার প্রগাঢ়তা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মের উষ্ণতা স্বল্প ও শীতের তীব্রতা বেশী হওয়ার মৃত্তিকায় সংযুক্ত জৈব পদার্থ ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা সেরূপ দ্রুত প্রেরিত হতে পারে না। ফলে মৃত্তিকার জৈব A^o স্তরে হিউমাস (Raw humus) সঞ্চিত হয়। 10° সের বাৎসরিক গড় তাপযুক্ত অঞ্চলেও পডজল মৃত্তিকা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এরূপ তাপযুক্ত অঞ্চলের উচ্চভূমিতে উষ্ণতা কম হওয়ায় পডজল মৃত্তিকা গড়ে উঠার অনুকূল তাপ ও বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা যায়। এজন্য ক্রান্তীয় অঞ্চলের সুউচ্চ পর্বতে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়েছে।

পডজল মৃত্তিকা গঠনের দ্বিতীয় অনুকূল অবস্থা হল সরলবর্গীয় বনভূমির অবস্থান। পাইন, ফার, লার্চ প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ অম্লধর্মী মৃত্তিকায় ভাল জন্মায়। এজন্য এই সমস্ত বৃক্ষের পাতা, কাণ্ড শাখা প্রশাখায় জৈব অ্যাসিড যৌগের প্রাধান্য থাকে। ঐ সমস্ত উদ্ভিদের জৈব অংশ ছত্রাকের দ্বারা বিয়োজিত বা পচে যাওয়ার সময় বিভিন্ন প্রকার জৈব অ্যাসিড নির্গত হয় এবং এর ফলে মাটির অম্লতা বৃদ্ধি পায় ও অম্লধর্মী জলবিশ্লেষণ অধিক কার্যকরী হয়। এরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া মৃত্তিকার A স্তর থেকে সিলিকা ব্যতীত সমস্ত প্রকার ধনাত্মক আয়ন বা ক্ষারকীয় পদার্থ এবং জৈব পদার্থ স্থানান্তরিত হয়ে B স্তরে জমা হয়।

পডজল মৃত্তিকা গঠনে তৃতীয় অনুকূল অবস্থা হল মূল শিলা খণ্ডের (Parent material) প্রকৃতি। যদিও পডজল মৃত্তিকা যে কোন প্রকার মূল শিলাখণ্ড থেকে সৃষ্টি হতে পারে তথাপি পডজল মৃত্তিকা গড়ে ওঠার প্রগাঢ়তা (Degree of development) নির্ভর করে মূল শিলাখণ্ডের উপর। মূল শিলাখণ্ডের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে ইহার মধ্যে ক্ষারকীয় উপাদানের পরিমাণ বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে ইহার উপাদানের পরিমাণ এইরূপ মৃত্তিকার উৎপত্তিকে প্রভাবিত করে। যে সমস্ত মূলশিলাখণ্ডে ক্ষারকীয় উপাদান সর্বাপেক্ষা কম থাকে কেবলমাত্র সেই সমস্ত ক্ষেত্রে পডজল মৃত্তিকার সুগঠন সম্ভব হয়। মূল শিলাখণ্ডে ক্ষারকীয় উপাদান কম থাকলে রাসায়নিক আবহবিকারে মাটিতে অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি হয়। মূলশিলাখণ্ডের প্রথাগত বৈশিষ্ট্যও পডজল মৃত্তিকা গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। মূলশিলাখণ্ড স্থান গ্রথনযুক্ত হলে যে মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় তার গ্রথনও হল স্থূল। এরূপ গ্রথন যুক্ত মৃত্তিকার রন্ধ্রগুলি বৃহদাকার হওয়ায় মাটির মধ্যে জলের প্রবেশ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া অনেক প্রগাঢ় হয়। যে সমস্ত স্থানে মূল শিলাখণ্ড কোয়ার্টজ সমৃদ্ধ বেলেপাথর প্রকৃতির সেই সমস্ত স্থানে পডজল মৃত্তিকা ভালভাবে সৃষ্টি হয়। এইরূপ শিলার ক্ষারকীয় উপাদান কম থাকে এবং মৃত্তিকার বালুকাকণার প্রাধান্য থাকে। এই দুই কারণে মাটিতে অ্যাসিডের পরিমাণ ও জলের প্রবেশ্যতা দুই-ই বৃদ্ধি পায়। ফলে মৃত্তিকায় অ্যাসিড ধর্মী ধৌত প্রক্রিয়া প্রাধান্যলাভ করে। কোন স্থানের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্রপ্রকৃতির হলেও মূলশিলাখন্ডের প্রতিকূলতার জন্য পডজল মৃত্তিকার উদ্ভব হয় না। এজন্য আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুযুক্ত ইংল্যান্ডের দক্ষিণপ্রান্তে অম্লধর্মী কোয়ার্টজ যুক্ত বেলেপাথরের উপর পডজল মৃত্তিকা সৃষ্টি হলেও একই জলবায়ু অঞ্চলে ক্ষারধর্মী আগ্নেয়শিলার উপরে অন্যপ্রকৃতির মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়েছে। পডজলের উপর মূল শিলাখণ্ডের এরূপ প্রভাবের জন্য ইহার বিন্যাস প্রকৃতি বিশেষভাবে ভূতাত্ত্বিক গঠনের উপর নির্ভরশীল।

প্রোফাইলের বর্ণনা : পরিণত পডজল মৃত্তিকার প্রোফাইলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ইহার মধ্যে সমস্ত স্তরের অবস্থান। পডজল মৃত্তিকায় নিম্নলিখিত স্তরগুলি দেখা যায়।

A_0 স্তর : 0.5 ইঞ্চি 2.5 ইঞ্চি গভীরতা যুক্ত এই স্তরটি আংশিকভাবে পচে যাওয়া এবং না পচে যাওয়া উদ্ভিদের পাতা কাণ্ড শাখা প্রশাখা, মস, ফার্ণ এবং অন্যান্য বহুজাতীয় তৃণ নিয়ে গঠিত। অরণ্য

অঞ্চলে জৈব পদার্থের জঞ্জালের এরূপ আচ্ছাদনকে ডাফ (Duff) বা মূল (Mull) নামে অবিহিত করা হয়। সরলবর্গীয় অরণ্য অঞ্চলে এরূপ স্তর ডাফ এবং শক্ত কাঠের অরণ্য (Hard wood trees) অঞ্চলে ইহা মূল নামে পরিচিত। A_0 স্তরের রাসায়নিক বিক্রিয়া অম্লপ্রকৃতির। পডজল মৃত্তিকা গঠনের পরিণত পর্যায়ে এই স্তর বেশী মাত্রায় অম্ল প্রকৃতির হয়। অম্লতার পরিমাণের ধাতুগত বৈচিত্র্যও দেখা যায়। শীতের শেষের দিকে এবং বসন্তের পর এই স্তরের অম্লতা হয় সর্বাপেক্ষা বেশী এবং শরৎকালে সর্বাপেক্ষা কম।

A_1 স্তর এই স্তর 6-8 ইঞ্চি পুরু। এই স্তর পচে যাওয়া জৈব পদার্থ বা হিউমাস সমৃদ্ধ এবং ধূসর থেকে বাদামি রঙের। এই স্তরে জৈব পদার্থের পরিমাণ গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায়। এই স্তরে কোন নির্দিষ্ট ধরনের গঠন গড়ে ওঠে না।

A_2 স্তর : এই স্তরে গভীরতা 6-8 ইঞ্চি। A_1 স্তর অপেক্ষা এর রঙ হাল্কা। পরিণত পডজল মৃত্তিকায় এই স্তরের রঙ ধূসর বা ছাই রঙের। কোন কোন ক্ষেত্রে রঙ সাদা ঢেউ নয়। এই স্তরের গভীরতা মৃত্তিকার গ্রথনের উপর নির্ভরশীল। স্তূপ গ্রথন যুক্ত পডজল মৃত্তিকার A স্তরের গভীরতা অনেক বেশী হয় কারণ এক্ষেত্রে এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া অনেক গভীরতা পর্যন্ত কার্যকরী হয়। যে সমস্ত পডজল মৃত্তিকা সম্পূর্ণরূপে বিকাশলাভ করেনি সেগুলির A_2 স্তরের ধূসর রঙ বা ছাই রঙ পরিণত পডজল মৃত্তিকার ন্যায় সুস্পষ্ট নয়।

B_1 স্তর : এই স্তর 6-10 ইঞ্চি পুরু। A স্তর গোষ্ঠী অপেক্ষা এই স্তরের গ্রথন সূক্ষ্ম প্রকৃতির। এর রঙ বাদামি বা গাঢ় বাদামি অথবা লালচে বাদামি, এই স্তরে মাঝে মাঝে গাঢ় বাদামি হিউমাসের ছিটে দেখা যায়।

B_2 স্তর : এই স্তরের গভীরতা 6-8 ইঞ্চি। এর রঙ বাদামি বা গাঢ় লালচে বাদামি। এই স্তরের নীচের দিকে গ্রথন অপেক্ষাকৃত স্থূল প্রকৃতির এই স্তরের উপাদানগুলি দৃঢ় ও সংবন্ধ। হিউমাস ও সেস্‌কিউ অক্সাইড (R_2O_3) এই স্তরের প্রধান সঞ্চিত উপাদান B_2 স্তরের ঐ দুই পদার্থের সঞ্চয়ের উপর ভিত্তি করেই পডজলকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— হিউমাস পডজল ও আয়রন পডজল। হিউমাস পডজল মৃত্তিকার B_2 স্তরে আয়রন অক্সাইড ও হিউমাস সঞ্চিত হয়। আয়রন পডজলের B_2 স্তরে কেবলমাত্র আয়রন অক্সাইড সঞ্চিত হয়। B_2 স্তরে হিউমাস ও আয়রন অক্সাইড সঞ্চয়ের ফলে ঐ উপাদানগুলি কর্দম কণিকার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংবন্ধ হয় এবং পিণ্ড গঠন করে যাহাকে অর্টস্টিন (Ortstein) বলে। আবার কখনও পাথরের ন্যায় শক্ত আস্তরণ সৃষ্টি হয় যাহাকে হার্ড প্যান (Hardpan) বলে।

C স্তর : এই স্তরটি মূল শিলাখণ্ড দ্বারা গঠিত।

প্রোফাইল গঠন পদ্ধতি (Mechanism) : যে প্রোফাইল গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পডজল মৃত্তিকা

সৃষ্টি হয় তাকে পডজলাইজেশান (Podsolization) বলে এই পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য A স্তর থেকে ক্রমান্বয়ে বৃষ্টিপাতের আধিক্যহেতু অতিমাত্রায় ধৌত প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ক্ষারকীয় পদার্থের অপসারণ এবং A_0 ও A_1 স্তরে অম্লধর্মী জৈবপদার্থের সৃষ্টি। পডজল মৃত্তিকা অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী বলে রাসায়নিক এ্যালুভিয়েশন অধিক কার্যকরী হয় এবং এর ফলে A স্তর থেকে প্রায় মৃত্তিকা ক্রমশ অম্লধর্মী হয়ে পড়ে। অ্যাসিড সমৃদ্ধ সরলবর্গীয় বৃক্ষের বিভিন্ন জৈবাংশ ছত্রাকের দ্বারা বিয়োজনের মধ্য দিয়ে একাধিক জৈব অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এর ফলে পডজল মৃত্তিকার রাসায়নিক বিক্রিয়া ক্রমশ অধিক অম্ল প্রকৃতির হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত অ্যাসিডের উপস্থিতিতে পডজল মৃত্তিকায় অম্ল জলবিশ্লেষণ (Acid Hydrolysis) প্রাধান্য লাভ করে।

মৃত্তিকার অম্লতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্দম যৌগ ও হিউমাস সুস্থিত থাকতে পারে না। ফলে উহারা বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে ও A স্তর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে B স্তরে অতিরিক্ত অম্লতা হেতু আয়রন (Fe) ও অ্যালুমিনিয়াম (Al) দ্রবীভূত হয়ে এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া স্থানান্তরিত হয়ে B স্তরে হাইড্রক্সাইড জেল রূপে সঞ্চিত হয়। A স্তরে উৎপন্ন অ্যাসিড অল্প পরিমাণে এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া B স্তরে পৌঁছলেও এই স্তরের রাসায়নিক বিক্রিয়া A স্তরের ন্যায় সেরূপ অম্ল প্রকৃতির হয় না। কারণ এই স্তর (B স্তর) সঞ্চিত কাদা কণা উপরের A স্তর থেকে স্থানান্তরিত ক্ষারকীয় পদার্থ অধিযেশন করে। A স্তরের অতিরিক্ত অম্লধর্মী রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ও হিউমাসের এবং ক্লেমকপ্লেক্সের অপসারণ সংঘটিত হয়। কিন্তু B স্তরে রাসায়নিক বিক্রিয়া তুলনামূলকভাবে ক্ষারকীয় হওয়ায় ঐ সমস্ত পদার্থের অধঃক্ষেপ ঘটে। A_2 স্তর থেকে ক্রমাগত আয়রন অক্সাইড ধূসর বা সাদাটে হয়ে পড়ে। পডজলাইজেশান (Podsolization) প্রক্রিয়ায় আয়রণ ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড A_2 স্তর থেকে স্থানান্তরিত হলেও সিলিসিক অ্যাসিডের স্থানান্তর হয় না। সুতরাং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডিসিলিসিফিকেশান (Desilicification) প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড জেল রূপে B_2 স্তরে সঞ্চিত হয়ে মৃত্তিকা রন্ধ্রের মধ্যে ঢুকে গিয়ে রন্ধ্রগুলিকে বন্ধ করে দেয় ও এর ফলে জলের অপ্রবেশ্যতা সৃষ্টি হয়। আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম জেল এবং হিউমাস বারংবার শুষ্ক ও আর্দ্র হওয়ার ফলে বিভিন্ন খনিজকণা ওই জেলের সহায়তায় দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয় এবং ছোট বড় প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় কঠিন পিণ্ড গঠন করে সেগুলিকে বলা হয় কংক্রিশান (Concretion) কখনও কখনও B স্তরের উপরের দিকে আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম জেল এবং হিউমাস জমাট বেঁধে পাথরের ন্যায় শক্ত স্তর গঠন করে থাকে তাকে বলা হয় হার্ড প্যান (Hardpan)।

পডজলাইজেশান প্রক্রিয়ার মূল বৈশিষ্ট্য হল A স্তর থেকে সমস্ত প্রকার ক্ষারকীয় উপাদান ও হিউমাসের স্থানান্তরণ এবং সেসকিউঅক্সাইডে ও হিউমাসের B স্তরে সঞ্চয়ন। ঠিক কোন পদ্ধতিতে হিউমাস ও

সেসকিউ-অক্সাইড A স্তর থেকে অপসারিত হয় সে সম্পর্কে মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা থাকলেও কি কারণে ঐ সমস্ত পদার্থ B স্তরে সঞ্চিত হয় সে সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়নি। এ সম্পর্কে অতিসাধারণ ধারণা হল যেহেতু অতিরিক্ত অম্লধর্মী বিক্রিয়ায় সেসেকিউঅক্সাইড ও হিউমাস বিশ্লিষ্ট হয় এবং সেই সঙ্গে স্থানান্তরিত হয় সেই হেতু B স্তরের অম্লতা অনেক কম হওয়ায় ঐ সমস্ত পদার্থের B স্তরে অধঃক্ষেপ ঘটে। আবার যান্ত্রিক এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া সূক্ষ্ম কর্দম কণিকা A স্তর থেকে অপসারিত হয়ে B স্তরে সঞ্চিত হওয়ায় B স্তর থেকে সেসকিউঅক্সাইড অপসারণকে ব্যাহত করে।

অতিরিক্ত অম্ল অবস্থায় (Acid condition) হিউমাস দ্রবীভূত ও বিয়োজিত হয় বলেই উহা A স্তর থেকে অপসারিত হয়। ক্ষারকীয় পদার্থের পরিপৃক্ত অবস্থায় কেমকপ্লেক্স সুস্থির অবস্থায় থাকে। কিন্তু ক্ষারকীয় অবস্থা অপরিপৃক্ত হলে কর্দম যৌগের অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে এবং তখন উহার অপসারণ ঘটে।

কৃষিকার্যে গুরুত্ব : পডজল মৃত্তিকা অতিরিক্তমাত্রায় অম্লধর্মী হওয়ার জন্য কৃষিকার্যের পক্ষে সেরূপ ভাবে উপযোগী নয়। মৃত্তিকা থেকে গাছের পুষ্টি মৌল বা ক্যাট আয়ন অপসারিত হয় বলে এরূপ মৃত্তিকা অত্যাধিক অনুর্বর রূপে মৌল অবস্থান করে সেটুকুও প্রতিকূল P^H-এর জন্য অর্থাৎ অধিক অম্লতার জন্য দ্রবীভূত হয় না বলে গাছের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে না। এই মৃত্তিকায় পৃষ্ঠস্তর থেকে হিউমাস অপসারিত হওয়ায় মৃত্তিকা গঠনও সেরূপভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। এজন্যও মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধিকারী অনুকূল ভৌত বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মাটির অত্যাধিক অম্ল বিক্রিয়ার জন্য মঙ্গলকারী ব্যাকটেরিয়া বসবাস করতে পারে না বলে নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ ও হিউমাস গঠন প্রভৃতি উর্বরতা বৃদ্ধিকারী প্রক্রিয়াগুলি অনুপস্থিত থাকে। এ সমস্ত কারণে পডজল মৃত্তিকা কোন প্রকার কৃষিকার্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় না। পডজল মৃত্তিকা অঞ্চলের বেশীরভাগ স্থান-ই সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির দ্বারা আচ্ছাদিত।

পডজল মৃত্তিকার উন্নতির পদ্ধতি : পডজল মৃত্তিকার অন্যতম সমস্যা হল এর অতিরিক্ত অম্লতা। বিরূপ রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্যই এই মৃত্তিকাকে কৃষিকার্যে ব্যবহার করা যায় না। অম্লতা হ্রাস করার জন্য এরূপ মাটিতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় চুন বা ক্যালশিয়াম কার্বোনেট ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। চুন ব্যবহারে ক্যালশিয়াম আয়নের সাথে মৃত্তিকাস্থিত হাইড্রোজেন আয়নের বিনিময় ঘটে। এর ফলে হাইড্রোজেন আয়নের আধিক্য হ্রাস পেয়ে ইহার অম্লও হ্রাস পায় এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া কাম্য অবস্থায় পৌঁছায় এবং কৃষিকার্যের উপযোগী হয়। কিন্তু পডজল মৃত্তিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চুন প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষিকার্যের উপযোগী করে তোলা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলে বাস্তবে ইহা অসম্ভব।

2.3.2 চারনোজেম মৃত্তিকা

উপ আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে যে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয় তাকে চারনোজেম মৃত্তিকা বলে। ইহার অপর নাম কৃষ্ণ মৃত্তিকা। রুশ পরিভাষা 'চারনোজেম' (Chernozem) শব্দটির অর্থ হল কালো রঙের মৃত্তিকা (Black earth)। এইরূপ মৃত্তিকায় হিউমাসের পরিমাণ সর্বাধিক থাকে বলে এর রঙ হয় গাঢ় কালো। চারনোজেম মৃত্তিকায় হিউমাসের পরিমাণ হয় শতকরা 3.5 ভাগ থেকে 15 ভাগ। হিউমাসের রঙ গাঢ় কালো হওয়ার কারণ হল মাটিতে সংযুক্ত জৈব পদার্থের (ঘাসের বিভিন্ন অংশ) ক্ষারকীয় বা নিরপেক্ষ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিশ্লেষণ বা বিয়োজন। কৃষ্ণ বর্ণই চারনোজেম মৃত্তিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলেও সমস্ত প্রকার কালোরঙের মাটিকে চারনোজেম নামে অভিহিত করা হয় না। আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের জলাভূমিতে যে সমস্ত মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় যথা পিট (Peat) বা মাক (Muck) মৃত্তিকাকে চারনোজেম নামে অভিহিত করা হয় না। এ সমস্ত মাটিতে জৈবপদার্থের পরিমাণ প্রায় শতকরা একশো ভাগ বলে মাটির রঙ কালো। কিন্তু পিট বা মাক মৃত্তিকা গঠনে যে প্রোফাইল গঠন প্রক্রিয়া দায়ী তা সম্পূর্ণরূপে চারনোজেম মৃত্তিকা প্রোফাইলের গঠন প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নাতিশীতোষ্ণ উপ আর্দ্র অঞ্চলের হিউমিফিকেশান প্রক্রিয়া বা এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়ায় চারনোজেম মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় কিন্তু বায়ুহীন অবস্থায় হিউমিফিকেশান প্রক্রিয়ায় আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলের নিম্নভূমিতে পিট বা মাক মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়। পিট বা মাক মৃত্তিকা সৃষ্টিতে যে এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া কার্যকরী হয় তাকে গ্লেয়িজেশান (Gleization) বলে।

চারনোজেম মৃত্তিকা পেডোক্যাল (Pedocal) শ্রেণীর আঞ্চলিক মৃত্তিকার অন্তর্গত। কারণ ইহার রাসায়নিক বিক্রিয়া। ইহার P^H 7 থেকে 4.2 8.2 A স্তরের তুলনায় কম। এই মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ বেশী পরিমাণে থাকে বলে ইহার নাইট্রোজেনের পরিমাণ শতকরা 0.15-0.5 ভাগ। একই কারণে ফসফরাসের পরিমাণও বেশী হয় (শতকরা 0.1-0.3) ভাগ।

চারনোজেম মৃত্তিকার বিন্যাস : চারনোজেম মৃত্তিকা প্রধানত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেইরী তৃণভূমি এবং পূর্বতন সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের স্টেপ তৃণভূমি অঞ্চলে দেখা যায়। এই মৃত্তিকাগুলটি ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিমে উত্তর বুলগেরিয়া থেকে হাঙ্গেরী রোমানিয়া এবং পূর্বতন রাশিয়ার মধ্য দিয়ে ইউরোপ পর্বত শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত। ইউরোপের পূর্ব দিকে সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে সুদূর আমুর প্রদেশ পর্যন্ত উহা বিস্তৃত হয়েছে। মাঞ্চুরিয়া, অর্ন্তমোঙ্গালিয়ার সীমান্তবর্তী প্রদেশে এবং পার্শ্ববর্তী চীনের বিভিন্ন প্রদেশেও এই মৃত্তিকা দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনার পম্পাস তৃণভূমি এবং পেরু ও চিলিতে চারনোজেম মৃত্তিকা দেখা যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ডাকোটা, দক্ষিণ ডাকোটা, নেব্রাস্কা, কানসাস, ওকলাহামা টেকসাস, উত্তর ওরিগণ আইডাহো, দক্ষিণ ওয়াশিংটন প্রভৃতি প্রদেশে এই মৃত্তিকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

অনুকূল অবস্থা : চারনোজেম মৃত্তিকা সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা হল উপ আর্দ্র বা মরুপ্রায় নাতিশীতোয় বা স্টেপ জলবায়ু। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের মান ১৭-৩০ ইঞ্চি এবং গড় বাৎসরিক উষ্ণতা 3.5° সে.। বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা হেতু মৃত্তিকা এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়ার প্রগাঢ়তা আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম হয়। এর ফলে মৃত্তিকার A স্তর থেকে ক্ষারকীয় পদার্থ খুব বেশী করে অপসারিত হয় না বলে মাটির বিক্রিয়া হয় ক্ষারকীয় বা নিরপেক্ষ প্রকৃতির। এখানের গ্রীষ্ম শুষ্ক এবং শীত বৃষ্টি যুক্ত। শীতের তীব্রতাও অনেক বেশী। এইরূপ উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের ঋতুগত বন্টন বৈষম্যের জন্য জৈব পদার্থের খনিজকরণ প্রক্রিয়ার (Mineralization) তুলনায় গঠনমূলক হিউমিফিকেশান প্রক্রিয়া বেশী কার্যকরী হয় বলে মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ অনেক বেশী হয়।

চারনোজেম মৃত্তিকা গঠনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রক হল নাতিশীতোয় তৃণভুমির অবস্থান। তৃণভূমির উপস্থিতির জন্যই এই মৃত্তিকায় জৈবপদার্থ বা হিউমাসের পরিমাণ বনাঞ্চলের মাটির তুলনায় অনেক বেশী হয়। প্রতি বৎসরান্তে তৃণের দেহাবশেষের বিভিন্ন অংশ যথা—পাতা, শিকড় প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে মাটিতে সংযুক্ত হয় বলে উহা বিয়োজিত হয়ে প্রচুর পরিমাণে হিউমাসে উৎপন্ন করে যা মাটির রঙকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করে তোলে।

তৃতীয় অনুকূল অবস্থা হল মূল শিলাখণ্ডের প্রকৃতি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চারনোজেম মৃত্তিকার মূল শিলাখণ্ড হল লোয়েস। অবশ্য অন্যান্য শিলাখণ্ড হল লোয়েস। অবশ্য অন্যান্য শিলা মাতৃকা (Parent rock) যেমন—গ্রানাইট, ব্যাসল্ট ও চুনাপাথর থেকে উদ্ভূত মূল শিলাখণ্ড থেকেও এই মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। তবে এ বিষয়ে লক্ষণীয় যে ঐ সমস্ত শিলাস্তরে ক্যালশিয়ামের প্রাধান্য থাকা প্রয়োজন। এজন্য লক্ষ্য করা গেছে চারনোজেম মৃত্তিকা অঞ্চলের মধ্যেও ক্যালশিয়ামহীন বেলেপাথর থেকে চারনোজেম মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়নি।

প্রোফাইল বৈশিষ্ট্য : চারনোজেমে মৃত্তিকার নিম্নলিখিত স্তরগুলি লক্ষ্য করা যায়।

A_0 স্তর : এই স্তরটি বৎসরান্তে মরে যাওয়া তৃণের অবিয়োজিত অংশ যথা— পাতা, শিকড় প্রভৃতি উপাদান দ্বারা গঠিত। ইহা ০.৫ ইঞ্চি থেকে ১ ইঞ্চি পর্যন্ত গভীর বা পুরু হয়।

A_1 স্তর : এই স্তরের রঙ গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ থেকে গাঢ় বাদামি রঙের হয়। ভিজে অবস্থায় এই রঙ আরও গাঢ় দেখায়। এই স্তরে হিউমাসের পরিমাণ শতকরা 4-15 ভাগ এবং 12 ইঞ্চি থেকে 24 ইঞ্চি পুরু। এই স্তরের উপরের দিকে হিউমাসের পরিমাণ নীচের দিকের তুলনায় অনেক বেশী হয়। জৈব পদার্থের প্রভাবে এই স্তরে চূর্নাকার দানা বন্ধ গঠন (Granular and crumb) সৃষ্টি হয়। এরূপ মৃত্তিকা গঠন খুব দৃঢ় হয় বলে ইহা সহজে ভেঙে পড়ে না। এই রূপ গঠনের জন্য মৃত্তিকায় রন্ধ্রের পরিমাণ অনেক বেশী হয় এবং জলের প্রবেশ্যতা ও বাতাসের পরিমাণ দুইই বৃদ্ধি পায়।

A_2 স্তর : এই স্তরটিতেও A_1 স্তরের ন্যায় জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশী হয় এবং গাঢ় কালো রঙের হয়। গভীরতায়ও ইহা A_1 স্তরের অনুরূপ। হিউমাস বেশী থাকায় মাটির গঠন হয় দানা বন্ধ বা বাদামের ন্যায়।

B স্তরে : ধূসর বর্ণের এই স্তরের গভীরতা ১৫-২৫ ইঞ্চি। A স্তরের ন্যায় B স্তরে মৃত্তিকা গঠন সেরূপ গড়ে ওঠে না। মাটি সাধারণত পিণ্ডময় বা পাউডারের ন্যায়। জৈব পদার্থের পরিমাণ কমে যাওয়ার জন্য এই স্তরের রঙ ধূসর। এই স্তরের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ক্যালশিয়াম কার্বনেট ও কোন কোন ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেটের সঞ্চয়। এই সমস্ত পদার্থের সঞ্চয় দাগ ; শিরা বা স্তরের আকারে ঘটতে দেখা যায়। সাদা চুণের দাগগুলি রুশ পরিভাষায় বেলোগ্লাজকি (Beloglazki) বলে। এই স্তরের নীচের দিকে কোন কোন সময় জিপসাম সঞ্চিত হতে দেখা যায়।

C স্তর : এই স্তরের রঙ ধূসর হলুদ বা হলুদ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মূল শিলাখণ্ডের এই স্তরটি লোয়েস প্রকৃতির।

প্রোফাইল গঠন প্রক্রিয়া : চারনোজেম মৃত্তিকার প্রোফাইল গঠনে এমন একটি হিউমিফিকেশান প্রক্রিয়া ও এ্যালুভিয়েশান কার্যকরী হয় যাহাদের একত্রে বলে ক্যালসিফিকেশান (Calicification)।

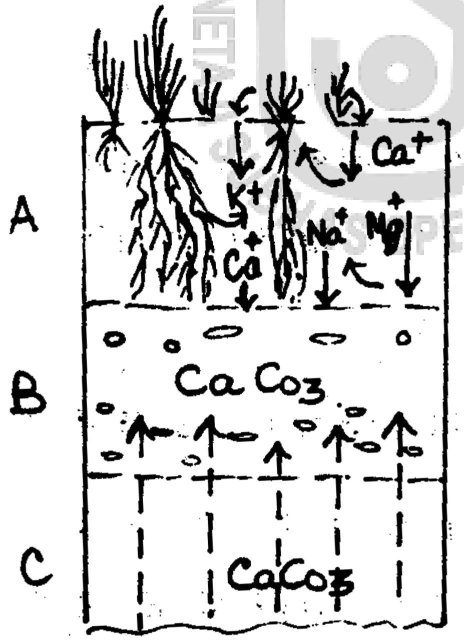

হিউমাস সমৃদ্ধ
জৈব স্তর

ক্যানসিয়াম
কার্বোনেটের
সঞ্চয়

শুষ্ক ঋতুতে কৈশিক প্রক্রিয়ায়
র উর্দ্ধে $CaCo_3$ গমন

ক্যালসিফিকেশান প্রক্রিয়া (চিত্র 2.1)

এই অঞ্চলের স্বল্প আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর জন্য এবং স্বাভাবিক উদ্ভিদ তৃণ হওয়ায় এক প্রকার হিউমিফিকেশান প্রক্রিয়া কার্যকরী হয় যার ফলে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে কালো রঙের হিউমাস উৎপন্ন

হয় এবং এর প্রভাবেই মাটির রঙ গাঢ় কালো রঙের হয়। মাটির প্রায় নিরপেক্ষ বা স্বল্প ক্ষারধর্মী রাসায়নিক বিক্রিয়াও এরূপ হিউমিফিকেশান প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে। এখানের স্বাভাবিক উদ্ভিদ তৃণ হওয়ার বৎসরান্তে তৃণের দেহাবশেষ প্রচুর পরিমাণে মাটিতে সংযুক্ত হয়। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে উষ্নতার বৃদ্ধিতে এবং মাটি বৃষ্টিপাতের অভাবে শুষ্ক হয়ে যাওয়ার তৃণ শুকিয়ে যায়। গ্রীষ্মের শেষে ও শরতের প্রথমে পুনরায় বৃষ্টি শুরু হওয়ার মাটি সরস হতে আরম্ভ করে এবং ঘাস পুনর্জীবিত হয়। বৎসরান্তে প্রচুর পরিমাণে এভাবে সংযুক্ত তৃণের দেহাবশেষ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিয়োজিত হয়ে হিউমাস সৃষ্টি হয়। এখানের গ্রীষ্ম ঋতুতে উষ্মতা বেশী থাকলেও এই ঋতু শুষ্ক হওয়ায় ব্যাকটেরিয়া তৃণের দেহাবশেষের পচন ঘটাতে সক্ষম হয় না কারণ তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা মাটিতে প্রায় থাকে না বললেই চলে। আবার আর্দ্র শীত ঋতুতে উষ্নতার স্বল্পতা হেতু ব্যাকটেরিয়া সেরূপ ক্রিয়াশীল হয় না। এর ফলে মৃত্তিকার জৈবাংশের অক্সিডেটিড বিয়োজনের (Oxidative decomposition) পরিবর্তে গঠনমূলক হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়া প্রাধান্য পায়। মরে যাওয়া ঘাসের শিকড় মাটির মধ্যেই থেকে যায় বলে ইহার বায়ুর অভাবে ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা দ্রুত বিয়োজিত হতে পারে না। এর ফলে মাটিতে সংযুক্ত জৈবাংশ ধীরে ধীরে হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়ায় বিয়োজিত হয়ে প্রচুর পরিমাণে হিউমাস উৎপন্ন করে।

প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ ও মন্টমরিলোনাইট কাদা কণিকার সাহায্যে মৃত্তিকা কণাগুলি পরস্পর সঙ্ঘাবদ্ধ হয়ে দানাবদ্ধ মৃত্তিকা গঠন সৃষ্টি করে। হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়ায় জৈব পদার্থের বিয়োজনের ফলে প্রচুর পরিমাণে জৈব ও অজৈব অ্যাসিড এবং বিকারক (Reagent) উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন প্রকারের এই সমস্ত জৈব যৌগ জলের সঙ্গে দ্রবীভূত হয়ে আঠালো প্রকৃতির পদার্থ সৃষ্টি হয় এবং গঠন এককগুলির চারিদিকে পাতলা আবরণ তৈরি করে। ঐ আবরণযুক্ত গঠন এককগুলি গ্রীষ্মের উষ্নতায় শুকিয়ে গেলে গঠনগুলি শক্ত হওয়ায় উহার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। ক্যালশিয়াম হিউমেটও (Calcium humate) মৃত্তিকা গঠন সৃষ্টি করতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। সদ্য সৃষ্ট ক্যালশিয়াম হিউমেট জলে সহজেই দ্রবীভূত হয় এবং গঠনগুলির উপর আবরণ তৈরী করে। কিন্তু ঐ আবরণ শুকিয়ে যাওয়ার পর জলে দ্রবণীয় হয় না। এজন্য গঠনগুলি এত দৃঢ় হয় যে বৃষ্টির জলের আঘাতে এগুলি ভেঙে যায় না। A স্তরে দানাবদ্ধ গঠন সৃষ্টি হয় বলে মাটির রন্ধ্রের পরিমাণ অনেক বেশী হয়। ফলে মাটিতে বায়ুর উপস্থিতি ও জলের প্রবেশ্যতা দুই-ই বেশী হয়। জলের প্রবেশ্যতা বেশী হওয়ায় এই স্তরের গভীরতাও বৃদ্ধি পায়।

চারনোজেম মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের বিয়োজনও খনিজের বিশ্লেষণের ফলে সোডিয়াম ও পটাশিয়াম মুক্ত হয়। সোডিয়াম জলে দ্রবীভূত হয়ে সহজেই এ্যালুভিয়েশান বা ধৌত প্রক্রিয়া A স্তর থেকে ভৌমজলে স্থানান্তরিত হয়। উৎপন্ন পটাশিয়ামের কিছু অংশ এভাবে ভৌমজলের সঙ্গে অপসারিত হলেও এর

বেশীরভাগ অংশ দীর্ঘ শুষ্ক গ্রীষ্ম ঋতুতে শুষ্ককরণ প্রক্রিয়ার A স্তরে পড়ে থাকে বা আবদ্ধ হয়। দ্রবণীয় ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম স্তর থেকে ধৌত প্রক্রিয়ায় B স্তরে স্থানান্তরিত হয়। এ জন্য A স্তরে এই দুই উপাদানের উপস্থিতি একেবারেই লক্ষ্য করা যায় না। A স্তর থেকে এই উপাদানগুলি অপসারিত হলেও A স্তরের রাসায়নিক বিক্রিয়া অম্ল হয়ে পড়ে না কারণ পৌনঃপুনিকভাবে বৎসরান্তে জৈব পদার্থ বিয়োজিত হয়ে পুনরায় এই সমস্ত উপাদান উৎপন্ন হয় এবং মাটিতে সংযুক্ত হয়। তাছাড়া অন্যান্য ক্যাট আয়ন মাটির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অবস্থান করে। এর ফলে মাটির স্তরের রাসায়নিক বিক্রিয়া নিরপেক্ষ বা স্বল্প ক্ষারকীয় হয়। A স্তরের রাসায়নিক বিক্রিয়া এরূপ হওয়ায় লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ যৌগ খনিজ থেকে বিশ্লিষ্ট হয় না বলে ঐ সমস্ত উপাদান A স্তর থেকে অপসারিত হয় না।

A স্তর থেকে অপসারিত ক্যালশিয়াম কার্বনেট ও ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট ইলুভিয়েশান প্রক্রিয়ায় B স্তরে সঞ্চিত হয়। এই সমস্ত উপাদানের সঞ্চয় সাধারণত দাগ ও শিরার আকারে হতে দেখা যায়। কোন কোন সময়ে স্তরের আকারেও ঐ উপাদানের সঞ্চয়ন হয়।

কৃষিকার্যে চারনোজেম মৃত্তিকার গুরুত্ব : আঞ্চলিক মৃত্তিকা সমূহের মধ্যে চারনোজেম মৃত্তিকা সর্বাপেক্ষা উর্বর। এই মৃত্তিকার বিভিন্নপ্রকার রাসায়নিক ও ভৌত বৈশিষ্ট্য মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক বলে কৃষিকার্যে ইহার এরূপ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, মাটিতে হিউমাসের পরিমাণ বেশী থাকায় উদ্ভিদের খাদ্য মৌল অনেক বেশী থাকে। এজন্য উদ্ভিদ সহজেই মাটি থেকে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে আশানুরূপ পুষ্টিলাভ করে।

দ্বিতীয়ত, হিউমাসের পরিমাণ বেশী হওয়ার জন্য মাটিতে দানাবদ্ধ বা চূর্ণাকার গঠন সৃষ্টি হয়। এরূপ গঠন সৃষ্টির ফলে মাটিতে জলের প্রবেশ্যতা ও বাতাসের উপস্থিতির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এরূপ অবস্থাও উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক।

তৃতীয়ত, হিউমাসের যোগান ও মন্টমোরিলোনাইট কর্দম কণিকার প্রাধান্য থাকায় মাটির জলধারণ ক্ষমতাও অনেক গুণ বৃদ্ধি হয়। প্রায় আর্দ্র বা শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে মাটির এরূপ বর্ধিত জলধারণ ক্ষমতা উর্বরতা বৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক।

চতুর্থত, এই মাটির ধনাত্মক আয়ন বিনিময় বা ক্যাট আয়ন বিনিময় ক্ষমতা অনেক বেশী হয় কারণ ইহাতে জৈবপদার্থের পরিমাণ অনেক বেশী হয় এবং মণ্টমোরিলোনাইট কাদা কণার প্রাধান্য থাকে। এই সমস্ত উপাদানের ধনাত্মক আয়ন বিনিময় ক্ষমতা বেশী হয় কারণ ইহারা ধনাত্মক ও ধনাত্মক আধান যুক্ত হয়। এর ফলে মাটিতে উদ্ভিদ খাদ্যের যোগান থাকে নিরবচ্ছিন্ন।

পঞ্চমত, মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া নিরপেক্ষ বা স্বল্পমাত্রায় ক্ষারকীয় হওয়ায় উদ্ভিদের পুষ্টি মৌল গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে বলে গাছ মাটিকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি মৌল গ্রহণ করতে পারে।

2.3.3 ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা

সংজ্ঞা : ল্যাটেরাইট (Laterite) শব্দটি ল্যাটিন শব্দ “Later” থেকে এসেছে যার অর্থ ইট “Brica”। সেই অর্থে ল্যাটেরাইট হল এমন একটি আঞ্চলিক মৃত্তিকা যার রঙ ইটের ন্যায় লাল। প্রখ্যাত মৃত্তিকা বিজ্ঞানী বুকানন (Buchanan) ল্যাটারাইট মৃত্তিকার প্রথম নামকরণ করেন। তাঁর মতে ল্যাটেরাইট হল এমন একটি মৃত্তিকা যার পৃষ্ঠ স্তরে প্রচুর পরিমাণে লৌহ অক্সাইড (Fe_2O_3) ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3) সঞ্চয়ের ফলে রঙ ইটের ন্যায় লাল।

ফারমোর (Fermor) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা বলতে সেই মৃত্তিকাকে বুঝিয়েছেন যে মৃত্তিকায় A_1 স্তরে কম বেশী সোদক বা জল সংযোজিত আয়রন অক্সাইড, ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ও টাইটেনিয়াম অক্সাইড প্রভৃতি উপাদানের পরিমাণ শতকরা 90-100 ভাগ। অপরদিকে যে সমস্ত লাল রঙের মৃত্তিকার এই সমস্ত সোদক অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা 50-60 ভাগ সেই সমস্ত মৃত্তিকাকে সিলিকাময় ল্যাটেরাইট (Siliceous Laterite) বলে। যে সমস্ত লাল রঙের মাটিতে পূর্বোক্ত অক্সাইডের পরিমাণ আরও কম অর্থাৎ শতকরা 25-50 ভাগ সেগুলিকে ল্যাটেরাইট জাতীয় (Lateritic) বা লাল মৃত্তিকা (Red soil) বলে।

মারবাট (Marbut) ল্যাটেরাইট বলতে সেই সমস্ত লাল রঙের মাটিকেই বলেছেন যেগুলির A স্তরে আয়রন অক্সাইড, টাইটেনিয়াম অক্সাইড ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা 90-100 ভাগ। ইহা ফারমোরের লাল মৃত্তিকার প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ। অন্য শ্রেণীর লালরঙের মাটিকে রেড লোম (Red loam) নামে অভিহিত করেছেন।

পেন্ডেলটন এর (Pendleton) মতে ল্যাটেরাইট হল সেই সমস্ত মৃত্তিকা যেগুলির প্রোফাইলে জমাটবাঁধা পিণ্ড বা ভূত্বক (crust) যুক্ত স্তর নানা বর্ণের ছাপযুক্ত (Mottled) স্বছিদ্র (vesicular) স্তরের উপরে অবস্থা করে এবং ঐরূপ বৈশিষ্ট্য ভৌমজলস্তরের ওঠানামার প্রভাবে সৃষ্টি হয়। পেন্ডেলটন ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার এরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণে এম. ক্যামপবেলকে (M. campbell) অনুসরণ করেছেন। ক্যামপবেল আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা সম্বন্ধে গবেষণা কালে ল্যাটেরাইট স্তরকে নকল ইল্যুভিয়াল (Pseudo-illuvial) স্তর রূপ চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে এই প্রকার ল্যাটেরাইট স্তর সমপ্রায় ভূমিতে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ভৌমজল তলের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যযুক্ত অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ভূ-আলোড়নে সমপ্রায় ভূমি উন্নত হলে ভৌমজলস্তর আরও গভীরে প্রবিষ্ট হলে নূতনভাবে প্রোফাইল গঠন প্রক্রিয়া

শুরু হয় এবং ল্যাটেরাইট স্তরের সৃষ্টি হয়।

ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার সংজ্ঞা সম্পর্কে উপরিউক্ত মতামতের বিভিন্নতা স্বত্ত্বেও বর্তমানে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা বলতে সেই সমস্ত লাল রঙের মৃত্তিকাকে বুঝায় যেগুলি ক্রান্তীয় বা উপক্রান্তীয় আর্দ্র পরিবেশে সৃষ্টি হয়।

অবস্থান : ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা উষ্ণ আর্দ্র ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের মৃত্তিকা। ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চলে, পাকিস্তান, বাংলাদেশে পার্বত্য অঞ্চল, ব্রহ্মদেশ বা মায়ানমারে মালয়েশিয়া আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা দেখা যায়। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী উপক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলেও ল্যাটেরাইট জাতীয় মৃত্তিকা পরিলক্ষিত হয়। নিরক্ষীয় জলবায়ুর ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যে এই মৃত্তিকার সর্বাধিক প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর হয়।

মৃত্তিকার অনুকূল অবস্থা : ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা গঠনের সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা হল উষ্ণ আর্দ্র ক্রান্তীয় জলবায়ু। এইরূপ জলবায়ুতে উষ্ণতা ও আর্দ্রতা দুই-ই বেশী বলে শিলাস্তরের রাসায়নিক আবহবিকার খুব প্রগাঢ় হয় এবং জটিল রাসায়নিক আবহবিকারের ফলে কর্দম কণিকার সৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্যের ফলে এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া খুব প্রগাঢ় হয় এবং বিভিন্নপ্রকার ধাতব অক্সাইড ছাড়া অধিকাংশ ক্ষারকীয় উপাদান (ক্যালশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি) মাটি থেকে অপসারিত হয় বলে এর রাসায়নিক বিক্রিয়া অম্লধর্মী হয়ে পড়ে। তাছাড়া মাটিতে সংযুক্ত উদ্ভিদের দেহাবশেষ অতিরিক্ত উষ্ণতা ও আর্দ্রতা হেতু দ্রুত বিয়োজিত হয়ে প্রায় নিঃশেষ হয় বলে মাটিতে হিউমাসের পরিমাণ অত্যন্ত কম হয়।

ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা গঠনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অনুকূল অবস্থা হল চিরহরিৎ বৃক্ষের অবস্থান। চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য অঞ্চলেই ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা বেশী করে লক্ষ্য করা যায়। সেরূপভাবে না হলেও সাভানা তৃণভূমি অঞ্চলেও এই মৃত্তিকা দেখা যায়। এই সমস্ত উদ্ভিদের জৈবাংশে অ্যাসিডের পরিমাণ কম থাকায় উহার বিয়োজনের ফলে জৈব অ্যাসিড সেরূপ নির্গত হয় না ; পরিবর্তে বিভিন্ন ক্ষারকীয় উপাদান উৎপন্ন হয়। এজন্য মাটির P^H অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে বলে অম্লধর্মী জলবিশ্লেষণের পরিবর্তে ক্ষারধর্মী জলবিশ্লেষণ প্রাধান্য পায়। এর ফলে সহজে দ্রবণীয় ক্ষারকীয় উপাদানগুলি মৃত্তিকার A_1 স্তর থেকে অপসারিত হলেও আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম, টাইটেনিয়াম প্রভৃতি অক্সাইডগুলি দ্রবণীয় নয় বলে ঐ স্তরে সঞ্চিত থাকে।

তৃতীয়ত মূল শিলাখণ্ডের প্রকৃতি এইরূপ মৃত্তিকা সৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করে। ফলেট স্মিথের (Follet Smith) মতানুসারে ধর্মী মূল শিলাখণ্ডের উপস্থিতিই এই মৃত্তিকা গঠনের অন্যতম সহায়ক। অম্লধর্মী মূল শিলাখণ্ড এই মৃত্তিকা সৃষ্টির অন্যতম প্রতিবন্ধক।

প্রোফাইল বৈশিষ্ট্য : হারাসোইজ (Harrassowiz) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার নিম্নলিখিত চারটি স্তরের উল্লেখ করেছেন।

A স্তর : এই স্তরটি আয়রন অ্যালুমিনিয়াম, টাইটেনিয়াম প্রভৃতির অক্সাইড যৌগের দ্বারা সমৃদ্ধ। এই সমস্ত উপাদান জমাট বাঁধা স্তরের আকারে (Ferruginous incrustation) বা পিণ্ডের (concretions) আকারে অবস্থান করতে দেখা যায়। এই স্তরের গভীরতা খুবই পাতলা থেকে এক মিটার বা তার বেশী পর্যন্ত হয়।

B স্তর : এই স্তরটি নানা বর্ণের বিশেষত হলুদ ও বেগুণি ছাপযুক্ত এবং সূক্ষ্ম কর্দম কণিকার দ্বারা গঠিত। অবশ্য কোয়ার্জট সমৃদ্ধ বেলেপাথর থেকে উৎপন্ন ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার ক্ষেত্রে এই স্তরের গ্রথন হয় স্থূল এবং স্বচ্ছিদ্র গঠন যুক্ত। এ প্রকার গঠন যুক্ত হওয়ার কোন কোন সময়ে রন্ধ্রগুলি ধূসর বা সাদা বর্ণের উপাদান দ্বারা পূর্ণ থাকে। এই স্তরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ভিজে অবস্থায় ইহা অত্যন্ত কোমল হয় কিন্তু শুকিয়ে গেলে কঠিন হয়ে পড়ে কোমল হয় এজন্য ভিজে অবস্থায় এ থেকে ইটের মতো কেটে নিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে বাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। ইহার কারণ হল কর্দম কণিকাগুলির স্থিতিস্থাপকতার (plasticity) স্বল্পতা। কাদা কণাগুলির উপর আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের আস্তরণ বা আবরণই স্থিতিস্থাপকতার স্বল্পতার অন্যতম কারণ। এরূপ ভৌত বৈশিষ্ট্যের জন্য কাদা কণাগুলি জলশোষণের পরেও সেরূপভাবে স্ফীত হয় না এবং শুকিয়ে যাওয়ার পরও সেরূপভাবে সংকুচিত হয় না।

C স্তর : এই স্তরটি ল্যাটারাইট মৃত্তিকার মূল শিলাখণ্ড দ্বারা গঠিত। ইহাতে কোয়ালিনাইট জাতীয় কাদাকণা সমৃদ্ধ শিলাখণ্ডের প্রাধান্য থাকে।

D স্তর : ইহা ল্যাটেরাইট শিলামাতৃকা যাহা থেকে মূল শিলাখণ্ড উদ্ভূত হয়।

ল্যাটারাইট মৃত্তিকা সৃষ্টির পদ্ধতি : যে পদ্ধতিতে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা গঠিত হয় তাকে ল্যাটারাইজেশান বলে। মৃত্তিকা সৃষ্টির এই পদ্ধতির প্রথম পদক্ষেপ হল জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যালুমিনো-সিলিকেট খনিজ ও শিলার পচন। শিলা ও খনিজের এইরূপ আবহবিকারের ফলে উৎপন্ন সিলিকা অপসারিত হয় কিন্তু সেস্‌কিউঅক্সাইড পড়ে থাকে বলে মাটির রঙ লাল হয়। যদিও সাধারণভাবে বলা যায় যে, অধিক উষ্ণতা ও আর্দ্রতা শিলা এবং খনিজের এরূপ আর্দ্র বিশ্লেষণে সাহায্য করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিরূপ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বা পদ্ধতিতে উহা সংঘটিত হয় সে সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

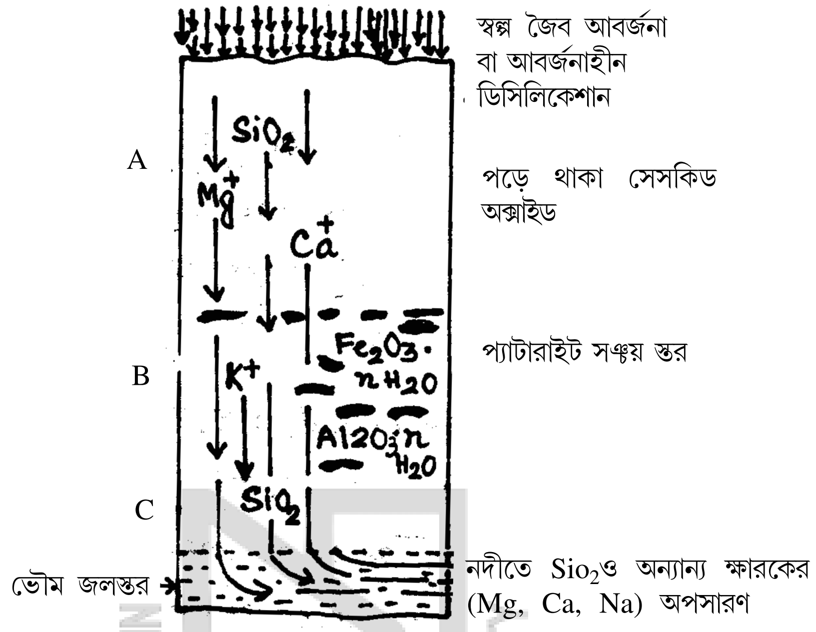

ল্যাভেরাইজেশান প্রক্রিয়া

(চিত্র 2.2)

উয়িগনারের (wiigner) মতে সিলিকেট খনিজ মুক্ত হাইড্রক্সিল (OH) আয়নের উপস্থিতিতে জলবিশ্লেষিত (Hydrolyze) হওয়ার ফলে ঋণাত্মক আধান যুক্ত সোদক সিলিকা (Hydrated Silica) মৃত্তিকা থেকে অপসারিত হয়। কিন্তু হাইড্রক্সিল আয়নের সঙ্গে ধনাত্মক আধান যুক্ত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ও ফেরিক অক্সাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অ্যালুমিনিয়াম ও ফেরিক অক্সাইডের তঞ্চন (coagulation) ঘটে। এর ফলেই ঐ সমস্ত উপাদান মৃত্তিকা স্তরে সঞ্চিত হয়। কিন্তু ধনাত্মক আধান যুক্ত হাইড্রক্সিক আয়রন সিলিসিক অ্যাসিডকে ($HSiO_3$) অপসারিত করে।

জেডরয়েজ (Gedroiz) ল্যাটারাইজেশান পদ্ধতি পডজলাইজেশান পদ্ধতির অনুরূপ বলে মত পোষণ করেন। কারণ উভয়ক্ষেত্রেই মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া অম্ল প্রকৃতির ; উভয় ক্ষেত্রেই মাটির ক্ষারক (Base) অপরিপৃক্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু উভয় মৃত্তিকার ক্ষারক বিনিময় ক্ষমতা (Base exchange capacity) বিভিন্ন। পডজল মৃত্তিকার ক্ষারক বিনিময় ক্ষমতা ল্যাটারাইটের তুলনায় অনেক বেশি। এই কারণে পডজল মৃত্তিকার অম্ল জলবিশ্লেষণ (Acid hydrolysis) প্রক্রিয়া প্রাধান্য লাভ করায় সিলিকা ; সেস্‌কিউঅক্সাইড অনুপাত (Silica : sesquioxide) অনেক বেশী হয় এবং এ জন্যই ইহার ক্ষারক বিনিময় ক্ষমতা বেশী

হয়। অপরদিকে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার স্বল্প অম্লধর্মী জলবিশ্লেষণ বা এমনকি ক্ষারকীয় জলবিশ্লেষণ (Alkaline hydrohysis) প্রাধান্য পায়। ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা অঞ্চলে উদ্ভিদের দেহাবশেষ জৈব অ্যাসিডের পরিমাণ কম থাকে বলে উহার বিয়োজনের ফলে জৈব অ্যাসিড উৎপন্ন হয় খুব স্বল্প পরিমাণ ; পরিবর্তে বিভিন্ন ক্ষারক উৎপন্ন হয় বেশী পরিমাণে। উৎপন্ন এই সমস্ত ক্ষারকের প্রভাবেই মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় স্বল্প অম্লধর্মী। ফলে ক্ষারকীয় জলবিশ্লেষণ প্রাধান্য পায়। এজন্য ল্যাটেরাইট মৃত্তিকায় সিলিকাঃ সেসকিউঅক্সাইড অনুপাত কম হয় এবং ইহার ক্ষারক বিনিময় ক্ষমতাও তুলনামুলকভাবে কম হয়। জেডররেজ ল্যাটেরাইজেশান প্রক্রিয়ায় সিলিকেট খনিজের বিয়োজনের কথা বললেও কিরূপে উহা সংঘটিত হয় সে বিষয়ে কোন আলোকপাত করেন নি। তাঁর মতে মাটিতে ক্ষারকের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী থাকায় আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সঞ্চয় ঘটে। ম্যাটসনের (Mattson) মতেও ক্ষারকীয় জলবিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সিলিকা অপসারিত হয় এবং আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড মাটিতে জমা হয়। তাঁর মতে ল্যাটেরাইজেশন পদ্ধতির অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হল ক্রান্তীয় আর্দ্র অঞ্চলে জৈবাংশের দ্রুত বিয়োজন এবং খনিজকরণ। এর ফলে হিউমাস গঠনের পূর্বে জৈব অ্যাসিডের ন্যায় মধ্যবর্তী কোন উপাদান খনিজের সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারে না। ঐ সমস্ত উপাদান উৎপন্নের পরমুহূর্তে জীবাণুদ্বারা গৃহীত হয়। তাছাড়া হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ক্ষারক উৎপন্ন হয়ে মাটিতে যুক্ত হয়। এর ফলে মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া স্বল্প অম্লধর্মী বা প্রায় নিরপেক্ষ হয়। এইরূপ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্ষারকীয় জলবিশ্লেষণ প্রাধান্য পায়। ইহার প্রভাবেই সিলিকা মৃত্তিকা থেকে অপসারিত হয় কিন্তু সেস্‌কিউঅক্সাইড মৃত্তিকার পৃষ্ঠ স্তরে সঞ্চিত হয়। ক্ষারকীয় জলবিশ্লেষণের ফলে অম্ল মূলকগুলির (Acid radicals) বেশীমাত্রায় আয়নীকরণ হলেও ক্ষারক মূলকগুলির (Basic radicals) সেরূপ আয়নীকরণ হয় না।

বহু ল্যাটেরাইট মৃত্তিকায় সেসকিউঅক্সাইডের পিণ্ড কোষের আকারে বা ধাতমলের ন্যায় A স্তরে জমা হতে দেখা যায়। এই প্রকার ল্যাটেরাইটকে কোষীয় ল্যাটারাইটের (Cellular laterite) নামে অভিহিত করা হয়। ল্যাটেরাইটের এপ্রকার গঠন প্রস্তর সদৃশ্য হার্ডপ্যানের ন্যায় (Hardpan) এগুলি গাঢ় বাদামি, লালচে বাদামি বা হলুদ রঙের। কোন কোন স্থানে টেবিলের ন্যায় বিস্তৃত ল্যাটেরাইট স্তর দেখা যায়। ইহাকে পার্ডিগন (perdigon) বলে।

ল্যাটারাইজেশান প্রক্রিয়া প্রগাঢ়তা নির্ধারণের সূচক হল সিলিকাঃ সেসকিউঅক্সাইড অনুপাত। ইহাকে 'কি' "ki" মান বলে যে সমস্ত মাটির 'কি' মান ১বি কম তাহাকে প্রকৃত ল্যাটেরাইট বলে এবং যাদের 'কি' মান 1-2 সেগুলিকে ল্যাটেরাইট জাতীয় মৃত্তিকা বলে।

কৃষিকার্যে গুরুত্ব : পডজল মৃত্তিকার ন্যায় ল্যাটেরাইট মৃত্তিকাও কৃষিকার্যের উপযোগী বলে বিবেচিত হয় না। এই মাটির অম্লতা এবং হিউমাসের স্বল্পতা হেতু ইহা অত্যন্ত অনুর্বর। মৃত্তিকার হিউমাসের পরিমাণ

কম থাকে বলে নাইট্রোজেন ও পটাশের পরিমাণও কম হয়। মাটির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস থাকলেও বদ্ধ অবস্থায় থাকে বলে উহা উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে না। এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়ায় সহজে দ্রবণীয় ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়াম মৃত্তিকার A স্তর থেকে ধৌত হয় বলে মাটিতে ক্ষারকের ঘাটতি দেখা যায় এবং বিক্রিয়া অসমধর্মী হয়। এ সমস্ত কারণে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকায় অধিকাংশ পুষ্টি মৌলের ঘাটতি দেখা যায়। এজন্য এই মাটিতে সফলভাবে কৃষিকার্যে ব্যবহার করতে হলে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়।

2.4 সারাংশ :

জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের পার্থক্য অনুসারে এ্যালুভিয়েশান ও ইলুভিয়েশান প্রক্রিয়ায় তারতম্য হয় এবং এর ফলেই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত মৃত্তিকা পরিলেখ সৃষ্টি হয়। এ প্রকার মৃত্তিকা আঞ্চলিক মৃত্তিকা রূপে পরিগণিত। কোন একটি আঞ্চলিক মৃত্তিকা অঞ্চলের মধ্যে মৃত্তিকা গঠনকারী অন্যান্য নিয়ন্ত্রক বিশেষত ভূপ্রকৃতির প্রভাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্য যুক্ত পৃথক একটি মৃত্তিকা পরিলেখ গড়ে ওঠে। এরূপ মাটিকে অর্ন্তআঞ্চলিক মৃত্তিকা বলে। আঞ্চলিক মৃত্তিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পডজল, চারনোজেম ও ল্যাটেরাইট। অনাঞ্চলিক মৃত্তিকার কোন সুনির্দিষ্ট পরিলেখ থাকে না।

পডজল মৃত্তিকা : রুশ শব্দ পডজল শব্দের অর্থ হল ধূসর বর্ণের মাটি। এই প্রকার মৃত্তিকা সরলবর্গীয় বা তাইগা বনভূমি অঞ্চলে দেখা যায়। উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার উত্তর অংশে ইহা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ গোলার্ধের কেবলমাত্র নিউজিল্যান্ডে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। ক্রান্তীয় অঞ্চলের সুউচ্চ পর্বতেও ইহা দেখা যায়। এরূপ মৃত্তিকা গঠনের অনুকূল অবস্থা হল নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু, সরলবর্গীয় বা তাইগা বনভূমি, স্থূল গ্রথন যুক্ত বা অম্লধর্মী শিলা। পডজল মৃত্তিকায় পরিলেখর সম্ভাব্য সমস্ত স্তরগুলিও বিদ্যমান। ইহার A_{00} স্তর সদ্য পতিত পত্র সমূহ গঠিত। A_0 স্তর আংশিকভাবে পচে যাওয়া জৈব পদার্থ দ্বারা গঠিত। A_1 স্তর পচে যাওয়া জৈবপদার্থ বা হিউমাস দ্বারা সমৃদ্ধ। A_2 স্তর ধূসর বা ছাই রঙের হয়। B_1 ও B_2 স্তরগুলিতে লৌহ যৌগ বা সেসকিউঅক্সাইড ও হিউমাসের সঞ্চয় হয়। এজন্য এদের রঙ গাঢ় বাদামি রঙের হয়।

পডজলাইজেশন প্রক্রিয়ার পডজল মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়ায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল A স্তর থেকে এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়ার ক্ষারকীয় পদার্থের দ্রুত অপসারণের ফলে ঐ স্তরে অতিরিক্ত অম্লীয় বিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়া সরলবর্গীয় বৃক্ষের অম্ল সমৃদ্ধ বিভিন্ন জৈবাংশ যথা পাতা ও এ ন্যায্য অংশ পচে গিয়েও অম্লতার সৃষ্টি করে। এর ফলে এরূপ মাটিতে অম্লধর্মী জলবিশ্লেষণ প্রাধান্যলাভ করে। এই প্রকার

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কর্দম যৌগ ও হিউমাস বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে এবং রাসায়নিক এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়ায় A স্তর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে B স্তরে সঞ্চিত হয়। লৌহ ও অ্যালুমিনিয়াম যৌগও এই প্রক্রিয়া A স্তর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে B স্তরে সঞ্চিত হয়। এই প্রক্রিয়া সিলিকা A স্তর থেকে স্থানান্তরিত না হওয়ায় A_2 স্তরেই সঞ্চিত থাকে। B স্তরে লৌহ ও অ্যালুমিনিয়াম যৌগ সঞ্চিত হয়ে শক্ত পিণ্ড ও প্যান গঠন করে। এই মাটি অত্যন্ত অম্লধর্মী হওয়ায় কৃষিকার্যের পক্ষে অনুপযোগী। চুন প্রয়োগের মাধ্যমে এই মাটিকে কৃষিকার্যের উপযোগী করা যায়।

চারনোজেম মৃত্তিকা : রুশ পরিভাষায় চারনোজেম শব্দটির অর্থ হলো কৃষ্ণমৃত্তিকা বা কালো রঙের মৃত্তিকা। হিউমাসের পরিমাণ সর্বাধিক থাকে বলেই এর রঙ কালো হয়। এ জন্য অন্যান্য কারণে বিশেষত মূল শিলাখণ্ডের প্রভাবে মাটির রঙ কালো হলেও তাকে চারনোজেম রূপে অভিহিত করা হয় না। এই মৃত্তিকায় হিউমাসের পরিমাণ হল শতকরা 3.5-15 ভাগ। এর P^H 7-8.2। চারনোজেম মৃত্তিকা প্রধানত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেইরী তৃণভূমি ও পূর্বতন সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের স্টেপ তৃণভূমি অঞ্চলে দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকায় আর্জেন্টিনা, পেরু ও চিলির তৃণভূমি অঞ্চলেও এই মৃত্তিকা দেখা যায়। চারনোজেম মৃত্তিকার সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা হল উপ আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু (উষ্ণতা 3.5° সে. সেঃ এবং বৃষ্টিপাত 45 সে. মি.—70 সেমি) নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি ও লোয়েস সমভূমি। ইহার A_0 স্তর বৎসরান্ত মরে যাওয়া তৃণের অবিয়োজিত অংশ দ্বারা গঠিত। A_1 স্তর হিউমাস সমৃদ্ধ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের ও দানাবদ্ধ গঠনযুক্ত। A_2 স্তর A_1 স্তরের অনুরূপ। B স্তরে ক্যালশিয়াম কার্বোনেট ও ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেটের সঞ্চয় দেখা যায়।

যে প্রক্রিয়া মাধ্যমে এরূপ মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় তাকে ক্যালসিফিকেশন বলে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণের স্বল্পতার জন্য চারনোজেম মৃত্তিকা অঞ্চলে এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া সহজে দ্রবণীয় ক্ষারকীয় পদার্থ যথা সোডিয়াম ক্লোরাইড ও ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হলেও অন্যান্য ক্যাট আয়রনগুলি অপসারিত হয় না। এর ফলে মাটির বিক্রিয়া নিরপেক্ষ বা স্বল্প পরিমাণে ক্ষারকীয় হয়। ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট A স্তর থেকে অপসারিত হয়ে B স্তরে জমা হয়। বৎসরান্তে মরে যাওয়া তৃণের বিভিন্ন অংশ মাটিতে যুক্ত হয় এবং পচে গিয়ে কালো রঙের হিউমাস সৃষ্টি করে। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া নিরপেক্ষ রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রভৃতি অনুকূল অবস্থার জন্য জীবাণু অধিক কর্মক্ষম থাকে কিন্তু শীতের তীব্রতা এবং শুষ্ক গ্রীষ্ম ঋতুর প্রভাবে জীবাণুর দ্বারা জৈবাংশের পচনে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়ার পরিবর্তে গঠন মূলত প্রক্রিয়া প্রাধান্য পায়। ফলে মাটিতে হিউমাসের পরিমাণ বেশী হয়।

ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা : ল্যাটিন শব্দ “Later” এর অর্থ হল ইট। সেই অর্থে ইটের ন্যায় লাল রঙের

মৃত্তিকাকে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা রূপে অভিহিত করা হয়। প্রখ্যাত মৃত্তিকা বিজ্ঞানী বুকানন ল্যাটারাইট মৃত্তিকার প্রথম নামকরণ করেন। সাধারণত যে সমস্ত মাটিতে সোদক বা জলসংযোজিত আবরণ অক্সাইড, ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পরিমাণ শতকরা 90-100 ভাগ সেগুলিকে ল্যাটেরাইট এবং যে সমস্ত মৃত্তিকার ঐ সমস্ত উপাদানের পরিমাণ 25-50 ভাগ সেইসমস্ত মাটিকে ল্যাটেরাইট বা ল্যাটেরাইট জাতীয় অথবা রেড লোম নামে অভিহিত করা হয়। এই মৃত্তিকা আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলে দেখা যায়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে যথা—ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল, মায়ানমার ও মালয়েশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকাে পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলে এই মাটি দেখা যায়। এরূপ মৃত্তিকা গঠনের অনুকূল অবস্থা হল আর্দ্র ক্রান্তীয় জলবায়ু, চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য বা ক্রান্তীয় তৃণভূমি এবং ক্ষারধর্মী শিলা। ইহার A স্তর আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম ও টাইটেনিয়াম অক্সাইড সমৃদ্ধ এবং জমাট বাঁধা স্তর বা পিণ্ডের ন্যায় অবস্থান করে। B স্তরটি নানা বর্ণের বিশেষত হলুদ ও বেগুনি ছাপযুক্ত এবং কর্দম কণিকার দ্বারা গঠিত। ইহা স্থূল প্রধান ও স্বছিদ্রযুক্ত।

যে প্রক্রিয়ায় ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় তাকে ল্যাটেরাইজেশন বলে। এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মৃত্তিকা বিজ্ঞানীর মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। জেডরয়েজ (Gedroiz) ল্যাটেরাইজেশন পদ্ধতি পডজলাইজেশনের ; অনুরূপ বলে মত পোষণ করেন। উভয়ক্ষেত্রেই মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া অম্লপ্রকৃতির। কিন্তু উভয়ের ক্ষারক বিনিময় ক্ষমতা বিভিন্ন হয়। পডজলের ক্ষারক বিনিময় ক্ষমতা ল্যাটেরাইটের তুলনায় কম। এর ফলে ল্যাটেরাইটের স্বল্প অম্লধর্মী জল বিশ্লেষণ বা ক্ষারধর্মী জলবিশ্লেষণ (Alkaline hydrolysis) প্রাধান্য পায়। কারণ ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার জৈবাংশ পচে গিয়ে শুধুমাত্র জৈব অ্যাসিডই কম পরিমাণে উৎপন্ন হয় না সেই সঙ্গে কিছু ক্ষারকীয় উপাদানও সৃষ্টি হয়। ক্ষারধর্মী জল বিশ্লেষণের ফলে সিলিকা বিশ্লিষ্ট হয়ে অপসারিত হয় কিন্তু সেসকিউঅক্সাইড মাটিতে সঞ্চিত হতে থাকে। মৃত্তিকার A স্তরে এই উপাদানের সঞ্চয়ের ফলেই মাটির রঙ লাল হয় এবং সিলিকা সেসকিউঅক্সাইড অনুপাত কম হয়।

2.5 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

A. (প্রতিটি প্রশ্নের মান— 10)

(1) পডজল মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ইহার গঠন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করো। এরূপ মৃত্তিকা গঠন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

(2) চারনোজেম মৃত্তিকার পরিলেখ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ইহার সৃষ্টি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

(3) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য ও উৎপত্তি প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করুন।

B. (প্রতিটি প্রশ্নের মান— 4)

(4) আঞ্চলিক মৃত্তিকা ও অনাঞ্চলিক মৃত্তিকার প্রভেদ কি?

(5) আঞ্চলিক ও অর্ন্তআঞ্চলিক মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য কি?

(6) চারনোজেম মৃত্তিকার অনুকূল অবস্থা উল্লেখ করুন।

(7) পডজোলাইজেশন প্রক্রিয়া বলতে কি বোঝায়?

(8) পডজল মৃত্তিকার পরিলেখ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

(9) চারনোজেম মৃত্তিকার পরিলেখ বৈশিষ্ট্য ও অনুকূল অবস্থা উল্লেখ করুন।

(10) ক্যালসিফিকেশান প্রক্রিয়া বলতে কি বোঝায়?

(11) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা বলতে কি বোঝায়? ইহার পরিলেখ বৈশিষ্ট্য কি?

(12) ল্যাটারাইজেশান প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

C. (প্রতিটি প্রশ্নের মান— 2)

(13) পডজল মৃত্তিকার সংজ্ঞা নির্দেশ করুন।

(14) পডজল মৃত্তিকা গঠনে মূল শিলাখণ্ড কি প্রভাব বিস্তার করে।

(15) সরলবর্গীয় বনভূমি ও পডজল মৃত্তিকার সম্পর্ক কি?

(16) জলবায়ু কিভাবে চারনোজেম মৃত্তিকার সৃষ্টিকে প্রভাবিত করে?

(17) চারনোজেম মৃত্তিকার B স্তরের বৈশিষ্ট্য কি?

(18) চারনোজেম মৃত্তিকার সংজ্ঞা নির্দেশ করুন।

(19) ল্যাটেরাইট কথাটির উৎপত্তি তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(20) ল্যাটেরাইজেশান প্রক্রিয়া কি?

2.6 উত্তরমালা

A. (1) 2.3.1. (2) 2.3.2 (3) 2.3.3.

B. (4) 2.3 এব a ও b, (5) 2.3 এর a ও b, (6) 2.3.2 এর অনুকূল অবস্থা, (7) 2.3.1 এর প্রোফাইল গঠন পদ্ধতি (8) 2.3.1 এর প্রোফাইলের বর্ণনা, (9) 2.3.2 এর প্রোফাইল বৈশিষ্ট্য (10) 2.3.2 এর প্রোফাইল গঠন প্রক্রিয়া (11) 2.3.3 এবং প্রোফাইল বৈশিষ্ট্য (12) 2.3.3 এর প্রোফাইল গঠন পদ্ধতি।

C. (13) 2.3.1 এর সংজ্ঞা, (14) 2.3.1 এর পডজল মৃত্তিকার অনুকূল পরিবেশ অংশের তৃতীয় অনুচ্ছেদ, (15) 2.3.1 এর পডজল মৃত্তিকার অনুকূল পরিবেশ আলোচিত অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ (16) 2.3.2 এর অনুকূল অবস্থা আলোচিত প্রথম পরিচ্ছেদ (17) 2.3.2 এর প্রোফাইল বৈশিষ্ট্য আলোচিত অংশ (18) এর প্রথম পরিচ্ছেদ (19) 2.3.3 এর প্রথম পরিচ্ছেদ (20) 2.3.3 এর ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা সৃষ্টির পদ্ধতি আলোচিত অংশ।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক 3 ❑ মৃত্তিকার ভৌত গুণাবলী

গঠন ঃ

3.1 প্রস্তাবনা

3.2 উদ্দেশ্য

3.3 মৃত্তিকার ভৌত গুণাবলী

3.3.1 মৃত্তিকার গ্রথন

3.3.2 মৃত্তিকার গঠন

3.3.3 মৃত্তিকার আর্দ্রতা

3.3.4 মৃত্তিকার বর্ণ

3.3.5 মৃত্তিকার সংহতি

3.3.6 মৃত্তিকার রন্ধ্র

3.3.7 মৃত্তিকা রন্ধ্রের শ্রেণীবিভাগ

3.3.8 মৃত্তিকার ঘনত্ব

3.3.9 মৃত্তিকার আপেক্ষিক গুরুত্ব

3.4 সারাংশ

3.5 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

3.6 উত্তরমালা

3.1 প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী দুইটি ইউনিটে যথাক্রমে মৃত্তিকা সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও নিয়ন্ত্রক এবং জলবায়ু ভেদে বিভিন্ন মৃত্তিকার পরিলেখা বৈশিষ্ট্য ও ইহার উৎপত্তির প্রক্রিয়া আলোচিত হয়েছে। পূর্ববর্তী ইউনিটে লক্ষ্য করা গেছে নির্দিষ্ট জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ অঞ্চলে যে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয় তাহা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত অর্থাৎ ইহার বর্ণ, জৈব পদার্থের পরিমাণ, রাসায়নিক বিক্রিয়া বা P^H, গ্রথন, গঠন, রন্ধ্র প্রভৃতি নির্দিষ্ট প্রকৃতির। মৃত্তিকার এসমস্ত বৈশিষ্ট্যের তারতম্য ঘটে মৃত্তিকা সৃষ্টির বিভিন্ন নিয়ন্ত্রকগুলির পার্থক্যের জন্য। প্রতিটি পদার্থের যেমন কতকগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে তেমনি মৃত্তিকারও কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ লক্ষ্য করা যায়। এ সমস্ত গুণাগুণ গুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় যথা ভৌত বা প্রাকৃতিক এবং রাসায়নিক। মৃত্তিকার এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং এর উপরেই নির্ভরশীল। এদিক থেকে এই সমস্ত গুণাগুণের ধারণা অত্যাবশ্যক রূপে বিবেচিত হয়।

3.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি মৃত্তিকার ভৌত গুণাগুণের যথা গ্রথন, গঠন, আর্দ্রতা, বর্ণ, সংহতি, রন্ধ্র, ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদ ধারণা করতে পারবেন।

3.3 মৃত্তিকার ভৌত গুণাবলী

অন্যান্য বহুবিধ পদার্থের ন্যায় মৃত্তিকাও ভৌত ও রাসায়নিক গুণ সম্পন্ন। এর ভৌত বৈশিষ্ট্য বলতে সেই গুণগুলিকেই বুঝায় যে গুলির মূল্যায়ন বা পরিমাপ ও অনুভবের মাধ্যমে সম্ভব হয়। মৃত্তিকার ভৌত বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন প্রকার পরিমাপক (Scale) যথা আয়তন, শক্তি বা আধিক্যের ভিত্তিতে পরিমাপ করা যায়। এই ভৌত বৈশিষ্ট্যগুলি মৃত্তিকার উপাদানগত প্রকৃতি, উপাদানগুলির পারস্পরিক পরিমাণ বা জোটবদ্ধ অবস্থান প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। মৃত্তিকা বিভিন্ন পরিমানের কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় উপাদান দ্বারা গঠিত। তরল ও গ্যাসীয় উপাদানের পরিমাণ নির্ভর করে অবস্থান ও প্যাকিং-এর উপর। স্থূল বস্তুকণার মধ্যে প্যাকিং অপেক্ষাকৃত আলগা হওয়ায় মৃত্তিকা রন্ধ্র আকারে বৃহৎ হয় কিন্তু সংখ্যায় কম হয় বলে মোট আয়তন কম হয়। ইহার বিপরীত অবস্থা হয় সূক্ষ্ম মৃত্তিকা কণার ক্ষেত্রে। সুতরাং মৃত্তিকার কঠিন কণিকার আয়তনিক পার্থক্যের জন্য মৃত্তিকার রন্ধ্রের বিভিন্নতা দেখা যায়। আবার রন্ধ্রের আয়তনিক ও আকারগত বিভিন্নতা হেতু মৃত্তিকার বায়ু ও আর্দ্রতার পরিমাণগত পার্থক্য দেখা যায়। আর্দ্রতার হ্রাস বৃদ্ধিতেও মৃত্তিকার জৈব কণিকা এবং বিশেষত খনিজ কণার প্রকৃতি ও প্রাধান্যের উপরেই নির্ভর করে মৃত্তিকার সংশক্তি বা কাঠিন্য। মৃত্তিকার গভীরতা সম্পর্কেও তারতম্য দেখা যায়। তাছাড়া মৃত্তিকার জৈব ও খনিজ কণার তারতম্যের উপর নির্ভর করে মাটির স্থিতিস্থাপকতা। সুতরাং মাটির ভৌত গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি হল গ্রথন (Texture), গঠন (Structure) আর্দ্রতা (Moisture) বর্ণ (Colour), রন্ধ্র (Porespace), ঘনত্ব (Density) আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity), গভীরতা (Depth) সংসক্তি (Consistency), স্থিতিস্থাপকতা (Plasticity) প্রভৃতি।

3.3.1 মৃত্তিকা গ্রথন (Soil Texture)

মৃত্তিকার ভৌত বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হল গ্রথন। গ্রথনের উপরেই মৃত্তিকার অন্যান্য ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অনেকাংশ নির্ভর করে। মৃত্তিকার গ্রথন বলতে এর খনিজ কণা যথা বালুকা, কর্দম ও শিল্ট কণার পারস্পরিক পরিমাণগত আয়তনিক তারতম্য। বস্তুত পক্ষে গ্রথন বলতে মৃত্তিকাস্থিত ২ মিঃ মিঃ ব্যাসযুক্ত খনিজ কণার (বালুকা, কর্দম ও সিল্ট) বিভিন্ন অনুপাতকে বুঝায়। পরীক্ষাগারে মৃত্তিকার বিভিন্ন খনিজ কণার পরিমাণ নির্নিত হয় বলে ২ মিঃ মিঃ ব্যাসযুক্ত খনিজ কণাকে গ্রথন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ ইহার বেশী ব্যাসযুক্ত শিলাখন্ড অন্তর্ভুক্ত হলে পরীক্ষাগারে উহাদের পরিমাণ নির্ণয়ে বিস্তর অসুবিধা হয়। তাছাড়া ২ মিঃ মিঃ ব্যাস পর্যন্ত কণাগুলি মৃত্তিকার ভৌত বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রভাবিত করে কিন্তু বৃহৎ প্রস্তরখন্ডগুলি তা করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে ২ মিঃ মিটারের বেশী ব্যাস কিন্তু ২০ মিঃ মিঃ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ব্যাসযুক্ত শিলাখন্ডের উপস্থিতি অনুসারে মৃত্তিকার গ্রথন

বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা হয়। যেমন গ্রাভেল যুক্ত বালি মাটি বা গ্রাভেল যুক্ত দোঁয়াস মাটি প্রভৃতি। উপরিউক্ত ব্যাসযুক্ত প্রস্তর খন্ড ছাড়াও আরও বৃহত্তর প্রস্তর খন্ডের উপস্থিতি অনুসারে মৃত্তিকার গ্রথন ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি সংস্থা (U.S.D.A.) কর্তৃক প্রণীত মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগে যাহা 'সেভেন্থ অ্যাপ্রক্সিমেশান' নামে পরিচিত বৃহৎ প্রস্তরের অবস্থান অনুসারে মৃত্তিকার বিশেষ নামকরণ করা হয়েছে। যেমন গ্লুসেস্টার প্রস্তরময় দোঁয়াশ মৃত্তিকা বা গ্লুসেস্টার অতি প্রস্তরময় দোঁয়াশ মৃত্তিকা। এভাবে বিভিন্ন আয়তনের ক্ষুদ্র কর্দম, পলি বা সিল্ট ও বালুকা কণা এবং প্রস্তর খন্ডের উপস্থিতি অনুসারে মৃত্তিকার গ্রথন ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ করলেও সাধারণত মৃত্তিকার গ্রথন ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ করতে 2 মিটার পর্যন্ত ব্যাস যুক্ত বালুকা, কর্দম ও সিল্ট কণার পরিমাণগত তারতম্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সুতরাং মৃত্তিকার গ্রথনগত শ্রেণীবিভাগের মূল ভিত্তি হল খনিজকণার আয়তনগত শ্রেণীবিভাগ এবং উহাদের পরিমাণগত তারতম্য নির্ণয়।

মৃত্তিকার খনিজ কণার আয়তনভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ এবং উহাদের পরিমাণ নির্ণয় পদ্ধতি ঃ (Size variation of mineral fraction of soil and their determination) :

মাটির খনিজ কণাকে আয়তন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। মূল বিভাগগুলিকে আবার কয়েকটা উপভাগে ভাগ করা হয়। পরীক্ষাগারে যান্ত্রিক বিশ্লেষণের (Mechanical Analysis) মাধ্যমে বিভিন্ন খনিজকণাগুলিকে চিহ্নিত করা হয় এবং উহাদের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় বলে এগুলিকে সয়েল সেপারেটও (Soil separate) বলা হয় মৃত্তিকার খণিজকণার আয়তনগত শ্রেণীবিন্যাসের দুইটি পদ্ধতি প্রচলিত যথা—U.S.A. (United States Department of Agriculture) এবং ISSS (International Society of Soil Science) পদ্ধতি।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি সংস্থা (USDA) কর্তৃক খনিজ কণার

শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি ঃ

খনিজ কণা/সয়েল সেপারেট	আয়তন (মিঃমিঃ) বা ব্যাস (মিঃমিঃ)
অতি স্থূল বালুকা (Very coarse Sand)	2.0—1.0
স্থূল বালুকা (Coarse Sand)	1.0—0.5
মাঝারি বালুকা (Medium Sand)	0.5—0.25
সূক্ষ্ম বালুকা (Fine Sand)	0.25—0.10
অতিসূক্ষ্ম বালুকা (Very fine Sand)	0.10—0.05
সিল্ট (Silt)	0.05—0.002
কর্দম (Clay)	<0.002

আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা বিজ্ঞান সংস্থা (ISSS) কর্তৃক খনিজকণার শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি

খনিজ কণা/সয়েল সেপারেট	আয়তন (মিঃমিঃ) বা ব্যাস (মিঃমিঃ)
স্থূল বালুকা (Coarse Sand)	2.0—0.2
সূক্ষ্ম বালুকা (Fine Sand)	0.2—0.02
সিল্ট (Silt)	0.02—0.002
কর্দম (Clay)	<0.002

মৃত্তিকার গ্রথন ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ ঃ মৃত্তিকার গ্রথন ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ সাধারণত দুইটি পদ্ধতিতে করা হয় যথা—(A) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (B) অনুভব পদ্ধতি।

(A) **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ঃ** এই পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষাগারে মৃত্তিকার যান্ত্রিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ইহার বালুকা, পলি ও কর্দম কণার শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। মাটির ঐ তিন খনিজকণার পারস্পরিক শতকরা পরিমাণের তারতম্য অনুসারে মৃত্তিকার গ্রথন নির্নীত হয় এবং সেই অনুসারে মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এইরূপ গ্রথন ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ করতে একটি সমবাহু ত্রিভুজ গ্রাফের সাহায্য নেওয়া হয়। এই গ্রাফের তিনটি বাহুতে বালি কাদা ও সিল্ট কণার শতকরা পরিমাণ নির্দেশিত হয়। ঐ তিন কণার শতকরা পরিমাণের নির্দেশিত হয়। ঐ তিন কণার শতকরা পরিমাণের বিভিন্নতা অনুসারে ত্রিভুজটিকে ১২টি বা ১১টি পৃথক ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে এক একটি গ্রথন রূপে চিহ্নিত করা হয়। এই প্রকার গ্রাফে বালি, সিল্ট ও তাহা একটি বিন্দুর দ্বারা নির্দেশিত হয়। বিন্দুটি যে ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হয় সেই অনুসারে উহার গ্রথন নির্ণীত হয়। যেহেতু মৃত্তিকার খনিজ কণাগুলির শ্রেণীবিভাগ দুইটি পদ্ধতিতে করা হয় যথা USDA এবং আন্তর্জাতিক (ISSS) পদ্ধতি সেই হেতু ঐ দুই পদ্ধতি অনুসারে ত্রিভুজ গ্রাফের সাহায্যে মৃত্তিকার দুইটি অল্পবিস্তর পৃথক গ্রথনভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ করা হয়। অবশ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি সংস্থা দ্বারা (USDA) গ্রথন ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ বর্তমানে অধিক প্রচলিত।

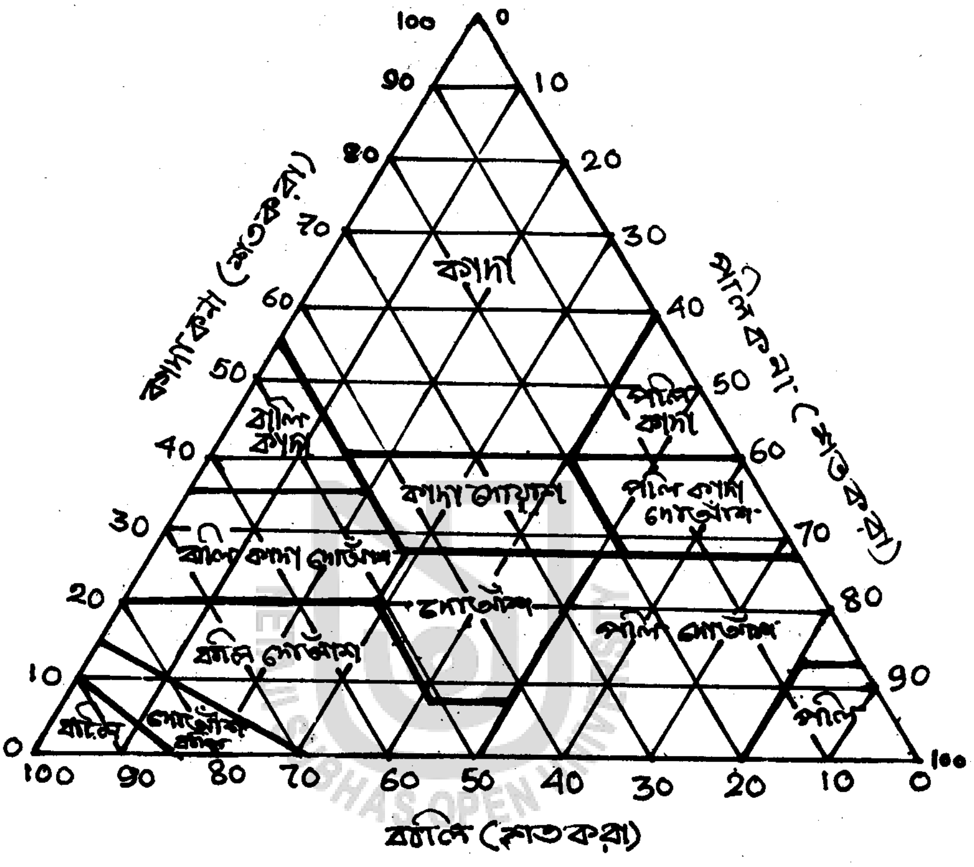

(চিত্র 3.1) ত্রিভুজ গ্রাফের সাহায্যে মৃত্তিকা গ্রথন নির্ণয় (ইউ. এস. ডি. এ. পদ্ধতি)

USDA পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতি অনুসারে মৃত্তিকায় নিম্নলিখিত গ্রথন ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

(1) বেলেমাটি (Sand) ঃ এইরূপ মৃত্তিকায় বালুকার ভাগ সর্বাপেক্ষা বেশী থাকে (85% বা তার বেশী) এবং কর্দম কণিকার শতকরা পরিমাণ 15% বা তার কম হয় বেলেমাটিকে বালুকা কণার আয়তন গত তারতম্য অনুসারে নিম্নলিখিত চারটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়।

(I) স্থূলকণাযুক্ত বেলেমাটি (Coarse Sand) ঃ এরূপ মৃত্তিকায় স্থূল বালুকণার পরিমাণ হয় 25% বা তার বেশী কিন্তু 50% এর কম অন্যান্য বালুকণা।

(II) মাঝারি বালুকা মৃত্তিকা (Medium Sand) ঃ এরূপ মৃত্তিকায় 25% অতি স্থূল বালুকণাও মধ্যম আয়তনের বালুকাকণা থাকে। এবং সূক্ষ্ম বালুকণার পরিমাণ হয় 50% এর কম।

(III) মিহি বালি মাটি (Fine Sand) ঃ এরূপ মৃত্তিকায় 50% বা তার বেশী মিহি বালুকাকণা থাকে এবং অতি স্থূল, মধ্যম রকম বালুকা কণার পরিমাণ হয় 25% এর কম এরূপ মৃত্তিকায় অতি সূক্ষ্ম বালুকা কণার পরিমাণ 50% এর কম।

(IV) অতি সূক্ষ্ম বেলেমাটি (Very fine Sand) ঃ এরূপ বেলেমাটিতে অতি সূক্ষ্ম বালুকা কণার পরিমাণ হয় 50% বা তার বেশী।

(2) বেলে দোঁয়াশ (Sandy Loam) ঃ এই মৃত্তিকায় বালুকা কণার সর্বোচ্চ পরিমাণ 50%—85% এবং কর্দম ও পলির পরিমাণ হয় যথাক্রমে 20% ও 50% এর কম ;

(3) দোঁয়াশ বেলে (Loamy Sand) ঃ এইরূপ মৃত্তিকায় কর্দম কণিকার পরিমাণ হয় 15% বা তার কম। পলির পরিমাণ হয় শতকরা 30 ভাগের কম। অপরদিকে বালুকা কণার পরিমাণ হয় 70%-85%।

(4) দোঁয়াশ মাটি ঃ এরূপ মৃত্তিকায় কর্দম কণিকার পরিমাণ হয় 7%, 27%, 28% ভাগ পলি এবং শতকরা 52 ভাগ এর কম বালুকা কণা।

(5) পলি দোঁয়াশ (Silt Loam) ঃ এইরূপ গ্রথনে পলিকণার পরিমাণ হয় 50% বা তার বেশী। কর্দম কণিকার পরিমাণ হয় 12%-27%।

(6) পলি মৃত্তিকা (Silt) ঃ এরূপ মৃত্তিকায় পলি কণিকার পরিমাণ হয় 80% বা তার বেশী এবং কর্দম কণিকার পরিমাণ হয় 12% এর কম বালির পরিমান শতকরা 20 ভাগের কম।

(7) কর্দম দোঁয়াশ (Clay Loam) ঃ এরূপ মৃত্তিকায় 27%-70% কর্দম কণিকা এবং 20%-45% বালুকা কণা থাকে সিল্টের পরিমাণ শতকরা 15-50 ভাগ।

(8) বেলে কাদা দোঁয়াশ (Sandy clay Loam) ঃ এরূপ মৃত্তিকায় কর্দম কণিকার পরিমাণ হয় 20%-35%, পলির পরিমাণ 28% এর কম। এবং বালুকা কণার পরিমাণ হয় 45% এর বেশী কিন্তু 80% এর কম।

(9) পলি কর্দম দোঁয়াশ (Silt Clay Loam) ঃ এই মৃত্তিকায় কর্দম কণিকার পরিমাণ হয় 27%-40% এবং বালুকাকণার পরিমাণ হয় 20% এর কম। কিন্তু সিল্টের পরিমান শতকরা 40%-70%।

(10) বালুকা কর্দম (Sandy Clay) ঃ এই মৃত্তিকায় 35% কর্দম কণিকা থাকে। বালুকা কণার পরিমাণ হয় 35%-69% এবং সিল্টের পরিমাণ শতকরা 20% বা তার কম।

(11) পলি কর্দম (Silty Clay) ঃ এরূপ মৃত্তিকায় কর্দম কণিকা ও পলি কণিকার বালির পরিমান শতকরা ২০ ভাগের কম।

(12) কাদা মাটি (Clay) ঃ এরূপ মৃত্তিকায় কর্দম কণিকার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কর্দম কণিকার পরিমাণ 40% বা তার বেশী বালুকা কণা ও পলিকণার উভয়ের পরিমাণ 40% এর কম।

B. অনুভব পদ্ধতি (Fed Method) ঃ

এই পদ্ধতিতে কিছু পরিমাণ মাটির সঙ্গে অল্প পরিমাণ জল ভালভাবে মিশিয়ে প্রথমে মাটির একটা তাল তৈরী করতে হয়। দেখা উচিৎ মাটির তালটা খুব বেশী শুকনো বা ভেজা না নয়। তারপর দুই হাতে তালুর সাহায্যে মাটির গোল করা তালটিকে কিছু চাপ দিয়ে অন্যান্য গুণাগুণ পরীক্ষার দ্বারা মাটির গ্রথন নির্ণয় করা যায়। যেমন—

(i) বেলেমাটি ঃ মাটির তালকে ঠিক গোল করা যায় না এবং আঙুলে মাটির দাগ পড়ে না। বালির খসখসে **(Gritty)** অনুভূতি হয়।

(ii) বেলে দোঁয়াশ ঃ তাহাকে গোলাকৃতি যদিও করা যায়, কিন্তু তা সহজেই ভেঙ্গে যায়। আঙুলে সামান্য মাটির দাগ লাগে।

(iii) দোঁয়াশ মাটি ঃ মাটির গোলাকৃতি তালটিকে, লেচি করতে গেলে মাটি কেটে কেটে পড়ে যায় এবং আঙুলে বেশ একটু মাটির দানা লাগে।

(iv) পলি দোঁয়াশ ঃ মাটির গোলাকৃতি তালটিকে লেচি করা যায়, এবং আঙুলে মাটির বেশ দাগ লাগে।

(v) এঁটেল দোঁয়াশ ঃ চট্‌চটে, কাদা হাতে লেগে যায়, সহজে লেচি করা সম্ভব, তবে মাঝে মাঝে লেচি ভেঙ্গে যায়।

(vi) এঁটেল মাটি ঃ খুব চট্‌চটে, আঙুলে বেশী দাগ লাগে। শুকনো অবস্থায় মাটির তালটি খুব শক্ত হয়ে যায়, তখন সহজে ভাঙ্গা যায় না। তবে পরিমাণ মত জল থাকলে সহজে বড় বড় লেচি করা যায়।

(vii) পলিমাটি তালটির মসৃন পাউডারের ন্যায় বা ময়দার ন্যায় অনুভূতি

(vii) মৃত্তিকার গ্রথনের গুরুত্ব (Improtance of soil texture) ঃ মৃত্তিকার ভৌত গুণাগুণ এবং উৎপাদিকা শক্তি নিয়ন্ত্রণে মৃত্তিকার গ্রথনের প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

স্থূল গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতা অনেক কম থাকে, কারণ এরূপ মৃত্তিকায় মৃত্তিকা কণিকার মধ্যস্থ ফাঁক বড় থাকায় জল সহজেই মাটির মধ্যেই প্রবেশ করে এবং নীচে চলে যায়। অবশ্য মৃত্তিকার স্থূল কণিকার মধ্যবর্তী ফাঁকগুলি বড় থাকায় মাটিতে বাতাসের পরিমাণ বেশী হয়, কিন্তু এরূপ মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি অনেক কম হয়, কারণ স্থূল বালুকণার রাসায়নিক বিক্রিয়া নিস্ক্রিয়। বালুকণাগুলি কর্দম কণিকার ন্যায় ধনাত্মক আয়নের আদান প্রদান করতে পারে না স্বভাবতই এইরূপ মৃত্তিকায় সার প্রয়োগ করলেও মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায় না।

সূক্ষ্মকণাযুক্ত কাদামাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ স্থূলকণার প্রাধান্যযুক্ত মৃত্তিকার তুলনায় অনেক বেশী হয়। প্রথমত—এইরূপ মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতা অনেক বেশী হয়। কারণ কর্দম কণিকা কলয়েড (colloid) ধর্মী। তাছাড়া এইরূপ মৃত্তিকায় দুই কণিকার মধ্যস্থ ফাঁকা আয়তনে ক্ষুদ্র হওয়ায় জল সহজে ভিতরে প্রবেশ করে নীচে নেমে যেতে পারে না। এছাড়াও কর্দম কণিকাগুলি জলের উপস্থিতিতে আয়তনে বৃদ্ধি হওয়ায় কণিকা মধ্যস্থ ফাঁক আরও ছোট হয়ে যায় এবং জল প্রবেশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এরূপ অবস্থার জন্য কর্দম কণিকার প্রাধান্যযুক্ত মৃত্তিকায় বাতাসের উপস্থিতি কম হয়। দ্বিতীয়ত এইরূপ মৃত্তিকা রাসায়নিক দিক থেকে বেশী সক্রিয় হয়। কারণ কর্দম কণিকার কেন্দ্র হয় ধণাত্মক আয়নযুক্ত এবং উহার বর্হিভাগে অবস্থান করে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নযুক্ত এবং উহার বর্হিভাগে অবস্থান করে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন। স্বভাবতই এরূপ মৃত্তিকায় ধনাত্মক আয়ন বিনিময় বেশী হওয়ায় মাটির উৎপাদিকা শক্তি অনেক বেশী হয়। সে সমস্ত মৃত্তিকায় কর্দম কণার প্রাধান্য থাকে সেই সমস্ত মৃত্তিকায় বিভিন্ন আকৃতির গঠনগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এর জন্য মৃত্তিকায় বাতাসের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায় এবং জল প্রবেশের পথও সহজতর হয়।

পলিকণার প্রাধান্যযুক্ত মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতা কর্দম কণিকার প্রাধান্য যুক্ত মৃত্তিকা অপেক্ষা কম হয়। এরূপ মৃত্তিকায় বিভিন্ন প্রকার গঠনেরও সৃষ্টি হয় না, কারণ পলিকণিকার আঠালো ভাব কম থাকে। এরজন্য মৃত্তিকায় বাতাসের উপস্থিতি অপেক্ষাকৃত কম হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতেও পলি কণিকাগুলি খুব বেশী সক্রিয় না হওয়ায় মাটির ধনাত্মক আয়ন বিনিময় ক্ষমতাও প্রাধান্যযুক্ত মৃত্তিকা অপেক্ষা অনেক কম হয়।

মৃত্তিকার গ্রথন গুলির মধ্যে দোঁয়াশ মৃত্তিকাই সর্বাপেক্ষা উর্বররূপে বিবেচিত হয়। এই মাটিতে কাদা ও বালির ভাগ প্রায় সমান থাকায় বালি মাটির গ্রথনগত প্রতিকূলতা যেমন বেশী করে প্রকট হয় না তেমনি কাদা কণিকার কুপ্রভাব থেকেও এই মাটি মুক্ত হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে কাদা কণার উপস্থিতিতে দোঁয়াশ মাটি বেলে মাটির ন্যায় শুষ্ক হয় না আবার মৃত্তিকা রন্ধ্রগুলি কাদামাটির ন্যায় শুষ্ক হয় না আবার মৃত্তিকা রন্ধ্রগুলি কাদামাটির ন্যায় অতি সূক্ষ্ম না হওয়ায় মাটির মধ্যে বায়ূশূন্য অবস্থারও সৃষ্টি হতে পারে না। তাছাড়া বালি কাদা ও পলি কণা পরস্পর জোট বন্ধ হয়ে গঠন একক সৃষ্টি করে বলে মৃত্তিকা রন্ধ্র কাম্য অবস্থায় থাকে। এ সমস্ত কারণে দোঁয়াশ মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাতাস ও জল থাকে যাহা উদ্ভিদের পুষ্টির সহায়ক হয়। কাদা কণার উপস্থিতিতে মাটির আয়ন বিনিময় ক্ষমতাও বেশী হয়। এর ফলে মাটি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ খাদ্যে সমৃদ্ধ হয়। মৃত্তিকা সুগঠনযুক্ত হয় বলে মাটির মধ্যে জলের প্রবেশ্যতাও বৃদ্ধি পায়। এই সমস্ত কারণে দোঁয়াশ মাটি সর্বাপেক্ষা উর্বর রূপে পরিগনিত হয়।

3.3.2 মৃত্তিকা গঠন

মৃত্তিকা গ্রথনের ন্যায় মৃত্তিকার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌত বৈশিষ্ট্য হল গঠন (Structure)। সাধারণভাবে মৃত্তিকার বিভিন্ন খনিজকণা (বালি, কাদা ও পলি) এবং জৈব কণিকাগুলি পৃথকভাবে অবস্থান করলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে উহারা জোটবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন আকার ও আয়তনের পিন্ড (Lump) গঠন করতে দেখা যায়। মৃত্তিকা কণাগুলির বিভিন্ন আকার ও আয়তনের এইরূপ জোট বন্ধ অবস্থায় বা পিন্ড সৃষ্টি হওয়াকেই মৃত্তিকা গঠন বলে। মৃত্তিকার এইরূপ পিন্ডকে ইংরাজী পরিভাষায় পেড (Ped) বলে। মৃত্তিকার জৈবপদার্থ বা হিউমাস এবং কাদা কণিকার সংযুক্তিপ্রবণতা বা সংযোগশীলতার জন্য খনিজ ও জৈব কণিকাগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে স্বাভাবিক ভাবে মৃত্তিকা গঠন সৃষ্টি করে। প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে সৃষ্টির জন্যই গঠনগুলি কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট ঢেলা (Clod) থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মৃত্তিকা কর্ষণের ফলে যে পিন্ড সৃষ্টি হয় সেগুলিকে ঢেলা বলে। কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি হয় বলে গঠন না বলে ঢেলা বলা হয়।

মৃত্তিকার গঠন সৃষ্টির প্রক্রিয়া (Formation of soil structure) ঃ মৃত্তিকা গঠন সৃষ্টির দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হল ঃ (A) জৈব পদার্থ ও কর্দম কণিকার সংসক্তি প্রবণতার জন্য মৃত্তিকার খনিজ ও জৈব কণার সমষ্টিকরণ (Aggregation) বা সংঘবদ্ধ অবস্থান (B) প্রাথমিকভাবে গঠিত গঠন এককগুলির উপ জৈব পদার্থ নিসৃত আঠালো পদার্থের আবরণ সৃষ্টির মাধ্যমে এদের স্থায়িত্ব দান।

(A) গঠন একক সৃষ্টি বা খনিজ ও জৈব কণার সমষ্টিকরণ (Aggregation of individual soil particles) ঃ মৃত্তিকা গঠন সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ হল পৃথকভাবে অবস্থানকারী খনিজ ও জৈব কণিকার পারস্পরিক সমষ্টিকরণ। এই পদ্ধতিতে জৈব পদার্থ এবং কাদা কণার ভূমিকা অপরিসীম। কাদা কণার পৃষ্ঠতলের মোট ক্ষেত্রফল অন্যান্য খনিজ কণার (সিল্ট ও বালি) তুলনায় বেশী বলে এবং ইহার উচ্চ তড়িৎ আধান যুক্ত হওয়ায় ইহা গঠন সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কাদা কণার এরূপ সংসক্তি

প্রবণতার জন্য একাধিক কাদা কণা পরস্পর মিলিত হয়ে বা কাদা কণা বালিও সিল্ট কণার সঙ্গে মিলিত হয়ে গঠন সৃষ্টি করে। কাদা কণার সঙ্গে অন্যান্য খনিজ কণার বন্ধন সৃষ্টি করতে বন্ধনকারী উপাদান বা মাধ্যমের (comenting agent) প্রয়োজন হয়। কাদা কণার লঘু প্রলম্বনের (Dilute suspension) সঙ্গে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ মিশ্রণ করলে কর্দমকণিকা দানা বন্ধ (flocculation) হয়। পরিশ্রবণ বা ভৌত প্রক্রিয়া বন্ধনকারী উপাদান ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বিতাড়িত করলে বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হয় অর্থাৎ কাদাকণাগুলি পরস্পর জোট বন্ধ হয় না। দুইটি কাদা কণার জোট বন্ধন ই. জে. রাসেলের (E. J. Russell) তত্ত্ব অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। জলের অনু দ্বিমেরু (Dipole) বিশিষ্ট এবং কলয়েডধর্মী কাদা কণা ঋণাত্মক আধান যুক্ত। এজন্য ক্যাট আয়নের যথা ক্যালসিয়ামের উপস্থিতিতে জল অণুর ঋণাত্মক আধানযুক্ত প্রান্ত ক্যাট আয়ন দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং ধনাত্মক আধান যুক্ত প্রান্ত কাদা কণার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এর ফলে দুইটি কাদা কণার মধ্যে সেতু তৈরী হয়।

— +— + + — — + — + + —

কাদা—জল—ক্যাট আয়ন—কাদা—জল—ক্যাট আয়ন—কাদা

clay—water—cation — clay — water — cation — clay

জল কণা শুকিয়ে গেলে পাশাপাশি নিকটে চলে আসে বলে বন্ধন দৃঢ় হয়। মাটির পর্যায় ক্রমে শুষ্কায়ন ও আর্দ্রায়ন (wetting) গঠন গুলিকে দৃঢ় করে। গঠনগুলি হওয়ার পর পুনরায় যখন ভিজে যায় তখন গঠন এককের বিভিন্ন স্থান অসমানভাবে স্ফীত হয় বলে তার মধ্যে দুর্বলতার সৃষ্টি হয় এবং দুর্বল তল বরাবর ভেঙ্গে যাওয়ায় গঠন এককগুলি ক্ষুদ্র হয়। এর ফলে দানাবন্ধ গঠন (Granular Structure) সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে মাটির গলন (thawing) এবং হিমায়নের (Freezing) ফলে এইরূপ গঠন সৃষ্টি হয়।

দুটি কাদাকণার মধ্যে সংযোগ ঘটাতে অনেক সময় ঋণাত্মক আয়ন বা এ্যান আয়নও ভূমিকা গ্রহণ করে। ফসফেট আয়ন এরূপ বন্ধনে বিশেষ কার্যকরী হয়। বহু যোগ্যতা যুক্ত ফসফেট আয়ন লৌহ ও অ্যালুমিনিয়াম আয়নের উপস্থিতেতে নিম্নলিখিত ভাবে গঠন সৃষ্টি করে।

clay—AI(OH).HP_{04}(OH)AI—clay

জৈব পদার্থের বিভিন্ন উপাদানে বিশেষত অর্গানিক কারবন মৃত্তিকা গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। স্থূল গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকায় গঠন সৃষ্টিতে জৈবপদার্থ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। হিউমিক ও ফালভিক অ্যাসিড ঋণাত্মক আধান যুক্ত হওয়ায় কোন ধনাত্মক আয়ন বা ক্যাট আয়নের উপস্থিতিতে মৃত্তিকা গঠন সৃষ্টি হয়। কলয়েড ধর্মী হিউমাস কণিকার সংসক্তি প্রবণতার জন্য ইহা বিভিন্ন খনিজকণার সঙ্গে বন্ধন সৃষ্টি করে গঠন তৈরী করে।

B. স্থায়িত্ব (Stability) ঃ মৃত্তিকার বিভিন্ন কণাগুলি জোটবন্ধ হওয়ার পর গঠন এককগুলির স্থায়িত্বসুলভ করা একান্ত প্রয়োজন। গঠন এককগুলি যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে দৃঢ় বা কঠিন হয় তাহলে

বৃষ্টির জলের আঘাতে গঠনগুলি সহজেই ভেঙ্গে পড়তে দেখা যায় এবং মৃত্তিকা কণাগুলি পুনরায় পৃথক অবস্থায় চলে আসে। গঠন এককগুলির স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করতে জৈব পদার্থ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। মৃত্তিকার জৈবপদার্থের রাসায়নিক উপাদান জলে দ্রবীভূত হয়ে একপ্রকার আঠালো পদার্থ সৃষ্টি করে। ঐ আঠালো পদার্থ জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মাটিতে প্রবেশ করার সময় গঠন এককগুলির উপরে একটি আবরণ তৈরী করে। পরে ঐ আবরণ শুকিয়ে গেলে আরও কঠিন হয় বলে গঠন এককগুলি জলের আঘাতে ভেঙ্গে যেতে পারে না। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী হলে জৈব পদার্থের এরূপ আঠালো উপাদান জলে ধুয়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে লৌহ অক্সাইড ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড প্রভৃতি যৌগ থেকে নিঃসৃত পদার্থ মৃত্তিকা গঠনের উপর কঠিন আবরণ সৃষ্টি করে। মৃত্তিকা গঠনগুলির স্থায়িত্ব মৃত্তিকা কণাগুলি মধ্যে রাসায়নিক বন্ধনের (chemical bonding) প্রকৃতির উপরেও অনেকাংশে নির্ভরশীল। মৃত্তিকা কণাগুলি যখন সুদৃঢ় রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় কেবলমাত্র তখনই গঠনগুলির স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত হয়। কাদাকণা ও জৈবকণা নিম্নলিখিতভাবে সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করে।

(i) কাদাকণার রাসায়নিক বন্ধন ঃ মৃত্তিকার কাদাকণা গুলি ষড়তল বিশিষ্ট প্লেটের ন্যায়। এর বিস্তৃতল ঋণাত্মক আধানযুক্ত যথা ধনাত্মক আয়ন বা ক্যাটআয়ন গুলির মজুত স্থল হিসাবে কাজ করে। কাদা কণার ধনাত্মক আধানের সঙ্গে ইহার অন্যতলের ধনাত্মক আধানের মধ্যে সমতা বজায় থাকে। নিম্নলিখিত তিন প্রকার ধনাত্মক আধান কাদা কণার সঙ্গে রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

(a) ক্যাটআয়ন বন্ধন (Cation linkage) ঃ বিভিন্ন ক্যাট আয়ন দুইটি কাদাকণার বিস্তৃত তলের ঋণাত্মক আধানে আকৃষ্ট হওয়ার মাধ্যমে ঐ দুই কাদাকণার মধ্যে দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি হয়। বন্ধনের দৃঢ়তা বা শক্তি নির্ভর করে ক্যাট আয়নের আয়তন ও আধানের (charge) পরিমাণের উপর। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্যাট আয়ন যেমন হাইড্রোজেন এবং বেশী আধানযুক্ত আয়ন যেমন ক্যালসিয়াম (দ্বিগুণ আধান) দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি হয়। কিন্তু সোডিয়াম আয়ন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং একটিমাত্র আধানযুক্ত হওয়ায় কাদাকণাকে বন্ধনের পরিবর্তে বিযুক্ত করে।

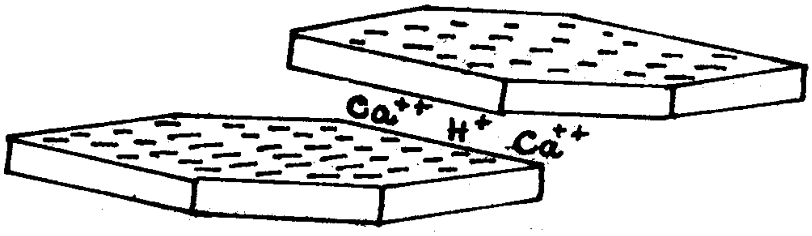

(চিত্র 3.2) ক্যাট কাদা কণার বন্ধন

(b) কার্ড হাউসের প্রভাব (Cardhouse effect) ঃ কাদা কণার বিস্তৃত তলে যেমন ঋণাত্মক আধান থাকে তেমনি উহার, সঙ্কীর্ণতলে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক উভয় আধানই থাকে। এর ফলে কাদাকণার পরস্পর সঙ্কীর্ণ তলগুলির মধ্যে বা সঙ্কীর্ণ তল ও বিস্তৃত তলের মধ্যে রাসায়নিক বন্ধন সৃষ্টি হয়।

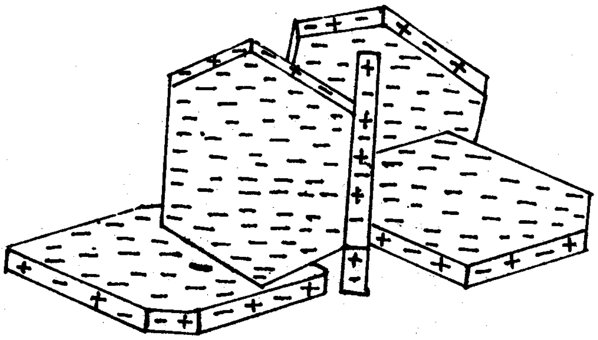

(চিত্র 3.3) কাদাকনার বন্ধনে কার্ড হাউস প্রভাব

(c) সোদক ক্যাট আয়নের বন্ধন (Bonding of hydrous Oxide) ঃ প্লিনথাইট অর্থাৎ ল্যাটেরাইটের মধ্যে কাদা কণা এবং সোদক লৌহ ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Hydrous oxides of iron and alluminium) অবস্থান করে। সোদক আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম ধনাত্মক আধান যুক্ত হয়। এর ফলে ইহারা ধনাত্মক আধানযুক্ত সিলিকেট কাদা কণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করে। শুকিয়ে যাওয়ার পর এই বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। ভিজে অবস্থায় ল্যাটেরাইট অনেক কোমল হওয়ায় এবং ইহা রোদে শুকিয়ে নিলে কঠিন ইটে পরিণত হয়। পরে ঐ ইট দিয়ে বাড়ি তৈরী হয়।

(ii) রাসায়নিক বন্ধন (Chemical bonding of humus) ঃ মৃত্তিকার জৈব পদার্থ বা হিউমাস কণিকা নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপায়ে রাসায়নিক বন্ধন সৃষ্টি করে।

(a) কাদা কণা ও জৈব কণিকার মধ্যে বন্ধন ঃ হিউমাস কণিকাগুলি সাধারণত ধনাত্মক আধানযুক্ত হয়। এর ফলে একটি কাদা কণার বিস্তৃত তলের সঙ্গে একটি হিউমাস কণার দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি হয়। কোন কোন সময়ে কাদা কণার সংকীর্ণ তলের ধনাত্মক আধানের সঙ্গে জৈব কণার ধনাত্মক আধানের সংযোগ হয় এবং ঐ দুই কণিকা দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

(b) ক্যাট আয়ন সংযোগ (Cation Linkage) ঃ ধনাত্মক আধান যুক্ত দুইটি জৈব কণিকার মধ্যস্থলে অন্য কোন ক্যাট আয়ন সংযুক্ত হয়ে এই প্রকার বন্ধন সৃষ্টি হয় এবং স্থায়ী গঠন গঠিত হয়।

(c) সয়েল মাইক্রোবস্ দ্বারা সৃষ্ট তন্তুর ন্যায় বস্তু পুঞ্জ গঠনের মাধ্যমে (Filamentous growth of soil microbes) ঃ মৃত্তিকার ক্ষুদ্র জীব যেমন ফাঙ্গি (Fungi) ও অ্যাকটিনো মাইসেট মাকড়সার ন্যায় দেহ নিঃসৃত রসের সাহায্যে জড়ানো তন্তুর ন্যায় বস্তু সৃষ্টি করে উহা মৃত্তিকা কণাগুলির চতুর্দিকে আবরণ সৃষ্টি করে উহাদিগকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে।

(d) ব্যাকটিরিয়া এবং অন্যান্য সয়েল মাইক্রোবস ও গাছের মূল থেকে নিঃসৃত থকথকে বস্তুর মাধ্যমে (Gelatinous exudates from plant roots and bacteria) ঃ মৃত্তিকার বসবাসকারী বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র জীব ও গাছের মূল থেকে নিঃসৃত সাদা থকথকে বস্তু একাধিক মৃত্তিকা কণার মধ্যস্থিত ফাঁকে বা রন্ধ্র পূর্ণ করে এবং বন্ধনকারী পদার্থ হিসাবে উহাদের সংযোগ ঘটায় ও দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করে।

(iii) মৃত্তিকা গঠন সৃষ্টিতে তাদের স্থায়ী করতে জীবের প্রভাব (Influence of organism) ঃ উদ্ভিদের মূল যান্ত্রিক পদ্ধতিতেও মৃত্তিকা গঠন সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে মূল যখন মাটির গভীরে প্রবেশ করে তখন উহার চাপে যান্ত্রিক উপায়ে মৃত্তিকা কণাগুলি জোটবদ্ধ হয়ে স্থায়ী পেড গঠন করে। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অমেরুদন্ডী প্রাণী যেমন কেঁচো মৃত্তিকা গঠন সৃষ্টি করতে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। কেঁচোর মল দানাবদ্ধ গঠন সৃষ্টি করে।

মাটির গঠনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of structure) ঃ গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে মাটির অবস্থাকে সাধারণ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা—(I) গঠন বিহীন অবস্থা (II) গঠনযুক্ত অবস্থা এবং (III) গঠন বিনষ্ট অবস্থা।

(I) গঠন বিহীন অবস্থা (Structureless) ঃ মাটির প্রথাগত বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে স্থূল বা সূক্ষ্ম প্রকৃতির হলে এই প্রকার অবস্থা সৃষ্টি হয় এই প্রকার অবস্থা দুটি উপভাগে বিভক্ত যথা (I) একক কণা অবস্থা এবং (II) ম্যাসিভ (Massive)

(I) একক কণা অবস্থা (Single grain) ঃ যে সমস্ত মাটির গ্রথন স্থল প্রকৃতির সেই সমস্ত মাটিতে এপ্রকার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কলয়েড ধর্মী সূক্ষ্ম কাদা কণার অভাবে বা জৈব পদার্থের অনুপস্থিতিতে খনিজকণা পরস্পর জোট বদ্ধ হয় না বলে খনিজ কণা পরস্পর পৃথক থাকে। বালি মাটিতে এ প্রকার গঠনবিহীন অবস্থা সৃষ্টি হয়।

(II) ম্যাসিভ (Massive) ঃ সূক্ষ্ম গ্রথন যুক্ত মাটিতে কলয়েডধর্মী কাদা কণা আঠালো গুণের জন্য পরস্পর সংযুক্ত হয়ে জমাট বাঁধা স্তরের ন্যায় অবস্থান করতে দেখা যায় এরূপ স্তর ছিদ্রবিহীন হয় এবং কোন দুর্বল তল (Plane of weakness) শূন্য হয় বলে সহজে ভঙ্গুর হয় না। কাদা মাটিতে এইপ্রকার গঠনবিহীন অবস্থা সৃষ্টি হয়।

(III) গঠনযুক্ত অবস্থা (Structured) ঃ মৃত্তিকার গঠনযুক্ত অবস্থায় কণাগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে বিভিন্ন আকার ও আয়তনের পিন্ড গঠিত হয়। পিন্ডের এরূপ আকার (shape) আয়তন (size) এবং স্থায়িত্ব বা স্পষ্টতা (stability, Distinctiveness) অনুযায়ী গঠনকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। আকার ভিত্তিক বিভাজনকে প্রকার (Type), আয়তন ভিত্তিক বিভাজনকে শ্রেণী (class) এবং স্থায়িত্ব বা স্পষ্টতা ভিত্তিক বিভাজনকে গ্রেড (Grade) বলে।

(a) গঠনের আকারভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ (Type) ঃ গঠনের বিভিন্ন আকার অনুসারে ইহাকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(i) প্লেটের মতো গঠন বা (Platy) ঃ এইরূপ গঠনে মাটির কণাগুলি পাতলা প্লেটের মতো অনুভূমিকভাবে বিন্যত থাকে। এবং সাধারণতঃ অবহিত জমির উপরিস্তরে দেখা যায়। মৃত্তিকার এই গঠনের অনুভূমিক বিস্তার উলম্ব বিস্তারের থেকে বেশী হয় (Horizontal dimension is greater than vertical dimension) মৃত্তিকার মধ্যে অনুভূমিকভাবে জলপ্রবাহের জন্য এইরূপ গঠন সৃষ্টি হয়। প্রধানতঃ জল ও হিমবাহ বাহিত মূল শিলা থেকে উদ্ভুত মাটিতে এই প্রকার গঠন দেখা যায়।

(ii) প্রিজমের মত গঠন বা (Prismatic) ঃ মাটির এরূপ গঠনে অনুভূমিক বিস্তারের তুলনায় উলম্ব বিস্তার অনেক বেশী হয় (Vertical dimension is greater than Horizontal dimension) এরূপ

গঠন বহু পার্শ্বযুক্ত প্রিজম অথবা স্তম্ভের ন্যায় হয়। এদের ব্যাস 15 সে.মি. বা তারও বেশী হয়। সাধারণতঃ উষ্ম এবং নাতিশীতোষ্ম আবহাওয়ায় নীচের স্তরের মাটিতে এরূপ গঠন দেখা যায়। কোন কোন সময় প্রিজমরূপী গঠনের শীর্ষ ধৌত প্রক্রিয়ায় গোলাকার রূপ ধারণ করে। শীর্ষদেশ গোলাকার যুক্ত প্রিজমের ন্যায় গঠনকে স্তম্ভরূপী গঠন (Columner) বলে।

(iii) ব্লকের মতো গঠন (Blocky) ঃ এই ধরণের গঠনে মাটির কণাগুলি দানাবদ্ধ হয়ে ছয়তল বিশিষ্ট আকার ধারণ করে এবং দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে এবং উচ্চতায় প্রায় সমান হয়। এরূপ গঠনের মাপ 1 সে.মি. থেকে 10 সে.মি. পর্যন্ত হতে পারে। যখন ব্লকের ধারগুলি অবিকৃত থাকে এবং তল আয়তক্ষেত্রের মতো হয় তখন এদের ব্লকরূপী গঠন বলা হয়। আবার যখন ব্লকের ধারগুলি অর্ধগোলাকার এবং উপকোণাকৃতির হয় তখন এই গঠনকে উপকোণাকৃতি ব্লক (Subangula block) বলা হয়। এইরূপ মাটি সাধারণতঃ নীচের স্তরেই দেখা যায়।

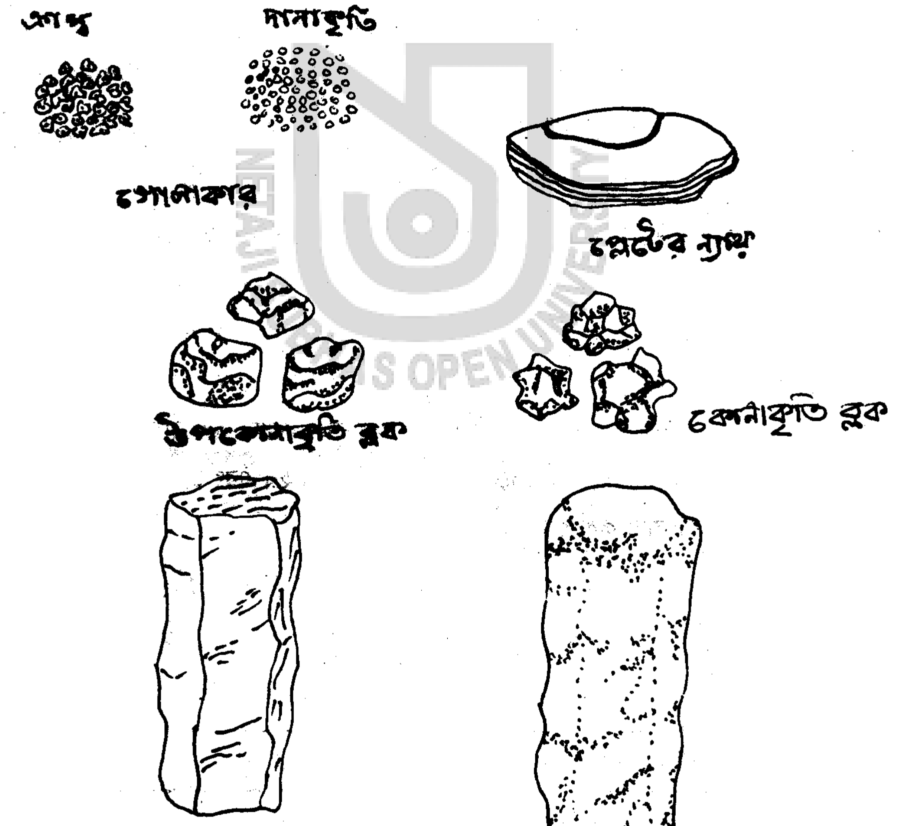

(চিত্র 3.4) বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা গঠন

(iv) দানাবদ্ধ বা চূর্ণাকার গঠন (granular or crumb structure) ঃ সাধারণত 1 সে.মি.-এর কম ব্যাস যুক্ত প্রায় সব গোলাকৃতি গঠনই এই পর্যায়ভুক্ত। এরূপ গঠনে মাটির দানাগুলি খুব আলগা ভাবে পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকে। ফলে সামান্য চাপেই বিচ্ছিন্ন করা যায়। জলে ভেজালে ব্লক আকৃতির গঠনের মতো এদের ভিতরের ছিদ্রগুলি বন্ধ হয়ে যায় না। মাটির দানাগুলি বেশী ছিদ্রযুক্ত হলে চূর্ণাকার গঠনের সৃষ্টি হয়। এই ধরণের গঠন সাধারণতঃ জমির উপরের স্তরেই দেখা যায় বিশেষ করে যে ধরণের জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকে।

(b) আয়তনভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ (Classification According to size) ঃ গঠনের উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও ইহাকে আয়তন (size) অনুযায়ী বিভিন্নভাগে ভাগ করা যায়। গঠনের এরূপ বিভাজনকে শ্রেণী (class) বলা হয়। পূর্বোক্ত বিভাজনকে প্রকার (type) বলে। গঠনের প্রধান শ্রেণীগুলি হল অতি সূক্ষ্ম (Very fine), সূক্ষ্ম (Fine), মাঝারি (Medium), স্থূল (Coarse), অতি স্থূল (Very Coarse)। গঠনের আকার ভিত্তিক প্রত্যেক প্রকারকে উহাদের আয়তন অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমন—প্লেটের ন্যায় গঠনের আয়তন 1-2 মিঃ মিটারের কম হলে অতি সূক্ষ্ম বা খুব পাতলা ; 1-2 মি. মিটার হলে সূক্ষ বা পাতলা ; 2-5 মি. মি. হলে মাঝারি ; 5-10 মি. মি. হলে স্থূল। অন্যান্য গঠনের প্রকারগুলিকে (Type) অনুরূপ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

(c) স্পষ্টতা স্থায়িত্ব বা শক্তিভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ (Classification according to strength) ঃ গঠন গুলিকে স্থায়িত্ব, স্পষ্টতা ও শক্তি বা কাঠিন্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই প্রকার বিভাজনকে গ্রেড (Grade) বলে। প্রকৃতিতে স্বাভাবিক অবস্থায় ভিজে মাটির গঠনকে সুস্পষ্ট ভাবে চেনা গেল উহাকে দুর্বল (weak) গঠন রূপে অবিহিত করা হয়। মাঝারি বা মডারেট গ্রেডের ক্ষেত্রে পেডগুলিকে সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। পেডগুলির অধিকাংশকেই ভেঙ্গে না যাওয়া অবস্থায় আলাদা করা যায়। সরল বা কঠিন (strong) গ্রেডের ক্ষেত্রে মাটির বেশীরভাগ অংশই পেডের আকারে দৃশ্যমান হয় এবং তাহাদের সিংহভাগ অতি সহজেই না ভেঙ্গে পড়া অবস্থায় আলাদা করা হয়।

(III) গঠন বিনষ্ট অবস্থা (Structure destroyed) ঃ পরিমিত আর্দ্র অবস্থায় মাটিতে বিশেষত সূক্ষ্ম গ্রথন যুক্ত মাটিকে কর্ষণ কালে বা খুড়লে গঠন এককগুলি ভেঙ্গে যায়। এর ফলে মাটির রন্ধ্র কমে যায় কারণ বড় পেডগুলি ভেঙ্গে যায়। মাটির এরূপ অবস্থাকে পুডুলড (puddled) বলে।

মৃত্তিকা গঠনের নিয়ন্ত্রক (Factors of Soil Structure) ঃ

মৃত্তিকা গঠনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

(a) কর্দম কণার উপস্থিতির ঃ মৃত্তিকা কর্দম কণিকার উপস্থিতি মৃত্তিকার গঠন সৃষ্টির জন্য একান্ত অপরিহার্য, কারণ কর্দম কণিকার আঠালো গুণের জন্য শিল্ট এবং বালুকা কণাকে সংঘবদ্ধ করে এক একটি একক গঠন করে। মৃত্তিকার কর্দম কণিকার উপস্থিতি কম করে শতকরা 8-10 ভাগ হওয়া উচিত।

(b) সোডিয়াম বিহীন কর্দম কণিকার উপস্থিতি ঃ বিভিন্ন প্রকার কর্দম কণিকার মধ্যে Na বিহীন কর্দম কণিকা মৃত্তিকা গঠন সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কর্দম কণিকা সোডিয়ামধর্মী হলে

কর্দম কণিকাগুলি অন্যান্য মৃত্তিকা কণার সঙ্গে সম্ভবত অবস্থার পরিবর্তনে পৃথকরূপে অবস্থান করে। ফলে মৃত্তিকার গঠন সৃষ্টি হয় না। এইজন্য যে মৃত্তিকায় অত্যধিক সোডিয়াম কার্বোনেট সার প্রয়োগ করা হয়, সেই সমস্ত মৃত্তিকা গঠিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে যে মৃত্তিকায় সোডিয়ামযুক্ত সেচের জল প্রয়োগ করা হয়, সেইসব মৃত্তিকা গঠন বিহীন হয়। এইরূপ গঠন বিহীন মৃত্তিকার মধ্যে গঠন সৃষ্টি করতে গেলে জিপসাম প্রয়োগ করতে হয়।

(c) জৈব পদার্থের উপস্থিতি ঃ মৃত্তিকার গঠন সৃষ্টিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব পদার্থের প্রয়োজন হয়। কারণ কর্দম কণিকার ন্যায় জৈব কণিকার মধ্যে আঠালো গুণ (stickiness) বর্তমান। স্বভাবতই এই গুণের জন্যই জৈব কণিকা মৃত্তিকার অন্যান্য কণিকাগুলিকে সংঘবন্ধ করে। মৃত্তিকার গঠনগুলি স্থায়িত্ব দিতেও হিউমাসের অবদান অপরিসীম। হিউমাস মিশ্রিত আঠালো পদার্থ জল সহযোগে এক একটি মৃত্তিকা গঠনের উপর একটি আবরণ তৈরী করে যা শুষ্ক হয়ে কঠিন হয় এবং মৃত্তিকা গঠন গুলিতে স্থায়িত্ব দান করে।

(d) সোদক আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড উপস্থিতি ঃ সোদক আয়রণ ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড সিলিকেট কাদা খনিজের ন্যায় আধান যুক্ত হয়। এজন্য এই সমস্ত উপাদান কাদা খনিজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মৃত্তিকা গঠন সৃষ্টি করে। এই সমস্ত পদার্থ নিঃসৃত বস্তু গঠন এককের উপর আবরণ তৈরীর মাধ্যমে গঠনগুলিকে সুসস্থিত করে।

(e) মৃত্তিকার ক্ষুদ্র জীব ও অন্যান্য জীবের প্রভাব ঃ মৃত্তিকার ক্ষুদ্র জীবের দেহ নিঃসৃত আঠাল পদার্থ মৃত্তিকা কণাগুলিকে জোটবন্ধ করতে দেখা যায়। উদ্ভিদের শিকড় নিঃসৃত জৈব পদার্থ এরূপ জোট বন্ধনে সহায়ক হয়। উদ্ভিদ মূলের চাপেও গঠন সৃষ্টি হয়। কেঁচো প্রভৃতি প্রাণীর কার্যের মধ্য দিয়েও গঠন সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই সমস্ত জীবের উপস্থিতিতে গঠন সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়।

মৃত্তিকা গঠনের গুরুত্ব ঃ সামগ্রিকভাবে মৃত্তিকার বিভিন্ন ভৌত গুণাগুণ মৃত্তিকা গঠনের উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য।

(1) মৃত্তিকায় বাতাসের উপস্থিতি (Soil airation) ঃ মাটির মধ্যে গঠন সৃষ্টি হলে বিভিন্ন গঠন এককের মধ্যবর্তী ফাঁকের সৃষ্টি হয়, যেগুলির মধ্যে শুষ্ক অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে বাতাস থাকে। মৃত্তিকায় বাতাসের উপস্থিতি বেশী হলে মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

(2) মৃত্তিকার মধ্যে জলের প্রবেশ্যতা (Permeability of water) ঃ মৃত্তিকার মধ্যে গঠন সৃষ্টি হলে জলের প্রবেশ্যতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। কারণ গঠন এককগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ফাঁক সৃষ্টি হওয়ায় (capillary and non-capillary) জল সহজেই প্রবেশ করতে পারে ভৌম জল ঐ সমস্ত ফাঁক বিশেষতঃ অতি ক্ষুদ্র ফাঁক দিয়ে উপরে উঠে আসতে পারে। জলের এরূপ স্বাভাবিক প্রবেশ্যতার ফলে গঠন যুক্ত মৃত্তিকার আর্দ্রতা কাম্য অবস্থায় থাকে।

(3) মৃত্তিকা ক্ষয়ের পথে বাধা ঃ গঠনযুক্ত মৃত্তিকায় জল সহজেই প্রবেশ করতে পারে বলে মৃত্তিকার উপর দিয়ে জলপ্রবাহ (Run off) অনেক কম হয় ফলে মৃত্তিকার ক্ষুদ্র অংশ দ্রবীভূত হয়ে ক্ষয় পেতে পারে না। বিপরীত ক্রমে গঠনবিহীন মৃত্তিকায় জল দ্রুত প্রবেশ করতে পারে না, ফলে মৃত্তিকার উপর দিয়ে জলপ্রবাহ অনেক বেশী হয় স্বভাবতই এরূপ মৃত্তিকায় ক্ষয় অনেক বেশী হয়।

3.3.3 মৃত্তিকার আর্দ্রতা (Soil moisture)

মৃত্তিকা গ্রথন ও গঠনের ন্যায় মৃত্তিকার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌত বৈশিষ্ট্য হল আর্দ্রতা। মৃত্তিকার আর্দ্রতা বা জল বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ (a) মৃত্তিকার উর্বরতার অন্যতম শর্ত হল ইহার আর্দ্রতা। মৃত্তিকার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ উদ্ভিদের পুষ্টি মৌল থাকলে এবং ইহা অন্যান্য ভৌত ও রাসায়নিক গুণ সম্পন্ন হলেও আর্দ্রতাবিহীন মৃত্তিকা সম্পূর্ণরূপে অনুর্বর রূপে বিবেচিত হয়। উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় পুষ্টি মৌল গ্রহণ করে তরল অবস্থা বা দ্রবণের মাধ্যমে। সুতরাং মৃত্তিকা শুষ্ক থাকলে গাছের পক্ষে খাদ্য গ্রহণ সম্ভব হয় না। (b) শুধুমাত্র পুষ্টির জন্যই উদ্ভিদের জলের দরকার হয় না। বিভিন্ন প্রকার শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া সমাধানের জন্য উদ্ভিদের জলের প্রয়োজন হয়। (c) অঙ্গার আত্মীকরণ বা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জল একটি মাধ্যম রূপে কাজ করে। (d) মৃত্তিকার ক্ষুদ্র জীবের কর্মক্ষমতাও আর্দ্রতার উপর নির্ভরশীল। অতিরিক্ত আর্দ্রতা বায়ুহীনতা সৃষ্টি করে বলে মৃত্তিকায় ক্ষুদ্র জীব কর্মহীন হয়ে পড়ে বা সংখ্যায় অনেক কম হয়। অনুরূপভাবে শুষ্ক মৃত্তিকায় তাদের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। একমাত্র কাম্য আর্দ্রতায় এই সমস্ত জীবের ক্রিয়াকলাপ বেশী হয় এবং সংখ্যাও অধিক হয়। (e) মৃত্তিকা গঠন প্রক্রিয়ারও অন্যতম মাধ্যম হল জল। মৃত্তিকার সিলিকেট খনিজের রাসায়নিক বিয়োজন জলের উপস্থিতি ছাড়া সম্ভব হয় না। মৃত্তিকার পরিলেখ গঠন পদ্ধতি বা স্তরায়ন পদ্ধতি জলের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্ক যুক্ত। মাটির মধ্যে জল প্রবেশ করলেই এ্যালুভিয়েশন ও ইলুভিয়েশান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য যুক্ত মৃত্তিকা প্রোফাইল গঠিত হয়।

মৃত্তিকা জলের অবস্থা ও প্রকারভেদ (State and categories of water) ঃ মৃত্তিকার জল ইহার সম্ভাব্য তিনটি অবস্থাতেই যথা কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় দেখা যায়। (a) হিমরেখার উচ্চে বা শীতল মেরু অঞ্চলে মৃত্তিকাস্থিত জল কঠিন অবস্থায় বা বরফ রূপে দেখা যায়। এ সমস্ত অঞ্চলে মৃত্তিকার উষ্ণতা সারাবছরই হিমাঙ্কের নীচে থাকে বলে মৃত্তিকা জলের এইরূপ অবস্থা দেখা যায়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে উষ্ণতা হিমাঙ্কের উপরে থাকে বলে মৃত্তিকা জলের এইরূপ অবস্থা কোন সময়েই দেখা যায় না। (b) মৃত্তিকা জলের বাষ্প রূপে অবস্থান দুইভাবে সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকা সূক্ষ্ম কণাগুলি বিশেষত কাদা কণা ও জৈব কণা বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প অধিশোধন করে উহার চর্তুদিকে জলীয় বাষ্পের স্তর গঠন করে। মৃত্তিকাস্থিত জল বাষ্পীভূত হলে ঐ জলীয় বাষ্পও মৃত্তিকা কণার দ্বারা অধিশোষিত হয়। ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জলীয় বাষ্প মৃত্তিকার কণাগুলির মধ্যে চলাচল করে। বেশী জলীয়বাষ্পের চাপের তল থেকে কম বাষ্পচাপের তলের দিকে বাষ্প চলাচল করে। (c) মৃত্তিকার জলের তরল অবস্থারই প্রাধান্য দেখা যায়। এই জলের উৎস হল বায়ুমন্ডল থেকে অধঃক্ষেপিত জল বা বৃষ্টিপাত অথবা ভৌম জল।

মৃত্তিকা জলের ধারণশীলতা বা রক্ষণ (Retention of Soil Moisture) ঃ অন্যান্য বেশীর ভাগ পদার্থের ন্যায় মৃত্তিকারও সহজাত প্রবণতা হল জলের প্রতি আসক্তি। ইহার জন্যই মাটির কণাগুলি বায়ুমন্ডল থেকে যেমন জলীয়বাষ্প শোষণ করে তেমনি বৃষ্টির জল, সেচের জল ও ভৌমজলও অধিশোধন করে এবং ধরে রাখতে সক্ষম হয়। মৃত্তিকা কণার এইরূপ জলধারণশীলতার মূলে রয়েছে দুইটি পৃথক শক্তি বা প্রক্রিয়া যথা **(a)** সজ্ঞ্যান (Adhesion) ও (b) সংসক্তি (Cohesion)।

(a) আসঞ্জন (Adhesion) ঃ জলের অণুর প্রতি কঠিন মৃত্তিকা কণার আকর্ষণ বা আসক্তিকে আসঞ্জন বলে। এই শক্তির প্রভাবে মাটির সূক্ষ্ম খনিজকণা অর্থাৎ কণা বা জৈব কণা জল অধিশোধন (Adhesion) করে মৃত্তিকা কলয়ডের বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ তলের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে বৈদ্যুত আয়নীর শক্তির (Electrostatic force) প্রভাবে জল কলয়েড কণার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। এই শক্তির প্রভাবে মৃত্তিকার কলয়েড কণাগুলি জল অধিশোষণ করে উহাদের চতুস্পার্শে পাতলা জলস্তর সৃষ্টি করে।

(b) সংসক্তি (Cohesion) ঃ জলের অণুর পারস্পরিক আকর্ষণকে সংসক্তি বলে। এই শক্তির প্রভাবে কলয়েড উপরে জলস্তরে ক্রমশ গভীর হতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত উহা বৃহৎ আকার ধারণ করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ভৌম জল রূপে মাটিতে প্রবেশ করে। জলের অনুদ্বিমেরু বিশিষ্ট হওয়ায় এবং এক একটি মেরুতে বিপরীত তড়িৎ আধান থাকায় ঋণাত্মক ও ধনাত্মক প্রান্তির মধ্যে স্বাভাবিক আকর্ষণে দুই জল অণুর সংযোগ ঘটে। এভাবে ধীরে ধীরে কলয়েড কণার চতুর্দিকে জলস্তরের গভীরতা বাড়তে থাকে এবং ক্রমশ পার্শ্ববর্তী সূক্ষ্ম কৈশিক রন্ধ্রগুলি (Capillary Pore space) জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

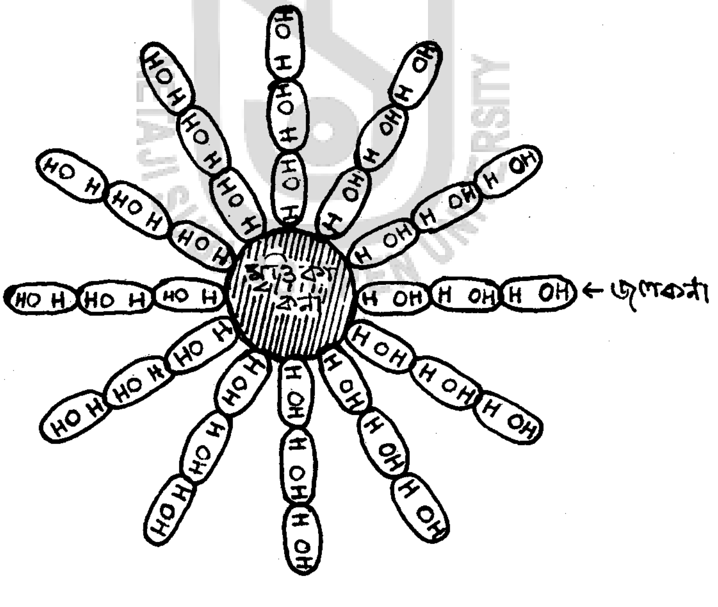

(চিত্র 3.5) ঃ আসঞ্জন ও সংসক্তি প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকা কণার জল অধিশোষণ

মৃত্তিকা জলের বিভা (Soil moisture Potential) ঃ মৃত্তিকাস্থির জলের উপর বিভিন্ন শক্তি ক্রিয়াশীল হয় যেগুলিকে সম্মিলিতভাবে মৃত্তিকা জলের বিভব রূপে (Moisture Potential) অবিহিত করা হয়। মৃত্তিকা জলের বিভব সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলি হল (a) মহাকর্ষীয় বিভব (Gravitational Potential), কৈশিক বিভব (Osmotic Potential)। মৃত্তিকা জলের উপর এই সমস্ত শক্তিগুলি ক্রিয়াশীল হয় বলেই বিভিন্ন সময়ে মৃত্তিকার আর্দ্রতার তারতম্য ঘটে।

(a) মহাকর্ষীয় বিভব (Gravitational Potential) ঃ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে মৃত্তিকার জল আকৃষ্ট হয়। কোন একটি কল্পিত তল থেকে কোন একটি বিন্দুর দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রকার শক্তি পরিমাপ করা হয়। মৃত্তিকা জলের ক্ষেত্রে ঐরূপ তল মৃত্তিকার পৃষ্ঠতল বা প্রোফাইলের মধ্যে যে কোন তল হতে পারে। কল্পিত তলের উপরে মহাকর্ষীয় বিভব ধনাত্মক এবং উহার নীচে ঋণাত্মক হয়।

(b) কৈশিক বিভব (Capillary Potential) ঃ জলকণার উপর মৃত্তিকার কলয়েড কণার কৈশিক টান এবং অধিশোষণ শক্তির মিলিত ফল হল কৈশিক বিভব। মৃত্তিকা কণাগুলির পৃষ্ঠতলে কৈশিক টানের উদ্ভিদের ফলে উহারা জল অধিশোষণ করে। কৈশিক টান এবং অধিশোষণ বলের (Adsorptive force) জন্যই মৃত্তিকা কণার চতুর্দিকে জলের আবরণ বা ঝিল্লী সৃষ্টি হয় এবং সূক্ষ্ম রন্ধ্রগুলি জলে মূলত মৃত্তিকা কণা এবং জলকণার মধ্যেও আকর্ষণের ফলেই কৈশিক বিভব সৃষ্টি হয়। হাইড্রোজেন বন্ধনের (Hydrogen bonding) প্রভাবে জল অণু মৃত্তিকা কণার পৃষ্ঠতলের অক্সিজেন আয়নের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মাধ্যমেই প্রথমে মৃত্তিকা কণার চারিপাশে জলের ঝিল্লী সৃষ্টি হয় এবং পরে সংশক্তি বলের প্রভাবে জল অণুগুলি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট সূক্ষ্ম রন্ধ্রগুলি জলে পূর্ণ হয়। কৈশিক বৈভব এবং কৈশিক জলের পরিমাণ নির্ভর করে মৃত্তিকার কণার পৃষ্ঠতলের মোট আয়তনের উপর। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কণাগুলির পৃষ্ঠতল সর্বমোট আয়তন বেশী হয় বলেই কাদাকণার জলধারণ ক্ষমতা স্থূল বালিকণার তুলনায় অনেক বেশী হয়। অবশ্য মৃত্তিকার খনিজকণার প্রকৃতি হিউমাসের পরিমাণ গঠনগত বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির মৃত্তিকার জলধারণক্ষমতা বা কৈশিক বিভবকে নিয়ন্ত্রণ করে। হিউমাস কণিকা এবং মন্টমরিলোনাইট কাদা কণার পৃষ্ঠতলের মোট আয়তন বেশী হয় বলে জলধারণ ক্ষমতাও বেশী হয়। গঠন বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মৃত্তিকা রন্ধ্রগুলির আয়তন নিয়ন্ত্রিত হয় বলে ইহাও কৈশিক বিভবকে প্রভাবিত করে।

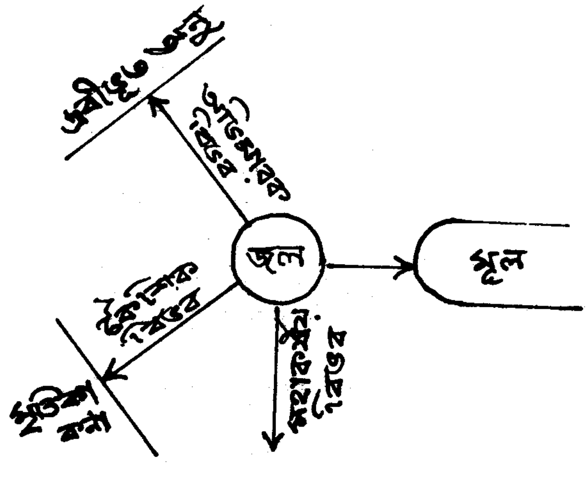

(চিত্র 3.6) ঃ মৃত্তিকা জলের উপর বিভিন্ন বিভব শক্তির ক্রিয়া

(c) **অভিসারক বিভব (Osmotic Potential)** ঃ জলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দ্রাব (Solutes) দ্রবীভূত থাকলে এই প্রকার শক্তির উদ্ভব হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মৃত্তিকার দ্রবণ তরল প্রকৃতির হওয়ায় অভিসারক বিভব অনেক কম হয়। কিন্তু ক্ষারকীয় মাটিতে (যেমন—লবণাক্ত মৃত্তিকা) প্রচুর পরিমাণে লবণ দ্রবীভূত থাকে বলে অভিসারক বিভব কৈশিক বিভব ও মহাকর্ষীয় বিভবের তুলনায় অনেক বেশী হয়। উদ্ভিদেরও নিজস্ব অভিসারক বিভব থাকে। উদ্ভিদ মূলে দ্রবীভূত দ্রাবের পরিমাণ বেশী থাকায় অভিসারক বিভব বেশী হয় বলে আর্দ্র মাটিতে উদ্ভিদের বেশী হয়। বিভবগত এরূপ পার্থক্যের জন্য উদ্ভিদ শিকড়ের দিকে জলের চলন ঘটে। মাটি শুষ্ক হওয়ার সাথে সাথে মূল সংলগ্ন মাটিতে অভিসারক সংলগ্ন মাটির আর্দ্রতা বিভব বেশী হওয়ার জন্য মৃত্তিকায় অন্যান্য অংশের জল মূলসংলগ্ন অঞ্চলে ধাবিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে মৃত্তিকার আর্দ্রতার বিভব অর্থাৎ জলধারণশীলতা নির্ভর করে উপরিউক্ত বিভবগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের উপর।

মৃত্তিকার জলের বিভব পরিমাপের একক (Moisture Potential Unit) ঃ মৃত্তিকা জলের বিভব বিভিন্ন এককের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। এগুলির মধ্যে সাধারণত ব্যবহৃত একক হল এ্যাটমস্ফিয়ার (Atmosphere) বার (Bar) এ্যাটমশ্ফিয়ারা 1.013 বারের সমান। 1 এ্যাটমস্ফিয়ারের তুল্যাঙ্ক নিম্নরূপ।

1 এ্যাটমশফিয়ার (1 atm) = 1.013 বার
= 1.033 কেজি/বর্গ সে.মি.
= 1033 সে. মি. জল স্তম্ভ
= 76 সে.মি. পারদ স্তম্ভ
= 14.7 পাউন্ড/বর্গ ইঞ্চি।

মৃত্তিকাজলের বিভাজন বা শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে জলের বিভবের পরিমাণ গত তারতম্যের উপর। জল কতটা দৃঢ়তার সঙ্গে মৃত্তিকা কণার সঙ্গে আবদ্ধ হয় সেই ভিত্তিতেই মৃত্তিকা জলের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ 15 এ্যাটমশফিয়ার দ্বারা আবদ্ধ জলকে শুষ্ক বিন্দু (Wilting Point) বলে। নির্দিষ্ট বর্গ একক পরিমিত স্থানে নির্দিষ্ট পারদস্তম্ভের বা জলস্তম্ভের উচ্চতার ভিত্তিতেও আর্দ্রতার বিভবকে পরিমাণ করা হয়। কিন্তু এইরূপ সংখ্যা ব্যবহারের অসুবিধার জন্য ইহার লগারিদম মানকে ব্যবহার করা হয় যাহাকে P^F বলে। নিম্নলিখিত সারণীতে বিভব এককের তুল্যমান দেওয়া হল।

জলস্তম্ভের উচ্চতা (সেন্টিমিটারে)	P^F মান	বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বা এ্যাটমশ্‌ফিয়ার (atm)
1	0	1/1000
10	1	1/100
100	2	1/10
1000	3	1
10000	4	10

মৃত্তিকা জলের শ্রেণীবিভাগ (Classification of soil moisture) ঃ মৃত্তিকা জলের শ্রেণীবিভাগ প্রধানত দুইটি পদ্ধতিতে করা হয়। যথা—(A) ভৌত শ্রেণীবিভাগ (Physical classification) এবং (B) জৈবিক শ্রেণীবিভাগ (Biological Classification)।

(A) **মৃত্তিকা জলের ভৌতিক বা প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ (Physical classification of water)** ঃ মৃত্তিকা কণার পৃষ্ঠটানের (surface tension) তারতম্যের ভিত্তিতে বা বিভব পরিমাণের পার্থক্য অনুসারে মৃত্তিকা জলকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(i) **জলগ্রাহী বা হাইগ্রোস্কোপিক জল (Hygroscopic water)** ঃ মৃত্তিকা কণার চারিদিকে যে জল অত্যন্ত দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ থাকে তাকে হাইগ্রোস্কোপিক বা জলগ্রাহী জল বলে। এই জল মৃত্তিকা কণার চারিদিকে অতি সূক্ষ্ম স্তরে অবস্থান করে। জলগ্রাহী জল অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে মৃত্তিকা কণার সঙ্গে 31-10,000 এ্যাটমসফিয়ার চাপে আবদ্ধ থাকে বলে এটি সাধারণ অবস্থায় চলমান হয় না এবং মৃত্তিকা কণা থেকে একে চ্যুত করা যায় না। কৈশিক বিভবের তুলনায় অভিসারক বিভবের মান কম হয় বলেই উদ্ভিদ ঐ বলে শোষন করতে সক্ষম হয় না। তরল অবস্থায় এই জল অবস্থান করে না বলেই

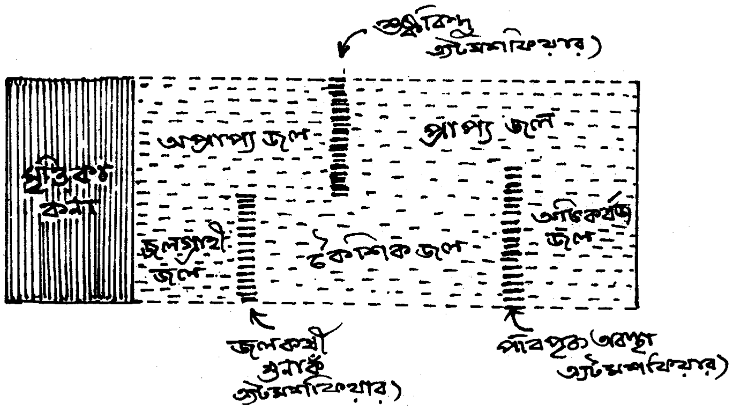

(চিত্র 3.7) ঃ মৃত্তিকা জলের শ্রেণীবিভাগ

এর চলন সম্ভব হয় না। মৃত্তিকার অন্যান্য জল সহজেই স্বাভাবিক যে কোন তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হলেও জলগ্রাহী জল বাষ্পীভূত হয় না। একে বাষ্পীভূত করতে হলে 105° সে.—110° সে. উত্তাপে 8-10 ঘন্টা তাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। বায়ু শুষ্ক মৃত্তিকায় এজন্য জলগ্রাহী জল অবস্থান করে। মৃত্তিকা বায়ুমন্ডল থেকে জলীয় বাষ্পাকারেই এই জল অধিশোষণ করে। এই জলের পরিমাণ এজন্য বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে।

জলগ্রাহী জলের পরিমাণ নির্ভর করে মৃত্তিকার গ্রথন, কলয়েড ধর্মী কাদা কণার প্রকৃতি ও পরিমাণ, জৈব পদার্থ বা হিউমাসের পরিমাণ এবং সর্বোপরি বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতার উপর। সূক্ষ্ম গ্রথন যুক্ত মৃত্তিকার এই জলের পরিমাণ স্থূল গ্রথন যুক্ত মৃত্তিকার তুলনায় অনেক বেশী হয় কারণ মৃত্তিকার সূক্ষ্ম খনিজ কণিকার জলাকর্ষী গুণাঙ্ক (Hygroscopic Coefficient) স্থূল কণার তুলনায় অনেক বেশী। হিউমাস কলয়েডধর্মী হওয়ায় এরও জলাকর্ষী গুণাঙ্ক কাদা কণার ন্যায় বেশী হয়। এজন্য হিউমাস সমৃদ্ধ মাটির জলগ্রাহী জল হিউমাস হীন মাটির তুলনায় বেশী হয়। মন্টমোরিলোনাইট কাদা খনিজ সমৃদ্ধ মাটির জলগ্রাহী জল কেওলিনাইট কাদা খনিজ সমৃদ্ধ মাটির তুলনায় বেশী হয়। অধিক আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে মাটির জলগ্রাহী জল শুষ্ক অঞ্চলের মৃত্তিকার তুলনায় বেশী হয়।

(ii) কৈশিক (Capillary Water) ঃ মৃত্তিকা 15-31 এ্যাটমস্‌ফিয়ার বলে ক্ষুদ্র রন্ধ্রের মধ্যে যে জল ধরে রাখে তাকে কৈশিক জল বলে। কৈশিক রন্ধ্রের মধ্যে এই জল অবস্থান করে বলেই একে কৈশিক জল বলে। মৃত্তিকা জলের পরিপৃক্ত অবস্থা (Field Capacity) এবং জলকর্ষী গুণাঙ্কের মধ্যবর্তী অবস্থাকে কৈশিক জল বলে। মৃত্তিকা জলের হাইগ্রোস্কোপিক (Hygroscopic) অবস্থার পরবর্তী পর্যায়ে জলের যোগান বৃদ্ধি পেলে মৃত্তিকা কণাগুলি আরও জল অধিশোষণ করায় তাদের চারদিকে পাতলা জলস্তর সৃষ্টি হয় এবং তা ক্রমশ স্ফীত হয়ে কৈশিক রন্ধ্রকে পরিপূর্ণ করে। এই জল মৃত্তিকা কণার সঙ্গে সেরূপ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে না বলে সহজেই চলাচল করতে পারে। তাছাড়া এই জল সহজেই স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয়। এই জলের বেশীরভাগ অংশই গাছ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। কৈশিক জলের পরিমাণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

(a) গ্রথন (Texture) ঃ সূক্ষ্ম গ্রথন যুক্ত মৃত্তিকা রন্ধ্রগুলি স্থূল গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকার তুলনায় সংখ্যায় বেশী হওয়ায় উহাদের আয়তন বেশী হয় এবং রন্ধ্রগুলি সূক্ষ্ম হয়। এজন্য সূক্ষ্ম গ্রথন যুক্ত কাদা মাটিতে বালি মাটির তুলনায় কৈশিক জলের পরিমাণ অনেক বেশী হয়। তাছাড়া কলয়েডধর্মী ক্ষুদ্র খনিজ কণার পৃষ্ঠ টান (Surface tension) স্থূল কণাগুলির তুলনায় বেশী হওয়ায় সূক্ষ্ম গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকার কৈশিক জল বেশী হয়।

(b) মৃত্তিকার গঠন ঃ মৃত্তিকা সুগঠনযুক্ত হলে মৃত্তিকার রন্ধ্র সংখ্যায় যেমন বেশী হয় তেমনি তাদের মোট আয়তনও বেশী হয়। তাছাড়া গঠন এককগুলি যদি ক্ষুদ্র হয় (যেমন দানাবদ্ধ গঠন বা ক্রাম্ব গঠন) তাহলে মাটিতে ক্ষুদ্র ক্যাপিলারি রন্ধ্রের সংখ্যা ও আয়তন দুইই বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কৈশিক জলের

বৃদ্ধি ঘটে। মাটি সূক্ষ্ম গ্রথনযুক্ত হয়েও তা সুগঠনযুক্ত না হলে কণাগুলির আঁটসাঁট (Compact) অবস্থার জন্য ক্যাপিলারি রন্ধ্রের সংখ্যা ও আয়তন দুইই হ্রাস পায় এর ফলে তাতে কৈশিক জল কম হয়।

(c) জৈব পদার্থ ঃ জৈব পদার্থ কাদা খনিজের ন্যায় কলয়েডধর্মী হওয়ায় তার পৃষ্ঠটান বেশী হয়। তাছাড়া হিউমাসের ছিদ্রময়তা (Porosity) বেশী হওয়ায় রন্ধ্রগুলি ক্যাপিলারি শ্রেণীভুক্ত। এই কারণে জৈব পদার্থেরও কাদাকণার ন্যায় কৈশিক বিভবও (Capillary) বেশী। এর ফলে অধিক হিউমাসযুক্ত মাটির কৈশিক জল হিউমাসহীন মৃত্তিকা অপেক্ষা বেশী। স্থূল গ্রথনযুক্ত বালিমৃত্তিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে হিউমাস প্রয়োগ করলে কৈশিক জলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কারণ হিউমাস প্রয়োগ মাটির গঠন সৃষ্টি হয় এবং এর প্রভাবে কৈশিক রন্ধ্রেরও সৃষ্টি হয়।

(III) **অভিকর্ষজ জল (Gravitational Water) ঃ** মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত জল সংযোজিত হলে, এই অতিরিক্ত জল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করে এবং নিচের দিকে গড়িয়ে যায় একে অভিকর্ষজ জল (Gravitational Water) বলে। যেহেতু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি মৃত্তিকার এইরূপ জলপ্রবাহের কারণ, সেইজন্য একে অভিকর্ষজ জল বলে। মৃত্তিকার উপরের স্তর থেকে নীচের স্তরে এই জলপ্রবাহকে Circulation বলে। অনেকসময় বিশেষত কর্দম মৃত্তিকায় ফাটলের মধ্য দিয়ে বা গর্ত খননকারী প্রাণীদের দ্বারা সৃষ্ট গর্তের মধ্যে ভৌমজল প্রবেশ করতে দেখা যায়। এই ভৌমজলকে সিপেজ ওয়াটার (Seepage water) বলে। এই জল অতিরিক্ত আলগা ভাবে মৃত্তিকা কণায় আবদ্ধ হয় বলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে সহজেই চ্যুত হয়ে মাটির মধ্যে প্রবেশ করে। এই জলের উপর মৃত্তিকা কণার পৃষ্ঠ টানের পরিমাণ 1/3 এ্যাটমসফিয়ার। বৃহৎ মৃত্তিকা রন্ধ্রের মধ্যেই এরূপ জল অবস্থান করে। অভিকর্ষজ জল মাটির মধ্যে আবদ্ধ না থাকায় গাছের এ জল কোন কাজে লাগে না। এদিক থেকে এই জল গুরুত্বহীন হলেও মাটির অতিরিক্ত জল নিকাশী ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্গত হওয়ার দিক থেকে এবং এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়াকে প্রগাঢ় করতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। অভিকর্ষজ জল মুক্ত জল রূপে অবিহিত হয় যাহা অভিকর্ষের টানে মাটি থেকে নিকাশিত হয়। বৃহৎ রন্ধ্রের মধ্যে এই জল অবস্থান করায় ইহা সুনিকাশী হীন মৃত্তিকায় জারণ প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এজন্য এই জল অনাকঙ্খিত হিসাবে বিবেচিত হয়। অভিকর্ষজ জলের পরিমাণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

(a) মৃত্তিকার গঠন ঃ মৃত্তিকার গঠন একককগুলি সূক্ষ্ম হলে, ভৌমজলের পরিমাণ হ্রাস পায়, এবং বিপরীতক্রমে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(b) মৃত্তিকা গ্রথন ঃ মৃত্তিকার গ্রথন স্থূল হলে অর্থাৎ মৃত্তিকায় স্থূল কণার প্রাধান্য থাকলে অভিকর্ষজ জলের পরিমাণ বেশী হয়। বিপরীতক্রমে মৃত্তিকার গ্রথন সূক্ষ্ম হলে অভিকর্ষজ জলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হয়। বেলেমাটিতে অভিকর্ষজ জলের পরিমাণ, সূক্ষ্ম গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকা অপেক্ষা বেশী হয়।

(c) উষ্মতা ঃ মৃত্তিকার উষ্মতা বেশী হলে, ভৌমজলের পরিমাণ হ্রাস পায়। কিন্তু জলের যোগান একই রকম থাকলে, উষ্মতা হ্রাসের ফলে ভৌমজলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(d) জৈবিক শ্রেণীবিভাগ (Biological Classification of Soil Water) ঃ পূর্বে আলোচিত

মৃত্তিকা জলের বিভিন্ন শ্রেণীর সব কটিই উদ্ভিদ বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক নহে। উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্তিকা জল নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—(a) প্রয়োজনাতিরিক্ত জল (Superfluous water), (b) প্রাপ্য বা লভ্য জল (Available Water), (c) অপ্রাপ্য বা দুর্লভ্য জল (Unavailable Water).

(a) প্রয়োজনাতিরিক্ত জল (Superfluous water) ঃ এ্যাটমসফিয়ার বা তার কম পৃষ্ঠ টানে আবদ্ধ মৃত্তিকা জলকে প্রয়োজনাতিরিক্ত জল বলে। এই জল মৃত্তিকার পরিপৃক্ত অবস্থায় (Field Capacity) বৃহৎ রন্ধ্রে অবস্থান করে। এই জল অতিরিক্ত পরিমাণে বহুসময় ধরে মাটিতে অবস্থান করলে বায়ুশূন্য অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে গাছের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্যাসের অভাব দেখা যায়। এজন্য গাছের শ্বসন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। বায়ুর অভাবে বেশীরভাগ মৃত্তিকা জীবাণুর অনুপস্থিতিতে নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ প্রক্রিয়া এবং নাইট্রিফিকেশান প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় বা আদৌ সংঘটিত হয় না। এই জলের বৃদ্ধিতে এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া দ্রুত সংঘটিত হয় বলে মাটির উর্বর পৃষ্ঠ স্তর সঙ্গে ধৌত বা অপসারিত হয়। এর ফলে মাটি ক্রমশ অনুর্বর হয়ে পড়ে। অভিকর্ষজ জল এই শ্রেণীভুক্ত জল।

(b) প্রাপ্য জল (Available Water) ঃ কৈশিক জলের যে অংশ মৃত্তিকা কণা 1/3-15 এ্যাটমসফিয়ার পৃষ্ঠ টানে ধরে রাখে তাকে প্রাপ্য জল বলে। এই জল মৃত্তিকা কণিকায় অত্যন্ত আলগাভাবে অবস্থান করে বলে উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় জল এই প্রকার জল থেকে গ্রহণ করতে পারে বলে একে প্রাপ্য জল বলে। মৃত্তিকার ক্ষুদ্র রন্ধ্রগুলি যখন জলে পরিপূর্ণ থাকে তখন মৃত্তিকা সম্পূর্ণরূপে পরিপৃক্ত অবস্থায় (Field Condition) পৌঁছায়। বৃষ্টির কয়েক ঘন্টা পরে যখন মৃত্তিকার মধ্যে অভিকর্ষজ জলের চুঁইয়ে পড়া বন্ধ হয় তখন মৃত্তিকার আর্দ্রতাকে পরিপৃক্ত আর্দ্রতা বলে। মৃত্তিকার পরিপৃক্ত অবস্থা বৃদ্ধির পরে দু-তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করে। যতক্ষণ না পর্যন্ত উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় জল মাটি থেকে শোষণ করে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্তিকার পরিপৃক্ত অবস্থা বজায় থাকে। কৈশিক জলের যে অংশ উদ্ভিদ দ্বারা প্রাপ্য হয়। তার পরিমাণ নির্ভর করে শস্যের প্রকৃতির উপর। অবশ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে মৃত্তিকার পরিপৃক্ত সীমা এবং শুষ্ক গুণাঙ্ক (Wilting Coefficient) পর্যন্ত মৃত্তিকার জল উদ্ভিদের জন্য বেশী করে লভ্য হয়।

(c) অপ্রাপ্য জল (Unavailable Water) ঃ এই জল মৃত্তিকা কণা 15 এ্যাটমসফিয়ারের বেশী পৃষ্ঠ টানে জলকে ধরে রাখে। জলগ্রহী জল বা হাইগ্রোস্কোপিক জলও এর অন্তর্গত। 15 এ্যাটমসফিয়ারে আবদ্ধ জলের সীমাকে শুষ্ক বিন্দু (Wilting point) বলে। কারণ এই সীমা পর্যন্তই কৈশিক জলের খানিকটা উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে। এর বেশী পৃষ্ঠটানে আবদ্ধ জল উদ্ভিদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না বলে জলাভাবে গাছ শুকিয়ে যেতে বা নিস্তেজ হয়ে যেতে থাকে। এরকম অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হলে গাছ অবশেষে মারা পড়ে। এজন্য 15 এ্যাটমশফিয়ার পৃষ্ঠ টানে আবদ্ধ জলকে শুষ্ক বিন্দু রূপে পরিগণিত করা হয়। এজন্য টবের গাছে বেশ কিছুদিন জল না দিলে গাছ জলাভাবে মারা পড়ে। গ্রীষ্ম ঋতুতে বৃষ্টির কয়েকদিন পরে মাটি শুকিয়ে গেলে শুষ্ক বিন্দুর সৃষ্টি হয়।

মৃত্তিকা জলের চলন (Movement of Soil Water) ঃ মৃত্তিকাস্থিত জলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য গতিশীলতা। মৃত্তিকা জলের তিন প্রকার চলন বা গতিশীলতা লক্ষ করা যায়। যথা—(a) কৈশিক সমন্বয়ন (Capillary adjustment, (b) অনুস্রাবন বা অন্তস্বরণ (Percolation) (c) বাষ্পায়ন (Evaporation).

(a) কৈশিক সমন্বয়ন (Capillary adjustment) ঃ মৃত্তিকার সূক্ষ্ম রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে জলের চলাচলকে কৈশিক চলন বা কৈশিক সমন্বয়ন বলে। মৃত্তিকা জলের এইরূপ চলাচল দুইটি শক্তির মিলিত ফল যথা আসঞ্জন (cohesion) অর্থাৎ মৃত্তিকা কণা ও জলকণার পারস্পরিক আকর্ষণ এবং সংসক্তি (cohesion) অর্থাৎ তরল পদার্থের অণুগুলির পারস্পরিক আকর্ষণ। আসঞ্জন প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকা কণাগুলির পৃষ্ঠটানে জল উহাতে আবদ্ধ হয়। আবদ্ধ একটি জলকণা আর একটি জলকণাকে আকর্ষণ করার ফলেই জল অণুগুলি চালিত হয় এবং মৃত্তিকা কণার চতুপার্শ্বে জলের ঝিল্লি গড়ে ওঠে এবং সূক্ষ্ম মৃত্তিকা রন্ধ্র জলে পূর্ণ হয়। মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বা একই স্তরের বিভিন্ন অংশে জলের বাষ্প বিভবগত পার্থক্যের (Difference in moisture potential) জন্যই কৈশিক চলন সৃষ্টি হয়। কম বিভব অঞ্চল (Areas of low water potential) থেকে বেশী বিভব অঞ্চলের দিকে জলের চলন সংঘটিত হয়। মৃত্তিকার বেশী আর্দ্রতা অঞ্চল থেকে কম আর্দ্রতা অঞ্চলের দিকে জল চালিত হয়। কৈশিক ক্রিয়ায় (Capillary action) জল নিচ থেকে উপরের দিকে কয়েক মিটার পর্যন্ত উঠতে দেখা যায়। সূর্যের উত্তাপে মাটির পৃষ্ঠস্তরের জল শুকিয়ে গেলে কৈশিক টানে ভৌমজল ধীরে ধীরে উপরের স্তরে উঠে আসে. ভৌম জল সংলগ্ন মৃত্তিকার কণাগুলি আসঞ্জন প্রক্রিয়ায় জল ধারণ করে এবং একটি জলকণা আর একটি জলকণাকে আকর্ষণ করায় ধীরে ধীরে জলকণা মৃত্তিকার উপরের স্তরে উঠে আসে। জলের এইরূপ কৈশিক উন্নয়ন (Capillary rise) মহাকর্ষের বিপরীতে কার্যকরী হয়। লবণাক্ত মৃত্তিকায় লবণ বর্ষা ঋতুতে ধৌত হয়ে অভিকর্ষজ জলের সাথে নিচে অপসারিত হয়ে ভৌমজলে জমা হয়। শুষ্ক ঋতুতে পৃষ্ঠস্তরের মাটি শুকিয়ে গেলে কৈশিক টানে লবণাক্ত ভৌমজল উপরে উঠে আসে। ঐ জল বাষ্পীভূত হলে মৃত্তিকার উপরে লবণ স্তর সৃষ্টি হয়।

একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে জলস্তরের ঠিক উপরিতলে কৈশিক ছিদ্র যুক্ত একটি কাঁচের নল স্থাপন করলে দেখা যাবে কাঁচনলের মধ্যে জল কিছুটা উপর পর্যন্ত উঠে রয়েছে অর্থাৎ কাঁচনলের মধ্যে জলতল এবং তার বাইরের পাত্রে জলতলের মধ্যে সমতা নেই। কারণ জলের সংস্পর্শে থাকা কাঁচনলের অংশ আসঞ্জন প্রক্রিয়া হেতু জল ধারণে সক্ষম হয় এবং কাঁচের পৃষ্ঠটানে কাঁচের উপরের দিকে জল কণা অধিশোষিত হয়। কিন্তু কাঁচসংলগ্নতা বিহীন জলকণাগুলি আসঞ্জন বা সংসক্তির প্রভাবে ক্রমশ উপরের দিকে উঠতে থাকে এবং একটি উচ্চতা পর্যন্ত উঠে থেমে যায়। কাঁচ নলের কৈশিকতাই এর জন্য দায়ী। আরও লক্ষ করলে দেখা যাবে কাঁচনলের মধ্যেও উন্নীত জলস্তম্ভের উপরিতল অবতল। কাঁচ নলটির দৈর্ঘ্য যত বেশী তার মধ্যস্থ জলস্তম্ভের উপরিতলের অবতলতাও (Concavity) তত বেশী। অধিক প্রশস্ত কাঁচনলের মধ্যে জলস্তম্ভের উচ্চতা কম প্রশস্ত কাঁচনলের জলস্তম্ভের উচ্চতার তুলনায় কম। কারণ গাণিতিকভাবে :

$$h = \frac{2T}{rdg}$$

যখন h = জলস্তম্ভের উচ্চতা (সেঃ মিঃ)

T = পৃষ্ঠ টান (Surface tension) (ডাইন প্রতি সেঃ মিঃ)

r = ক্যাপিলারির ব্যাস (সেঃ মিঃ)

d = তরল পদার্থের ঘনত্ব

g = অভিকর্ষজ ত্বরণ (সেঃ মিঃ প্রতি বর্গ সেকেন্ড)

(b) অনুস্রবণ বা অন্তস্রবণ (Percolation) ঃ পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টির জল বা সেচের জল মাটিতে সংযুক্ত হলে মাটি সম্পূর্ণরূপে পরিপৃক্ত হয়। এই অবস্থায় মাটির বৃহৎ রন্ধ্রে আলগা ভাবে অধিশোষিত জল অভিকর্ষের টানে নীচে প্রবেশ করে যতক্ষণ অতিরিক্ত জলের যোগান অব্যাহত থাকে এবং মাটির বৃহৎ রন্ধ্রগুলি কোন কারণে বন্ধ হয়ে গিয়ে জল প্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি না করে ততক্ষণ পর্যন্ত জলের অনুস্রবণ পদ্ধতি চলতে থাকে। অনুস্রবন নির্ভর করে মাটির গ্রথন প্রকৃতি এবং গঠন বৈশিষ্ট্যের উপর। কারণ এই দুই ভৌত বৈশিষ্ট্য মৃত্তিকা রন্ধ্রের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

(c) বাষ্পায়ন (Evaporation) ঃ মাটির বাহিরে এবং অভ্যন্তরে বাষ্পায়ন প্রক্রিয়া মৃত্তিকা জলের চলন সংঘটিত হয়। মাটির বৃহৎ রন্ধ্রগুলিতে আবদ্ধ জল সহজেই বাষ্পীভূত হয় কারণ এই জল খুব আলগাভাবে মৃত্তিকা কণায় আবদ্ধ হয়।

3.3.4 মৃত্তিকার বর্ণ (Soil Colour)

মৃত্তিকার দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হল এর বর্ণ। অন্যান্য ভৌত বৈশিষ্ট্য যেমন গ্রথন গঠন ও আর্দ্রতা প্রভৃতির ন্যায় প্রত্যক্ষভাবে মৃত্তিকার বর্ণ গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটি অন্যান্য ভৌত বৈশিষ্ট্যের উপর প্রভাব বিস্তাব না করলেও মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগকরণে, এবং মৃত্তিকার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ করতে এর বর্ণ বিশেষ সাহায্য করে। বিভিন্নশ্রেণীর মৃত্তিকার রঙ বিভিন্ন হয় কারণ এক একটি শ্রেণীর মৃত্তিকা সৃষ্টিতে এক এক প্রকার মৃত্তিকা গঠনকারী প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়। উদাহরণস্বরূপ ল্যাটারাইট মৃত্তিকার রঙ যেমন লাল বর্ণের হয় তেমনি চারনোজেম মৃত্তিকার রঙ গাঢ় কালো রঙের হয়। অপরদিকে পডজল মৃত্তিকার রঙ ধূসর ছাই রঙের হয়। মৃত্তিকা প্রোফাইলের বিভিন্ন স্তরের বর্ণও ভিন্ন প্রকৃতির হয়। এই প্রকার বর্ণবিভেদের মাধ্যমে ও নির্দিষ্ট স্তরের নির্দিষ্ট রঙ লক্ষ করে মাটি কোন শ্রেণীভুক্ত তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়। যেমন—প্রোফাইলের (A_2) স্তর যদি ধূসর বর্ণের হয় এবং তাতে সিলিকার প্রাধান্য থাকে তবে ঐ মৃত্তিকা পডজল মৃত্তিকা রূপে পরিগণিত হবে।

মৃত্তিকার উপাদানগত বৈশিষ্ট্যও রঙের দ্বারা প্রতিফলিত হয়। যে মৃত্তিকায় হিউমাস বেশী থাকে তার রঙ সাধারণত কাল রঙের হয়। মাটির পৃষ্ঠস্তরের রঙ কাল না হলে বুঝতে হবে হিউমাসের পরিমাণ

কম আছে। মাটিতে প্রচুর পরিমাণে অনার্দ্র (Unhydrated) আয়রণ অক্সাইড (Fe_2O_3) থাকলে মাটির রঙ লাল হয়। আংশিক সোদক ম্যাঙ্গানীজ অক্সাইড ও আয়রণ অক্সাইড থাকলেও মাটির রঙ লাল হয়। মৃত্তিকায় লবণ ও কার্বোনেট সঞ্চিত হলে মাটির রঙ সাদাটে হয়।

মৃত্তিকার রঙ তার প্রোফাইল গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কেও নির্দেশ করে। মৃত্তিকার কোন স্তরে বিভিন্ন রঙের ছোপ বিশেষত লাল মরচে পড়ার রঙ দেখা গেলে বুঝতে হবে বৎসরের কোন একটি সময়ে মৃত্তিকায় বায়ুর অনুপস্থিতি বা অভাব ঘটে। মৃত্তিকার কোন স্তরের রঙ নীলাভ, ধূসর বা সবুজ বর্ণের হলে বুঝতে হবে ঐ স্থানে গ্লেইজেশান (Gleization) প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল।

মৃত্তিকা রঙের নিয়ন্ত্রক (Determinant of Soil Colour) ঃ মৃত্তিকার বর্ণ নির্ভর করে জৈব পদার্থের পরিমাণ খনিজ উপাদান, জলবায়ু এবং জল নিকাশী ব্যবস্থা প্রকৃতির উপর।

(c) জৈব পদার্থ ঃ মাটিতে জৈব পদার্থ বেশী থাকলে মাটির রঙ কালো হয়। উপ অনার্দ্র নাতিশীতোষ্ম জলবায়ু অঞ্চলের চারনোজেম মাটিতে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ থাকে বলে মাটির রঙ গাঢ় কালো। ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের উপস্থিতিতে জৈবপদার্থ পচে গিয়ে হিউমাস সৃষ্টি হলে এর রঙ গাঢ় কালো হয়। ঐ প্রকার হিউমাস মাটির রঙকে গাঢ় কালো করে। আর্দ্র ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে উচ্চ ক্ষারক অবস্থায় জৈব পদার্থ পচে গিয়ে যে কালো রঙের হিউমাস গঠিত হয় তার প্রভাবে মাটির রঙ কালো হয়।

(b) খনিজ পদার্থ ঃ মাটির রঙ নির্ধারণে খনিজের প্রভাব অপরিসীম। মাটিতে আনহাইড্রেটেড আয়রণ অক্সাইড বা ফেরিক অক্সাইড থাকলে মাটির রঙ লাল হয়। কিন্তু সোদক আয়রণ অক্সাইডের (Hydrated ironoxide) উপস্থিতিতে মাটির রঙ হলুদ হয়। ল্যাটেরাইট জাতীয় মাটির রঙ হলুদ বা লাল এবং ল্যাটারাইট মৃত্তিকার রঙ এজন্য লাল হয়। জৈব পদার্থের সঙ্গে আয়রণ অক্সাইডের মিশ্রণে মাটির রঙ সাধারণত বাদামী হয়। মাটিতে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট, জিপসাম, কেয়োলিন এবং অন্যান্য কাদা খনিজ, কোয়ার্টজ লবণ প্রভৃতি উপাদান বেশী থাকলে মাটির রঙ সাদাটে বা ধূসর হয়।

(c) জল নিকাশ ব্যবস্থা (Drainage) ঃ জল নিকাশের অব্যবস্থার ফলে মাটি বায়ুশূন্য হলে আয়রন যৌগ ফেরিক অক্সাইডের পরিবর্তে ফেরাস অক্সাইডে পরিণত হয়। এর রঙ ধূসর বলে মাটির রঙ ধূসর প্রকৃতির হয়। তাছাড়া এরূপ পরিবেশে আয়রণ যৌগ বিজারণ প্রক্রিয়ার নীলাভ বা সবুজ ফেরাস অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এর প্রভাবে মাটির রঙ নীলাভ বা সবুজ হয়। বদ্ধ জলাশয়ে উৎপন্ন মাটির রঙ এজন্য ধূসর, নীলাভ বা সবুজ হয়। যে সমস্ত স্থানে ভৌমজল নিরন্তর ওঠানামা করে সেই সমস্ত স্থানে হাইড্রেটেড বা আনহাইড্রেটেড ফেরিক অক্সাইডের প্রভাবে মাটির স্তরে লাল, হলুদ বা বাদামী রঙের ছোপ (Mottle) সৃষ্টি হয়।

(d) মূল শিলা খন্ড (Parent material) ঃ মূল শিলাখন্ড যে শিলামাতৃকা থেকে উৎপন্ন হয়েছে তার রঙের উপরও মাটির রঙ নির্ভর করে। ইংল্যান্ডের যে অঞ্চলে লাল বেলে পাথরের প্রাধান্য দেখা যায় সেখানকার মাটির রঙ লাল। অনুরূপভাবে ভারতের কৃষ্ম কার্পাস মৃত্তিকা (Black Cotton soil) কালো রঙের ব্যাসল্ট শিলা থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে এর রঙ কালো।

(c) আর্দ্রতা ঃ মাটির আর্দ্রতা এর মূল বর্ণকে গাঢ় বা হালকা করতে দেখা যায়। মাটি ভিজে থাকলে এর যে কোন রঙই খুব গাঢ় দেখায়। শুষ্ক অবস্থায় আবার মাটির রঙ হাল্কা হয়ে পড়ে।

মাটির রঙ নির্ণয় পদ্ধতি ঃ মুনসেল কালার চার্টের (Munsell colour chart) সাহায্যে মাটির রঙ নির্ধারণ করা হয়। এই কালার চার্টে 175টি রঙের নমুনা সাজান থাকে। মুনসেন প্রবর্তিত হিউ (Hue), ভ্যালু (Value) ও ক্রোমা (Chroma) এই তিনটি পরিবর্তনীয় গুণের ভিত্তিতে সংখ্যা ভিত্তিক সাঙ্কেতিক চিহ্নের মাধ্যমে মাটির রঙ নিরুপিত হয়। হিউ সূর্য রশ্মির প্রধান রঙ যথা লাল, হলুদ প্রভৃতি রঙ নির্দেশ করে। রঙের ইংরাজী প্রথম অক্ষরের সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা হিউ নির্দেশিত হয়। যেমন—লালের ক্ষেত্রে R এবং হলুদের ক্ষেত্রে Y এবং লালচে হলুদ YR সঙ্কেত ব্যবহৃত হয়। হিউর পূর্বে 0-10 সংখ্যা যুক্ত করে হলদে ও লালরঙের সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি বোঝান হয়। যেমন সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে রঙ বেশী করে হলুদ হয় এবং কম লাল হয় যেমন 5YR এবং 10YR ভ্যালু রঙের আপেক্ষিক গাঢ়তা (Darkness) বা লঘুতা (Lightness) নির্দেশ করে। ভ্যালুও 0-10 সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা হয়। শূণ্য সম্পূর্ণরূপে কালো এবং 10 সম্পূর্ণ সাদা নির্দেশ করে। ক্রোমা (Chroma) মূল রঙের স্বচ্ছতা (Purity) নির্দেশ করে। ইহাও 0-8 সংখ্যার দ্বারা দেখানো হয়। সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে রঙের ধূসরতা বৃদ্ধি পায়। মূনসেল রঙের সাংকেতিক চিহ্নগুলি হিউ, ভ্যালু ও ক্রোমার সংখ্যা ও অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত। উদাহরণস্বরূপ মুনসেল কালার চার্ট অনুযায়ী যদি রঙের সাংকেতিক চিহ্ন 10YR 5/3 হয় তবে 10YR ভ্যালু, 5 এবং 3 ক্রোমাকে বোঝায় এবং মাটির রঙ বাদামী বলে পরিগণিত হয়।

3.3.5 মৃত্তিকার সংহতি (Soil Consistence) ঃ

মৃত্তিকার সংহতি বলতে এর এমন একটি শক্তি বা প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বোঝায় যার দ্বারা এর বিরুপণকে প্রতিহত করে। এটি নির্ভর করে দুইটি অণুর পরস্পরকে আকর্ষণকারী শক্তির প্রকার ও আধিক্যের উপর। এরূপ শক্তি দুপ্রকারের, যথা আসঞ্জন (Adhesion) এবং সংসক্তি (Cohesion)। দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির বস্তুকণার মধ্যে পরস্পর আকর্ষণকে আসঞ্জন এবং সমধর্মী বা একই বস্তুর দুইটি কণার মধ্যে আকর্ষণকে সংহতি বলে। আসঞ্জন শক্তির প্রভাবে মৃত্তিকা কণা জলকণার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এর ফলেই এর চারদিকে জলের আবরণ বা ঝিল্লি সৃষ্টি হয়। জলের অণুর দ্বিমেরুত্বের (Dipolar) জন্য তা ঋণাত্মক আধানযুক্ত মৃত্তিকা কণায় অধিশোষিত হয়। যখন মৃত্তিকা কণার চতুর্দিকের জলের ঝিল্লি শুকিয়ে যায় তখন দুই মৃত্তিকা কণার মধ্যে সংসক্তি বৃদ্ধি পায় বলে তারা পরস্পরের নিকটবর্তী হয় এবং এর ফলে তাদের বন্ধন দৃঢ় হয়। এজন্য মৃত্তিকার সংহতি নির্ভর করে তার আর্দ্রতার পরিমাণের উপর। এজন্য শুষ্ক মৃত্তিকা অনেক কঠিন হয় বলেই কর্ষণ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। যখন স্বল্পমাত্রায় আর্দ্র (Moist) হয় তখন তা অপেক্ষাকৃত কোমল হয় বলে মৃত্তিকা কর্ষণ সহজতর হয়। যখন মাটি ভিজে যায় তখন তা আরও স্থিতিস্থাপক হয়ে পড়ে। সুতরাং আর্দ্রতার পরিমাণগত পার্থক্য হওয়ার মৃত্তিকার সংহতিরও তারতম্য হয়। প্রখ্যাত কৃষিবিদ এ্যাটারবার্গ (Atterberg) 1991 খ্রিষ্টাব্দে মৃত্তিকার আর্দ্রতাভেদে সংসক্তির চারিটি সীমা বা প্রকৃতি নির্ধারণ করেন যা এ্যাটারবার্গ সীমা (Atterberg limit) নামে পরিচিত।

(a) তরলসীমা বা নমনীয়তার উচ্চসীমা (Liquid limit or upper plastic limit) ঃ যে অবস্থায়

মৃত্তিকায় আরও জল মিশ্রিত করলে মৃত্তিকা সান্দ্র তরলের ন্যায় প্রবাহিত হতে থাকে তাহাকে নমনীয়তার উচ্চসীমা বলে। এই অবস্থায় মাটির সংহতি সর্বাপেক্ষা কম হয়।

(b) চটচটে সীমান্ত (Sticky limit) ঃ এটি মাটির এমন একটি আর্দ্রতা-অবস্থা যখন জল ও মাটির মিশ্রণ স্টীলের বা অন্য কোন বস্তুর সঙ্গে আটকে যায়। মাটির চট্‌চটে ভাবকে মাত্রা অনুসারে চারভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—চট্‌চটে বিহীন, অল্প চট্‌চটে, চট্‌চটে এবং খুব চট্‌চটে।

(c) নমনীয়তা সীমান্ত বা নিম্ন নমনীয়তা সীমান্ত (Plastic limit or lower plastic limit) ঃ এটি মাটির এমন একটি আর্দ্রতা-অবস্থা যখন জল ও মাটির মিশ্রণ নমনীয় হয় অর্থাৎ কোন চাপের প্রভাবে একটা বিশেষ আকৃতি বা রূপ পরিগ্রহ করে এবং ঐ চাপ সরিয়ে নেওয়ার পর আগের আকৃতির অবস্থায় ফিরে যায়। বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জনীর চাপে মাটিকে রডের আকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে নমনীয়তার মাত্রা নিরুপণ করা যায়। যেমন অনমনীয়, অল্পনমনীয়, নমনীয় এবং অতি নমনীয়।

(d) সঙ্কোচন সীমান্ত (Shrinkage limit) ঃ ভিজে মাটি শুকিয়ে যেতে থাকলে তার আয়তন হ্রাস পায় বলে মাটির মধ্যে ফাটলের সৃষ্টি হয়। এটি মাটির আর্দ্রতার এমন এক অবস্থা যখন বাষ্পীভবনের সঙ্গে মাটির আয়তনের আর কোন পরিবর্তন হয় না। এইজন্য একে আয়তন সঙ্কোচনের নিম্নসীমা বলে।

আর্দ্র মাটির সংহতি ব্যবহারিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর দ্বারাই জমি চাষের উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা হয়। বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জনীর চাপে মাটির ঢেলা ভাঙ্গতে যে পরিমাণ শক্তি লাগে তার ভিত্তিতে আর্দ্র মাটির সংহতি ভাগ করা হয় যেমন আলগা, অতি ভঙ্গুর, শক্ত, অতি শক্ত ও প্রচন্ড শক্ত। শুষ্ক মাটিতে কণাগুলির মধ্যে আকর্ষণ বেড়ে যায় বলে ঐ মাটি ভাঙ্গাতে বেশী শক্তির দরকার হয়। ভঙ্গুরতার ভিত্তিতে শুষ্ক মাটির সংহতির কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা—আলগা বা নরম, অল্প শক্ত, অতি শক্ত ও প্রচন্ড শক্ত।

সংহতি নির্ভর করে মাটির বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণের উপর যথা গ্রথন, জৈব পদার্থের পরিমাণ, জলের পরিমাণ, কাদা কণার প্রকৃতি।

3.3.6 মৃত্তিকা রন্ধ্র (Soil pore space)

কোন নির্দিষ্ট আয়তনের মৃত্তিকাতে খনিজ কণা সমূহের মধ্যে অথবা মৃত্তিকা গঠনের মধ্যবর্তী যে ফাঁকা জায়গা থাকে তার মিলিত আয়তনকে মাটির রন্ধ্র বলে। মাটির প্রবেশ্যতা বলতে বোঝায় তার মধ্যে জল প্রবেশ করার গুণকে। যে মাটিতে জল সহজেই প্রবেশ করতে পারে সেই মাটির প্রবেশ্যতা বেশী হয়। মৃত্তিকাতে রন্ধ্র বেশী হলেই যে সচ্ছিদ্রতা বা প্রবেশ্যতা বেশী হবে তা বলা যায় না। কারণ মৃত্তিকার মধ্যে জল প্রবেশ করা বা স্বচ্ছিদ্রতা নির্ভর করে মৃত্তিকা রন্ধ্রগুলির আয়তনের উপর। মৃত্তিকা রন্ধ্রগুলি বৃহৎ আকারের হলে মৃত্তিকার মধ্যেও জল সহজেই প্রবেশ করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে মাটি হয় বেশী প্রবেশ্য। যেমন—বেলে মাটির প্রবেশ্যতা কাদামাটির প্রবেশ্যতা অপেক্ষা অনেক বেশী। কারণ বেলেমাটিতে রন্ধ্রগুলি অপেক্ষাকৃত বড় আকারের হয়। কাদা মাটির মধ্যে রন্ধ্রগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হওয়ায় জল সহজে প্রবেশ করতে পারে না। প্রাকৃতিক অবস্থায় কোনও এক নির্দিষ্ট আয়তনের মৃত্তিকার কিছু

অংশ খনিজ ও জৈবকণার দ্বারা অধিকৃত থাকে এবং বাকী অংশ ছোট বড় নানা আকারের রন্ধ্র অধিকার করে থাকে। এরূপ রন্ধ্রগুলি সাধারণত জল বা বায়ুর দ্বারা পূর্ণ থাকে।

মৃত্তিকা রন্ধ্রের পরিমানগত তারতম্য কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। মৃত্তিকার গঠন ও গ্রথন বিশেষভাবে মৃত্তিকার রন্ধ্রকে প্রভাবিত করে। যে সমস্ত মৃত্তিকার গ্রথন স্থূল প্রকৃতির, যেমন—বেলেমাটি বা বেলে দোঁয়াশ মাটি, সেই সমস্ত মৃত্তিকায় রন্ধ্র অপেক্ষাকৃত কম হয়। কারণ এরূপ মৃত্তিকায় বালুকাকণা গোলাকার হওয়ায় তাদের কণাগুলির মধ্যবর্তী ফাঁক অপেক্ষাকৃত বড় হলেও সংখ্যায় অনেক কম হয়। বিপরীত ক্রমে যে সমস্ত মৃত্তিকার গ্রথন সূক্ষ্ম সেই সমস্ত মৃত্তিকার কণাগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হওয়ায় ক্ষুদ্র কণাগুলির মধ্যবর্তী ফাঁক বা রন্ধ্রের সচ্ছিদ্রতা বেশী হয়। মৃত্তিকার গঠনও এ বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করে। যে সমস্ত মৃত্তিকার গঠন উন্নত সে সমস্ত মৃত্তিকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গঠন এককের মধ্যে অবস্থিত রন্ধ্রের সংখ্যা যেমন বেশী হয় তেমনি তার বৃহৎ আকারের হয়। ফলে রন্ধ্রের পরিমান অনেক বেশী হয়। যে সমস্ত মাটিতে হিউমাস ও কাদাকণার পরিমাণ বেশি সেই সমস্ত মৃত্তিকার গঠন উন্নত হওয়ায় রন্ধ্রের আয়তন বেশী হয়। মৃত্তিকার রন্ধ্রগুলির আয়তন ও আকৃতি মৃত্তিকার খনিজ কণার আকৃতি ও তাদের পারস্পরিক অবস্থান এবং মৃত্তিকার গঠন এককের আয়তন ও আকারের উপর নির্ভরশীল। যদি মৃত্তিকার গঠন এককগুলি গোলাকার এবং একই ব্যাসবিশিষ্ট হয় তা হলে মৃত্তিকারন্ধ্র নির্ভর করবে তাদের পারস্পরিক অবস্থানের উপর। এরূপ ক্ষেত্রে গঠন একক ও মৃত্তিকা কণাগুলির ব্যাসের বিভিন্নতা মৃত্তিকা রন্ধ্রের আয়তনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না। মৃত্তিকার খনিজ কণাগুলির বা গঠন এককগুলির পারস্পরিক অবস্থান যদি রম্বস আকৃতির হয় তাহলে মৃত্তিকা রন্ধ্রের আয়তন অপেক্ষাকৃত কম হয়। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে দুটি গঠন একক বা খনিজ কণিকার উপরে একটি খনিজ কণা বা গঠন—একক অবস্থান করে বলে মধ্যবর্তী ফাঁক অনেক ছোট হয়, ফলে রন্ধ্রের আয়তন অনেক কম হয়। খনিজ কণার ও গঠনের এককের অবস্থান যদি ঘনক সদৃশ হয় তাহলে মধ্যবর্তী ফাঁকের আকার বড় হওয়ায় রন্ধ্রের আয়তন অনেক বেশী হয়। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে মৃত্তিকা কণাগুলি একটির উপরে আর একটি অবস্থান করে।

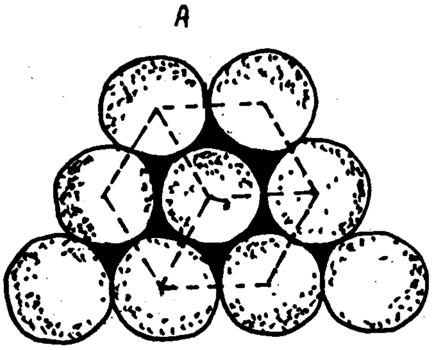

(চিত্র 3.8A. মৃত্তিকা কণাগুলির অবস্থান রম্বস আকৃতির জন্য রন্ধ্রের হ্রাস)

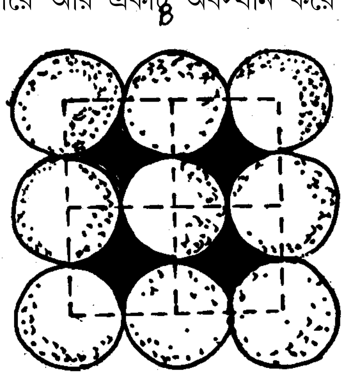

(চিত্র 3.8B. মৃত্তিকা কণাগুলির অবস্থান ঘনক আকৃতির জন্য রন্ধ্র বৃদ্ধি)

উপরিউক্ত দৃঢ় গাঁটবন্দী অবস্থা (Tightest packing) লক্ষ করা যায় কেবলমাত্র তখনই যখন মৃত্তিকাকণা অবস্থা কদাচিৎ লক্ষ করা যায়। কারণ মৃত্তিকার কণাগুলি সাধারণত বিভিন্ন আয়তনের হয়। স্বভাবতই মৃত্তিকার গাঁটবন্দী অবস্থা সেরূপ দৃঢ় হয় না। কেবলমাত্র বেলেমাটির ক্ষেত্রে এরূপ দৃঢ় গাঁটবন্দী অবস্থা লক্ষ করা যায়। কারণ বালুকা কণাগুলি একই আয়তনবিশিষ্ট ও গোলাকার হয়। মৃত্তিকা কণাগুলি যখন বিভিন্ন আকৃতি ও আয়তন বিশিষ্ট হয় তখন ঐ কণাগুলির পারস্পরিক অবস্থান রন্ধ্রের আয়তনের উপর নির্ভর করে। যখন বৃহৎ কণাগুলির মধ্যের ফাঁকে অবস্থিত ক্ষুদ্র মৃত্তিকাকণার আয়তন ঐ ফাঁকের আয়তনের সমান হয় তখন রন্ধ্রের আয়তন কমে আসে। কারণ মৃত্তিকা কণাগুলির গাঁটবন্দী অবস্থা অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হয়। বিপরীতক্রমে বৃহৎ কণাগুলির মধ্যের ফাঁকে অবস্থিত ক্ষুদ্রকণাগুলির আয়তন ঐ ফাঁকের আয়তনের তুলনায় বেশী হলে কণাগুলির গাঁটবান্দী অবস্থা সেরূপ দৃঢ় হয় না। ফলে রন্ধ্রের আয়তন অপেক্ষাকৃত বেশী হয়।

বৃহৎ আয়তনের মৃত্তিকা কণাগুলির মধ্যবর্তী ফাঁকে রন্ধ্রের আয়তন অপেক্ষা বৃহৎ আয়তনের কণার অবস্থানের ফলে মৃত্তিকা কণাগুলির অপেক্ষাকৃত আলগা গাঁটবন্দী অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং রন্ধ্রের পরিমাণও বেশী হয়।

A

B

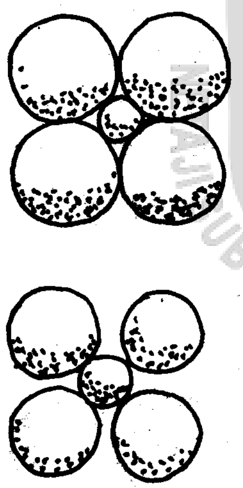

(চিত্র 3.9A. দৃঢ় গাঁটবন্দী অবস্থার জন্য রন্ধ্রের হ্রাস)

A

B

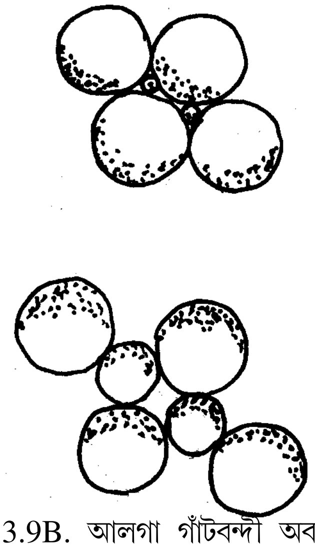

(চিত্র 3.9B. আলগা গাঁটবন্দী অবস্থার জন্য রন্ধ্রের বৃদ্ধি)

3.3.7 মৃত্তিকা রন্ধ্রের শ্রেণীবিভাগ

সাধারণত মাটির ছিদ্রগুলিকে বড় এবং ছোট (Macro & Micro) এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। এইগুলিকে যথাক্রমে অকৈশিক ও কৈশিক (Non-capillary & Capillary) ছিদ্র বলা হয়। বড়ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়ে সহজে বায়ু ও জল চলাচল করতে পারে কিন্তু ছোট ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়ে তত সহজে পারে

না। ছোট ছিদ্র সহযোগে অতিসূক্ষ্ম রন্ধ্র তৈরী হয়। সেজন্য জলের চলাচল মন্দ গতিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বেলেমাটিতে ছিদ্রগুলো বড় হওয়ার জন্য জল ও বায়ু সহজেই চলাচল করে। বায়ু ও জলের স্বচ্ছন্দ চলাচল গাছের ও জীবাণুর জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য। সুতরাং মাটির ভৌতিক গুণাবলী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে বড় ও ছোট ছিদ্রগুলি আনুপাতিক পরিমাণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সূক্ষ্ম গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকার গঠন সেরূপভাবে গড়ে না উঠলে ছিদ্রগুলি অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় তার মধ্য দিয়ে জল ও বায়ু প্রবেশের পথে বাধার সৃষ্টি হয়, যদিও এরূপ মৃত্তিকার ছিদ্রগুলির মোট আয়তন স্থূল গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকা অপেক্ষা অনেক বেশী। স্থূল গ্রন্থনযুক্ত মৃত্তিকা যথা—বেলেমাটির ছিদ্রগুলির মোট আয়তন তুলনামূলকভাবে কম হলেও তারা অপেক্ষাকৃত বড় হওয়ায় মাটিতে বায়ু ও জলের প্রবেশ্যতা অনেক বেশী হয়।

মৃত্তিকা রন্ধ্রের নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়সমূহ ঃ

(a) গ্রথন ঃ মৃত্তিকায় ছিদ্রের মোট পরিমাণে নিয়ন্ত্রণকারী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মাটির গ্রথন। মাটির গ্রথন যত সূক্ষ্ম হয় ছিদ্রের পরিমাণও তত বেশী হয়। স্থূল গ্রথনযুক্ত বেলেমাটির পৃষ্ঠস্তরের মৃত্তিকার ছিদ্রের পরিমাণ 35-50% যেখানে সূক্ষ্ম গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকার রন্ধ্রের পরিমাণ 40-60%।

সুগঠনযুক্ত মৃত্তিকা বা যে সমস্ত সূক্ষ্ম গ্রথনের মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকে সে সমস্ত মৃত্তিকায় রন্ধ্রের পরিমাণ আরও বেশী হয়।

(b) মানুষের ক্রিয়াকলাপ ঃ মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের ফলে মৃত্তিকার রন্ধ্রের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি পায়। মৃত্তিকা কর্ষণ করলে মৃত্তিকায় রন্ধ্রের পরিমান অনেক কম হয়। যখন মানুষের কাজকর্মের ফলে মৃত্তিকার সুনির্দিষ্ট গঠন বিনষ্ট হয়ে মৃত্তিকা কণাগুলি বিশ্লিষ্ট হয় তখন মৃত্তিকায় রন্ধ্রের পরিমাণ বহুগুণ হ্রাস পায়। মৃত্তিকায় রাসায়নিক সার প্রয়োগে বিশেষত সোডিয়াম বাই কার্বনেট প্রয়োগ মৃত্তিকার দানাবদ্ধ অবস্থা বা গঠন রাসায়নিকভাবে শিথিল হয় বলে মৃত্তিকা রন্ধ্র হ্রাস পায়। লবনাক্ত মৃত্তিকা (Saline) থেকে সোডিয়াম লবণ দ্রবীভূত হয়ে ধৌত প্রক্রিয়ায় অপসারিত হওয়ার ফলে যখন তা ক্ষারীয় মৃত্তিকায় পরিণত হয় তখন মৃত্তিকার গঠন বিনষ্ট হয়, ফলে মৃত্তিকার রন্ধ্র হ্রাস পায়। জমিতে ক্রমাগত কর্ষণ করলে জৈব পদার্থের পরিমাণ কমে যাওয়ায় মৃত্তিকা গঠন সেরূপভাবে গড়ে ওঠে না। এর ফলেও কর্ষিত মৃত্তিকায় ছিদ্রে পরিমাণ হ্রাস পায়।

মাটির গভীরতা, জৈব পদার্থ ও চাষের তারতম্যে মৃত্তিকা রন্ধ্রের তারতম্য

মাটির গভীরতা (সেঃ মিঃ)	চাষের তারতম্য	জৈবপদার্থের তারতম্য (শতকরা)	রন্ধ্রের পরিমাণ (শতকরা)		
			মোট	বড়	ছোট
0-15	অকর্ষিত	5.6	58.3	32.7	25.6
	কর্ষিত	2.9	50.2	16.0	34.2
15-30	অকর্ষিত	4.2	56.1	27.0	29.1
	কর্ষিত	2.8	50.7	14.7	36.0

(c) মৃত্তিকার গভীরতা ঃ মৃত্তিকার গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপরের স্তরের চাপও বৃদ্ধি পায়। ফলে মৃত্তিকার রন্ধ্রের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। মৃত্তিকার নিম্নস্তরে গাঢ় অবস্থা দৃঢ় হয় বলে মৃত্তিকা রন্ধ্রের পরিমাণ হয় 25-30%। সেই তুলনায় পৃষ্ঠস্তরে মৃত্তিকার রন্ধ্রের পরিমাণ 35-50%।

মৃত্তিকায় রন্ধ্রের পরিমাণ নির্ণয় পদ্ধতি ঃ মৃত্তিকার আপাত ঘনত্ব (Apparent density) এবং প্রকৃত ঘনত্বের (True density) অনুপাতের মাধ্যমে মৃত্তিকার রন্ধ্র নিরূপণ করা যায়। মৃত্তিকা রন্ধ্রের পরিমাণ হল প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকার নির্দিষ্ট আয়তন ও ঐ নির্দিষ্ট আয়তনের কঠিন মৃত্তিকা কণার দ্বারা অধিকৃত আয়তনের পার্থক্য। নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে মৃত্তিকা রন্ধ্রের আয়তন নিরূপন করা হয়।

$$P = \left(1 - \frac{d}{d_1}\right) \times 100$$

যখন, P = মৃত্তিকা রন্ধ্রের শতকরা পরিমাণ

d = মৃত্তিকার আপাত ঘনত্ব

d_1 = মৃত্তিকার প্রকৃত ঘনত্ব

উদাহরণস্বরূপ যদি মৃত্তিকার আপাত ঘনত্ব 1.2 গ্রা./ঘন সেঃ মিঃ এবং প্রকৃত ঘনত্ব 2.65 গ্রা./ঘন সে. মি. হয় তাহলে রন্ধ্রের মোট শতকরা পরিমাণ হবে—

$$P = \left(1 - \frac{1.20}{2.65}\right) \times 100$$

$$= (1-0.453) \times 100$$

$$= 0.547 \times 100$$

$$= 54.7$$

3.3.8 মৃত্তিকার ঘনত্ব (Density of Soil) ঃ

প্রতি ঘন একক পরিমিত আয়তনের বস্তুর ভরকে উহার ঘনত্ব বলে। মৃত্তিকার ঘনত্ব দুভাবে প্রকাশ করা হয়। যথা—(A) আপাত ঘনত্ব (Apparent Density) ও (B) প্রকৃত ঘনত্ব (True Density)

(A) আপাত ঘনত্ব (Apparent density) ঃ সছিদ্র অবস্থায় এক ঘন একক আয়তনের বায়ু শুষ্ক মৃত্তিকার ভরকে তার আপাত ঘনত্ব বলে। মাটির ঐ আয়তনে মৃত্তিকার নিরেট কণা (solid particles) এবং রন্ধ্রের আয়তন অন্তর্ভুক্ত হয়।

$$\text{আপাত ঘনত্ব} = \frac{\text{মাটির ওজন}}{\text{সছিদ্র অবস্থায় বায়ু শুষ্ক মাটির ওজন}}$$

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

উদাহরণ : সছিদ্র অবস্থায় মাটির আয়তন 1 ঘন সে.মি. এবং তার ওজন 1.33 গ্রাম হলে আপাত ঘনত্ব হবে—

$$\text{আপাত ঘনত্ব} = \frac{1.33 \text{ গ্রাম}}{1 \text{ ঘন সেঃ মিঃ}}$$

= 1.33 গ্রাম \ ঘন সেঃ মিঃ

(a) মাটির আপাত ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়সমূহ ঃ

মাটির আপাত ঘনত্ব নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ঃ

(a) মৃত্তিকা রন্ধ্র : মাটির আপাতঘনত্ব বিশেষভাবে নির্ভর করে মাটির রন্ধ্রের পরিমাণের উপর। যেসব মাটিতে রন্ধ্রের পরিমাণ বেশী সেইসব মাটির আপাত ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম। স্থূল গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকায় বৃহৎ রন্ধ্রের প্রাধান্য থাকলেও মোট রন্ধ্রের সংখ্যা কম হওয়ায় তার আপাত ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী। এজন্য বেলেমাটির আপাত ঘনত্ব সূক্ষ্ম গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকা অপেক্ষা বেশী হয় সাধারণভাবে বেলেমাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কম থাকে বলে মৃত্তিকার গঠনও সেরকম গড়ে উঠতে পারে না। এ কারণেও তার ছিদ্রের পরিমাণ কম হয়। সূক্ষ্ম গ্রথন যুক্ত মৃত্তিকায় বৃহৎ রন্ধ্রের প্রাধান্য ছিদ্রের পরিমাণ স্থূল গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকা অপেক্ষা বেশী হয়। তাছাড়া এরূপ মাটিতে কর্দম কণিকা বা পলি কণিকার প্রাধান্য থাকায় এবং জৈব পদার্থের পরিমান বেশী হয় বলে মাটির গঠন ভালোভাবে গড়ে ওঠে এর ফলেও তার ছিদ্রের পরিমাণ অনেক বেশী হয়। স্বভাবতই এরূপ মাটির আপাত ঘনত্ব বেলেমাটির থেকে কম হয়। মাঝারি গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকার আপাতঘনত্ব কাদামাটি অপেক্ষা কম হয় কিন্তু স্থূল গ্রথন যুক্ত বেলে মাটি থেকে বেশী হয়।

(b) মাটির গভীরতা ঃ মাটির আপাত ঘনত্ব তার গভীরতার উপরও নির্ভর করে। মাটির পৃষ্ঠ স্তর অপেক্ষা ক্রমশ নিচের স্তরে উপরের স্তরের চাপে রন্ধ্রের পরিমাণ কম হয়। এর ফলে মৃত্তিকার যতই গভীরে জৈব পদার্থের হ্রাসও তার অন্যতম কারণ। বিভিন্ন অবস্থায় কাদা, দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটির পৃষ্ঠস্তরে আপাত ঘনত্ব 1.00-1.50 গ্রাম। ঘন সেমি. হয়ে থাকে। বেলে ও বেলে দোআঁশ মাটির আপাত ঘনত্ব 1.00-1.20 গ্রাম/ঘন সেমি. পর্যন্ত হতে দেখা যায়। ঠাস বুনোট যুক্ত (Compact subsoil) নীচের স্তরের মাটির আপাত ঘনত্ব 2.00 গ্রাম/ঘন সেমি. বা তারও বেশী হয়। প্রোফাইলের যত গভীরে যাওয়া যায় সাধারণত মাটির আপাত ঘনত্ব ক্রমশ তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ নীচের স্তরে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কমতে থাকে এবং উপরের স্তরগুলির চাপে নীচের স্তরের বুনোটিও ঠাসা হয়। শস্য ও মাটির পরিচর্যার পদ্ধতি দ্বারাও আপাত ঘনত্ব অনেকখানি প্রভাবিত হয়, বিশেষ করে উপরের স্তরের মাটি। উপরের স্তরে জৈব সার প্রয়োগে মাটির গঠন বহুগুণ বৃদ্ধি পায় বলে মৃত্তিকা রন্ধ্রের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এর জন্য মাটির আপাত ঘনত্ব হ্রাস পায়।

(B) প্রকৃত বা নিরেট ঘনত্ব (True Density) ঃ রন্ধ্রবিহীন এক ঘন একক আয়তনের মাটির ওজনকে নিরেট বা প্রকৃত ঘনত্ব বলে। এই ঘনত্বও আপাত ঘনত্বের ন্যায় গ্রাম প্রতি ঘন সেঃ মিঃ এ প্রকাশ করা হয়।

$$\text{প্রকৃত ঘনত্ব} = \frac{\text{মাটির ওজন}}{\text{রন্ধ্রবিহীন মাটির আয়তন}}$$

উদাহরণস্বরূপ, মাটির ওজন 1.33 গ্রাম এবং রন্ধ্রবিহীন মাটির আয়তন 0.5 ঘন সেঃ মিঃ তার প্রকৃত ঘনত্ব হবে।

$$\text{প্রকৃত ঘনত্ব} = \frac{1.33 \text{ গ্রাম}}{0.5 \text{ ঘন সেঃ মিঃ}}$$

$$= 2.66 \text{ গ্রাম/ঘন সেঃ মিঃ।}$$

মাটির প্রকৃত ঘনত্বের নিয়ন্ত্রক ঃ

(i) খনিজ কণার প্রকৃতি ঃ মাটিতে ভারী খনিজ পদার্থের প্রাধান্য থাকলে প্রকৃত ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বেশী হয়। এজন্য ম্যাগনেটাইট, গার্নেট, জিরকন, টুরমালিন ও হর্নব্লেন্ড প্রভৃতি ভারী খনিজ যুক্ত মাটির প্রকৃত ঘনত্ব বেশী হয়। কাদা খনিজের ঘনত্ব কোয়ার্টজ খনিজের তুলনায় বেশী বলে কাদা মাটির প্রকৃত ঘনত্ব বালি মাটির তুলনায় বেশী হয়। ভারী আয়রণ অক্সাইড যুক্ত মাটির প্রকৃত ঘনত্বও অনেক বেশী হয়।

(ii) গ্রথন ঃ গ্রথনের উপরও মাটির প্রকৃত ঘনত্ব নির্ভর করে। সূক্ষ্ম গ্রথন যুক্ত কাদা মাটির প্রকৃত ঘনত্ব স্থূল গ্রথন যুক্ত বালিমাটির তুলনায় বেশী হয়। কাদা মাটির প্রকৃত ঘনত্ব যেখানে 2.6 গ্রাম/ঘন সেঃ মিঃ — 2.7 গ্রাম/ঘন সেঃ মিঃ দোঁয়াশ মাটির প্রকৃত ঘনত্ব সেখানে 2.5 গ্রাম/ঘন সেঃ মিঃ — 2.7 গ্রাম/ঘন সেঃ মিঃ এবং বালি মাটির ক্ষেত্রে 2.4 গ্রাম/ঘন সেঃ মিঃ—2.5 গ্রাম/ঘন সেঃ মিঃ।

(iii) জৈব পদার্থ ঃ জৈব পদার্থের পরিমাণের উপরেও মাটির প্রকৃত ঘনত্ব নির্ভর করে, কারণ জৈব পদার্থের ঘনত্ব মাটির খনিজ কণার তুলনায় কম। জৈব পদার্থের ঘনত্ব 1.2–1.5 গ্রাম/ঘন সেঃ মিঃ। সুতরাং জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ মাটির প্রকৃত ঘনত্ব জৈব পদার্থহীন মৃত্তিকার তুলনায় কম হয়। পিটের ন্যায় জৈব মৃত্তিকার প্রকৃত ঘনত্ব খনিজ মৃত্তিকার তুলনায় অনেক কম হয়।

(iv) গভীরতা ঃ মাটির উপরের স্তরে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকে বলে মৃত্তিকার নীচের স্তরের তুলনায় প্রকৃত ঘনত্ব কম হয়।

3.3.9 মৃত্তিকার আপেক্ষিক গুরুত্ব ঃ

কোন নির্দিষ্ট আয়তনের মাটির ওজন ও তার সমআয়তনের জলের ওজনের অনুপাতকে আপেক্ষিক গুরুত্ব বলে। সেই অর্থে নির্দিষ্ট আয়তনের মাটি তার সময় আয়তন জলের তুলনায় যতগুণ ভারী তাকেই

আপেক্ষিক গুরুত্ব বলে। মাটির প্রকৃত ঘনত্বের ন্যায় আপেক্ষিক গুরুত্ব মৃত্তিকার গ্রথন, খনিজ উপাদান ও জৈব পদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। সূক্ষ্ম গ্রথন যুক্ত কাদা মাটির আপেক্ষিক গুরুত্ব স্থূল গ্রথন যুক্ত বালি মাটি বা মাঝারি গ্রথনযুক্ত দোঁয়াশ মাটির তুলনায় অনেক বেশী হয়। ভারী খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ মাটির আপেক্ষিক গুরুত্ব তুলনামূলক ভাবে বেশী হয়। জৈব পদার্থের ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম বলে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ মাটির আপেক্ষিক গুরুত্ব সাধারণত কম হয়।

3.4 সারাংশ

অন্যান্য বহুবিধ পদার্থের ন্যায় মৃত্তিকাও ভৌত ও রাসায়নিক গুণ সম্পন্ন। ইহার ভৌত বৈশিষ্ট্য বলতে সেই গুণগুলিকেই বোঝায় যেগুলির মুল্যায়ন বা পরিমাপ পরিদর্শন ও অনুভবের মাধ্যমে সম্ভব হয়। মৃত্তিকার ভৌত বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন প্রকার পরিমাপক যথা আয়তন, শক্তি বা আধিক্যের ভিত্তিতে পরিমাপ করা যায়। মাটির ভৌত বৈশিষ্ট্যগুলি হল, গ্রথন গঠন, আর্দ্রতা, বর্ণ, সংহতি, রন্ধ্র, ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্ব।

মৃত্তিকার গ্রথন ঃ মৃত্তিকার গ্রথন বলতে তার খনিজ কণার যথা বালুকা, শিল্ট ও কর্দম কণার পারস্পরিক তারতম্যকে বোঝায়। আয়তন অনুসারে মৃত্তিকার খনিজ কণাগুলি তিনভাগে বিভক্ত যথা বালুকা (0.02 – 2 মি. ব্যাস যুক্ত), শিল্ট (0.002 মি. মি. ব্যাসযুক্ত) এবং কর্দম (0.002 মি.মি. অপেক্ষা কম ব্যাস যুক্ত)। এদের পারস্পরিক পরিমাণগত তারতম্যই গ্রথন বা বুনন নির্ধারণ করে। U.S.D.A. পদ্ধতি অনুসারে মৃত্তিকার গ্রথনভিত্তিক শ্রেণীগুলি হল বেলেমাটি, বেলে দোঁয়াশ, দোঁয়াশ বেলে, দোঁয়াশ, পলি দোঁয়াশ, পলি মৃত্তিকা, কর্দম দোঁয়াশ, পলি কর্দম, দোঁয়াশ, বেলে কাদা দোঁয়াশ, বালুকা কর্দম, পলি কর্দম ও কাদা মাটি। উর্বরতার দিক থেকে মৃত্তিকা গ্রথনের গুরুত্ব অপরিসীম। এর উপর মৃত্তিকার অন্যান্য ভৌতিক বৈশিষ্ট্য যথা রন্ধ্র গঠন, আপেক্ষিক গুরুত্ব, ঘনত্ব ও আর্দ্রতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। গ্রথন মৃত্তিকার রাসায়নিক গুণাগুণ বিশেষত আয়ন বিনিময় ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। সাধারণভাবে মাঝারি ও সূক্ষ্ম গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকা স্থূল গ্রথন যুক্ত মৃত্তিকা অপেক্ষা উর্বর হয়ে থাকে। কারণ এরূপ মৃত্তিকার রন্ধ্র, আর্দ্রতা বা জল ধারণ ক্ষমতা, জলের প্রবেশ্যতা ও আয়ন বিনিময় ক্ষমতা স্থূল গ্রথন যুক্ত মৃত্তিকা অপেক্ষা বেশী হয়। তাছাড়া এইরূপ গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকা সুগঠন যুক্ত হওয়ায় সচ্ছিদ্রতা ও জলের প্রবেশ্যতা অনেক বেশী হয়।

মৃত্তিকার গঠন ঃ মৃত্তিকার কণাগুলির বিভিন্ন আকার ও আয়তনের জোটবন্ধ অবস্থাকে গঠন বা পেড বলে। মৃত্তিকার জৈব পদার্থ বা হিউমাস এবং কাদা কণার সংসক্তি প্রবণতা বা সংযোগশীলতার জন্য খনিজ ও জৈবকণাগুলি স্বাভাবিকভাবে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে মৃত্তিকা গঠন সৃষ্টি করে। বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বন্ধন যেমন ক্যাটায়ন বন্ধন কার্ড হাউস প্রভাব। সোদক ক্যাটায়নের বন্ধন গঠন এককগুলিকে সুস্থির ও দঢ় করতে সহায়ক হয়। তাছাড়া গঠন এককগুলির উপরে হিউমাসের আঠালো আবরণ শুকিয়ে

গেলেও গঠন এককগুলি দৃঢ় হয়ে স্থায়িত্বলাভ করে। গঠনগুলির আকারভিত্তিক শ্রেণীগুলি হল প্লেটের ন্যায় গঠন, প্রিজমের ন্যায় গঠন, ব্লকের ন্যায় গঠন। দানাবন্ধ বা চূর্ণাকার গঠন। গঠন গুলিকে আয়তন অনুসারেও বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় যথা অতি সূক্ষ্ম (1 মি.মি.-এর কম সূক্ষ্ম (1-2 মি. মি.) মাঝারি (2-5 মি.মি.), স্থূল (5-10 মি. মি.), অতিস্থূল (10 মি. মি. এর বেশী)। গঠন এককগুলির স্থায়িত্ব অনুসারে দুর্বল, মাঝারি ও সবল বা কঠিন এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। কর্দম কণার উপস্থিতি, জৈব পদার্থের পরিমাণ, সোদক আয়রণ ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতি, জীবাণু প্রভৃতি মৃত্তিকা গঠন সৃষ্টি প্রভাব বিস্তার করে। মৃত্তিকা গঠন মৃত্তিকার বায়ু, আর্দ্রতা, জলের প্রবেশ্যতা, ক্ষয়ের প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি বিষয়কে প্রভাবিত করে।

মৃত্তিকার আর্দ্রতা ঃ উদ্ভিদের পুষ্টি, বিভিন্ন প্রকার বৃত্তীয় শারীর প্রক্রিয়া, খাদ্য উৎপাদন, মৃত্তিকার জীবাণুর কর্মক্ষমতা প্রভৃতি মৃত্তিকার আর্দ্রতা বা জলের উপর নির্ভর করে। এমনকি মৃত্তিকার গঠন বা সৃষ্টি প্রক্রিয়াও আর্দ্রতার উপর নির্ভরশীল। মৃত্তিকাস্থিত জল কঠিন ও গ্যাসীয় অবস্থাতেও দেখা যায়। মৃত্তিকার জলধারণশীলতা নির্ভর করে মৃত্তিকার আসঞ্জন (Adhesion) ও সংসক্তি (Cohesion) গুণের উপর। মৃত্তিকার আসঞ্জন শক্তি বা প্রক্রিয়ার জন্য কঠিন মৃত্তিকা কণা জলকে আকর্ষণ করে। সংসক্তি ক্রিয়ার ফলে কলয়েড কণার উপরে জলের স্তর ক্রমশ গভীর হতে থাকে কারণ জলের দ্বিমেরুত্বের জন্য ধনাত্মক মেরু ও ঋণাত্মক মেরু পরস্পর আকর্ষিত হয়। মৃত্তিকা জলের উপর বিভিন্ন বল বা বিভব ক্রিয়াশীল হয় ; যথা মহাকর্ষীয় বিভব, কৈশিক বিভব ও আভিসারিক বিভব। মৃত্তিকা জলের বিভব পরিমাপের সাধারণ একক হল এ্যাটমশফিয়ার, বার, কেজি/বর্গ সেঃ মিঃ।

মৃত্তিকা জলকে বিভব পরিমাণের পার্থক্য অনুসারে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় ; যথা 'হাইগ্রোস্কোপিক' জল কৈশিক জল ও অভিকর্ষজ জল। হাইগ্রোস্কোপিক জল অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে মৃত্তিকা কণার সঙ্গে আবদ্ধ থাকে (31–10,000 এ্যটমশফিয়ার)। এই জল সাধারণ তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয় না এবং চলমান অবস্থায় থাকে না বলে উদ্ভিদও গ্রহণ করতে পারে না। মৃত্তিকার সূক্ষ্ম রন্ধ্রের মধ্যে যে জল অবস্থান করে তাকে কৈশিক জল বলে। মৃত্তিকা কণার সঙ্গে সেরূপ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ (1/3 এ্যাটমশফিয়ার থেকে 31 এ্যাটমশফিয়ার) থাকে না বলে এই জল সহজেই চলাচল করতে পারে এবং উদ্ভিদ এর বেশীরভাগ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। যে জল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে মাটির ভিতরে প্রবেশ করে এবং মৃত্তিকা কণা ধরে রাখতে সক্ষম হয় না তাকে অভিকর্ষজ জল বলে। উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা বা ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্তিকা জল তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা প্রয়োজনাতিরিক্ত জল, প্রাপ্য জল ও অপ্রাপ্য জল।

মৃত্তিকার বর্ণ ঃ মৃত্তিকার দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হল বর্ণ। মৃত্তিকার শ্রেণী চিহ্নিতকরণে মৃত্তিকার বর্ণ অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করে। মৃত্তিকার বর্ণ নির্ভর করে জৈবপদার্থের পরিমাণ, খনিজ উপাদান ও মূল শিলা খন্ডের প্রকৃতির উপর। অধিক জৈবপদার্থ সমৃদ্ধ মৃত্তিকার রঙ গাঢ় কালো হয়, যেমন চারনোজেম

পিট বা মাক মৃত্তিকা। মাটিতে আনহাইড্রেটেড ফেরিক অক্সাইড থাকলে মাটির রঙ লাল হয় কিন্তু সোদক আয়রণ অক্সাইডের প্রভাবে রঙ হলুদ হয়. মাটিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট, জিপসাম, কেয়োলিন প্রভৃতি থাকলে মাটির রঙ সাদাটে বা ধূসর হয়। লাল বেলে পাথর থেকে উৎপন্ন মৃত্তিকার রঙ লাল এবং ব্যাসল্ট শিলা থেকে উৎপন্ন মৃত্তিকার রঙ কালো হয়। মুনসেল কালার চার্টের মাধ্যমে মৃত্তিকার রঙ নির্ধারণ করা হয়।

মৃত্তিকার সংহতি ঃ মৃত্তিকার সংহতি বলতে এর এমন একটি শক্তি বা প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বোঝায় যার দ্বারা এর বিরূপনকে প্রতিহত করে। সংহতি নির্ভর করে আসঞ্জন ও সংসক্তির উপরে। এ্যাটারবার্গ (Atterberg limit) সীমার দ্বারা সংহতির পরিমাপ করা হয়। এই পরিমাপক অনুসারে সংহতি চারটি ভাগে বিভক্ত যথা ঃ (ক) তরলসীমা, (খ) চটচটে সীমান্ত, (গ) নিম্ন নমনীয়তা সীমান্ত ও (ঘ) সঙ্কোচন সীমান্ত।

মৃত্তিকার রন্ধ্র ঃ কোন নির্দিষ্ট আয়তনের মৃত্তিকায় মৃত্তিকা কণার মধ্যস্থিত যে ফাঁকা স্থান থাকে তার সর্বমোট আয়তনকে রন্ধ্র বলে। আয়তন অনুসারে রন্ধ্রগুলিকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা-সূক্ষ্ম বা ক্যাপিলারী রন্ধ্র এবং বৃহৎ বা ননক্যাপিলারী রন্ধ্র। মৃত্তিকা রন্ধ্র নির্ভর করে মৃত্তিকার গ্রথন, গঠন গভীরতা এবং মানুষের কার্যকলাপের উপর। তাছাড়া খনিজকণার আকৃতি ও তাদের পারস্পরিক অবস্থান এবং মৃত্তিকার গঠন এককগুলির আয়তন ও আকারের উপরও রন্ধ্রের পরিমাণ নির্ভর করে। স্থূল গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকার রন্ধ্র সূক্ষ্ম গ্রথন যুক্ত মৃত্তিকার তুলনায় কম হয়। আবার গঠন হীন মৃত্তিকার রন্ধ্র সংগঠনযুক্ত মৃত্তিকার তুলনায় কম হয়। মৃত্তিকার গভীরতা বৃদ্ধি পেলে উপরের চাপে রন্ধ্রের পরিমাণ হ্রাস পায়। কর্ষিত মৃত্তিকার রন্ধ্র অকর্ষিত মৃত্তিকার তুলনায় বেশী হয়। মৃত্তিকার সম আয়তনের খনিজ কণা বা গঠনে এককগুলির পারস্পরিক অবস্থান রম্বস আকৃতির হলে মৃত্তিকা রন্ধ্র অপেক্ষাকৃত কম হয়। খনিজ কণাগুলি ভিন্ন আকৃতির হলে তাদের পারস্পরিক অবস্থান ভেদে রন্ধ্রের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে।

মৃত্তিকার ঘনত্ব ঃ মৃত্তিকার ঘনত্ব দুভাবে প্রকাশ করা হয়, যথা—আপাতঘনত্ব ও প্রকৃত ঘনত্ব। সছিদ্র অবস্থায় এক ঘন একক আয়তনের বায়ু-শুষ্ক মৃত্তিকার ভরকে আপাতঘনত্ব বলে। রন্ধ্রহীন এক ঘন একক আয়তনের বায়ু শুষ্ক মৃত্তিকার ওজনকে নিরেট বা প্রকৃত ঘনত্ব বলে। মৃত্তিকার ঘনত্ব গ্রাম প্রতি ঘন সে. মিটারে প্রকাশ করা হয়। মৃত্তিকার ঘনত্ব নির্ভর করে মাটির গ্রথন, গঠন, খনিজ কণার প্রকৃতি, জৈব পদার্থ ও গভীরতার উপর।

আপেক্ষিক গুরুত্ব ঃ কোন নির্দিষ্ট আয়তনের মাটির ওজনও তার সম আয়তনের জলের ওজনের অনুপাতকে আপেক্ষিক গুরুত্ব বলে।

3.5 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

A. (প্রতিটি প্রশ্নের মান 10)

(1) মৃত্তিকার গ্রথনগত শ্রেণীবিভাগ কর। মৃত্তিকার উর্বরতা কী ভাবে গ্রথনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?

(2) মৃত্তিকা গঠন কীভাবে সৃষ্ট হয়? বিভিন্ন প্রকার গঠনের শ্রেণীবিভাগ করুন ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

(3) মৃত্তিকা জলের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন? বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা জলের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

(4) মৃত্তিকা রন্ধ্রের নিয়ন্ত্রকগুলি উল্লেখ করুন। মৃত্তিকা রন্ধ্রের গুরুত্ব কী?

B. (প্রতিটি প্রশ্নের মান 4)

(6) মৃত্তিকার গ্রথন ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ করুন।

(7) 'মাঝারি গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকা সর্বাপেক্ষা উর্বর' উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা করুন।

(8) মৃত্তিকা গ্রথনের গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

(9) মৃত্তিকা গঠন কীভাবে সৃষ্ট হয় ও স্থায়িত্বলাভ করে তাহা উল্লেখ করুন।

(10) মৃত্তিকার গঠন কীভাবে তার অন্যান্য ভৌত বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে?

(11) কৈশিক জল ও অভিকর্ষজ জলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।

(12) হাইগ্রোস্কোপিক ও কৈশিক জলের মধ্যে পার্থক্য কী?

(13) মৃত্তিকার বর্ণ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

(14) মৃত্তিকার সংহতি বলতে কী বোঝায়?

(15) মৃত্তিকার রন্ধ্র কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

(16) মৃত্তিকার আপাত ঘনত্ব কী কী বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?

C. (প্রতিটি প্রশ্নের মান 2)

(17) গ্রথন ও গঠনের মধ্যে পার্থক্য কী?

(18) বালি মাটি কেন সর্বাপেক্ষা অনুর্বর?

(19) মৃত্তিকার গঠনহীন অবস্থা বলতে কী বোঝায়?

(20) মৃত্তিকার গঠন বিনষ্ট অবস্থা কী?

(21) শুষ্ক বিন্দু কী?

(22) প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য জলের মধ্যে তফাত কী?

(23) মৃত্তিকা জলের গুরুত্ব কী?

(24) মৃত্তিকার খনিজ কণা কীভাবে এর রঙকে প্রভাবিত করে?

(25) আর্দ্রতার সঙ্গে মৃত্তিকা রঙের সম্পর্ক কী?

(26) মুনসেল কালার চার্ট কী?

(27) মৃত্তিকার রন্ধ্র বলতে কী বোঝায়?

(28) কীভাবে মৃত্তিকা রন্ধ্র নিরূপিত হয়?

(29) কৈশিক ও অকৈশিক রন্ধ্র বলতে কী বোঝায়?

(30) মৃত্তিকায় আপাত ও প্রকৃত ঘনত্বের মধ্যে তফাৎ কী?

(31) মৃত্তিকার আপেক্ষিক গুরুত্ব বলতে কী বোঝায়?

(A) উত্তরমালা

A. (1) এর মৃত্তিকার গ্রথন ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ অংশ।

(2) এর মৃত্তিকার গঠন সৃষ্টির প্রক্রিয়া অংশ এবং গঠন যুক্ত অবস্থা।

(3) 3.3.3-এর প্রথম পরিচ্ছেদ এবং মৃত্তিকা জলের শ্রেণীবিভাগ অংশ।

(4) 3.3.6-এর সমস্ত অংশ।

B.

(5) 3.3.1-এর মৃত্তিকার গ্রথন ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ।

(6) 3.3.1-এর মৃত্তিকা গ্রথনের গুরুত্ব অংশের শেষ পরিচ্ছেদ।

(7) 3.3.1-এর মৃত্তিকার গ্রথনের গুরুত্বের সমুদয় অংশ।

(8) 3.3.2-এর মৃত্তিকার গঠন সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সমস্ত অংশ।

(9) 3.3.2-এর মৃত্তিকার গঠনের গুরুত্ব।

(10) 3.3.3-এর মৃত্তিকা জলের শ্রেণীবিভাগ অংশে।

অভিকর্ষজ ও কৈশিক জল সম্বন্ধীয় অংশ

(11) 3.3.3-এর মৃত্তিকা জলের শ্রেণীবিভাগ অংশের কৈশিক ও হাইগ্রোস্কোপিক জল।

(12) 3.3.4-এর মৃত্তিকা রঙের নিয়ন্ত্রক অংশ।

(13) 3.3.5-এর সমুদয় অংশ।

(14) 3.3.6-এর মৃত্তিকা রন্ধ্রের নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়সমূহ।

(15) 3.3.7-এর মৃত্তিকার আপাত ঘনত্ব অংশটি।

(16) 3.3.7-এর মৃত্তিকার প্রকৃত ঘনত্ব অংশটি।

C.

(17) 3.3.1-এর প্রথম পরিচ্ছেদ ও 3.3.2-এর প্রথম পরিচ্ছেদ।

(18) 3.3.1-এর মৃত্তিকার গ্রথনের গুরুত্ব অংশটির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(19) 3.3.1-এর মাটির গঠনের শ্রেণীবিভাগ অংশের 3-এ আলোচ্য অংশ।

(20) 3.3.2-এর মাটি গঠনের শ্রেণীবিভাগ অংশের 3-এ আলোচ্য অংশ।

(21) 3.3.3-এর আর্দ্রতার জৈবিক শ্রেণীবিভাগ অংশের গ অংশের আলোচনা।

(22) 3.3.3-এর আর্দ্রতার জৈবিক শ্রেণীবিভাগের খ ও গ অংশের আলোচনা।

(23) 3.3.3-এর প্রথম পরিচ্ছেদ।

(24) 3.3.4-এর মৃত্তিকা রঙের নিয়ন্ত্রক আলোচনার খ অংশ।

(25) 3.3.4-এর মৃত্তিকা রঙের নিয়ন্ত্রক আলোচনার গ অংশ।

(26) 3.3.6-এর প্রথম পরিচ্ছেদ।

(27) 3.3.6-এর মৃত্তিকা রন্ধ্রের পরিমাণ নির্ণয় পদ্ধতি আলোচিত অংশ।

(28) 3.3.6-এর মৃত্তিকা রন্ধ্রের শ্রেণীবিভাগ আলোচিত অংশ।

(29) 3.3.7-এর আপাত ঘনত্ব ও প্রকৃত ঘনত্বের আলোচিত অংশের প্রথম পরিচ্ছেদ।

(30) 3.3.8 অংশ।

একক ❑ 4 মৃত্তিকার রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

গঠন
4.1 প্রস্তাবনা
4.2 উদ্দেশ্য
4.3 মৃত্তিকার রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য
4.3.1 মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া
4.3.2 মাটির জৈব পদার্থ
4.3.3 মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি
4.4 সারাংশ
4.5 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
4.6 উত্তরমালা

4.1 প্রস্তাবনা

পূর্বের এককে উল্লিখিত হয়েছে যে অন্যান্য বহুবিধ পদার্থের ন্যায় মৃত্তিকাও নির্দিষ্ট কয়েকটি গুণসম্পন্ন বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এরূপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য। ভৌত বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ন্যায় মৃত্তিকার কয়েকটি রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ইহার রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলির ভৌত বৈশিষ্ট্যের ন্যায় সমান গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি নিয়ন্ত্রনে রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অপরিসীম। এমনকি মৃত্তিকার ভৌত বৈশিষ্ট্যও ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

4.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- মৃত্তিকার কয়েকটি রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গো পরিচিত হবেন।
- বিশেষভাবে মৃত্তিকার রাসায়নিক বিক্রিয়া, pH এবং জৈব পদার্থ সম্পর্কে বিশদ ধারণা করতে পারবেন।
- উদ্ভিদের সার্থক পরিপুষ্টি এবং স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধির জন্য এদের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হবেন।

4.3. মাটির রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য (Chemical Properties of Soil)

ভৌত বৈশিষ্ট্যের ন্যায় মৃত্তিকার কয়েকটি রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যও পরিলক্ষিত হয়। মৃত্তিকার উর্বরতা নির্ণয়ে ইহার রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের ভূমিকা ভৌত বৈশিষ্ট্যের ন্যায় অপরিসীম। মৃত্তিকার ভৌত বৈশিষ্ট্য অনেক ক্ষেত্রে রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। মৃত্তিকার অন্যতম রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য হল রাসায়নিক বিক্রিয়া (Soil reaction) ক্যাটায়ন বিনিময় (Cation exchange), উদ্ভিদের পুষ্টি মৌল (Plant materials), জৈব পদার্থ (Organic Matter) প্রভৃতি।

4.3.1 মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া (Soil reaction)

মাটির রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল রাসায়নিক বিক্রিয়া। মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া বলতে ইহার দ্রবনের অম্লত্ব ও ক্ষারত্বকে বোঝায়। তাছাড়া বিক্রিয়া নিরপেক্ষও হতে পারে। ইহার রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ভর করে দ্রবনে হাইড্রোজেন (H+) ও হাইড্রক্সিল (OH-) আয়নের পারস্পরিক গাঢ়ত্বের (Concentration) উপর। মাটির দ্রবনে হাইড্রক্সিল আয়নের চেয়ে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমান বেশী হলে ইহার বিক্রিয়া হয় অম্ল (Acidic) । হাইড্রোজেন আয়নের তুলনায় হাইড্রক্সিল আয়নের গাঢ়ত্ব বেশী হলে বিক্রিয়া হবে ক্ষারকীয় (Basic or Alkaline)। দ্রবণে হাইড্রোজেন ও হাইড্রক্সিল আয়নের গাঢ়ত্ব সমান হলে বিক্রিয়া হয় নিরপেক্ষ।

মৃত্তিকার রাসায়নিক বিক্রিয়া নির্ধারণ করতে সাধারণত হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্বের পরিমান নির্ণয় করা হয় এবং ঐ মানকে P^H রূপে অবিহিত করা হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়া যখন নিরপেক্ষ হয় তখন মাটির P^H হয় 7। P^H 7 অপেক্ষা কম হলে উহার বিক্রিয়া হয় অম্ল এবং P^H7 অপেক্ষা বেশী হলে উহার বিক্রিয়া ক্ষারকীয় হয়।

(i) P^H : P^H বলতে এমন একটি স্কেল বা পরিমাপককে বোঝায় যার মাধ্যমে দ্রবনের রাসায়নিক বিক্রিয়া নিরূপন করা হয়। এই পরিমাপকে 75^0 ফা: উষ্মতায় বিশুদ্ধ জলে হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্বের মানকে নিরপেক্ষ একক হিসাবে (Neutral or reference point) ধরা হয়। 24^0 সে: উত্তাপে 1 লিটার বিশুদ্ধ জল যখন আয়নিত হয় তখন উহার মধ্যে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমান হয় 1.0×10^{-7} গ্রাম এবং হাইড্রক্সিলের গাঢ়ত্ব বা পরিমান হয় 17.0×10^{-7} গ্রাম। অর্থাৎ 24^0 সে: তাপে 1 লিটার বিশুদ্ধ জলের আয়নিত অবস্থায় হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্ব হয় 1.0×0.0000001 গ্রাম এবং হাইড্রক্সিল আয়নের গাঢ়ত্ব হয় 17.0×0.0000001গ্রাম। সাধারণত হাইড্রোজেন আয়ন ও হাইড্রক্সিল আয়নের সংখ্যার মধ্যে সমতা থাকে না যখন অন্য কোন আয়নও উপস্থিত থাকে। কিন্তু হাইড্রোজেন ও হাইড্রক্সিল আয়নের গাঢ়ত্বের গুণফলে (Product of Concentration of H^+ and OH^-) সর্বদাই সমতা থাকে।

যে কোনো অবস্থায় হাইড্রোজেন ও হাইড্রক্সিল আয়নের গাঢ়ত্বের গুণফল হয় 10^{-14} । উভয় আয়নের গাঢ়ত্বের গুণফলকে নরম্যালিটি (Normality) হিসাবে প্রকাশ করা হয় এবং N দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এক লিটার দ্রবণে গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভারের (Grain eduivale waiget) সঙ্গে নিরম্যাললণ্টি সমান হয়। এজন্য কোন দ্রবণে হাইড্রোজেন বা হাইড্রক্সিল আয়নের যে কোনো একটির গাঢ়াত্ব জানা যায় যদি অন্যটি গাঢ়ত্ব জানা থাকে। যেমন কোনো একটি দ্রবণে হাইড্রাজেন আয়নের গাঢ়ত্ব যদি 10^{-6} মোল/লিটার তবে হাইড্রাক্সিল আয়নের গাঢ়ত্ব হবে 10-8 মোল/লিটার কারণ উহাদের প্রোডাক্ট 10^{-14} মোল। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দ্রবনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হবে অম্ল (Acid) কারণ এক্ষেত্রে হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্ব (10^{-6}) হাইড্রক্সিল আয়নের গাঢ়ত্ব (10^{-8}) অপেক্ষা বেশী। সুতরাং দ্রবণের রাসায়নিক বিক্রিয়া জানতে হলে হাইড্রোজেন আয়ন বা হাইড্রক্সিল আয়নের যে কোনো একটির গাঢ়ত্ব জানার প্রয়োজন হয় এবং তদানুসারে ঐ পরিমাপকে P^H স্কেল বা P^{OH} স্কেল বলে। যেহেতু একটির পরিমাপ জানলে অন্যটিরও পরিমাপ জানা সম্ভব হয়। সেই হেতু দুইটি স্কেলেরই ব্যবহার অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এজন্য কোনো দ্রবণের রাসায়নিক বিক্রিয়া সাধারণত নির্ধারিত হয় P^H স্কেলের দ্বারা।

বাস্তব ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন ও হাইড্রক্সিল আয়নের গাঢ়ত্ব বোঝাবার জন্য 10^7 বা 0.0000001 সংখ্যা ব্যবহার করা অসুবিধাজনক। P^H স্কেল হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্বের নেগেঠিভ লগারিদিমের মাধ্যমে এই অসুবিধা দূর করা হয়েছে। প্রখ্যাত রসায়নবিদ Sorenson হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্বের এই রূপ সরলীকরণ করেন।

$$or \quad P^H = Log\frac{1}{\left[H^+\right]}$$

$$\left[H^+\right] = 10^{-PH}$$

$$Log\left[H^+\right] = \left|P^H\right|\log 10$$

$$P^H = \frac{Log\left[H^+\right]}{Log10}$$

$$Since Log10 = 1 Therefore P^H = -Log[H^+]$$

অর্থাৎ P^H বলতে কোনো দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্বের নেগেটিভ লগারিদিম (P^H is the negative logerthim of hydrogen ion concentration) অন্যভাবে বলতে গেলে P^H হল হাইড্রোজেন আয়নের অন্যোন্যকের (Reciprocal) নেগেটিভ লগারিদিম (Logerthim to the base

ten of the reciprocal of hydrogen ion concentration) উদাহরণস্বরূপ 0.01 N. HCl এর P^H নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রকাশ করা যায়।

$$[H^+] = 0.01 = 10^{-2}$$

$$= -(-2)$$ যেহেতু

P^H স্কেলের সাহায্যে যেমন হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাপ করা হয় তেমনি P^{OH} স্কেলের সাহায্যে হাইড্রাক্সিল আয়নের গাঢ়ত্ব নির্দেশ করা হয়। P^H ও P^{OH} স্কেলের মিলিত মান 14। এজন্য যে কোনো স্কেলে মানের বিস্তার 0-14। P^H ও P^{OH} মানের বিপরীত সম্পর্ক অর্থাৎ একটি মান বর্ধিত হলে অন্যটির মান হ্রাস হয় অর্থাৎ উহাদের গাঢ়ত্বের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে। নিম্নলিখিত সারণীতে ঐ দুই স্কেলের সম্পর্ক দেখান হল।

P^H	অম্লতা (H^+ এর নরম্যালিটি)	ক্ষারকতা (OH^- -র নরম্যালিটি)	P^{OH}
0	1.0	0.00000000000001	14
1	0.1	0.0000000000001	13
2	0.01	0.000000000001	12
3	0.001	0.00000000001	11
4	0.0001	0.0000000001	10
5	0.00001	0.000000001	9
6	0.000001	0.00000001	8
7	0.0000001	0.0000001	7
8	0.00000001	0.000001	6
9	0.000000001	0.00001	5
10	0.0000000001	0.00001	4
11	0.00000000001	0.0001	3
12	0.000000000001	0.001	2
13	0.0000000000001	0.01	1
14	0.00000000000001	1.0	0

P^H এর উপরিউক্ত সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে P^H শব্দটির উৎপত্তি হয় ফরাসী শব্দ "Pouvoir hydrogene" থেকে যার অর্থ হল হাইড্রোজেন আয়নের ঘাত (Hydrogen power)।

(ii) P^H অনুসারে মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া নির্ধারম :

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে P^H হল একটি পরিমাপক যার সাহায্যে মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া পরিমাপ করা হয়। মাটির P^H পরিমাপের জন্য মাটির নমুনাকে জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে প্রলম্বন (Suspension) করতে হয়। মাটির এই প্রলম্বনের P^H কেই মাটির P^H বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে মাটির দ্রবণের P^H মাটির P^H থেকে ভিন্ন হয়। কারণ মাটিতে যে আয়নগুলি মুক্ত অবস্থায় থাকে মাটির দ্রবণেও সেগুলিই পাওয়া যায়। কিন্তু অধিশোষিত আয়নকে মাটি থেকে পৃথক করা সম্ভব নয় বলেই মাটির দ্রবনেও তারা চলে আসেত পারে না। এই জন্য মাটির P^H অম্লতা নির্দেশ করলেও মাটির দ্রবণ অম্ল নাও হতে পারে। যদি অম্ল হয় তাহলে বুঝতে হবে মুক্ত অবস্থায় কোনো অম্ল আছে যার থেকে H^+ পাওয়া যাচ্ছে। অন্যথায় মাটির সঙ্গে অধিশোষিত H^+ যুক্ত থাকার জন্য মাটির P^H অম্লত্ব নির্দেশ করলেও মাটির দ্রবণে তার প্রভাব পড়বে না। মাটির P^H নির্ধারিত হলে তার ভিত্তিতে মাটির রাসানিক বিক্রিয়া নির্ধারিত হয়। P^H যদি 7 হয় তাহলে মাটির বিক্রিয়া নিরপেক্ষ বলে বিবেচিত হবে। P^H যদি 7 অপেক্ষা বেশী হয় তাহলে ইহার বিক্রিয়া ক্ষারকীয় এবং 7 অপেক্ষা কম হলে অম্লপ্রকৃতির, P^H এর আরও তারতম্য অনুসারে অম্ল বা ক্ষারকীয় বিক্রিয়াকে আরও কয়েকটি নিম্নলিখিত উপভাগে ভাগ করা যায়।

বিক্রিয়া	—	**P^H এর মান**
(very strongly acid) অতি তীব্র অম্ল		3.6-4.0
(Strongly acid) তীব্র অম্ল		4.0–5.0
(Medium acid) মৃদু অম্ল		5.0–6.0
(Slightly acid) স্বল্প অম্ল		6.0–7.0
(Neutral) নিরপেক্ষ		7.0
(Slightly Alkaline) স্বল্প ক্ষার		7.0–8.0
(Medium Alkaline) মৃদু ক্ষার		8.0–9.0
(Strongly Alkaline) তীব্র ক্ষার		9.0–10.0
(Very Strongly Alkaline) অতি তীব্র ক্ষার		10.0–11.0

(iii) মৃত্তিকার P^H এর নিয়ন্ত্রক : Determinants of Soil P^H)

মাটির P^H নির্ভর করে ইহার প্রোফাইল গঠন প্রক্রিয়ার উপর। এই জন্য মৃত্তিকার সৃষ্টির বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক যথা জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, ভূমির প্রকৃতি, মূল শিলাখন্ড, সময় প্রভৃতি P^H এর উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাছাড়া কৃষিকার্য, সার প্রয়োগ, প্রভৃতিও P^H কে নিয়ন্ত্রন করে।

(a) জলবায়ু : P^H এর নিয়ন্ত্রকগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল জলবায়ু। জলবায়ুর উপরে এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া প্রভৃতি নির্ভর করে বলে P^H ও উহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্রান্তীয় এ নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য হেতু মাটির ক্ষারকগুলি সহজেই ধৌত বা এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়ায় অপসারিত হয় বলে মাটি সহজেই অম্ল হয়ে পড়ে অর্থাৎ P^H হ্রাস পায়। নাতিশীতোষ্ণ উপআর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণে সেরূপ বেশী নয় বলে মাটির বেশীর ভাগ ক্ষারকীয় পদার্থ এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়ায় ধৌত হয় না। এজন্য মাটির বিক্রিয়া প্রায় নিরপেক্ষ প্রকৃতির হয়। অন্যদিকে শুষ্ক মরু অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের অভাবে মাটির ক্ষারকগুলি আদৌ অপসারিত হয় না। এর ফলে মাটির P^H অনেক বেশী হয়, এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া ক্ষারকীয় হয়।

(b) স্বাভাবিক উদ্ভিদ : সরলবর্গীয় অরণ্য অঞ্চলের বৃক্ষ সমূহ অম্ল পরিবেশে জন্মায় বলে এপ্রকার উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে অ্যাসিড যৌগ বেশী থাকে। এই সমস্ত বৃক্ষের বিভিন্ন অংশ মাটিতে সংযুক্ত হলে বিয়োজিত হয়ে অ্যাসিড হিউমাস সৃষ্টি হয় বলে মাটিতে ক্ষারকীয় পদার্থ হ্রাস পায়। তাছাড়া আর্দ্র জলবায়ুর জন্যও ক্ষারকীয় পদার্থ অপসারিত হয় বলে মাটির অম্লতা বৃদ্ধি পায়। স্বভাবতই মাটির P^H হ্রাসের জন্য স্বাভাবিক উদ্ভিদও অনেকটা দায়ী। নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে বৎসরান্তে তৃণের পাতা, মূল প্রভৃতি ব্যাক্টেরিয়ার দ্বারা ভালভাবে বিয়োজিত হয় যে হিউমাস সৃষ্টি হয় তাহাতে ক্ষারকের পরিমান বেশী থাকে। এর ফলে মাটিতে পৌণপৌনিক ভাবে মাটির ক্ষারক বৃদ্ধি পায় বলে P^H মাঝারি অবস্থায় থাকে। ক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলের উদ্ভিদের দেহাংশ অ্যাসিড কম্পাউন্ড অনেক কম থাকে বলে উহাদের দেহাংশ পচে গিয়ে যে হিউমাস উৎপন্ন হয় তাতে ক্ষারকের পরিমাণ তৃণভূমির অঞ্চলের ন্যায় বেশী না হলেও তুলনামূলকভাবে বেশী হয়। এজন্য মাটির P^H নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু বা তৈগা অঞ্চলের ন্যায় ক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলের কম হয় না অর্থাৎ অম্লতা তত বেশী হয় না।

(c) ভূ-প্রকৃতি : ভূ-প্রকৃতি বিশেষ করে ভূমির ঢাল P^H কে প্রভাবিত করে। একই জলবায়ু অঞ্চলের একই স্থানে ভূমিঢালের পার্থক্যের জন্যে P^H এরও তারতম্য হয়। ভূমি ঢাল বেশী হলে মাটির উপর দিয়ে দ্রুত জল নিষ্কাশিত হয় বলে এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া সেরূপ কার্যকরী হয় না। এজন্য ঢালের ঋজুরেখা বা উত্তরণ অংশে মাটির P^H অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। কিন্তু নিচের অবতল ঢালে বা উপত্যকায় ভূমির ঢাল কম হয় বলে জল সহজেই নিষ্কাশিত হয় না বলে এ্যালুভিয়েশান প্রক্রিয়া বেশী করে কার্যকর হয়। এর ফলে মাটির P^H কম হয়।

(d) সার প্রয়োগ : সারের প্রকৃতিও P^H কে নিয়ন্ত্রণ করে। মাটির সালফার ও নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করলে মাটির P^H হ্রাস পেতে দেখা যায় এবং এর ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে শস্যের ফলন গুরুত্বপূর্ণভাবে হ্রাস পায়। মাটিতে চুন প্রয়োগ করলে মাটির P^H বৃদ্ধি পায়। অম্ল মাটিকে এজন্য চুন প্রয়োগে শোধন করা হয়। মাটিতে অত্যধিক সোডিয়াম থাকলে মাটির P^H অত্যধিক বেশী হয়। এরূপক্ষেত্রে মাটিতে প্রয়োজন মত জিপসম প্রয়োগ করলে মাটির P^H হ্রাস পায়। তাছাড়া অত্যধিক ক্ষারযুক্ত মাটিতে সালফার প্রয়োগ করলেও মাটির P^H হ্রাস পায়। কারণ জীবাণু সালফারকে জারিত করে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

(e) কার্বন-ডাই অক্সাইডের প্রভাব : মাটিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণগত তারতম্যের জন্য তারতম্য P^H হয়। জীবাণুর দ্বারা জৈবাংশ বিয়োজিত হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড জলে মিশ্রিত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড সৃষ্টি হয়। কার্বনিক অ্যাসিড সক্রিয় হাইড্রোজেন আয়ন (Active hydrogen ion) সৃষ্টির মাধ্যমে P^H এর মাত্রাকে হ্রাস করে। কারণ এর ফলে মাটিতে হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পায়। হাইড্রোজেন আয়ন অন্যান্য ক্যাটায়নকে অপসারিত করায় মাটির অম্লতা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(f) ক্ষারকের অপসারণ : (Removal of bases) মাটি থেকে ক্রমাগত ক্ষারকগুলি (Bases) অপসারিত হলেও মাটির P^H ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। যথাক্রমে জৈব পদার্থের বিজারন, নাইট্রিফিকেশন এবং সালফার অক্সিডেশান প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন জৈব ও অজৈব অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিড মাটির P^H কে হ্রাস করতে সাহায্য করে।

(iv) মৃত্তিকার P^H এর গুরুত্ব : (Importance of Soil P^H) রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে

P^H বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। মাটির উর্বরা শক্তি বিভিন্ন দিক থেকে P^H এর উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদের পুষ্টি অনেকাংশে P^H দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদ্ভিদের বিভিন্ন পুষ্টি মৌল গ্রহণ বা ইহাদের প্রাপ্যতা P^H এর উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া মাটির ভৌত গুণাগুণ, ব্যাক্টেরিয়ার কর্মক্ষমতা প্রভৃতির উপরেও P^H এর প্রভাব অপরিসীম।

(a) গাছের খাদ্য গ্রহণযোগ্যতার উপর মাটির P^H এর প্রভাব : (Nutritional and Impression of Soil P^H)

গাছের খাদ্য গ্রহণযোগ্যতার উপর মাটির P^H এর প্রভাব অপরিসীম মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া অর্থাৎ অম্লীয়, ক্ষারকীয় এবং নিরপেক্ষ থেকে গাছের খাদ্য গ্রহনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। মাটির P^H গাছের খাদ্য গ্রহযোগ্যতা প্রধানত: দুইভাবে প্রভাবিত করে। (1) প্রত্যক্ষভাবে মাটিতে হাইড্রোজেন আয়নের প্রভাবের মাধ্যমে (2) পরোক্ষভাবে মাটিতে গ্রহণযোগ্য খাদ্য উপস্থিতির মাধ্যমে এবং Toxic

আয়নের উপস্থিতির মাধ্যমে মাটির P^H আবহবিকারের ফলে উদ্ভুত গাছের বিভিন্ন খাদ্য উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রন করে। তাছাড়া, মাটিতে অবস্থিত গাছের বিভিন্ন খাদ্য বস্তুর দ্রবণকে প্রভাবিত করে। এমনকি বিনিময়যোগ্য ধনাত্মক আয়নের (ক্যাটয়ন) সঞ্চয়কেও নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং P^H জানা থাকলে মাটিতে গাছেরকোন বিশেষ খাদ্যের অভাব আছে বা ঘটতে পারে তা সহজেই বলা যায়। মাটিতে উপস্থিত গাছের বিভিন্ন দ্রবণ মাটির P^H এর উপর নির্ভর করে। গাছ মাটি থেকে দ্রবনের মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করে। সুতরাং, গাছের খাদ্য দ্রবীভূত না হলে গাছ তা গ্রহণ করতে পারে না গাছের বিভিন্ন খাদ্যের দ্রবণ P^H এর উপর নির্ভর করে।

গাছ মাটি থেকে বিভিন্ন খাদ্য সেরূপভাবে গ্রহণ করতে পারে না যদি মাটির P^H 5 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 7.5 অথবা 8.0 হয়। উদাহরণস্বরূপ—লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ এবং জিঙ্ক উপরিউক্ত P^H -এ দ্রবীভূত হয় না বলে গাছের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় না। কিন্তু মলিবডিনাম উক্ত P^H -এ দ্রবীভূত হয় বলে বেশী করে গাছ তা গ্রহণ করতে পারে।

ক্ষারীয় P^H -এ অর্থাৎ OH^- এর প্রাধান্য থাকলে অ্যালুমিনিয়াম , লৌহ , এবং ম্যাঙ্গানীজ হাইড্রক্সাইড এ পরিণত হয় এবং গাছের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে না। মাটির P^H 5 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 7 কিংবা 7.5 হলে লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ ও জিঙ্ক এর প্রাপ্যতা কমতে থাকে। মাটির P^H 5 থেকে 5.5 এর কম হলে উপরিউক্ত খাদ্যমৌল বেশী মাত্রায় দ্রবীভূত হয়ে বিষবৎ কাজ করায় গাছের বৃদ্ধি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্যালসিয়াম সালফেট ছাড়া বেশীর ভাগ নাইট্রোজেন ও সালফার যৌগ যে কোনও P^H মাত্রায় দ্রবীভূত হয়। ফলে এই সমস্ত যৌগগুলি মাটির ধৌত প্রক্রিয়ায় মাটি থেকে নি:শেষিত হয়ে গাছের খাদ্যের ঘাটতি ঘটায়। এই সমস্ত খাদ্য উপাদানগুলি প্রধানত মাটিতে সংযুক্ত জৈবপদার্থের জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়। জৈব পদার্থের এইরূপ পচন দ্রুত হয় যদি মাটির P^H এর মাত্রা 6 থেকে 8 এর মধ্যে হয়। এজন্য এইরূপ P^H মাত্রায় নাইট্রোজেন ও সালফার যৌগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

মাটির ফসফরাস যৌগগুলির দ্রবণীয়তা সাধারণত কম। কিন্তু মাটির P^H 6.5 থেকে 7.5 এর মধ্যে হলে এই সমস্ত যৌগগুলির দ্রাব্যতা বেড়ে যায়। লৌহ এবং অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট যৌগ কম P^H মাত্রায় অধ:ক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু ক্যালসিয়াম ফসফেট অধিক P^H মাত্রায় অধ:ক্ষিপ্ত হয়। মাটির P^H 8.5 বেশী হলে ফসফেটের দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায়।

পটাসিয়াম যে কোনেও P^H মাত্রায় অধিক দ্রবনীয় হয়। এদের মধ্যে কিছু পটাশিয়াম আয়ন বিনিময়যোগ্য অবস্থায় থাকে এবং কতকগুলি অবিনিময় যোগ্য অবস্থায় থাকে। ধৌত প্রক্রিয়ায় মাটির অম্লত্ব বেশী হলে মাটির মোট পটাশিয়ামের পরিমাণ কমে যায় এবং সেই সঙ্গে দ্রাব্যতা হ্রাস পায়।

লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, তাম্র এবং দস্তা প্রভৃতি যৌগগুলির দ্রবণীয়তা অধিক P^H মাত্রায় হ্রাস পায়। যার ফলেই উহাদের দ্রাব্যতা কমে আসে। এজন্য অধিক P^H মাত্রায় অর্থাৎ ক্ষারকীয় মাটিতেই এই সমস্ত খাদ্যগুলির যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। লৌহ যৌগের দ্রাব্যতা কম P^H মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য উপাদানগুলি কম P^H মাত্রায় দ্রবীভূত হয়ে ধৌত প্রক্রিয়ায় অপসারিত হয় বলে মাটিতে উহাদের ঘাটতি দেখা যায়। বোরন অতিরিক্ত কম P^H মাত্রায় বেশী করে দ্রবীভূত হয় বলে মাটি থেকে ধৌত প্রক্রিয়ায় অপসারিত হয়। কিন্তু অধিক P^H মাত্রায় ইহা সেইরূপ দ্রবীভূত হয় না বলে ক্ষারকীয় মাটিতে বোরণের পরিমাণ বেশী থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, মাটির P^H বা তার কাছাকাছি হলে অর্থাৎ মাটির বিক্রিয়া নিরপেক্ষ হলে মাটিতে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ খাদ্যের দ্রাব্যতা সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। মাটির P^H যদি 6.5 থেকে 7.5 হয় এর মধ্যে হয় তাহলে গাছের বিভিন্ন খাদ্যের গ্রহণযোগ্যতা সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক হয়। মাটির P^H 7 এর কম হলে বুঝতে হবে অধিশোষিত হাইড্রোজেন আয়ন আছে এবং অন্যান্য ক্যাটায়নের বিনিময়ে অধিশোষণ সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ মাটিতে সৃষ্টিকারী ক্যাটায়নের ঘাটতি হয়েছে। অম্ল মাটিতে হাইড্রোজেন আয়নের সঙ্গে বিনিময় করে এ্যালুমিনিয়াম মৃত্তিকা কণার ল্যাটিস থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এবং এর ঘনত্ব বেশী হলে গাছের উপর বিষবৎ কাজ করতে পারে। একই পদ্ধতি উদ্ভূত অল্প পরিমাণ ফেরিক ও ফেরাস কম্পাউন্ড এবং ম্যাঙ্গানীজ গাছের অনুখাদ্যের অভাব মেটাতে পারে। অধিকমাত্রায় এরাও বিষবৎ কাজ করে। ক্ষারীয় বিক্রিয়ায় উপরিউক্ত উপাদানগুলি হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয় এবং গাছের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকেনা।

(b) মাটির ভৌত ধর্মের উপর P^H এর প্রভাব : মাটির ভৌত ধর্মও P^H দ্বারা প্রভাবিত হয়। মাটির P^H যদি 8.5 বেশী হয় তাহলে মাটিতে সোডিয়াম আয়নের আধিক্য ঘটে এবং এর উপস্থিতিতে মাটির কলয়েড কণিকাগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। কলয়েড কণাগুলি এরূপভাবে বিশ্লিষ্ট হলে মাটির গঠন বিনষ্ট হয়। বিশ্লিষ্ট কলয়েড কণাগুলি ক্ষুদ্র মৃত্তিকা রন্ধ্রগুলিকে পূরণ করার জন্য মাটির রন্ধ্রের পরিমাণ বহুগুণ হ্রাস পায়। ফলে মাটির মধ্যে জল ও বায়ুর প্রবেশ বিশেষভাবে ব্যহত হয়। বায়ুর অনুপস্থিতিতে মাটিতে অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাসের অভাব ঘটে বলে গাছ সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠতে পারে না।

(c) মাটির জীবাণুর উপর P^H এর প্রভাব : মাটির জীবাণুর (Micro organisms) কর্মক্ষমতা P^H এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। সাধারণতভাবে ব্যাক্টেরিয়া, এ্যাক্টিনোমাইসেটের কাজকর্ম নিরপেক্ষ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বা স্বল্প ক্ষারকীয় বিক্রিয়ায় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মাটির P^H 5.5 হলে এদের কর্মক্ষমতা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। অবশ্য ফাঙ্গি এই প্রকার P^H এ বেশী কর্মক্ষম হয়। নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলের পডজল মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়ার অম্ল প্রকৃতির বলে ব্যাক্টেরিয়ার পরিবর্তে ফাঙ্গি জৈব

পদার্থের বিয়োজন ঘটায়। কিন্তু চারনোজেম মৃত্তিকা অঞ্চলে মাটির বিক্রিয়া নিরপেক্ষ প্রকৃতির ব্যাক্টেরিয়া জৈবপদার্থের বিয়োজন ঘটায়। ক্রান্তীয় আর্দ্র অঞ্চলের মাটির P^H পডজলমাটির P^H এর তুলনায় তত কম নয় বলে এখানেও ব্যাক্টেরিয়া জৈব পদার্থের বিয়োজন ঘটায়।

মাটির P^H এর বেশী হলে নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ (Nitrogen Fixation) এবং নাইট্রিফিকেশন অর্থাৎ অ্যামোনিয়াকে জারিত করে নাইট্রাইট ও নাইট্রেট রূপান্তরিত করা দ্রুত হয়। কারণ এইরূপ P^H মাত্রায় বিভিন্ন প্রকার ব্যাক্টেরিয়া ও অ্যাকটিনোমাইসেটের প্রাধান্য দেখা যায়।

(vi) মৃত্তিকার বাফারিং বা উপরোধন (Buffering of Soil) :

ইহা মৃত্তিকায় সংঘটিত এমন একটি প্রক্রিয়া যাহার ফলে মৃত্তিকাস্থিত কয়েকটি অম্ল মূলকের (Acid radiradical) উপস্থিতিতে মাটিতে অতিশয় অম্ল পদার্থ বা ক্ষারক যুক্ত করলেও P^H এর পরিবর্তন প্রতিহত বা উপরোধিত হয়। P^H সংশ্লিষ্ট মৃত্তিকার এরূপ ধর্মকে উপরোধন বলে। মাটির দুর্বল অম্ল মৌল যেমন কার্বোনেট, বাইকার্বোনেট ও ফসফেট প্রভৃতি উপরোধক (Buffer) হিসাবে কাজ করে। জৈব পদার্থের বিয়োজনের ফলে উৎপন্ন অনেক দুর্বল জৈব অ্যাসিড উপরোধনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। মাটিতে এই সমস্ত মূলকের থাকার ফলে ইহাতে যখন অতিশয় অম্ল উপাদান বা ক্ষারক প্রয়োগ করা হয় তখন মাটির P^H সেরূপভাবে পরিবর্তিত হয় না বা পরিবর্তন হলেও নাম মাত্র হয়।

মাটিতে সবসময়ে মৃত্তিকা কণার দ্বারা অধিশোষিত হাইড্রোজেন আয়ন ও দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়মের মধ্যে সমতা থাকে।

Adsorbed H^+		Soil Solution H^+
অধিশোষিত হাইড্রোজেন আয়ন	$\rightleftharpoons$	মৃত্তিকার দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়ন
(Reserve acidity)		(Active acidity)

সুতরাং মাটির দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়নকে প্রশমিত (Neutralise) করতে চুন প্রয়োগ করলে মাটিতে অধিশোষিত হাইড্রোজেন আয়ন দ্রবণে স্থানান্তরিত হয়। এজন্য আপাত দৃষ্টিতে দ্রবণের P^H বৃদ্ধি পায় না। ফলে উহার অম্লতাও প্রশমিত হয় না। অনুরূপভাবে মাটিতে অ্যাসিড প্রয়োগ করলেও দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন শোষিত হয়। এর ফলে দ্রবণের P^H এর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। সাধারণত মাটির আয়ন বিনিময় ক্ষমতা যত বেশী হয় ততই ইহার উপরোধন ক্ষমতা বেশী হয় পরিমাণ যত বেশী হয় অম্লতা হ্রাসের জন্য মাটিতে তত বেশী চুন প্রয়োগ করতে হয়। মাটির উপরোধন প্রক্রিয়ার জন্যই ইহার প্রয়োজন হয়।

উপরোধনের গুরুত্ব : (Importance of bufferings) উপরোধন প্রক্রিয়া মাটির P^H কে অনেকাংশে স্থিতিশীল করে বলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা বিবেচিত হয়। মাটিতে সার প্রয়োগের মাধ্যমে বা স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন কারণে P^H মানের দ্রুত হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে তবে উদ্ভিদ ও মাটির জীবাণু বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। P^H দ্রুত বৃদ্ধি পেলে বা হ্রাস পেলে উদ্ভিদ পুষ্টি মৌল সেরূপভাবে প্রাপ্য অবস্থায় থাকে না বলে উদ্ভিদের পুষ্টি ব্যাহত হয়। অনুরূপভাবে জীবানুর কর্মক্ষমতা বিঘ্নিত হয়। ইহা ব্যাতীত মৃত্তিকা সংশোধনে কোন উপাদান কি পরিমান দিতে হবে তাহা মৃত্তিকার উপরোধন প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয় বলে মৃত্তিকা সংশোধন সঠিকভাবে ও আশানুরূপ ভাবে করা সম্ভব হয়।

4.3.2 মাটির জৈবপদার্থ (Soil Organic Matter)

মাটিতে জৈব পদার্থ খুব কম পরিমাণে থাকলেও এই উপাদান মাটির ভৌত ও রাসায়নিক, ধর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মাটির ক্যাট আয়ন বিনিময় ক্ষমতা (Cation exchange capacity), আর্দ্রতা, গঠন, উদ্ভিদের পুষ্টি মৌল (Plant nutriant), P^H প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য জৈব পদার্থের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। মৃত্তিকা জীবানুর কর্মক্ষমতা ও প্রভাবিত করতেও ইহার গুরুত্ব অপরিসীম।

(i) জৈবপদার্থের সংজ্ঞা : (Definition of Organic matter)

মাটির জৈব পদার্থ বলতে মৃত ও জীবিত উভয় প্রকার জৈব উপাদানকে (Living and dead organic material) বোঝায়।

জীবিত জৈব উপাদানকে বৃহৎ জীব (Living macro organisms) এবং জীবানু (living microbes) এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। বৃহৎ জীবিত জৈব উপাদান হল উদ্ভিদের মূল, পতঙ্গ, কেঁচো, নিমাটোড (Nemetode) ছুঁচো (Rodent) শামুক জাতীয় প্রাণী (Crustaceans) প্রভৃতি। মৃত্তিকা জীবানু বা সয়েল মাইক্রোভস্ বলতে ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গি (Fungi) এ্যকটিনো-মাইসেটিস (Actionomycetes) প্রোটোজোয়া (Protozoa) এবং এ্যালগিকে (Algae) বোঝায়।

মৃত জৈব উপাদানকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা হয় যথা (a) সদ্য সংযুক্ত অবিয়োজিত জৈব দেহাবশেষ বা আর্বজনা (Organic remains of litter) (b) প্রায় পচে যাওয়া জৈবাংশ (Semidecomposed organic remains) এবং (c) হিউমাস (Humus)।

(a) সদ্য সংযুক্ত সতেজ অবিয়োজিত জৈবাংশ (Organic remains or litters) মাটির পৃষ্ঠস্তরে জমে থাকা অবিয়োজিত গদ্য সংযুক্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের জৈব অংশ ইহার অন্তর্ভূক্ত। এই সমস্ত জৈবাংশ যথা গাছের পাতা ও অন্যান্য অংশ মাটিতে জঞ্জালের ন্যায় সঞ্চিত থাকতে দেখা যায়। ইহা জীবানুর দ্বারা স্বল্পপরিমাণে বিয়োজিত হয় বলে বাদামী রঙের আধপচা বস্তু রূপে অবস্থান করতে দেখা যায়। ইহাদের উৎস সহজে বোঝা না গেলেও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখে অনুমান করা যায়।

(b) প্রায় পচে যাওয়া জৈবাংশ (Semi decomposed organic remains) : জৈব দেহাবশেষ আর্বজনার নীচে এই জৈবাংশ দেখা যায়। ইহা জীবাণুর দ্বারা স্বল্প পরিমাণে বিয়োজিত হয় বলে বাদামী রঙের আধপচা বায়ু রূপে অবস্থান করতে দেখা যায়। ইহাদের উৎস সহজে বোঝা না গেলেও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখে অনুমান করা যায়।

(c) হিউমাস : (Humus) মাটির মধ্যে সংযোজিত জৈবাংশ অর্থাৎ প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহাংশ বিভিন্ন জীবানুর দ্বারা জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিশ্লিষ্ট হয়ে গাঢ় কালো অথবা বাদামী রঙের যে স্থায়ী বা অপরিবর্তনশীল উপাদান তৈরী হয় তাকে হিউমাস বলে। হিউমাস সম্পূর্ণরূপে পচে যাওয়া জৈবাংশ বলে ইহা পরিবর্তনশীল নয় এবং ইহার উৎস সম্বন্ধেও ধারণা করা যায় না।

জৈব পদার্থের উৎস : (Source of organic matter) জৈব পদার্থের মূল উৎস হল উদ্ভিদের দেহাংশ। প্রকৃতিতে বৃক্ষ, তৃণ ও লতা গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদ পাতা ও শিকড়ের মাধ্যমে প্রচুর পরিমানে জৈব দেহাবশেষ মাটিতে সংযুক্ত করে। ঐ সমস্ত জৈবাংশ পচে গিয়ে বেশীরভাগ জৈবপদার্থ বা হিউমাস গঠিত হয়।

জৈব পদার্থের উৎস হিসাবে প্রাণীর অবদান গঠন। জীবিত বেশীরভাগ প্রাণীতে মলমূত্র জৈবাংশ হিসাবে মাটিতে যুক্ত হয় ও পচে গিয়ে হিউমাস সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এই সমস্ত প্রাণীর দেহাবশেষও পচে গিয়ে হিউমাস সৃষ্টি হয়।

(ii) **জৈব পদার্থের প্রকৃতি ও উপাদান :** (Nature and Fractionation of soil organic matter) জৈব পদার্থের সমগ্র অংশের শতকরা 75 ভাগ জল এবং বাকী শুষ্ক অংশ কার্বন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন এবং অন্যান্য খনিজ উপাদান দ্বারা গঠিত।

জৈব পদার্থের রাসায়নিক গঠন খুবই জটিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহজাতীয় পদার্থ। স্নেহজাতীয় পদার্থ কার্বোহাইড্রেট থেকেও জটিল এবং বিভিন্ন জাতীয় আঠাল রেজিনের সাথে মিশে থাকে। জৈব পদার্থের বিশ্লেষণের হারকে ভিত্তি করে জৈব যৌগের পদার্থের নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

প্রথম শ্রেণী :(a) সুগার, স্টার্চ (Starch ও সরল জল দ্রাব্য প্রোটিন (Simple protein)

(b) জটিল প্রোটিন (Crude Protein)

দ্বিতীয় শ্রেণী : (a) হেমি সেলুলোজ (Hemi Cellulose)

(b) সেলুলোজ (Cellulose)

(e) লিগনিন (Lignin)। স্নেহজাতীয় পদার্থ (Fat) ওয়াক্স (Wax)

উপরিউক্ত উপাদান গুলির সুগার, স্টার্চ, সেলুলোজ এবং হেমিসেলুলোজ কার্বোহাইড্রেটের অন্তর্গত। ইহারা কার্বন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত। স্নেহজাতীয় পদার্থ ও ওয়াকস বিভিন্ন প্রকার অ্যাসিড যথা বাট্রিক (Butyric) স্টীয়ারিক (Stearic) প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। প্রোটিনের মূল উপাদান হল কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, লৌহ, ফসফরাস এবং অন্যান্য স্বল্প পরিমানের মৌল।

বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে রবিনসন (G. W. Robinson) বেক্‌লে (Beckley) এবং জোনস্ (Jones) জৈব পদার্থের উপাদান হিসাবে নিম্নলিখিত পদার্থের উল্লেখ করেছেন।

জৈব পদার্থ
(Organic matter)

- শীতল ক্ষারে দ্রাব্য (Soluble in Cold alkaline
  - লঘু অ্যাসিডে দ্রাব্য লঘু (Soluble in dilute acid) এ্যাপ্রোক্রেনিক অ্যাসিড (Approcrenic Acid)
  - অ্যাসিড দ্বারা অধ:ক্ষিপ্ত (Precipitated by dilute acidic)
    - জলে দ্রাব্য (Soluble in water) ফালভিক অ্যাসিড (Fulvic Acid) বাদামী বা হলুদ
    - এ্যালকোহলে দ্রাব্য (Soluble in alcohol) হাইমোটোমেলানিক (Hymato melanic Acid) কাল অ্যাসিড
    - এ্যালকোহলে অদ্রাব্য (Insoluble in alcohol) হিউমিক অ্যাসিড (Humic Acid) কাল অ্যাসিড
- শীতল ক্ষারেঅদ্রাব্য (lnsoluble in cold alkali)

(iii) হিউমাসের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of humus)

হিউমাসের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য

(a) হিউমাস মৃত্তিকার কর্দম কণিকার উল্লেখযোগ্য কলয়েড ধর্মী। হিউমাস কলয়েড প্রধাণত কঠিন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন সমন্বয়ে গঠিত একটি জটিল যৌগ ; যেমন পলিস্যাকারাইড (Polysacarides) এবং পলিইউরোনাইড (polyuronide)

(b) হিউমাস কলয়েড কর্দম কণিকার ন্যায় কোন নির্দিট কেলাস গঠন করে না। ইহা পাউডার বা ধূলার ন্যায় (Amarphous)। হিউমাসের কাদা কণার ন্যায় সুনির্দিষ্ঠ পারমানবিক গঠন না থাকায় ইহা ধুলার ন্যায় অবস্থায় থাকে।

(c) হিউমাসের কলয়েডের পৃষ্ঠতলের আয়তন কর্দম কণিকার তুলনায় বেশী হয়। তুলনামূলকভাবে হিউমাস কলয়েড কাদা কলয়েডের তুলনায় ক্ষুদ্র বলেই এর পৃষ্ঠতলের মোট আয়তন বেশী হয়।

(d) হিউমাস কলয়েড ধনাত্মক আয়নধর্মী। পৃষ্ঠতলে উন্মুক্ত এবং ফেনোলিক হাইড্রক্সিল (Phenolic Hydroxyl) রূপে থাকে এবং এর থেকে হাইড্রোজেনের বিয়োজন ঘটে বলেই নেগেটিভ আধানের সৃষ্টি হয়। হিউমাসে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ বেশী থাকার জন্য খনিজ পদার্থে অবস্থিত ক্যালসিয়াম পটাসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়ণ বিনিময়ের মাধ্যমে মৃত্তিকার সংস্থাপিত হয়।

(iv) হিউমাসের উৎপত্তি : (Origin of humus)

মাটিতে সংযুক্ত জৈব দেহাংশ জটিল জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিয়োজিত হয়ে হিউমাসের সৃষ্টি হয়। জৈবাংশ থেকে হিউমাস সৃষ্টির এই পদ্ধতিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয় যথা :

(1) জারণ প্রক্রিয়া (Oxidative decomposition)

(2) হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়া (Humification)

(1) জৈব পদার্থের জারণ প্রক্রিয়া : মাটিতে প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহাবশেষ সংযুক্ত হওয়ার পর জৈবাংশের শর্করা (Sugar) শ্বেতসার (Starches) এবং প্রোটিন ও সেলুলোড প্রভৃতি পদার্থগুলি মৃত্তিকার বিভিন্ন জীবাণুদ্বারা জারিত হয়ে জল কার্বন ডাই অক্সাইড এবং শক্তি উৎপন্ন হয়।

$$\xrightarrow{\text{Enzymic oxidation}} CO_2 + H_2O + \text{Energy}$$

কার্বন ও হাইড্রোজেন যৌগ $\xrightarrow{\text{উৎসেচকীয় জারণ}}$ কার্বন ডাই অক্সাইড + জল + শক্তি

জৈবপদার্থের জারন কালে নাইট্রোজেনের চাহিদা খুব বেশী থাকে কারণ এই সময়বহু সংখ্যক জীবাণু জৈব দেহাংশ বিজারণে অংশ গ্রহণ করে। এ জন্য জীবানুদের মধ্যে নাইট্রোজেন গ্রহনের প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ার ফলে নামমাত্র নাইট্রিফিকেশান প্রক্রিয়া সম্ভব হয়। এই প্রক্রিয়া জীবাণুর দ্বারা সংঘটিত হয় বলে ইহার আধিক্য নির্ভর করে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাসের আর্দ্রতার উপস্থিতি এবং 35ºc – 40ºc উষ্ণতা। মাটি শুষ্ক হলে বা বায়ুর অভাব ঘটানো ব্যাহত হয়। মাটিতে চূণ জাতীয় পদার্থের উপস্থিতিও এই প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করে। কারণ মাটিতে চূণ জাতীয় পদার্থ বেশী থাকলে মাটির অনুকূল গঠন

সৃষ্টি হয় এবং মাটি পর্যাপ্ত বায়ুযুক্ত হয়। তাছাড়া মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া নিরপেক্ষ বা স্বল্প ক্ষারকীয় হয় বলে জীবানুরা অধিক ক্রিয়াশীল হয়।

(2) হিউমিফিকেশান প্রক্রিয়া : (Humification) এই পর্যায়ে মাটিতে সংযুক্ত জৈবপদার্থ পরিবর্তিত হয়ে একটি স্থায়ী অপরিবর্তনীয় পদার্থ সৃষ্টি হয় যাকে হিউমাস বলে। জৈব পদার্থের প্রোটিন ও অন্যান্য উপাদান যথা লিগনিন, তেল, ওয়াকস ও স্নেহজাতীয় পদার্থ বিশ্লেষিত হয়ে জল, কার্বনডাই অক্সাইড ও শক্তি ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি যৌগ উৎপন্ন হয়। জৈব পদার্থের উপরিউক্ত উপাদানগুলি বিশ্লেষিত হয়ে প্রথমে অ্যামাইড ও পরে অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। পরবর্তী পর্যায়ে উৎসেচকের সাহায্যে আর্দ্র সংশ্লেষ প্রক্রিয়া অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট ও পরে নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়। রেচন পদার্থ ও মৃত জীবদেহের প্রোটিন অংশ থেকে বিয়োজনের ফলে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হওয়াকে অ্যামোনিফিকেশন (Amonification) প্রক্রিয়া বলে। জৈবাংশের নাইট্রোজেন যৌগের অ্যামোনিয়া রূপান্তর অ্যামোনিফাইং ব্যাকটিরিয়া যথা মাইক্রোকক্কাস (Mycrococcus) সহযোগিতায় সংঘটিত হয়। নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া নাইট্রোসোমোনাসের (Nitrosomonas) সহায়তায় অ্যামোনিয়া নাইট্রেটে পরিণত হওয়াকে নাইট্রিফিকেশান (Nitrification) বলে।

যদিও এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাটিতে সংযুক্ত জৈব উপাদানের কিছু অংশ বিশ্লেষিত হওয়ার মাধ্যমে বিনাশ প্রাপ্ত হয় তথাপি বেশীরভাগ জৈবাংশ বিয়োজিত হয়ে স্থায়ী কলায়েডধর্মী গঠন বিহীন (Amorphous) বস্তুর উদ্ভব হয় যা হিউমাস নামে পরিচিত। জৈব দেহাবশেষের এইরূপ বিশ্লেষণের ফলে উৎপন্ন হিউমাসে ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য জীবানুর জন্য খাদ্যের যোগান কমে আসায় উহা পুণরায় বিশ্লেষিত হয় না। এর ফলে ঐ অপরিবর্তনীয় জৈব উপাদান হিউমাসরূপে সঞ্চিত হয়। মাটিতে সংযুক্ত বিভিন্ন জৈবাংশের হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়া হিউমাসে রূপান্তর পদ্ধতির প্রকৃতি নির্ভর করে পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের উপর। বিভিন্ন পরিবেশে নিম্নলিখিত হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়া প্রাধান্যলাভ করে।

(a) অবায়বীয় হিউমিফিকেশন (Anaerobic humification) এপ্রকার হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়া বায়ুহীন জলা জায়গায় পুকুরে বা হ্রদে দেখা যায়। এরূপ পরিবেশে মাটিতে অক্সিজেনের অভাবে বেশীর ভাগ ব্যাকটিরিয়া ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জীব জৈবাংশের দ্রুত পচন ঘটাতে পারে না। এজন্য সংযুক্ত জৈবাংশের বিনাশ মুলক পচন (Destructive decomposition) প্রাধান্য পায় না। পরিবর্তে জৈবাংশ ধীরে ধীরে পচে গিয়ে অপরিবর্তিত হিউমাসে পরিণত হয়। এজন্য এরূপ পরিবেশে মাটির জৈবাংশ খুব বেশী মাত্রায় থাকে এবং এরূপ মাটিকে পিট (Peat) বা বগ (Bog) মৃত্তিকা বলে।

সুষ্ঠু নিকাশীযুক্ত স্বাভাবিক মৃত্তিকায় (Normal Soil) এপ্রকার হিউমিফিকেশন একমাত্র তখনই প্রাধান্য

পায় যখন অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে মাটির রন্ধ্র সম্পূর্ণরূপে জলকণা ভর্ত্তি থাকার ফলে বায়ু হীন অবস্থার সৃষ্টি হয়। নাতিশীতোষ্ণ ও ক্রান্তীয় অঞ্চলে বর্ষাকালে স্বাভাবিক মৃত্তিকায় একপ্রকার হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়া প্রাধান্য লাভ করতে দেখা যায় গিয়ে অপরিবর্তিত হিউমাসে পরিণত হয়। এজন্য এরূপ পরিবেশে মাটির জৈবাংশ খুব মাত্রায় থাকে এবং এরূপ মাটিকে পিট বা বর্গ মৃত্তিকা বলে।

(b) অম্লধর্মী হিউমিফিকেশন (Acid humification) এপ্রকার হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়া প্রাধান্য পায় যখন মাটিতে ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য ক্ষারকীয় উপাদান (Base) কমে আসে বা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত হয়। অর্থাৎ মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া অম্লধর্মী হয়ে পড়ে। তুন্দ্রা ও সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য অঞ্চলে এ প্রকার হিউমিফিকেশন প্রধাণত ঘটতে দেখা যায়। মস লিকেন (moss, lichen) ও সরলবর্গীয় বৃক্ষ মাটি থেকে ক্ষারকীয় উপাদানের পরিবর্তে অম্লধর্মী উপাদান বেশী মাত্রায় গ্রহণ করে বলে উহাদের জৈবাংশে অম্লের মাত্রা বাড়তে থাকে। এর ফলে উদ্ভিদের দেহাবশেষও অম্লধর্মী হতে দেখা যায়। তাছাড়া মাটির ধৌত প্রক্রিয়া বৃষ্টিপাতের প্রাধান্য হেতু বেশী হওয়ায় মাটি অম্লধর্মী হয়ে পড়ে। এপ্রকার মাটিতে বেশীর ভাগ ব্যাকটেরিয়া জৈবাংশের পচন ঘটাতে সক্ষম হয় না। পরিবর্তে ফাঞ্জি জৈবাংশের পচন ঘটায় এবং হিউমাস উৎপন্ন হয়। যাহা Raw humus বা duft নামে পরিচিতি। অবায়বীয় ও অম্লধর্মী হিউমিফিকেশনের মধ্যে মূলগত পার্থক্য হল অম্লধর্মী হিউমিফিকেশন সংঘটিত হয় ক্ষুদ্র উদ্ভিদ বা ফাঞ্জি দ্বারা, কিন্তু অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রানী (Microfauuna) জৈবাংশের হিউমিফিকেশন ঘটাতে সক্ষম হয় না। অপরদিকে বায়ুহীন হিউমিফিকেশন সংঘটিত করতে ক্ষুদ্র প্রাণীদের (Micro fauna) ভূমিকা দেখা যায়।

(c) উপআর্দ্র বা মরুপ্রায় অঞ্চলের হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়া (Humification under semiacid condition) নাতিশীতোষ্ণ উপআর্দ্র বা মরু প্রায় অঞ্চলে অরন্যের পরিবর্তে তৃণভূমির উপস্থিতি দেখা যায়। এ প্রকার তৃণভূমি অঞ্চলে (স্টেপ ও প্রেইরী) মাটিতে হিউমাসের পরিমাণ অত্যধিক থাকায় মাটির রঙ গাঢ় কাল রঙের হওয়ায় উহাকে কৃষ্ণমৃত্তিকা বলে। এ প্রকার জলবায়ু অঞ্চলে এমন একধনের হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়া প্রাধান্যলাভ করে যাহা পূর্বোক্ত হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এবং মাটির প্রায় নিরপেক্ষ বা স্বল্প ক্ষার ধর্মী রাসায়নিক বিক্রিয়াই এরূপ হিউমিফিকেশনের জন্য দায়ী। এখানের গ্রীষ্মঋতু শুষ্ক হওয়ায় ঐ ঋতুতে ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জীব উদ্ভিদের দেহাবশেষের পচন ঘটাতে সক্ষম হয় না কারণ উহাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন হয় মৃত্তিকার পরিমিত আর্দ্রতা। আবার আর্দ্র শীত ঋতুতে ঐ প্রকার ক্ষুদ্র জীব (প্রাণী বা উদ্ভিদ) উচ্চতার স্বল্পতা হেতু সেরূপ ক্রিয়াশীল হয় না। এর ফলে মৃত্তিকার জৈবাংশের Oxidative decomposition প্রাধান্য পায় না বলে গঠনমূল হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়া প্রাধান্য পায় এবং এর প্রভাবেই প্রচুর পরিমানে হিউমাস সৃষ্টি হয়।

মাটিতে প্রচুর পরিমাণে ক্ষয় জাতীয় উপাদানের উপস্থিতিও এ প্রকার হিউমিফিকেশনের জন্য দায়ী। বিভিন্ন নিরীক্ষণের মধ্যে দেখা গেছে যে অধিক ক্ষারযুক্ত (Base rich) মৃত্তিকায় আর্দ্র অঞ্চলে জৈবাংশ পচে গিয়ে কাল রঙের হিউমাস গঠন করে।

(d) আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলের হিউমিফিকেশন : (Humification under humid tropical condition)

আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলে মাটিতে প্রায় সারা বৎসর আর্দ্রতা ও উষ্ণতা অত্যধিক হওয়ায় জৈবাংশের দ্রুত জারণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং এরফলে জৈবাংশের অধিকাংশত দ্রুত নিঃশেষিত হয়। কিন্তু জৈবাংশের কিছু অংশ হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষিত হয়ে স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় হিউমাসে পরিণত হয়। আর্দ্র ক্রান্তীয় বনভূমি অঞ্চলে এরূপ প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়। এরূপ জলবায়ু অঞ্চলে মৃত্তিকাস্থিত ক্ষুদ্র প্রাণী ও উদ্ভিদের (Soil micro flora and famna) সংখ্যা অগুনিত হওয়ায় উহাদের প্রভাবে জৈবাংশের ধ্বংসাত্বক পচন প্রক্রিয়া প্রাধান্য পায় বলে মৃত্তিকায় হিউমাসের পরিমাণ তুলনামুলকভাবে কম হয়।

(v) মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমান নিয়ন্ত্রনকারী বিষয়সমূহ (Controlling factors of humus)

মৃত্তিকার জৈব পদার্থের পরিমান নির্ভর করে কতকগুলি বিষয়ের উপর। এ বিষয়ে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য—

(a) জলবায়ু : জৈব পদার্থের পরিমান নির্ধারনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল জলবায়ু, জলবায়ুর প্রকৃতির উপরেই জৈব পদার্থেরজারন প্রক্রিয়ার আধিক্য নির্ধারিত হয়। উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুতে এই প্রক্রিয়া দ্রুততর হয় বলে মৃত্তিকায় সংযোজিত জৈব পদার্থের বেশীর ভাগ অংশই নি:শেষ হয় ফলে কম পরিমানে হিউমাস উৎপন্ন হয়। ফলে হিউমাসের পরিমান কমে যায়। সেই তুলনায় নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে উষ্ণতা ও মাটির আর্দ্রতা কম হওয়ায় জারন প্রক্রিয়া উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের তুলনায় কম হয়। ফলে ঐ মাটিতে হিউমাসের পরিমান বেশী হয়। লক্ষ্য করা গেছে গড়ে প্রতি $10^{o}c$ উত্তাপ কমলে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমান ও গুন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শীতল মেরু অঞ্চলে জৈব পদার্থের পরিমান কম এর কারন হল মাটিতে জৈব পদার্থের যোগানের অভাব এবং উষ্ণতা কম হওয়ায় মাটির জীবাণু প্রায় অনুপস্থিত।

(b) স্বাভাবিক উদ্ভিদ : মাটির জৈব পদার্থের পরিমান ও নির্ধারন করতে স্বাভাবিক উদ্ভিদ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এ বিষয়ে তৃণ ও বনাঞ্চলে যে প্রভাব সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বনাঞ্চলে সৃষ্ট মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমান তৃণাঞ্চল অপেক্ষায় অনেক কম হয়। কারন বনভূমিতে ঝড়ে পরা পাতা মাটির জৈব পদার্থ সৃষ্টি করার প্রধান উপাদান। মাটির উপরিভাগে পাতা সংযোজিত হওয়ায় এগুলি বিভিন্নপ্রকার জীবানুর দ্বারা সহজেই জারিত হয় এবং কম পরিমান জৈব পদার্থ সৃষ্টি করে। বিপরীতক্রমে তৃণাঞ্চলে (প্রেইরী অঞ্চলে) মাটির হিউমাসের প্রধান উৎস্য হল প্রতিবছর মরে যাওয়া ঘাসের পাতা ও কান্ড প্রভৃতি অংশ যা মাটির উপরে সংযোজিত হয় এবং ঘাসের শিকড় যা মৃত্তিকার মধ্যেই সংযোজিত

থাকে। প্রতিবছর এইভাবেই মৃত্তিকায় প্রচুর জৈব পদার্থ সংযোজিত হয় যা বিশ্লিষ্ট হয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে হিউমাস সৃষ্টি করে। মাটির মধ্যস্থিত ঘাসের শিকড় খুব বেশী করে জীবানুর দ্বারা জারিত হয়ে নি:শেষ হয় না। ফলে মৃত্তিকার জৈব পদার্থের পরিমাণ অনেক কম হওয়ার কারণ এরূপ জমিতে স্বাভাবিক উদ্ভিদের মাধ্যমে জৈব পদার্থ সংযোজিত হতে পারে না। তাছাড়া চাষের জমি অতিরিক্ত বায়ুযুক্ত হওয়ায় এবং মাটির আর্দ্রতা কম হওয়ায় জৈব পদার্থের জারন প্রক্রিয়া দ্রুত হওয়ার ফলে সংযোজিত জৈব পদার্থের বেশীর ভাগ অংশ নি:শেষিত হয়।

(c) **মাটির গ্রথন :** মাটির গ্রথনও জৈব পদার্থের পরিমাণকে প্রভাবিত করে। বেলে মাটিতে কাদা মাটির চেয়ে কম পরিমাণে হিউমাস থাকে এর কারণ সম্ভবত কম পরিমাণ জল থাকে। এবং মাটি অতিরিক্ত বায়ুযুক্ত হওয়ায় জৈব পদার্থ খুব তাড়াতাড়ি জারিত হয়ে নি:শেষিত হয়। তাছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশ ও গ্রথন এমন থাকে যাতে এই মাটিতে খুব অল্প পরিমাণে জৈব পদার্থযুক্ত হয়। আবার যে মাটিতে বেশী পরিমাণ জল জমে থাকার জন্য বায়ু চলাচল কম হয় সেখানে জৈব পদার্থের বিশ্লেষনের হার কমে যায়। ফলে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই জন্যই নীচু জমিতে নদীর ধারের জমিতে ও পুকুরের তলদেশের মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশী হয়।

(d) মানুষের প্রভাব : মানুষের কাজকর্ম বিশেষত শস্য চাষ মাটিতে জৈবপদার্থের পরিমাণকে প্রভাবিত করে। সাধারণত দেখা গেছে যে, জমিতে চাষ দিয়ে ফলন ফলানো হয় সেই জমির জৈব পদার্থের পরিমাণ পতিত জমির তুলনায় কম হয়। এর কারণ সম্ভবত এই চাষের জমি থেকে ফসলের প্রায় সব জৈব অংশই তুলে নেওয়া হয়। তাছাড়া চাষ দেওয়ার ফলে মাটি অধিক বায়ুযুক্ত হয় বলে জৈব পদার্থের জারণ প্রক্রিয়া অস্বাভাবিকবাবে বেশী হয়। ফলে মাটির কেবলমাত্র পৃষ্ঠ স্তরেই নয় নীচের স্তরেও জৈব পদার্থের পরিমাণ কমে যায়। কোন জমিতে কি পরিমাণে ও কি ধরণের ফসল ফলানো হয় তার উপরেও জৈব পদার্থের পরিমাণ নির্ভর করে। মাটিতে সাধারণ শস্য চাষ করলেও (সীম বীজ জাতীয় ফসল ছাড়া) মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পায়। কিন্তু শিম্বী জাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে ও জৈব পদার্থের পরিমাণ অনেকগুনে বৃদ্ধি পায়।

মাটিতে চুনজাতীয় পদার্থের উপস্থিতি : (চুন সমৃদ্ধ মাটিতে বাতাস বেশী থাকে কারণ এরূপ মাটিতে উপযুক্ত গঠন সৃষ্টি হয়। এরূপ মাটিতে বাতাসের পরিমাণ বেশী থাকায় এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া ক্ষারকীয় হওয়ায় বিভিন্নপ্রকার জীবাণু মৃত্তিকায় সংযোজিত জৈব পদার্থকে দ্রুত জারণ করে প্রায় নি:শেষ করে ফেলে। এইজন্য যে সমস্ত মৃত্তিকায় চুনজাতীয় পদার্থ বেশী পরিমাণে থাকে সেই সমস্ত মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ খুব কম হয়।

(উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে যদিও মৃত্তিকার জৈব পদার্থ বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভরশীল তথাপি জলবায়ুর প্রভাব এবিষয়ে সর্বপ্রধান কারণ।) জলবায়ুর প্রকৃতির উপর জৈব পদার্থের জারণ প্রক্রিয়া

নির্ভরশীল সেইরূপ জলবায়ু পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ ও অন্যান্য বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রন করে। শষ্য চাষ মূলত জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল।

(vi) **মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের গুরুত্ব : (Importance of Role of organic matter)**

মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ বা হিউমাস একটি অন্যতম উপাদান। মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ মৃত্তিকার বহুবিধ ভৌত ও রাসায়নিক গুনাগুনকে প্রভাবিত করে। সেগুলো পরোক্ষভাবে উদ্ভিদকে প্রভাবিত করে।)

(a) উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহকারী হিসাবে হিউমাসের গুরুত্ব : (মৃত্তিকার বিভিন্ন উপাদান গুলির মধ্যে হিউমাস গাছের খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। গাছের প্রধান খাদ্যগুলি যথা: নাইট্রোজেন, পটাশ ও সালফেটের মধ্যে এবি,য়ে নাইট্রোজেন উল্লেখযোগ্য। মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ হিউমাসের পরিমানের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এছাড়াও অন্যতম উদ্ভিদ খাদ্যের উৎসও হিউমাস জীব ও প্রাণী দেহের বিভিন্ন অংশ জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পচে যাওয়ার পর তৈরী হয়। (কেবলমাত্র উদ্ভিদের খাদ্য সরবরাহকারী হিসাবে বা উৎস্য হিসাবে হিউমাসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ নয়, হিউমাস উদ্ভিদখাদ্য বিনিময় করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব নয়, হিউমাস উদ্ভিদখাদ্য বিনিময় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।) হিউমাসের কলোয়েড ধর্মী গুন থাকায় এর ধনাত্মক আয়ন বিনিময় ক্ষমতা (Cal-Ion exchange capacity) অনেক বেশী হয়। এরজন্য হিউমাস মূলত: বিভিন্নপ্রকার আয়নের সঞ্চয়কারী হিসাবে কাজ করে।

(b) মৃত্তিকার ভৌতধর্মকে প্রভাবিত করতে হিউমাসের গুরুত্ব : মৃত্তিকার বিভিন্ন ভৌতধর্ম যথা— গঠন (Structure) জলধারন ক্ষমতা প্রভৃতিকে প্রভাবিত করতে হিউমাসের গুরুত্ব অপরিসীম। হিউমাসের সংহতি শক্তি বেশী থাকায় মাটির মধ্যে কর্দম বালুকণাকে ও পলিকণাকে একতাবদ্ধ করে বিভিন্ন আয়তন ও আকারের গঠন সৃষ্টি হয়। প্রাথমিকভাবে সৃষ্ট মাটির গঠনের স্থায়িত্ব দিতে হিউমাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করে। হিউমাস নিষ্পেষিত এক প্রকার আঠালো পদার্থ মাটির গঠনের উপর পাতলা স্তরের সৃষ্টি করে। যা পরে শুকিয়ে গিয়ে কঠিন হয়, ফলে গঠনগুলি জলের আঘাতে ভেঙ্গে যেতে পারে না।

মাটি জলধারন ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে হিউমাসের গুরুত্ব : হিউমাস অত্যন্ত কলোয়েড ধর্মী হওয়ায় এর জলধারন ক্ষমতা অনেক বেশী হয়। এজন্য যে মাটিতে হিউমাসের পরিমান বেশী থাকে সে মাটির জলধারণক্ষমতা অনেক বেশী হয়। সেইতুলনায় হিউমাসবিহীন মৃত্তিকার জলধারনক্ষমতা অনেক কম হয়।

(c) মাটির জীবানুর উপর হিউমাসের প্রভাব : (বিভিন্ন প্রকার মাটির জীবানুর কর্মদক্ষতা মাটির জৈব পদার্থের পরিমানের উপর অনেকটা নির্ভর করে। সাধারণভাবে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমান বেশী

হলে মাটিতে জীবানুর সংখ্যা অনেক বেশী হয়। বিপরীতক্রমে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমান কম হলে জীবানুর পরিমাণও অনেক কম হয়। এর কারন হল মাটিতে সংযুক্ত জৈব পদার্থ পচনের সময় বিভিন্ন প্রকার জীবানু তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি এবং কার্বন গ্রহন করে।) মাটির জীবানুর কর্মক্ষমতা বা তাদের উপস্থিতি মাটিতে অবস্থিত বাতাসের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। মৃত্তিকা বেশী পরিমানে বায়ুমুক্ত হলেই বিভিন্ন প্রকার জীবানুর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এবং কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। এদিক থেকেও হিউমাসের গুরুত্ব অনেক বেশী। কার্বন হিউমাসের উপস্থিতিতে মাটিতে বিভিন্ন প্রকার গঠন সৃষ্টি হয়। যার ফলে মাটিতে স্বাভাবিকের তুলনায় বায়ুর পরিমান অনেক বেশী হয়।

4.3.3 মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি :

(i) উর্বরতার সংজ্ঞা : মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি ইহার একটি বিশেষ গুণ যার উপর উদ্ভিদের সুস্থ বৃদ্ধি তথা উৎপাদিকা শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরশীল। উর্বর মৃত্তিকাই গাছের উৎপাদিকা শক্তিকে সুনিশ্চিত করে। শস্যোৎপাদনে পরিমান বিশেষভাবে নির্ভর করে মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তির উপর। যে মৃত্তিকা যত উর্বর সে মাটির উৎপাদিকা শক্তি তত বেশী। অবশ্য শস্যের উৎপাদিকা শক্তি নির্ভর করে মাটির উর্বরতা ছাড়াও মাটির পরিচর্যার উপর। মাটি ঠিক ভাবে কর্ষিত না হলে, ইহাতে সার প্রয়োগ না করলে এবং সেচের জল সরবরাহ না করলে উর্বর মৃত্তিকাতেও শস্যোৎপাদন আশানুরূপ হয় না। বিপরীত ক্রমে অনুর্বর মৃত্তিকাকে ঠিকমত পরিচর্যা করলেও শস্যের উৎপাদন অনুরূপভাবে আশানুরূপ হয় না। সুতরাং মাটির উৎপাদিকা শক্তি নির্ভরশীল মাটির উর্বরতা শক্তি ও ইহার পরিচর্যার উপর। পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অন্নসংস্থান সম্ভব হয়েছে উর্বর মৃত্তিকার সুষ্ঠু পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে।

মৃত্তিকার উর্বরতার সংজ্ঞা নিরূপন একটি জটিল ব্যাপার। এর কারণ হল উর্বরতা পরিমাপের নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নেই। মৃত্তিকার উর্বরতা বলতে ইহার একটি সহজাত গুণকে বোঝায় যাহা মৃত্তিকার অন্যান্য ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুনের সমষ্টিগত ফল। এই অর্থে উর্বরতা বলতে মৃত্তিকার এমন একটি অবস্থা যাহা গাছের উৎপাদিকা শক্তিকে নিয়ন্ত্রন করে। গাছের সুস্থ বৃদ্ধি নির্ভর করে কয়েকটি অপরিহার্য মৌলিক উপাদানের উপর যেগুলি গাছ মাটি বা বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রহণ করে। এই উপাদানগুলি গাছের পুষ্টি ঘটায় বলে এগুলিকে উদ্ভিদের পুষ্টিমৌল বলে। উদ্ভিদের এই পুষ্টি নির্ভর করে মাটির কয়েকটি ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের উপর। সুতরাং উর্বরতা হল মাটির একটি গুণগত মান যা মাটির স্বাভাবিক ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টিগত ফল।

(ii) মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তির নিয়ন্ত্রক : মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি ইহার বিভিন্ন প্রকার ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। এগুলি হল (a) উদ্ভিদের পুষ্টিমৌল (b) মাটির গভীরতা (c) মৃত্তিকার গ্রথন

(d) গঠন (e) মাটির রন্ধ্র (f) মাটির উয়্নতা (g) মাটির বায়ু (h) মাটির আর্দ্রতা (i) মাটির P^H (j) মৃত্তিকার ধনাত্বক আয়ন বিনিময় ক্ষমতা (k) হিউমাস বা জৈব পদার্থ।

A. মৃত্তিকার উদ্ভিদপুষ্টি মৌল (Nutrient in soil)

উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন হয় বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের যেগুলো উদ্ভিদ মাটি থেকে সংগ্রহ করে। গাছ মাটি থেকে যেসকল মৌল সংগ্রহ করে সেগুলি সংখ্যায় 17টি এবং এদের মধ্যে নাইট্রোজেন ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং সালফার এই 6টি অধিকতর পরিমানে প্রয়োজন হয়। এদের প্রদান খাদ্যমৌল (Macro nutrient) বলা হয়। এদের মধ্যে আবার N, P, K প্রথম শ্রেণীর বা প্রাথমিক খাদ্য মৌল এবং Ca, Mg, S কে দ্বিতীয় শ্রেণীর বা গৌণ খাদ্য মৌল বলা হয়। অন্যগুলিকে অনুখাদ মৌল (Micronutrient) বলে।

প্রধান খাদ্য মৌলের গুরুত্ব : উদ্ভিদের পুষ্টিতে প্রধান খাদ্য মৌলগুলি বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করে। এই সমস্ত উদ্ভিদ খাদ্যের প্রধান কাজ হল—

(a) উদ্ভিদ কোষের গঠন

(b) কোষ সংগঠনকে বজায় রাখা

(c) শক্তির বিনিময়

(d) উৎসেচক হিসাবে বিক্রিয়া

অনুখাদ্য মৌল (Micro nutrient)

Fe, Mn, Cu, Zn, Bo মলিবডেনাম (Mo), ক্লোরিণ (Cl) অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়। এইগুলি অনুখাদ্য নামে পরিচিত। একমাত্র লৌহ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে Mg ছাড়া অন্যান্য অনুখাদ্য মাটিতে অল্প পরিমাণে থাকে। মাটিতে অনুখাদ্যের পরিমান খুবই কম থাকলেও তারা আবশ্যক বলে বিবেচিত হয়। কারণ উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অনুখাদ্যগুলি যদিও প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে না, কিন্তু সহায়ক হিসাবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কতগুলি অনুখাদ্য উদ্ভিদ বৃদ্ধিতে উৎসেচক হিসাবে কাজ করে। ঋণাত্মক আয়ন-গঠনকারী মৌলগুলি যথা—বোরণ, এবং মলিবডেনাম উৎসেচক পরমাণু গঠনে সহায়তা করে। এই সমস্ত উপাদানগুলি উদ্ভিদপুষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে কাজ করে, ধনাত্মক আয়নযুক্ত অনুখাদ্য যথা কপার সহযোগী উৎসেচক হিসাবে কাজ করে এবং উৎসেচক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। কোন কোন অনুখাদ্য যথা Fe, Cu, Mg উদ্ভিদের পুষ্টিতে জারণ বিজারণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে এবং অন্যান্য কয়েকটি অনুখাদ্য উদ্ভিদের ক্লোরোফিল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

মাটিতে খাদ্য মৌল সমূহের আয়নিক বৈশিষ্ট্য :—

মাটিতে মৌলসমূহ সাধারণত দুই অবস্থায় থাকে যথা — (a) জটিল এবং অদ্রবণীয় ও (b) দ্রবণীয় প্রথম পর্যায় ভুক্ত মৌল উপাদানগুলির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি। রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে মাটির জটিল মৌল পদার্থগুলি দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। আবার কোন কোন অবস্থায় সহজপ্রাপ্য দ্রবনীয় মৌলও জটিল এবং অদ্রাবনীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে। দ্রবনীয় অবস্থায় উপাদান সমূহের কিছু অংশ জীবাণু ও গাছ তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে এবং বাকী অংশ মাটির নীচে চুঁইয়ে যায়।

মাটির জৈব পদার্থে অনেক খাদ্য মৌল জটিল যৌগ অবস্থায় থাকে। এইসব পদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়ে দ্রবনীয় মৌলে পরিণত হয় এবং গাছের চাহিদা মেটায়। মাটিতে অবস্থিত প্রায় সমস্ত নাইট্রোজেন সালফার এবং ফসফরাসের মোট পরিমাণের বেশির ভাগই জৈব যৌগ রূপে থাকে। জৈব N এবং S যত সত্ত্বর দ্রবনীয় অবস্থায় পরিণত হয় জৈব ফসফরাস তত দ্রুত রূপান্তরিত হতে পারে না।

P,K, Mg এর বেশির ভাগই অজৈব অবস্থায় মাটিতে থাকে। মাটির কলয়েড অংশে বিনিময়ক্ষম যে Ca^{2+} আয়ন থাকে গাছ, সেই Ca কে সহজেই গ্রহণ করতে পারে। মাটিতে গ্রহণযোগ্য Ca এর পরিমাণই বেশি, K এর মোট পরিমাণের শতকরা একভাগ মাত্র বিনিময়ক্ষম অবস্থায় থাকে। সেই তুলনায় বিনিময়ক্ষম Mg এর পরিমান অনেক বেশি; S অজৈব এবং যৌগ দুই বস্থাতেই থাকে কিন্তু জৈব S আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলের মাটিতে পটাসিয়াম ক্লোরাইড (KCl) সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) সোডিয়াম সালফেট (Na2SO4) প্রভৃতি খনিজ লবনের পরিমাণ অল্প থাকে কিন্তু খরাক্লিষ্ট গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের মাটিতে এইসব লবণ বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়।

(a) প্রথম শ্রেণীর প্রধান খাদ্য মৌল (Primary Macro nutrient) :

নাইট্রোজেন গাছের অন্যতম প্রদান খাদ্য। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টিতে N সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বেশিরভাগ জৈব উপাদান গুলির মধ্যেই নাইট্রোজেন থাকে। এই সমস্ত জৈব উপাদান গুলির মধ্যে অন্যতম হল অ্যামিনো অ্যাসিড, নিউক্লিক অ্যাসিড, বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক, শক্তি বিনিয়োগকারী বিভিন্ন উপাদান বিশেষত: ক্লোরোফিল, ADP, ATP প্রভৃতি। এই সমস্ত উপাদানগুলি ছাড়া উদ্ভিদের জৈবিক প্রক্রিয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারন নাইট্রোজেন উদ্ভিদদেহে এই সমস্ত উপাদান গঠন করে। উদ্ভিদেহে নতুন কোষ গঠনের জন্য N এর প্রয়োজন অনেক বেশী। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জল থেকে কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন করে কিন্তু বিভিন্ন জৈব যৌগ যথা — প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড প্রভৃতি গঠিত হতে পারে না যদি মাটির মধ্যেও N এর বিশেষ

অভাব ঘটে। মাটিতে নাইট্রোজেনের অভাব ঘটলে গাছের বৃদ্ধি বা পুষ্টি এবং প্রজনন প্রক্রিয়ার বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। নাইট্রোজেনের অভাবে অনেক উদ্ভিদ খর্বাকৃতি অবস্থায় থাকে। এজন্য উদ্ভিদকোষ গঠনকারী বিভিন্ন উপাদান যথা প্রোটিন ও অন্যান্য যৌগগুলির উৎপাদন বহুল পরিমাণে হ্রাস পায় এবং গাছের দ্রুত বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। এর ফলে উদ্ভিদের ক্লোরোফিলের ঘাটতি দেখা যায় যা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে অতি ধীর করে তোলে এবং কার্বোহাইড্রেট উৎপাদনও কমে যায়। এই সমস্ত কারণে মাটিতে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করলে গাছের বৃদ্ধি দ্রুততর হয় এবং গাছের বিভিন্ন অংশ যথা কান্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা প্রভৃতি গাঢ় সবুজ রঙের হয়। নাইট্রোজেনের ঘাটতি হলে গাছের বিভিন্ন অংশের রং হলুদ বা সবুজ হলদে হতে দেখা যায়। অনুরূপ ভাবে নাইট্রোজেনের যোগান মাটিতে বেশী হলে গাছের পাতা ও কান্ডের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং এর ফলে গাছ ভারি হয়ে গিয়ে বেঁকে গিয়ে অনেক সময় মাটিতে পড়ে যায়, তাছাড়া প্রজনন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। সর্বোপরি গাছেরা বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

মাটিতে অতিরিক্ত নাইট্রোজেনের প্রভাব : কোন কোন সময় মাটিতে অধিক পরিমানে N এর যোগান উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। বিশেষত: যখন P, K ও জলের যোগান অপ্রচুর হয়। কিন্তু P, K এবং জলের যোগান পরিমিত হলে অতিরিক্ত N এর যোগান উদ্ভিদের স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। N এর অতিরিক্ত যোগানে উদ্ভিদের পাতা ও অন্যান্য অংশ ঘন সবুজ হয় এবং বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের রসালো উপাদানের বৃদ্ধি ঘটে এবং খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত N যোগাযোগের ফলে উদ্ভিদের প্রজনন ক্ষমতা উদ্ভিদের অন্যান্য অংশের রসালো অংশের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যে সমস্ত উদ্ভিদ থেকে চিনি উৎপাদিত হয়, যথা, ইক্ষু, সুগার বীট প্রভৃতি, সে সমস্ত উদ্ভিদের এরূপ ক্ষেত্রে চিনির পরিমাণ কমে যায় অতিরিক্ত N এর যোগানে আলুতে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বাগিচা শস্যের ক্ষেত্রে বিশেষত ফলের বাগানে অতিরিক্ত N ঘটিত সার প্রয়োগ করলে এদের রসালো অংশের অতিরিক্ত বৃদ্ধিতে শীতকালে তুহিনের দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়ে পড়ে। উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে N যোগানের কুফল রদ করা যায় যদি মাটিতে N এর ন্যায় পর্যাপ্ত P ও K প্রয়োগ করা যায়। কারণ অতিরিক্ত K, P প্রয়োগের ফলে উদ্ভিদের রসালো অংশের বৃদ্ধি ঘটে না এবং প্রজনন সময় বিলম্বিত হয় না যা অতিরিক্ত N প্রয়োগে সংঘটিত হয়। মাটিতে অতিরিক্ত N যোগান দু'ভাবে ঘটতে পারে, যথা—

(i) মাটিতে অতিরিক্ত N ঘটিত সার প্রয়োগের ফলে।

(ii) মাটি থেকে উদ্ভিদ যে পরিমাণ N গ্রহণ করতে পারে তার থেকে যদি বেশি N স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়ে উৎপত্তি হয়। অতিরিক্ত N নাইট্রেট রূপে মৃত্তিকায় অবস্থান করে।

নাইট্রোজেনের উৎস :— যদিও N এর সীমাহীন উৎস হল বায়ুমণ্ডল, তথাপি উদ্ভিদ এই উপাদান সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। মৃত্তিকায় অবস্থিত নাইট্রোজেন কেবলমাত্র জৈব যৌগ অবস্থায় অবস্থান করে। যথা প্রোটিন ও অন্যান্য জৈব যৌগ বায়ুমন্ডলে অবস্থিত নাইট্রোজেন যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বনের সঙ্গে মিলিত হয়ে N ঘটিত যৌগ গঠন করে ততক্ষণ তা উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে না। যে প্রক্রিয়ায় বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেন মাটিতে আবদ্ধ হয় তাকে নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ (Nitrogen fixation) বলে। মাটির জীবাণু নাইট্রোজেন স্থিতিকরণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন জীবাণু উদ্ভিদের দেহাবশেষের পচন ঘটিয়ে হিউমাস গঠন করে। এর ফলে মাটিতে N যৌগের সৃষ্টি হয় যা গাছ গ্রহণ করে। মাটির মোট N এর যোগানের শতকরা নব্বইভাগ এভাবে আসে। বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া জটিল জৈব নাইট্রোজেন যৌগকে বিশ্লেষণ করে অজৈব নাইট্রোজেন আয়নে রূপান্তরিত করে।

(b) ফসফরাস :— নাইট্রোজেনের পর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ পুষ্টি মৌল হল ফসফরাস। উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে ফসফরাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এটি DNA-র একটি উল্লেযোগ্য উপাদান। উদ্ভিদের প্রজননেও এটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। তাছাড়া এটি ADP ও ATP-র উল্লেখযোগ্য উপাদান। এই দুই উপাদান শক্তি প্রবাহের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। উদ্ভিদের শ্বসন এবং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ADP থেকে উৎপন্ন ATP উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। এই কারনে ফসফরাস উদ্ভিদের পুষ্টিতে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে ফসফরাস নিম্নলিখিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করে।

(i) সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায়।

(ii) নাইট্রোজেন এর স্থিতিকরণ।

(iii) শস্যের পরিপূরণ ও বিকাশে গাছের ফুল, ফল, বীজ সৃষ্টি।

(iv) গাছের শিকড়ের প্রসার, বিশেষত তন্তুজাতীয় মূল।

(v) খাদ্য শস্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদের কান্ড শক্ত করতে, এর জন্য গাছ সহজে পড়ে যেতে পারে না।

(vi) শস্যের গুণগত মান বিশেষত: শাকসব্জির গুণগতমান উন্নয়ন করতে।

ফসফরাসের উৎস :— ফসফরাসের উৎস জৈব ও অজৈব অবস্থায় মাটি ও খনিজ পদার্থ। তাছাড়া কৃত্রিম রাসায়নিক সার ও জৈব সার প্রয়োগের ফলে মাটির ফসফরাস সমৃদ্ধি লাভ করে।

মাটিতে অজৈব ফসফরাস :— ক্ষারীয় মাটিতে ফসফেটের প্রধান উৎস হল বিভিন্ন প্রকার ক্যালসিয়াম

খনিজ, যথা কার্বনেট, অ্যাপাটাইট কণা, হাইড্রক্সাইড অ্যাপাটাইট, ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট, ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট ও মনোক্যালসিয়াম ফসফেট। মাটিতে আয়রণ, অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট যৌগের প্রাধান্য ঘটে এবং এটিই ফরফরাসের প্রধান উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়। এই ধরনের আয়রণ ফসফেট ল্যাটেরাইটে প্রধানত পাওয়া যায়।

মাটি থেকে H_2PO_4 - আয়ন গাছ গ্রহণ করে। সাধারণত মাটিতে এর পরিমাণ খুব কম থাকে এবং বিভিন্ন অজৈব ফসফেট যৌগের দ্রবনীয়তার ওপর নির্ভর করে। প্রধানত: মাটির P^H, দ্রবনীয় আয়রণ, অ্যালুমিনিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ, স্বল্প দ্রবণীয় ফসফেট যৌগের উপস্থিতি ফসফেটের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করে। এদের মধ্যে P^H এর প্রভাব সর্বাধিক। অম্ল মাটির জলীয় দ্রবণে ($P^H<6.7$) HPO_4^{2-} এর থেকে H_2PO^{4-} এর পরিমাণ বেশী। P^H 6.7 এর বেশী হলে HPO_4^{2-} এর পরিমাণ $H_2PO_4^-$ এর থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী। P^H9 এর বেশী হলে এই দুই আয়নের পরিবর্তে PO_4^{3-} এর পরিমাণ বাড়ে। মাটির P^H 6–7 এর মধ্যে হলে ফসফরাসের গ্রহণযোগ্যতা সর্বাপেক্ষা বেশী হয়।

মাটিতে জৈব ফসফরাস :— মাটির জৈব ফসফরাসের প্রায় অর্ধেক অংশ প্রধানত তিনটি অবস্থায় থাকে যথা ইনোসিস্টস ফসফেট, ফসফোলিপিড এবং নিউক্লিক অ্যাসিড। এছাড়া ফসফোপ্রোটিন, সুপার ফসফেটেও ফসফরাস পাওয়া গিয়েছে। বাকী অর্ধেকের উৎস সম্পর্কে সেরকম কিছু জানা যায় নি, অজৈবীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা ফসফরাস গাছের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। নাইট্রেট বা সালফেটের মতো ফসফেট উদ্ভিদদেহে বিজারিত হয় না ; জারিত রূপে জৈব যৌগের মধ্যে থাকে, সাধারণভাবে মনে হয় শীত প্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অজৈবীকরণ পদ্ধতিতে ফসফরাস কম পরিমাণে গ্রহণযোগ্য হয় কিন্তু গ্রীষ্ম প্রধান দেশে জৈব ফসফরাস অধিকতর সহজেই গাছের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়। জৈবীকরণ ও গ্রহণযোগ্য ফসফরাস জীবাণুর দ্বারা অবদ্ধীকরণ এই দুই পদ্ধতি জীবাণুর সাহায্যে সংঘটিত হয়। অম্ল মাটিতে অ্যালুমিনিয়াম ও আয়রন ফাইটোফসফেট এনজাইম দ্বারা সহজে বিশ্লেষিত হতে পারে না। কিন্তু চুন প্রয়োগের পর ক্যালসিয়াম নাইট্রেট তৈরী হয় যার দ্রবনীয়তা অধিকতর। একারনেই এটি জীবাণু দ্বারা বিশ্লেতি হয় এবং গ্রহণযোগ্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

(c) পটাসিয়াম : গাছের তিনটি অপরিহার্য খাদ্যের মধ্যে পটাসিয়াম অন্যতম। পটাসিয়ামের ঘাটতি ঘটলে গাছ খর্বাকৃতি হয়ে পড়ে এবং গাছের কোষের পরিপুষ্টি না হওয়ায় গাছের বৃদ্ধি ঘটে না। মাটি থেকে উদ্ভিদ পটাসিয়াম গ্রহণ করার পর তা সরাসরি বৃদ্ধিকালীন অংশে অর্থাৎ কোশে পৌঁছায়। পটাস গাছের বিভিন্ন শিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উহার মধ্যেই সঞ্চিত হয়। এর অভাবে গাছের পুরোনো পাতাগুলির কিনারা প্রথমে হলুদ ও পরে বাদামী রঙরে হয়ে পড়ে। দুই নালীর মধ্যবর্তী অংশে প্রথমে হলুদ ও পরে বাদামী রং এর ছোপ সৃষ্টি হয়। এর ফলেই গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং এর

প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়। এতে শস্য উৎপাদন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। পটাসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন প্রকার শস্য বিশেষত ভুট্টা, তুলা প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সাধারণত যে সমস্ত শস্য প্রোটিনের তুলনায় বেশী কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করে সেগুলির পটাসিয়ামের চাহিদা অনেক বেশী হয়। এজন্য মাটিতে এর যোগান বেশী হলে ঐ সমস্ত শস্যগুলি ভালো করে জন্মাতে পারে। আবার যে সমস্ত শস্য দীর্ঘসময় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় সেগুলির তুলনায় দ্রুত বর্ধনশীল শস্যসমূহ পটাসিয়ামের বৃদ্ধিতে দ্রুত সাড়া দেয়।

মাটিতে পটাসিয়াম সরবরাহ বেশী থাকার জন্য সার হিসেবে এর ব্যবহার সীমিত ছিল, কিন্তু পটাসিয়াম-সার প্রয়োগ করে ক্রমাগত শস্য উৎপাদন করার ফলে পটাসিয়াম অভাব ঘটতে থাকে। এজন্য এখন প্রায় সর্বক্ষেত্রে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের ন্যায় পটাসিয়ামও অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

গাছের গ্রহণযোগ্যতাকে ভিত্তি করে মাটিতে পটাসিয়ামকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা (ক) অপ্রাপ্য (খ) দ্রুত গ্রহণযোগ্য এবং (গ) ধীরে গ্রহণযোগ্য। মাটিতে পটাসিয়ামের প্রয়োজন মেটাবার ক্ষমতা নির্ভর করে (i) পটাসিয়াম যুক্ত খনিজের প্রকৃতি ও পরিমাণ (ii) খনিজ থেকে পটাসিয়ামের মুক্তির হার এবং (iii) কাদাকণার প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর।

(i) **পটাসিয়াম যুক্ত খনিজের প্রকৃতি ও পরিমাণ :** মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন খনিজে শতকরা 1–3 ভাগ পটাসিয়াম থাকে। এক হেক্টর জমিতে 3–100 কেজি পটাসিয়াম থাকে। এর মাত্র 2% কাদাকণা জৈব পদার্থও জলীয় দ্রবণে পাওয়া যায়। কাদাকণার বিনিময় যোগ্য পটাসিয়াম গাছের পক্ষে সহজে গ্রহণযোগ্য হলেও পটাসিয়ামযুক্ত খনিজগুলি এর ভান্ডার হিসাবে কাজ করে। মাটির বিভিন্ন খনিজের মধ্যে যেগুলিতে পটাসিয়াম যুক্তভাবে থাকে সেগুলির মধ্যে প্রধান হল মাসকোভাইট, মাইকা, বায়োটাইট মাইকা এবং অর্থোক্লেজ ফেলসপার।

(ii) **খনিজ থেকে পটাসিয়াম মুক্তির হার :** সূক্ষ্ম খনিজ কণা কার্বন-ডাই-অক্সাইড যুক্ত অম্ল-জলের সংস্পর্শে হাইড্রোজেন আয়নের বিনিময়ে পটাসিয়াম আয়ন মুক্ত হয়। ফেলসপারের আর্দ্র বিশ্লেষণের (hydrolysis) ফলেও পটাসিয়াম মুক্ত হয়। শীত প্রধান দেশে আর্দ্রবিশ্লেষণ শ্লথ বলে পটাসিয়ামের মুক্তি ব্যাহত হয়। মাইকা শ্রেণীর খনিজের রাসায়নিক বিশ্লেষণের সময় দুটি কেলাসের অন্তবর্তী স্তরে পটাসিয়াম আয়ন জলীয় দ্রবনে H^+ এবং H_3O^+ আয়নের দ্বারা বিনিময়ের ফলে বাইরে বেরিয়ে থাকে।

(iii) **কাদা কণার প্রকৃতি ও পরিমাণ :** পটাসিয়াম কাদা কণার দ্বারা আবন্ধ হতে দেখা যায়। পটাসিয়াম আয়ন দুটি কাদাকণার জালক (lattice) কে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকতে পারে। ইলাইট ও ভার্মিকুলাইটে একইভাবে পটাসিয়াম আবব্ধ থাকতে পারে। এই আবব্ধীকরণ পদ্ধতিতে পটাসিয়াম সহজে মাটি থেকে

অপসারিত হতে পারে না অথচ গাছের পক্ষে ধীরে গ্রহণযোগ্য হয়। কাদাকণার সাথে পটাসিয়ামের এরূপ আবদ্ধীকরণ মাটির P^H এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(B) মাটির গভীরতা : মাটির উর্বরতা এর গভীরতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। মৃত্তিকা গভীর হলে গাছের শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় (উলম্ব ও অনুভূমিক উভয় দিকে), এর ফলে মাটি থেকে উদ্ভিদ বেশী করে পুষ্টি মৌল গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এজন্য অধিক গভীরতা যুক্ত মৃত্তিকার উর্বরতা স্বল্প গভীর মৃত্তিকা থেকে বেশী হয়। প্লবন সমভূমির মাটি অধিক গভীর হওয়ায় ইহার উৎপাদিকা তথা উর্বরতা শক্তি সর্বাপেক্ষা বেশী হতে দেখা যায়। অধিক ঢালযুক্ত পাহাড়ের ঢালে গায়ে গভীরতা কম হওয়ায় এর উর্বরতাও কম হয়।

(C) মৃত্তিকার গ্রথন : ভৌত গুণাগুণের মধ্যে মৃত্তিকার গ্রথন এর উর্বরতা শক্তিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সূক্ষ্ম ও মাঝারি গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকার উর্বরতা স্থূল গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকার তুলনায় বহুগুণ বেশী হয়। মৃত্তিকার অন্যান্য ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ যথা—মাটির বায়ু, রন্ধ্র, আর্দ্রতা, আয়ন বিনিময় ক্ষমতা প্রভৃতি নির্ভর করে এর খনিজকণা যথা বালি কাদা ও পলির পারস্পারিক পরিমাণ অর্থাৎ গ্রথনের উপর। সূক্ষ্ম ও মাঝারি গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকার পূর্বোক্ত গুণাগুণ স্থূল গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকার তুলনায় বেশী থাকে কারণ সূক্ষ্ম ও মাঝারি গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকার কাদা কণার পরিমাণ বেশী থাকে। মৃত্তিকার খনিজকণাগুলির মধ্যে এক মাত্র কাদা কণারই বেশী পরিমাণে জলধারণ ক্ষমতা, আয়নবিনিময় ক্ষমতা, রন্ধ্র প্রভৃতি বেশী থাকে। কাদা কণা বেশী থাকলে মৃত্তিকা গঠনও সৃষ্টি হয়। এর ফলে কর্দম মৃত্তিকার রন্ধ্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বলে জলের প্রবেশ্যতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি বাতাসের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। বালুকাকণায় এ সমস্ত গুণগুলি না থাকায় বালুকা প্রাধান্যযুক্ত স্থূল গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর হয়।

(D) মৃত্তিকার গঠন : মৃত্তিকার কঠিন খনিজ কণা ও জৈব কণিকাগুলি পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন আকৃতি ও আয়তনের পিন্ড বা গঠন সৃষ্টি হলে মাটির অন্যান্য ভৌত গুণাগুণ প্রভাবিত হয় বলে এটি উর্বরতার নিয়ন্ত্রক হিসাবে বিবেচিত হয়। মাটিতে গঠন সৃষ্টি হলে বিভিন্ন আয়তনের (ক্ষুদ্র বা ক্যাপিলারি এবং বৃহৎ বা ননক্যাপিলারি) রন্ধ্রের সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্র রন্ধ্রগুলি মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। চারনোজেম মৃত্তিকার দানাকৃতি বা ক্রাম্ব গঠন বৈশিষ্ট্য এর বেশী পরিমাণে জলধারণ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। বৃহৎ রন্ধ্রগুলি জলের দ্বারা পূর্ণ না থাকায় এটি বায়ুর দ্বারা পূর্ণ হয় বলে সুগঠনযুক্ত মৃত্তিকার বায়ু গঠনহীন মৃত্তিকার তুলনায় বেশী হয়। উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি মৌলগুলির মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন বায়ু ও জল থেকে গৃহীত হয়। এজন্য মাটিতে বেশী পরিমাণে বায়ুর উপস্থিত থাকা প্রয়োজন হয়। বৃহৎ রন্ধ্রগুলি আর একদিকে জলের প্রবেশ্যতাকে বৃদ্ধি করে। এর ফলে মাটি অধিক গভীরতা পর্যন্ত সরস হয়ে উঠতে পারে। মাটিতে জলের প্রবেশ্যতা বৃদ্ধি পায় বলে মাটিতে জল জমে

বাতাসের ঘাটতি ঘটে না। দোঁয়াশ এবং কাদা মাটি ও জৈবপদার্থ সমৃদ্ধ মাটি সুঠনযুক্ত হওয়ায় এদের জলধারণ ক্ষমতাই শুধু বেশী হয় না মাটিতে বায়ুর পরিমাণও বেশ হয়। এর ফলে ঐ মৃত্তিকাগুলির উর্বরতা গঠনহীন বালিকণার প্রাধান্যযুক্ত মৃত্তিকার তুলনায় অনেকগুণ বেশী হয়।

(E) মৃত্তিকা রন্ধ্র : মৃত্তিকা রন্ধ্রের পরিমাণের উপরও উর্বরতা শক্তি নির্ভর করে। বিশেষত মৃত্তিকা রন্ধ্রে আয়তনিক পার্থক্য এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বৃহৎ রন্ধ্রযুক্ত মৃত্তিকার মধ্যে জল সহজেই প্রবেশ করতে পারে বলে এরূপ মাটির জলধারণক্ষমতা কম হয়, কিন্তু বায়ুর পরিমাণ বেশী হয়। বালিমাটির রন্ধ্রগুলি বৃহৎ আয়তনের হওয়ায় এর মধ্য দিয়ে বৃষ্টি ও সেচের জল সহজে নীচে নেমে যায় বলে মাটিতে প্রয়োজনীয় জলের অভাব ঘটে। কিন্তু সুগঠনযুক্ত কাদা ও দোঁয়াশ মাটির গঠন—এককগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুইই হওয়ায় এদের জলধারণ ক্ষমতা ও জলের প্রবেশ্যতা যেমন বেশী হয় তেমনি তুলনায় দোঁয়াশ ও কাদা মাটি বেশী উর্বর বলে বিবেচিত হয়। চারনোজেম মৃত্তিকা সর্বাপেক্ষা সুগঠনযুক্ত হওয়ায় এর উর্বরতা সর্বাপেক্ষা বেশী।

(F) মৃত্তিকার উষ্ণতা : মৃত্তিকা তথা বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা উদ্ভিদের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন প্রক্রিয়া সচল রাখার জন্য প্রয়োজন হয় ন্যূনতম উষ্ণতা। মৃত্তিকার উষ্ণতা এর কম হলে তার উৎপাদিকা শক্তি তথা উর্বরতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। অনুকূল ভৌত ও রাসায়নিক গুণ বিশিষ্ট মৃত্তিকার উষ্ণতা কাম্য অবস্থায় না থাকলে মৃত্তিকার উর্বরতা কম হয়। মৃত্তিকার উষ্ণতা যদি সারাবৎসর উদ্ভিদ জন্মাবার অনুকূল হয় তাহলে উর্বরতা বেশী হবে। উষ্ণ অঞ্চলের তুলনায় অধিকতর শীতল জলবায়ু অঞ্চলের মাটির উর্বরতা কম হয়।

(G) মাটির বায়ু : যেহেতু উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় পুষ্টি মৌলের মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বায়ু ও জল থেকে গ্রহণ করে সেইহেতু বেশী বায়ুযুক্ত মৃত্তিকা স্বল্প বায়ুযুক্ত মৃত্তিকার তুলনায় উর্বর হয়। জলাভুমিতে বায়ুর অভাবঘটে বলে উদ্ভিদের সেরূপ পুষ্টি হয় না। এজন্য জলাভূমি অনুর্বর রূপে বিবেচিত হয়। অনুকূল ভৌত—রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মৃত্তিকায় যদি সারাবৎসর বা অধিকাংশ সময় জল জমে থাকে তাহলে বায়ুর অভাবঘটিত কারণে ঐ মাটি শস্যোৎপাদন বা অন্যান্য উদ্ভিদ জন্মাবার পক্ষে অনুকূলরূপে বিবেচিত হয় না। অর্থাৎ ঐ মাটির উর্বরতা কম হয়।

(H) মৃত্তিকার আর্দ্রতা : গাছের বৃদ্ধির জন্য জল একটি অপরিহার্য উপাদান। উদ্ভিদ পুষ্টির জন্য মাটি থেকে খাদ্য মৌল সংগ্রহ করে। পুষ্টি মৌলের তরল অবস্থা ব্যতীত উদ্ভিদের পক্ষে ঐ সমস্ত পুষ্টি মৌল গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং মাটিতে জল না থাকলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্ভব হয় না, এমন কী প্রাণ বিপন্ন হয়। উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য মাটিতে পরিমিত জলের যোগান অব্যাহত থাকা আবশ্যক।

এজন্য যে সমস্ত মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশী সেগুলির উর্বরতাও বেশী হয়। বিপরীত ক্রমে যে সমস্ত মাটির জলধারণ ক্ষমতা কম তাহাদের উর্বরতা শক্তিও কম হয়। মাটির আর্দ্রতা উদ্ভিদের কাম্য আর্দ্রতার তুলনায় বেশী হলেও মাটির উর্বরতা হ্রাস পেতে পারে। কারণ মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জলের সাথে পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে বায়ুর উপস্থিতিও থাকা দরকার। এ সমস্ত কারণে দোঁয়াশ মাটি কাদামাটির তুলনায় অধিকতর উর্বর হয়। কাদামাটির বেশী আর্দ্রতার জন্য মাটিতে বায়ুর ঘাটতি হয় কারন বৃহৎ রন্ধ্রের অভাবে অতিরিক্ত জল মাটির মধ্যে প্রবেশ করতে না পারায় এর পৃষ্ঠস্তরে জল জমে যায়। বালিমাটিতে আদৌ জল থাকে না বলে এটি সর্বাপেক্ষা অনুর্বর।

(I) মৃত্তিকার P^H : P^H এর উপর মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া নির্ভর করে। মাটির P^H 9 হলে মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া নিরপেক্ষ হয়। অপরদিকে P^H 9 এর বেশী হলে তার বিক্রিয়া ক্ষারকীয় এবং 9 এর কম হলে বিক্রিয়া হয় আম্লিক। মাটির P^H এর উপর নির্ভর করে উদ্ভিদের পুষ্টি—মৌলের দ্রবনীয়তা তথা গ্রহণযোগ্যতার উপর। মাটির P^H 9 এর কাছাকাছি হলেই বেশীর ভাগ পুষ্টি—মৌল দ্রবীভূত হয় বলে উদ্ভিদও তা গ্রহণ করতে পারে। এজন্য ঐরূপ মাটিতে উদ্ভিদের পুষ্টি মৌলের ঘাটতি ঘটে না বলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সন্তোষজনক হয়। সুতরাং নিরপেক্ষ রাসায়নিক বিক্রিয়াযুক্ত মাটির উর্বরতা ক্ষারকীয় ও আম্লিক মৃত্তিকার তুলনায় বেশী হয়। মাটির P^H 9 এর কম বা বেশী হলে উদ্ভিদ-পুষ্টি-মৌলগুলি জলে দ্রবীভূত না হওয়ায় উদ্ভিদের খাদ্যের ঘাটতি ঘটে। সুতরাং উদ্ভিদ-পুষ্টি-মৌল মাটিতে থাকা সত্ত্বেও ঐগুলি উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে না বলে উদ্ভিদের পুষ্টির ঘাটতি ঘটে। এজন্য ঐ প্রকার মাটির উর্বরতা কম হয়।

(J) মৃত্তিকার আয়ন বিনিময় ক্ষমতা : যে সমস্ত মৃত্তিকার ধনাত্মক আয়ন বিনিময় ক্ষমতা বেশী সেই মৃত্তিকার উর্বরতা বেশী হয়। বিপরীত ক্রমে কম আয়ন বিনিময় ক্ষমতাযুক্ত মৃত্তিকার উর্বরতা তুলনামূলকভাবে কম। উদ্ভিদের বেশীর ভাগ পুষ্টি-মৌলগুলি ধনাত্মক আধান যুক্ত হওয়ায় (ক্লোরিন, বোরণ, মলিবডেনাম ব্যতীত) ঐগুলি ধনাত্মক আয়ন বিনিময়ের মাধ্যমে সংস্থাপিত হয় এবং গ্রহণযোগ্য অবস্থায় অবস্থান করে। মাটিতে উদ্ভিদ পুষ্টিমৌল প্রয়োগ করলে মাটির কলয়েড কণার (কাদা ও জৈব কণা) ক্যাট আয়ন ও প্রযুক্ত ক্যাটায়নের (পুষ্টি মৌলের) মধ্যে বিনিময় হয় অর্থাৎ কলয়েডকণা থেকে ক্যাটায়ন অপসারিত হয় এবং পুষ্টিমৌল ঋণাত্মক আধানযুক্ত কলয়েড কণার দ্বারা গৃহীত হয়। সুতরাং যে সমস্ত মৃত্তিকার আয়ন বিনিময় ক্ষমতা বেশী সেই সমস্ত মৃত্তিকা তত উর্বর। কাদা মাটি দোঁয়াশ মাটি এবং হিউমাস সমৃদ্ধ মাটির কলয়েড কণা (জৈব ও কাদা কণা) ঋণাত্মক আধান যুক্ত হওয়ায় ইহাদের ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা বেশী হয়। কিন্তু বালুকা কণা ঋণাত্মক আধানযুক্ত না হওয়ায় ইহার ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা একেবারেই নেই। এই জন্য বালিমাটি সর্বাপেক্ষা অনুর্বর।

(K) জৈব পদার্থ বা হিউমাস : মাটির উর্বরতা শক্তির সর্বাপেক্ষা ভ্রমণ নিয়ন্ত্রক হল জৈবপদার্থ। জৈবপদার্থ বিভিন্ন ভাবে মৃত্তিকার অন্যান্য ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে। মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতা হিউমাসের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। হিউমাসকণা কাদার ন্যায় কলয়েডধর্মী হওয়ায় তার জলধারণ ক্ষমতা কাদা কণার ন্যায় বেশী। হিউমাস সমৃদ্ধ মৃত্তিকায় এজন্য যোগান কাম্য অবস্থায় থাকে যাহা উদ্ভিদ বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। হিউমাস মৃত্তিকা গঠন সৃষ্টি করতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। হিউমাস সমৃদ্ধ মাটি সুগঠন যুক্ত হওয়ায় এর মধ্যে জলের প্রবেশ্যতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি বৃহৎ রন্ধ্রে বায়ুর পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে হিউমাস-সমৃদ্ধ মাটিতে অক্সিজেন, কার্বন ও হাইড্রোজেনের অভাব থাকে না। তাছাড়া মাটিতে উদ্ভিদ-পুষ্টি-মৌলের যোগান নির্ভর করে হিউমাসের পরিমাণের উপর। হিউমাসই মাটির পুষ্টি-মৌলের মজুত ভাণ্ডার রূপে বিবেচিত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ বিয়োজিত হয়ে হিউমাস গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন পুষ্টিমৌল উৎপন্ন হয় ও মাটিতে সংযুক্ত হয়। উদ্ভিদ পুষ্টিমৌলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল জীব জগৎ। মাটির প্রধান পুষ্টিমৌলের যথা নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল হিউমাস। সুতরাং হিউমাস সমৃদ্ধ মাটির উর্বরতা সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। এজন্য হিউমাস সমৃদ্ধ চারনোজেম মাটির উর্বরতা সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু স্বল্প হিউমাস বিশিষ্ট পডজল বা ল্যাটেরাইট মৃত্তিকায় উর্বরতা অনেক কম।

4.4 সারাংশ :

ভৌত বৈশিষ্ট্যের ন্যায় মৃত্তিকার কয়েকটি রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। ভৌত বৈশিষ্ট্যের ন্যায় রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলিও মাটির উর্বরতা তথা উৎপাদিকা শক্তিকে প্রভাবিত করে। মৃত্তিকার প্রধান রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য হল রাসায়নিক বিক্রিয়া, ক্যাটায়ন বিনিময়, উদ্ভিদ-পুষ্টি-মৌল এবং জৈবপদার্থ।

(a) মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া : মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া বলতে তার দ্রবনের অম্লত্ব বা ক্ষারত্বকে বোঝায়। তাছাড়া মৃত্তিকা বিক্রিয়া নিরপেক্ষও হতে পারে। মাটির দ্রবনে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ বেশী হলে এর বিক্রিয়া হয় অম্ল। ইহার বিপরীত হলে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় ক্ষারকীয়। যখন উভয় আয়ন সমপরিমাণ হয় তখন বিক্রিয়া হয় নিরপেক্ষ প্রকৃতির।

যে পরিমাপকের সাহায্যে মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রকৃতি নির্ধারিত হয় তাকে P^H বলে। P^H বলতে কোন দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্বের নেগেটিভ লগারিদম (P^H is the negative logarthim of hydrogen ion concentration), অন্যভাবে বলতে গেলে P^H হল হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্বের অন্যোন্যকের (Reciprocal) লগারিদম।

$$\left[H^+\right] = 10^{-P^H}$$

$$Log[H^+]^{=-P^H \log 10}$$

$$P^H = -\frac{Log\left[H^+\right]}{Log10}$$

$$\therefore P^H = -Log\left[H^+\right] \quad (since \log 10 = 1)$$

মৃত্তিকার P^H বিভিন্ন নিয়ন্ত্রকের দ্বারা প্রভাবিত হয় যথা জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ ভূপ্রকৃতি সার প্রয়োগ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি। আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলের মৃত্তিকার থেকে ক্ষারকগুলি ধৌত প্রক্রিয়ায় অধিক মাত্রায় অপসারিত হয় বলে মাটির P^H কম হয় অর্থাৎ এর রাসায়নিক বিক্রিয়া অম্লপ্রকৃতির হয়। শুষ্ক অঞ্চলের মাটির P^H তুলনামুলকভাবে বেশী হয়। অরণ্য অঞ্চলের মাটির P^H তৃণভূমি অঞ্চলের তুলনায় কম হয়। ভূমির উচ্চঢালে উপত্যকার তুলনায় P^H বেশী হয়। মাটিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের জোগান বেশী হলেও মাটির P^H হ্রাস পায়।

$$Or \quad P^H = Log\frac{1}{\left[H^+\right]}$$

মাটির P^H বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। মাটির উর্বরতাশক্তি অনেকাংশ P^H এর উপর নির্ভরশীল উদ্ভিদের বিভিন্ন পুষ্টি মৌল গ্রহণ বা তাদের প্রাপ্যতা P^H এর উপর নির্ভরশীল। গাছ মাটি থেকে দ্রবনের মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করে। মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন পুষ্টি-মৌলের দ্রবনীয়তা নির্ভর করে P^H এর উপর। মাটির P^H 6.5 থেকে 7.5 এর মধ্যে থাকলে উদ্ভিদের বিভিন্ন পুষ্টিমৌল দ্রবীভূত হয় এবং গাছ সহজেই তা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এজন্য অধিক P^H যুক্ত মাটি যেমন অনুর্বর তেমনি কম P^H যুক্ত মাটিও সমানভাবে অনুর্বর। নিরপেক্ষ বিক্রিয়ায় মৃত্তিকার জীবাণুগুলি সর্বাপেক্ষা বেশী ক্রিয়াশীল হয়। এরূপ অবস্থায় মাটিতে জৈব পদার্থের জোগান বৃদ্ধি পায়।

কয়েকটি অম্ল মূলকের উপস্থিতিতে মাটিতে অতিশয় অম্ল পদার্থ বা ক্ষারক যুক্ত করলেও P^H এর পরিবর্তন প্রতিহত বা উপরোধিক হয়। এই অবস্থাকে বাফারিং বা উপরোধন (Buffering) বলে।

(b) জৈব পদার্থ : মাটির জৈব পদার্থ বলতে জীবিত ও মৃত উভয় প্রকার জৈব উপাদানকে বোঝায়। জীবিত জৈব উপাদান বলতে বৃহৎ জীব যথা উদ্ভিদের মূল, পতঙ্গ, কেঁচো প্রভৃতি এবং জীবাণু যথা ব্যাকটিরিয়া ফাঙ্গি প্রভৃতিকে বোঝায়। মৃত জৈব উপাদানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় যথা (i) মাটিতে সদ্য সংযুক্ত গাছের পাতা ও অন্যান্য অংশ (ii) প্রায় বিয়োজিত বা পচে যাওয়া জৈবাং শ এবং সম্পূর্ণ

বিয়োজিত কাল রঙের জৈবাংশ যা হিউমাসরূপে পরিচিত। জৈব পদার্থের প্রধান উৎস হল উদ্ভিদের দেহাবশেষ ও প্রাণীর দেহাবশেষ। এর মলমূত্র গৌণ উৎসরূপে বিবেচিত হয়। জৈব পদার্থের সমগ্র অংশের শতকরা 75 ভাগ জল এবং বাকী অংশ কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি উপাদান এবং অন্যান্য উপাদান দ্বারা গঠিত। ইহার রাসায়নিক গঠন খুবই জটিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহজাতীয় পদার্থ। সুগার, স্টার্চ, সেলুলোজ এবং হেমিসেলুলোজ কার্বোহাইড্রেটের অন্তর্গত। স্নেহজাতীয় পদার্থ বিভিন্নপ্রকার অ্যাসিড যথা বিউটিরিক, স্টীয়ারিক প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। প্রোটিনের মূল উপাদান হল হাইড্রোজেন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস প্রভৃতি।

সাধারণত মাটির জৈব পদার্থ বলতে হিউমাসকেই বোঝায়। হিউমাস কাদা খনিজের ন্যায় কলয়েডধর্মী। হিউমাস কলয়েড কাদাকণিকার ন্যায় কোন নির্দিষ্ট কেলাস গঠন করে না এটি পাউডার বা ধূলার ন্যায়। হিউমাস কলয়েডের পৃষ্ঠতল কর্দম কণার তুলনায় বেশী হয়।

মাটিতে সংযুক্ত জৈব দেহাংশ জটিল জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিয়োজিত হয়ে হিউমাসের সৃষ্টি হয়। হিউমাস সৃষ্টির পদ্ধতিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় যথা (ক) জারণ বা খনিজকরণ প্রক্রিয়া (Oxidative decomposition or Mineralisation) এবং (খ) হিউমিফিকেশান প্রক্রিয়া। জৈবাংশের শর্করা শ্বেতসার এবং প্রোটিন ও সেলুলোজ প্রভৃতি উপাদানগুলি জীবাণুর দ্বারা জারিত হয়ে জল, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং শক্তির উৎপাদনকে জারন প্রক্রিয়া বলে। হিউমিফিকেশান প্রক্রিয়ায় জৈবাংশ পরিবর্তিত বা বিয়োজিত হয়ে একটি স্থায়ী অপরিবর্তনীয় ধূলার ন্যায় কালো রঙের পদার্থ সৃষ্টি হয় যাকে বলে হিউমাস। হিউমিফিকেশান প্রক্রিয়া অ্যামোনিফিকেশান ও নাইট্রিফিশান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। বিভিন্ন পরিবেশে সংঘটিত হিউমিফিকেশান প্রক্রিয়া প্রধানত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা (i) অবায়বীর হিউমিফিকেশান, (ii) উপআর্দ্র অঞ্চলের হিউমিফিকেশন এবং (iii) ক্রান্তীয় আর্দ্র অঞ্চলের হিউমিফিকেশান।

হিউমাসের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয় জলবায়ু স্বাভাবিক উদ্ভিদ, মানুষের ক্রিয়াকলাপ, প্রভৃতি উপাদানের দ্বারা। উপআর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে হিউমাসের পরিমাণ সর্বাধিক হয়। অন্যদিকে নাতিশীতোষ্ণ ও ক্রান্তীয় আর্দ্র অঞ্চলের মাটিতে হিউমাসের পরিমাণ কম হয়। তৃণভূমি অঞ্চলের মাটিতে অরণ্য অঞ্চলের তুলনায় হিউমাসের পরিমাণ অধিক হয়। শুষ্ক মরু অঞ্চলে স্বাভাবিক উদ্ভিদের স্বল্পতার জন্য হিউমাসের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম হয়। কৃষিকার্যের ফলে মাটিতে হিউমাসের পরিমাণ হ্রাস পায়। জৈবসার প্রয়োগে হিউমাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। নিম্ন জলাভূমিতে হিউমাসের পরিমাণ বহুগুণ বেশী থাকে।

বিভিন্ন দিক থেকে হিউমাস মৃত্তিকার একটি অন্যতম উপাদান। মাটির উর্বরতা হিউমাসের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। হিউমাস সমৃদ্ধ মাটিতে উদ্ভিদ পুষ্টি মৌলের জোগান সর্বাপেক্ষা বেশী থাকে। এরূপ মাটির জলধারণ ক্ষমতা ও আয়ন বিনিময় ক্ষমতাও বেশী হয়। জৈব পদার্থ মৃত্তিকা গঠন সৃষ্টিরও

সহায়ক হয়। এজন্য মাটিতে জলের প্রবেশ্যতা যেমন বৃদ্ধি পায় সেরূপ মাটিতে বায়ুর পরিমাণও বেশী হয়। জীবাণুর কর্মক্ষমতাও হিউমাস সমৃদ্ধ মাটিতে বেশী হয়।

(c) মৃত্তিকার উর্বরতা : মৃত্তিকার উর্বরতাশক্তি এর একটি বিশেষ গুণ যার উপর মৃত্তিকা তথা উদ্ভিদের উৎপাদিকা শক্তি সর্বাপেক্ষা বেশী নির্ভরশীল। মৃত্তিকা উর্বর না হলে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। মৃত্তিকার উর্বরতা বলতে এর একটি সহজাত গুণকে বোঝায় যা মৃত্তিকার অন্যান্য ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণের সমষ্টিগত ফল। এই অর্থে এটি মৃত্তিকার এমন একটি সহজাত গুণ যা মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। উৎপাদিকা শক্তি নির্ভর করে মৃত্তিকার কয়েকটি গুণাগুণের উপর যথা (i) পুষ্টিমৌল, (ii) মাটির গভীরতা, (iii) মৃত্তিকার গ্রথন, (iv) মৃত্তিকার গঠন, (v) রন্ধ্র, (vi) উষ্ণতা, (vii) মাটির বায়ু, (viii) আর্দ্রতা, (ix) P^H , (x) আয়ন বিনিময় ক্ষমতা, (xi) জৈব পদার্থ।

(1) মৃত্তিকার উদ্ভিদ পুষ্টি মৌল : উদ্ভিদ পুষ্টির জন্য মাটি থেকে বিভিন্ন খাদ্য মৌল মাধ্যমে গ্রহণ করে। মাটিতে উদ্ভিদের ঐ সমস্ত পুষ্টি মৌলের পর্যাপ্ত পরিমাণে উপস্থিতির উপরেই উদ্ভিদের স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি নির্ভর করে। মাটিতে সর্বমোট 17টি পুষ্টি-মৌল থাকে। এদের মধ্যে 6টি প্রধান পুষ্টিমৌল রূপে বিবেচিত হয়। এগুলি হল নাইট্রোজেন (N), ফরফরাস (P), পটাসিয়াম (K), ক্যালসিয়াম (Ca), সালফার (S) এবং ম্যাগনেসিয়াম (Mg)। এদের মধ্যে N, P, K প্রথম শ্রেণীর পুষ্টি মৌল কারণ এগুলি উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য বেশী মাত্রায় প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে Ca, Mg, ও S দ্বিতীয় শ্রেণীর পুষ্টি-মৌল। মাটির গৌণ খাদ্যমৌল হল লৌহ (Fe), ম্যাঙ্গানীজ (Mn), তামা (Cu), জিঙ্ক (Zn), ব্রোমিন (Br), মলিবডেনাম (Mo) এবং কোবাল্ট।

(i) **নাইট্রোজেন :** উদ্ভিদের অন্যতম প্রধান পুষ্টিমৌল হল নাইট্রোজেন। উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টিতে নাইট্রোজেন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অ্যামিনো-অ্যাসিড, নিউক্লিক অ্যাসিড ও বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক প্রভৃতি জৈব উপাদানগুলির মধ্যে নাইট্রোজেন অবস্থান করে। নাইট্রোজেনই এই সমস্ত উপাদান গঠন করে। উদ্ভিদ দেহে নূতন কোষ গঠনে নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয়। নাইট্রোজেনের অভাবে গাছের প্রজনন প্রক্রিয়া ও বৃদ্ধি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। এর অভাবে গাছ খর্বাকৃতি হয়ে পড়ে। এর অভাবে গাছের ক্লোরোফিলের ঘাটতি দেখা যায় বলে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেট উৎপাদনও কমে যায়। ফলে এর বৃদ্ধি হ্রাস পায়। অতিরিক্ত নাইট্রোজেনের প্রভাবে গাছের পাতা ও অন্যান্য অংশ ঘন সবুজ হয় এবং এদের বেশী বৃদ্ধি হয় বলে উদ্ভিদের প্রজনন প্রক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকাস্থিত নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস হল বায়ুমন্ডল ও জীব মন্ডল। নাইট্রোজেন স্থিতীকরণ বিভিন্ন জীবাণু বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেন মাটিতে আবদ্ধ করে। তাছাড়া অন্যভাবেও বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেন মাটিতে

আবদ্ধ হয়। প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহাংশ বিয়োজিত হয়ে নাইট্রেটে পরিণত হয়। এটিই নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস।

(ii) **ফসফরাস :** উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে ফসফরাসও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এর DNA উল্লেখযোগ্য উপাদান হল ফসফরাস। উদ্ভিদের প্রজননেও ইহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ADP ও ATP-রই উল্লেখযোগ্য উপাদান হল 'ফসফরাস'—সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায়, শস্যের পরিপূর্ণ বিকাশে, গাছের ফুল, ফল ও বীজ সৃষ্টিতে, গাছের শিকড় বৃদ্ধিতে ও কান্ডকে শক্ত করতে ফসফরাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(iii) **পটাসিয়াম :** পটাসিয়ামের অভাবে গাছ খর্বাকৃতি হয়ে পড়ে এবং কোষের পরিপুষ্টি না হওয়ায় গাছের বৃদ্ধি ঘটে না। এর অভাবে গাছের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়। পটাসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন প্রকার শস্য বিশেষত ভূট্টা, তুলা প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং সালফার দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান খাদ্য-মৌল। এগুলি N, P এবং K র তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়। উপরিউক্ত খাদ্য মৌল ছাড়া উদ্ভিদের আরও কয়েকটি গৌণ খাদ্য মৌল প্রয়োজন হয়। এগুলিকে অণু খাদ্য মৌল (Micro nutrient) বলে। এগুলি হল আয়রণ (Fe), ম্যাঙ্গানীজ (Mn), কপার (Cu), জিঙ্ক (Zn), বোরণ (Bo), মলিবডেনাম (Mo), ক্লোরিন (Cl), কার্বন (C), অক্সিজেন (O), হাইড্রোজেন (H)। এদের মধ্যে উদ্ভিদ কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন বায়ুমন্ডল ও জল থেকে সংগ্রহ করে। অণুখাদ্য মৌলগুলি প্রধান খাদ্যমৌলের (Macro nutrient) তুলনায় বহুগুণ কম লাগে—

(2) **মাটির গভীরতা :** মাটি গভীর হলে উদ্ভিদের শিকড় বহুদূর বিস্তৃত হয় বলে গাছ অনেক নীচ থেকে পুষ্টি মৌল গ্রহণ করতে পারে। ফলে গাছ বেশী করে পুষ্টি মৌল সংগ্রহ করতে পারে। এজন্য অধিক গভীর মাটি অপেক্ষা স্বল্প গভীর উর্বরতা কম হয়।

(3) **মৃত্তিকার গ্রথন :** সূক্ষ্ম ও মাঝারি গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকা স্থূল গ্রথনযুক্ত মৃত্তিকা অপেক্ষা অধিক উর্বর হয়। কারণ এরূপ মাটির জলধারণ ক্ষমতা, আয়ন বিনিময় ক্ষমতা অনেক বেশী হয় এবং মাটি সচ্ছিদ্রযুক্ত হয়।

(4) **মৃত্তিকার গঠন :** মৃত্তিকা সুগঠনযুক্ত হলে নানা আয়তনের মৃত্তিকা—রন্ধ্র সৃষ্টি হয় বলে মাটির জলধারণ ক্ষমতা জলের প্রবেশ্যতা ও বায়ুর উপস্থিতি গঠনহীন মাটির তুলনায় বেশী হয়। এর ফলে ঐরূপ মাটির উর্বরতা শক্তি বেশী হয়।

(5) **মৃত্তিকা রন্ধ্র :** মাটিতে রন্ধ্র বেশী পরিমাণে থাকলে মাটিতে বায়ু চলাচল ও জলের প্রবেশ্যতা দুইই বৃদ্ধি পায় বলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

(6) **মৃত্তিকার উষ্ণতা :** মৃত্তিকার উষ্ণতা উদ্ভিদ জন্মাবার ও বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল হলে তার উর্বরতা বেশী হয়।

(7) **মাটির বায়ু :** মাটিতে বায়ু বেশী থাকলে উদ্ভিদ বেশী করে মাটির গ্যাসীয় উপাদান গ্রহণ করতে পারে। ফলে তার সুস্থ বৃদ্ধি সম্ভব হয়। অধিক বায়ুযুক্ত মৃত্তিকা এজন্য অধিক উর্বর।

(8) **মৃত্তিকার আর্দ্রতা :** গাছের বৃদ্ধির জন্য জল একটি অপরিহার্য উপাদান। মাটির আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে বা কাম্য অবস্থায় থাকলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক মাটি সম্পূর্ণরূপে অনুর্বর।

(9) **মৃত্তিকার P^H :** নিরপেক্ষ বা প্রায়-নিরপেক্ষ রাসায়নিক বিক্রিয়াযুক্ত মৃত্তিকা সর্বাপেক্ষা বেশী উর্বর হয়। ক্ষারকীয় ও অম্লীয় মাটি অধিক অনুর্বর।

(10) **আয়ন বিনিময় ক্ষমতা :** অধিক আয়ন-বিনিময় ক্ষমতাযুক্ত মৃত্তিকায় উর্বরতা অপেক্ষাকৃত বেশী। কিন্তু আয়ন-বিনিময় ক্ষমতাহীন মৃত্তিকার উর্বরতা কম।

(11) **জৈব পদার্থ :** উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ বিয়োজিত হয়ে হিউমাস গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন পুষ্টি মৌল সৃষ্ট হয় বলে হিউমাস এদের মজুত ভান্ডার রূপে পরিগণিত হয়। হিউমাস সমৃদ মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশী হয়। তাছাড়া আয়নবিনিময় ক্ষমতাও এরূপ মাটির বেশী হয়। হিউমাস মৃত্তিকা গঠন সৃষ্টির মাধ্যমে মৃত্তিকা-রন্ধ্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করে বলে জলের প্রবেশ্যতা ও বায়ুর পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এজন্য হিউমাস সমৃদ্ধ মাটি বেশী উর্বর হয়

4.5 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

A. (সমস্ত প্রশ্নের মান 10)

1. P^H বলতে কি বোঝায় তার ব্যাখ্যা করুন। মাটির উপর P^H এর প্রভাব কী?

2. হিউমাস সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন। মৃত্তিকার উর্বরতা নির্ধারনে হিউমাসের ভূমিকা কী?

3. মাটিতে জৈব পদার্থের কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে? মাটিতে হিউমাসের প্রভাব উল্লেখ করুন।

4. মাটির উর্বরতা শক্তি বলতে কী বোঝায়? কিভাবে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রকের দ্বারা মাটির উর্বরতা শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়?

B. (সমস্ত প্রশ্নের মান 4)

5. মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?
6. মাটির P^H বলতে কী বোঝায়?
7. মাটির P^H এর নিয়ন্ত্রকগুলি উল্লেখ করুন।
8. মাটির ভৌত ধর্মের ও জীবাণুর উপর P^H এর প্রভাব উল্লেখ করুন।
9. মৃত্তিকার বাফারিং বা উপরোধন বলতে কী বোঝায়?
10. জৈব পদার্থ বলতে কী বোঝায়?
11. ‘ P^H 8 এর তুলনায় P^H 2 অধিক অম্লত্ব নির্দেশ করে’ উক্তিটির ব্যাখ্যা করুন।
12. হিউমাসের প্রকৃতি কীরূপ?
13. হিউমিফিকেশান প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?
14. অম্লধর্মী হিউমিফিকেশনের মধ্যে পার্থক্য কী?
15. স্বাভাবিক উদ্ভিদ কীভাবে হিউমাসের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে?
16. মাটিতে হিউমাসের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।
17. মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি পুষ্টি মৌলের দ্বারা কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?
18. মৃত্তিকার উর্বরতা নির্ধারণে ভৌত গুণাগুণের গুরুত্ব উল্লেখ করুন।
19. মৃত্তিকার P^H এবং আয়ন বিনিময় ক্ষমতা কিভাবে মৃত্তিকার উর্বরতাকে নিয়ন্ত্রণ করে?

C. (প্রত্যেক প্রশ্নের মান 2)

20. P^H এর সংজ্ঞা কী? P^H মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?
21. বাফারিং বা উপরোধন বলতে কী বোঝায়?
22. জীবাণুর উপর P^H এর প্রভাব কী?
23. হিউমাস বলতে কী বোঝায়?
24. হিউমাস কীভাবে পুষ্টি মৌলকে প্রভাবিত করে?
25. উর্বরতার সংজ্ঞা কী?
26. প্রধান ও অনুপুষ্টি মৌল বলতে কী বোঝায়?
27. উদ্ভিদের উপর অনুপুষ্টি মৌলের প্রভাব কী?

4.6 উত্তরমালা

A. 1. 4.3.1 এর (i) এবং (iv) 2. 4.3.2 (iv) 3. 4.3.2 এর (v) এবং (vi) 4. 4.3.3

B. 5. 4.3.1 6. 4.3.1 এর (i) 7. 4.3.1 এর (iii) 8. 4.3.1 এর (iv) অংশের খ ও গ 9. 4.3.1 এর (vi) 10. 4.3.2 এর (i) 11. 4.3.1 এর (i) 12. 4.3.2 এর (iii) 13. 4.3.2 এর (iv) অংশের 2 14.4.3.2 এর (iv) অংশের 2 এর খ ও গ 15. 4.3.2 এর (v) 4.3.2 এর (vi) 17. 4.3.3 এর (i) 18. 4.3.3 এর 2, 3, 4, 5, 6, 7, ও 8 19. 4.3.3 এর 9 ও 10.

C. 20. 4.3.1 এর (i) 21. 4.3.1 22. 4.3.1 এর (vi) 23. 4.3.1 এর (iv) অংশের 24. 4.3.2 এর (i) অংশের (গ) 25. 4.3.2 এর (vi) অংশের (ক) 26. 4.3.3 এর (i) 27. 4.3.3 এর (ii) অংশের (i) 28. 4.3.3 এর (ii) অংশের (1)

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক ৫ ❑ মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ

গঠন

5.1 প্রস্তাবনা

5.2 উদ্দেশ্য

5.3 মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগের সংজ্ঞা

মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ধারণা

মৃত্তিকার উৎপত্তিগত শ্রেণীবিভাগ

5.3.1 ডকুচ্যায়েভ কর্তৃক মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ

5.3.2 মারকট কর্তৃক মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ

5.3.3 ইউ.এস.ডি.এ শ্রেণীবিভাগ (সপ্তম এ্যাপ্রক্সিমেশান)

5.3.4 ভারতের মাটির শ্রেণীবিভাগ

5.3.5 ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর মাটির বিবরণ

5.4 সারাংশ

5.5 প্রশ্নাবলি

5.6 উত্তরমালা

5.1 প্রস্তাবনা

পূর্বের একক গুলিতে মৃত্তিকার সামগ্রিক পরিচিতি অর্থাৎ এর বিভিন্ন প্রকার ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য, গঠন প্রক্রিয়া ও তার নিয়ন্ত্রক প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সাধারণভাবে মৃত্তিকার সংশ্লিষ্ট উক্ত বিষয়গুলি আলোচিত হলেও এক একটি মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য সেরূপভাবে আলোচিত হয় নি। এরূপ আলোচনার জন্য প্রয়োজন এক একটি মৃত্তিকার গুণগত বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ। পৃথিবী-পৃষ্ঠে শত সহস্র মৃত্তিকার প্রকার ভেদ দেখা যায়। এক একটি অঞ্চলে পাশাপাশি অবস্থিত মৃত্তিকা হুবহু একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নয়। কিন্তু নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মৃত্তিকাগুলির মধ্যে স্বল্পবিস্তর পার্থক্য থাকলেও মূলগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মিল লক্ষ করা যায়। এবং এর উপর ভিত্তি করেই এক একটি মৃত্তিকাকে চিহ্নিত করা যায় এবং উহার নির্দিষ্ট নামকরণ হয়ে থাকে। এক একটি মৃত্তিকাকে এরূপ চিহ্নিত করা ও অন্য থেকে পৃথক করাকেই মাটির শ্রেণীকরণ বলে।

5.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বিশদ ধারণা করতে পারবেন।

- শ্রেণী বিভাগের প্রাসঙ্গিক বিবর্তন সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- ডকুচ্যায়েভ, মারবাট ও ইউ.এস.ডি.এ-র উৎপত্তিগত শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ভারতের মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন এবং প্রধান মৃত্তিকাগুলির বিবরণ দিতে পারবেন।

5.3 মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগের সংজ্ঞা

কোন কিছুর শ্রেণীবিভাগ বলতে, তার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিশৃঙ্খল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনকেই বোঝায়। একটি বিষয়ের সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু একই প্রকার বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এর ফলে বিষয়টির বিভিন্ন শ্রেণী সংশ্লিষ্ট সম বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ মৃত্তিকার রাসায়নিক ধর্ম জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রভাবে বিভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু এক একটি জলবায়ু অঞ্চলের মাটিতে একই প্রকারের রাসায়নিক বিক্রিয়া তথা P^{u} পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং একই রাসায়নিক শ্রেণী মৃত্তিকাগুলিকে একই শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করা সহজ হয়ে পড়ে। আর্দ্র অরণ্য অঞ্চলে মাটি অম্ল প্রকৃতির হয়। আবার ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য ও সরলবর্গীয় অরণ্য অঞ্চলে বৃক্ষের প্রকৃতি ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায় ক্রান্তীয় আর্দ্র অঞ্চলের মাটি সরলবর্গীয় বনভূমি অঞ্চলের মাটির ন্যায় সেরূপ অম্ল প্রকৃতির হয় না। উপ আর্দ্র নাতিশীতোষ্ম অঞ্চলের মাটির বিক্রিয়া নিরপেক্ষ বা স্বল্প ক্ষারধর্মী হয়। মরু অঞ্চলের মাটি অধিক ক্ষারকীয় হয়। এরূপ ভাবে মাটির বর্ণ সম্পর্কেও বিভিন্নতা দেখা যায় এবং একইভাবে সৃষ্ট মৃত্তিকার রঙও একই রকমের হয়। মৃত্তিকার প্রোফাইল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে বৈচিত্র্য দেখা যায়। কিন্তু একই জলবায়ু অঞ্চলের মাটির একই প্রকার প্রোফাইল বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। প্রোফাইল গঠনের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াগুলির প্রভাবে মাটির ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য দেখা যায়। কিন্তু একই জলবায়ু অঞ্চলের মৃত্তিকায় ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য একই ধরনের হয়ে থাকে। সুতরাং মৃত্তিকার বিশৃঙ্খল বৈশিষ্ট্যগুলির সমসত্ততা স্থাপনকেই মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ রূপে আখ্যা দেওয়া যায়।

অন্য কোন বিষয়ের ন্যায় মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ বিভিন্নদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এইরূপ শ্রেণীবিন্যাসের ফলে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর মৃত্তিকার বিভিন্ন তথ্য ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য গঠন প্রক্রিয়া

প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় এবং তারই ভিত্তিতে কোন একটি অঞ্চলের মৃত্তিকাকে সঠিকভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়।

দ্বিতীয়ত, এরূপ শ্রেণীবিভাগের ফলে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর মৃত্তিকার গুণাগুণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে বলে তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারও সম্ভব হয়। ভূমির ব্যবহার মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যের উপর সামগ্রিক ভাবে নির্ভরশীল। উর্বর মৃত্তিকা শস্য উৎপাদনেই ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে অনুর্বর স্বল্প গভীর কাঁকুরে বা প্রস্তরময় মৃত্তিকা পশুচারণে ব্যবহৃত হয় অথবা অরণ্যের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত বৈশিষ্ট্য তথা উৎপত্তির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে সংশ্লিষ্ট মৃত্তিকার কোন সমস্যাকে সমাধান করা সম্ভব হয়। উদারণস্বরূপ পডজল মৃত্তিকা অতিরিক্ত অম্লপ্রকৃতির বলে এটি কৃষি কার্যের আদৌ উপযুক্ত নয়। কিন্তু এরূপ মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে চুন প্রয়োগ করলে তা কৃষি কার্যের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। অনুরূপভাবে কৃষিজ জমি সার প্রয়োগের জন্য অম্লপ্রকৃতির হয়ে পড়লে চুন প্রয়োগে তাকে সংশোধন করা সম্ভব হয়। কৃষি জমি ক্ষারকীয় বা লবণাক্ত হয়ে পড়লে নিকাশী ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে বা জিপসাম প্রয়োগের দ্বারা মাটির সংশোধন সম্ভব হয়।

মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ধারণা :

সুদূর অতীতে মাটির ব্যবহারের শুরু থেকে মাটির শ্রেণীবিভাগ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত মাটির শ্রেণীবিভাগ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে মূলত তিনটি ধারনার উপর নির্ভর করে মাটির শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। প্রথম ধারণা অনুসারে মাটিকে এমন একটি পদার্থ রূপে গণ্য করা হয় যার উপর গাছপালা ও ফসল জন্মায়। এই ধারণার উপর নির্ভর করে সেই শ্রেণীবিভাগ করা হয় যা প্রধাণত জমির উৎপাদিকা শক্তিরই প্রতিফলন। দ্বিতীয় ধারনায় মাটিকে মনে করা হয় কেবল মাত্র বিশ্লেষিত ও ক্ষয়িত শিলার উপরিভাগ হিসাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত এই ধারণার উপর নির্ভর করে মাটির শ্রেণীবিভাগ চলতে থাকে। কিন্তু ভূ-বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণার অবসান হয়। তৃতীয় ধারণায় মাটিকে একটি প্রাকৃতিক পদার্থ অর্থাৎ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে সৃষ্ট পদার্থ রূপে মনে করা হয়। রাশিয়ার প্রখ্যাত মৃত্তিকা-বিজ্ঞানী ভি. ভি. ডকুচ্যায়েভ প্রথম এই ধারণা ব্যক্ত করেন। তিনি ও তাঁর সহযোগীরা লক্ষ করেন উদ্ভিদের প্রকৃতি, আবহাওয়া মাটির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা সুস্থিত সম্পর্ক আছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আর এক বিখ্যাত মৃত্তিকা-বিজ্ঞানী সি. এফ, মারবাট সম্ভবত সর্বপ্রথম তৃতীয় ধারণার উপর ভিত্তি করে মাটির শ্রেণীবিভাগ করেন। তাঁর প্রথম শ্রেণী বিভাগ ১৯২৭ এ প্রকাশিত হয়। মারবাটের ধারণার উপর ভিত্তিকরে আমেরিকার কৃষি বিভাগের বিজ্ঞানীরা ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মাটির বিস্তারিত শ্রেণীবিভাগ করেন এবং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আরও উন্নতরূপে প্রকাশিত করেন। মাটির এই শ্রেণীবিভাগ মূলত সৃষ্টি ভিত্তিক অর্থাৎ প্রধানত

কী কী সম্ভাব্য বিক্রিয়ার প্রভাবে বিভিন্ন মাটির সৃষ্টি হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। এজন্য এ প্রকার মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগকে উৎপত্তিগত শ্রেণীবিভাগ (Genetic classification) বলে।

মৃত্তিকার উৎপত্তিগত শ্রেণীবিভাগ :

মৃত্তিকার বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীবন্ধকরণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল উৎপত্তিগত শ্রেণীবিভাগ। সাধারণত মৃত্তিকার উদ্ভবের সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলি হল আবহবিকার ও প্রোফাইল গঠন। মৃত্তিকা গঠনের এই দুই প্রক্রিয়া একই সঙ্গে চলতে থাকে এবং এর ফলে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়। নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভব জল, বায়ু, জীবজগৎ,মূলশিলাখন্ড, ভূ-প্রকৃতি ও সময় প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল জলবায়ু। স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং ভূপ্রকৃতি। এগুলির মধ্যে জলবায়ুর প্রভাব সর্বাধিক। জলবায়ু ভেদেই উদ্ভিদেরও বৈচিত্র্য দেখা যায়। এর ফলে জলবায়ু ভেদে পরিলেখ গঠনের অন্যতম দুই প্রক্রিয়া যথা এ্যলুভিয়েশান ও ইল্যুভিয়েশান ভিন্ন প্রকৃতির হয় এবং ইহার প্রভাবে বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট প্রোফাইল বা পরিলেখ বৈশিষ্ট্য যুক্ত বিভিন্ন মৃত্তিকা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট প্রোফাইল বা পরিলেখ বৈশিষ্ট্য যুক্ত বিভিন্ন মৃত্তিকা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে যে মৃত্তিকা সৃষ্ট হয় তাকে আঞ্চলিক মৃত্তিকা বলে। এই প্রকার মৃত্তিকার কোন স্থানান্তর না হওয়ায় একই জলবায়ু অঞ্চলে নির্দিষ্ট প্রকৃতির মৃত্তিকার উদ্ভব হয় এবং তাদের নির্দিষ্ট নামে অভিহিত করা হয়। আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলে ল্যাটারাইজেশান প্রক্রিয়ায় ল্যাটেরাইট, আর্দ্র নাতিশীতোষ্ম জলবায়ু অঞ্চলে পডজলাইজেশানের ফলে পডজল মৃত্তিকা এবং নাতিশীতোষ্ম উপআর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে ক্যালসিফিকেশান প্রক্রিয়ার ফলে চারনোজেম মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। উপরিউক্ত প্রক্রিয়াগুলির প্রভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর মৃত্তিকা ছড়াও প্রায় একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভিন্ন শ্রেণীর মৃত্তিকার উদ্ভব হয়।

নির্দিষ্ট জলবায়ু অঞ্চলে মৃত্তিকা গঠনে জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রভাব ব্যতীত মৃত্তিকার অন্যান্য নিয়ন্ত্রক যথা ভূপ্রকৃতির প্রত্যক্ষ আঞ্চলিক মৃত্তিকা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক শ্রেণীর মৃত্তিকার উদ্ভব হয়। এই প্রকার মৃত্তিকাকে অন্তরাঞ্চলিক মৃত্তিকা বলে। ক্রান্তীয় বা নাতিশীতোষ্ম আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলের নিম্ন জলাভূমিতে গ্লেইজেশান (Gleization) প্রক্রিয়ার প্রভাবে হিউমাস সমৃদ্ধ পীট বা বগ মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। শুষ্ক মরুপ্রায় জলবায়ুতে প্লায়া, হ্রদে অথবা অবনত ভূমিতে স্যালিনাইজেশান বা এ্যালকালিজেশান্ প্রক্রিয়ায় যথাক্রমে লবণাক্ত ও ক্ষারকীয় মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়।

উক্ত দুইপ্রকার মৃত্তিকা ছাড়াও আর এক প্রকার মৃত্তিকার উদ্ভব হয় যা স্থানান্তরিত মূল শিলাখন্ড থেকে সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রকার ক্ষয়কারী মাধ্যম যথা নদী, হিমবাহ, বায়ু, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভৃতির প্রভাবে

মূলশিলাখন্ড বা মৃত্তিকা ক্ষয়ের মাধ্যমে অপসারিত হয়ে অন্য একটি স্থানে সঞ্চিত হয়। সঞ্চিত ঐ মূলশিলাখন্ড থেকে ভিন্ন প্রকৃতির মৃত্তিকা উদ্ভব হয়। যেহেতু এ সমস্ত মৃত্তিকা সদ্য সঞ্চিত হয়েছে সেইহেতু সময়াভাবে এর নির্দিষ্ট পরিলেখ বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে না। এ প্রকার মৃত্তিকাকে অনাঞ্চলিক মৃত্তিকা বলে। পলিমৃত্তিকা লোয়েস মৃত্তিকা প্রভৃতি এই প্রকার মৃত্তিকার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

মৃত্তিকা সৃষ্টির উপরিউক্ত তিনটি প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্তিকার আদর্শ শ্রেণীবিভাগ সম্ভব। উৎপত্তি অনুসারে মৃত্তিকার এরূপ শ্রেণীবিভাগকে উৎপত্তিগত শ্রেণীবিভাগ বলে। বিভিন্ন মৃত্তিকা বিজ্ঞানী যথা ডক্যুচায়েভ, মারবাট, গিঙ্কা, সিবার্টজেভ, ভিলেনেস্কী প্রভৃতি মৃত্তিকার এরূপ শ্রেণীবিভাগ করেছেন। ব্যক্তিবিশেষ ছাড়াও কোন কোন সংস্থা এইরূপ শ্রেণীবিভাগে অগ্রণী হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি সংস্থাও (U.S.D.A) মাটির এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

5.3.1 ডকুচ্যায়েভ কর্তৃক মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ : (Classification by V.V Dakuchayev)

মৃত্তিকা বিজ্ঞানের জনক ভি. ভি. ডকুচ্যায়েভ 1979 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মৃত্তিকার বিজ্ঞানসম্মত ও গ্রহণযোগ্য শ্রেণীবিভাগ প্রবর্তন করেন। ভি. ভি. ডকুচ্যায়েভ ও তাঁর অনুগামীরা মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে মৃত্তিকা স্তরায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। যেহেতু মৃত্তিকার স্তরায়নের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল সেহেতু মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ করতে ঐ সমস্ত বিষয়গুলির দিকেও তাঁদের দৃষ্টিপাত করতে হয়। সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার বিন্যাস প্রকৃতি নিরীক্ষণ করে তিনি ও তাঁর অনুগামীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মৃত্তিকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই স্থানের উদ্ভিদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিক উদ্ভিদের তুলনায় জলবায়ুর সঙ্গে মৃত্তিকার যে নিবিড় সম্পর্ক আছে সেদিকেও তাদের দৃষ্টি আরো বেশী করে নিবন্ধ হয়। সুতরাং তিনি মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ করতে জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন সেই অনুসারে মৃত্তিকার নিম্নরূপ শ্রেণী বিভাগ করেন

A শ্রেণী : স্বাভাবিক মৃত্তিকা (Normal) অথবা আঞ্চলিক মৃত্তিকা

অঞ্চল	(i) বোরিয়াল (Boreal)	(ii) তৈগা (Taiga)	(iii) বনভূমিযুক্ত স্টেপ অঞ্চল (Farest stippe)	(iv) স্টেপ (steppe)
মৃত্তিকার প্রকৃতি	তুন্দ্রা, গাঢ় বাদামী রঙের মৃত্তিকা	হাল্কা ধূসর বর্ণের পডসল মৃত্তিকা	ধূসর এবং গাঢ় ধূসর বর্ণের মৃত্তিকা	চারনোজেম

অঞ্চল	(v) শুষ্ক স্টেপ (Desert Steppe)	(vi) মরু অঞ্চল (Desert)	(vii) উপক্রান্তীয় এবং ক্রান্তীয় বনভূমি অঞ্চল (Tropical Forest)
মৃত্তিকার প্রকৃতি	চেস্টনাট এবং বাদামী মৃত্তিকা	শুষ্ক মৃত্তিকা হলুদ ও সাদা বর্ণের মৃত্তিকা	ল্যাটেরাইট অথবা লালবর্ণের মৃত্তিকা

B. **শ্রেণী :** পরিবর্তনসূচক মৃত্তিকা (Transitional soil)

অঞ্চল	(viii) শুষ্ক ভূমি (Dry land)	(ix) কার্বোনেট সংশ্লিষ্ট মৃত্তিকা (carbonats containing soil)	(x) মাধ্যমিক মৃত্তিকা/ দ্বিতীয় পর্যায়ে মৃত্তিকা (Secondary soil)
মৃত্তিকার প্রকৃতি	মুর মৃত্তিকা (Moor soil) মুর মেডো মৃত্তিকা (Moor meadow soil)	রেঞ্জিনা (Rendzina)	অনুষঙ্গী ক্ষার মৃত্তিকা (Secondary alkaline soil)

C. **শ্রেণী :**— অস্বাভাবিক মৃত্তিকা (Abnormal soil)

মৃত্তিকার প্রকৃতি	(xi) মুর মৃত্তিকা (Moor soil)	(xii) পলি মৃত্তিকা (Alluvial soil)	(xii) বাতাসের সঞ্চয় কার্যের ফলে সৃষ্ট মৃত্তিকা (Aeolian soil)

D. **শ্রেণী :**— অতি অস্বাভাবিক মৃত্তিকা (Extranormal soil)

ডকুচ্যায়েভ কর্তৃক প্রবর্তিত মৃত্তিকার উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগ সেই সমস্ত দেশ বা মহাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলির ভূ-প্রকৃতি মৃদু ঢাল যুক্ত এবং উঁচুনীচু। তাঁর শ্রেণীবিভাগ পার্বত্য অঞ্চলের মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো অতি প্রাচীন ভূ-খন্ডেও মৃত্তিকার এরূপ শ্রেণীবিভাগ কার্যকরী নয়। মৃত্তিকার এরূপ শ্রেণীবিভাগ কেবলমাত্র নাতিশীতোষ্ণ শীতল জলবায়ু অধ্যুষিত সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের ক্ষেত্রে বেশী করে প্রযোজ্য।

পশ্চিম ইউরোপ ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের মৃত্তিকার সুষ্ঠু শ্রেণীবিভাগ ডকুচ্যায়েভ কর্তৃক প্রবর্তিত মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ দ্বারা মোটেই সম্ভব নয়। এই সমস্ত অসুবিধা থাকা সত্বেও সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের মৃত্তিকার সুষ্ঠু শ্রেণীবিভাগ ডকুচ্যায়েভ কর্তৃক মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ অনুসারে করা সম্ভব হয়েছে। এই শ্রেণীবিভাগে মৃত্তিকার উপর মানুষের প্রভাবের উপর ভিত্তি করে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

5.3.2 মারবাটের শ্রেণীবিভাগ (Classification by Marbut)

আমেরিকার প্রখ্যাত মৃত্তিকা বিজ্ঞানী সি.এফ মারবাট 1927 সালে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা বিজ্ঞান কংগ্রেসে মৃত্তিকা শ্রেণীবিভাগের একটি আধুনিক মতবাদ উপস্থাপন করেন। মারবাট তাঁর মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে নিম্নলিখিত পর্যায়গুলির (stage) উল্লেখ করেন।

প্রথম পর্যায় : মারবাট প্রাথমিক ভাবে মৃত্তিকাকে আর এক প্রখ্যাত মৃত্তিকা বিজ্ঞানী হিল গার্ডের শ্রেণী বিভাগের ন্যায় দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করেন যথা - পেডোক্যাল (Pedocal) এবং পেডালফার (Pedalfer)। হিলগার্ডের শ্রেণীভুক্ত মরুঅঞ্চলের মৃত্তিকার ন্যায় পেডোক্যাল মৃত্তিকায় ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সঞ্চয়যুক্ত একটি স্তর লক্ষ করা যায়। অপরদিকে হিলগার্ড প্রবর্তিত আর্দ্র অঞ্চলের মৃত্তিকার ন্যায় পেডালফার মৃত্তিকার স্তরায়নে এরূপ কোন ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সঞ্চয় স্তর দেখা যায় না। এর পরিবর্তে এরূপ মৃত্তিকার উপরিভাগে সেসকুই অক্সাইডের সঞ্চয় দেখা যায়।

দ্বিতীয় পর্যায় : মারবাট এই পর্যায়ে পেডালফার ও পেডোক্যাল শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন মৃত্তিকাকে কতকগুলি উপভাগে ভাগ করেছেন। পেডোক্যাল মৃত্তিকাকে প্রধানত দুটি ভাগে করা হয়, যথা — (ক) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পেডোক্যাল মৃত্তিকা এবং (খ) ক্রান্তীয় অঞ্চলের পেডোক্যাল মৃত্তিকা। অনুরূপভাবে পেডালফার মৃত্তিকাকেও দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,যথা — (ক) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পডসল জাতীয় মৃত্তিকা এবং (খ) ক্রান্তীয় অঞ্চলের ল্যাটেরাইট জাতীয় মৃত্তিকা। স্বভাবতই দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রেণীভুক্ত মৃত্তিকাকে উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে বিভক্ত করা হয়।

তৃতীয় পর্যায় : এই পর্যায়ে মারবাট দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত মৃত্তিকাকে আরও কয়েকটি উপভাগে বিভক্ত করেন। এই পর্যায়ে পেডালফার শ্রেণীভুক্ত পডসল ও ল্যাটেরাইট জাতীয় মৃত্তিকাকে আরও কয়েকটি উপভাগে বিভক্ত করা হয়। এই শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন মৃত্তিকা গুলি হল — (ক) তুন্দ্রা, (খ) পডসল, (গ) বনাঞ্চলে সৃষ্ট বাদামী রঙের মৃত্তিকা (Brown forest soil), (ঘ) লোহিত বর্ণের মৃত্তিকা (Red soil), (ঙ) পীতবর্ণের মৃত্তিকা (Yellow soil), (চ) প্রেইরী মৃত্তিকা, (ছ) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা এবং (জ) ফেরাগনিয়াস ল্যাটেরাইট। অনুরূপ ভাবে পেডোক্যাল মৃত্তিকাকে কয়েকটি উপভাগে বিভক্ত করা যায় যথা — (১) উত্তর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পেডোক্যাল মৃত্তিকা, (২) মধ্য অক্ষাংশীয় পেডোক্যাল মৃত্তিকা,

(৩) দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পেডোক্যাল মৃত্তিকা, (৪) ক্রান্তীয় অঞ্চলে পেডোক্যাল মৃত্তিকা।

চতুর্থ পর্যায় : এই পর্যায়ে তৃতীয় পর্যায়ের শ্রেণীবিভক্ত কোন কোন মৃত্তিকাকে বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে কয়েকটি উপভাগে ভাগ করা হয়। এই শ্রেণী বিভাগ অনুসারে মধ্য অক্ষাংশের পেডোক্যাল মৃত্তিকাকে বৃষ্টিপাতের হ্রাস অনুসারে চারটে ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা — (ক) চারনোজেম, (খ) চেস্ট্নাট মৃত্তিকা, (গ) বাদামী রঙের মৃত্তিকা, (ঘ) ধূসর বর্ণের মৃত্তিকা। সেই সময় উপযুক্ত তথ্যের অভাবে (বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত) উষ্ম ও শীতল অঞ্চলের পেডোক্যাল মৃত্তিকাকে ভাগ করা সম্ভব হয় নি। বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে পেডালফার মৃত্তিকাকেও অনুরূপভাগে বিভক্ত করা যায়।

পঞ্চম পর্যায় : এই পর্যায়ে উপযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত মৃত্তিকাগুলিকে তাদের স্তরায়ন গঠনের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হয়।

ষষ্ঠ পর্যায় : এই পর্যায়ে উপযুক্ত বিভিন্ন মৃত্তিকাকে মূল শিলাখন্ডের (Parent Material) তারতম্য অনুসারে কয়েকটি উপভাগে বিভক্ত করা যায়।

5.3.3 ইউ. এস. ডি. এ'র শ্রেণীবিভাগ

(U.S.D.A Classification) : মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগের সর্বাধুনিক মতবাদ হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি সংস্থা (United States Department of Agriculture) কর্তৃক প্রবর্তিত 7th approximation, যা 1960 সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা বিজ্ঞান কংগ্রেসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানীরা উপস্থাপন করেন। দুইটি বিশেষ কারণে এই শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি কেবলমাত্র একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নয়, সেই সঙ্গে গ্রহণযোগ্য বলেও বিবেচিত হয়েছে। প্রথমত যে বৈশিষ্ঠ্যগুলির উপর ভিত্তি করে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে তা সহজেই পরিমাপযোগ্য। ফলে ঐ সমাস্থ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাপের মাধ্যমে মৃত্তিকার শ্রেণী নির্ধারণে নি:সন্দেহ হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন শ্রেণীর মাটির যে নাম ব্যবহার করা হয় তা মূল গ্রীক শব্দ থেকে নেওয়া এবং মাটির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যাদির প্রকাশসূচক। এই শ্রেণী বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য হল একই প্রক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভূত বিভিন্ন মৃত্তিকাকে এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা। এটি অধিকতর সুবিধাজনক কারণঁ এই শ্রেণীবিভাগে :—

(i) মাটি সৃষ্টির বিক্রিয়াগুলির পরিবর্তে মাটিকে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়।

(ii) মাটির বৈশিষ্ট্যগুলি মুখ্য বলে বিবেচিত হয়।

(iii) মাটি ঠিক কী বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট হয়েছে তা জানা না থাকলেও বৈশিষ্ট্যগুলির পরিমানের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ সম্ভব।

(iv) শ্রেণীবিভাগটি ব্যক্তি নিরপেক্ষ। সুতরাং বিভিন্ন দেশের মৃত্তিকা বিজ্ঞানীদের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে মতভেদের সম্ভাবনা কম।

মাটির যেসব বৈশিষ্ট্য শ্রেণীবিভাগের নির্দেশক হিসাবে ধরা হয় তার সবকটিকেই খুব সাধারণ দু একটি সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব। মাটির প্রায় সবকটি ভৌতিক, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যই মাটির শ্রেণী বিভাগের নির্দেশক রূপে ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে মাত্র বিশেষ কয়েকটি মাটির কোন বিশেষ স্তরে বিদ্যমান আছে অথবা নেই তার উপর ভিত্তি করেই মাটির শ্রেণীবিভাগ করা হয়। বৈশিষ্ট্যযুক্ত মাটির পৃষ্ঠস্তরকে বলা হয় এপিপেডন (Epipedon)। মাটির পৃষ্ঠ স্তরের উপরে অপেক্ষাকৃত বেশী জৈবপদার্থ থাকার জন্য মাটির রঙ গাঢ় বাদামী হয়। এ্যালুভিয়াল স্তরও এই এই এপিপেডনের অন্তর্গত। এছাড়া B স্তরের কিছু অংশ এপিপেডনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অধ:স্তরের ছয়টি এপিপেডন এখন পর্যন্ত চিহ্নিত হয়েছে। পৃষ্ঠস্তরের এপিপেডনের মধ্যে চারটি বিশেষ গুরুত্বপর্ণ। চারটি পৃষ্ঠস্তরের এপিপেডনের মূল বৈশিষ্ট্য নিচের সারনীতে উল্লেখ করা হল :—

বিশেষ লক্ষণ যুক্ত মাটির পৃষ্ঠ স্তর	**মাটির বৈশিষ্ট্য (পৃষ্টস্তর এপিপেডন)**
মলিক (Mollic)	মাটি যথেষ্ট গভীর, রঙ-গাঢ় বাদামী। ক্ষারীয় আয়ন দ্বারা কলয়েডের আধান প্রশমিত। অধিকাংশ মাটির গঠন অত্যন্ত দৃঢ়।
আমব্রিক (Umbric)	অন্য সব বিষয়েই মলিকের মতো। কেবল কলয়েডের নেগেটিভ আধান খুব অল্প পরিমাণে ক্ষারীয় আয়ন দ্বারা প্রশমিত। মাটি অম্লভাবাপন্ন।
ওকরিক (Ocric)	হাল্কা রঙ। জৈব পদার্থের পরিমান অপেক্ষাকৃত কম, শুষ্ক অবস্থায় মাটির গঠন খুব শক্ত। গঠনগুলি বড় আকারের বৃহৎ দানাযুক্ত।
হিস্টিক (Histic)	জৈব পদার্থের পরিমান খুব বেশী, বছরের অন্তত কিছু সময় জলে নিমজ্জিত থাকে।

অধ:স্তরে মাটির বৈশিষ্ট্য

বিশেষ লক্ষণযুক্ত মাটির অধ:স্তর (B স্তর)	অধ:স্তরের মাটির বৈশিষ্ট্য
আরজিলিক (Argillic)	সঞ্চিত সিলিকেট কাদাকণা
ন্যাট্রিক (Natric)	আরজিলিকের মতোই, কিন্তু বেশী পরিমাণে সোডিয়াম ক্লোরাইডযুক্ত, মৃত্তিকার গঠন স্তম্ভ ও প্রিজমের ন্যায়।
স্পডিক (Spodic)	জৈব পদার্থের এবং আয়রণ ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সঞ্চয় দেখা যায়।
ক্যাম্বিক (Cambic)	ভৌতিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত স্তর
এগ্রিক (Agric)	কর্ষিত স্তরের নীচে সঞ্চিত জৈব পদার্থ ও কাদাকণা।
অক্সিক (Oxic)	প্রধানত আয়রণ ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ও 1:1 শ্রেণীর কাদাকণা মিশ্রণে সৃষ্ট।

মাটির এই শ্রেণী বিভাগ ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত যথা

(a) বর্গ (Order)

(b) উপবর্গ (Sub order)

(c) প্রধান গোষ্ঠী (Great groups)

(d) উপগোষ্ঠী (Sub groups)

(e) পরিবার (Family) এবং

(f) ক্রম (Series)

সাধারণত একই বিক্রিয়ার প্রভাবে সৃষ্ট মাটির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য একই রকম হয়। সব মাটি একই বিক্রিয়ার প্রভাবে সৃষ্ট তারা একই বর্গের অন্তর্গত একই বর্গের মাটিগুলির মধ্যে আবহাওয়া ও গাছপালার প্রভাব, মাটিতে জলের পরিমাণ প্রভৃতির তারতম্য ঘটে। বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাব মূলত নির্ধারণ করে মাটি কোন উপবর্গভুক্ত হবে। কিন্তু লক্ষণসূচক স্তরের সাহায্যে প্রধান গোষ্ঠী নির্ধারক হয়। এক প্রধান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মাটিতে লক্ষণসূচক ছাড়া বিভিন্ন স্তরের ক্রমবিন্যাস একরকম হয়। মাটির যে বৈশিষ্ট্য গাছের বৃদ্ধিকে নির্ধারিত করে, যেমন — গ্রথন, খনিজ পদার্থের পরিমান P^H, তাপ গভীরতা প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে মাটির পরিবার স্থির করা হয়।

মাটির শ্রেণীর নামকরণ :—

এই শ্রেণীবিভাগে মাটির নামকরণ কয়েকটি শব্দাংশের সহযোগে তৈরী হয় এবং প্রতিটি মূল শব্দাংশ গ্রীক অথবা লাতিন শব্দ থেকে গৃহীত। উদাহরণস্বরূপ এরিডিসল (Aridisol) শুষ্ক অঞ্চলের একটি বর্গের নাম। লাতিন ভাষায় অ্যারিডাস শব্দের অর্থ শুষ্ক এবং সোলাম এর অর্থ মাটি। উপবর্গের নামের মধ্যে বর্গের নাম উল্লেখিত থাকে। অ্যাকুওল (Aquoll) একটি উপবর্গের মাটি। এটি মলিসল (Mollisol) বর্গের আর্দ্র পরিবেশের মাটি। কারণ অ্যাকুও /Aquo শব্দের অর্থ জল। একইভাবে যদি প্রধান গোষ্ঠীর নাম হয় আরজিঅ্যাকুওল (Argiaquoll) তখন বুঝতে হবে অ্যাকুওল উপবর্গের মাটিতে এমন একটি স্তর বিদ্যমান যে স্তরে তুলনামূলকভাবে অনেকবেশী পরিমান সিলিকেট কাদাকনা জমা হয়েছে। লাতিন ভাষায় Argila -র অর্থ কাদাকণা। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রেণীভুক্ত মাটির নামের বিশ্লেষিত রূপ হল : বর্গ-মলিসল (Mollisol), ম-অল-ইসল; উপবর্গ - অ্যাকুওল (Aquoll) প্রধান গোষ্ঠী-আরজিঅ্যাকুওল (Argiaquoll), আরজি - অ্যাকু - অল।

উপরিউক্ত নামকরণে বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঐ তিন শ্রেণীর মাটির নামেই তিন অক্ষয়ের শব্দাংশ oll বর্তমান। ত্রটি মলিসল বর্গের নাম বহন করে। এই নামকরণের সূত্র শ্রেণীবিভাগের সর্বস্তরে সমানভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে এই পদ্ধতিতে নামকরণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত। যদি কতগুলি মাটির ক্রমের (Series) গ্রথন, খনিজ উপাদান ও উপরের 50 cm মাটির গভীরে তাপমাত্রা একই হয় তাহলে তাদের একই পরিবারের ভুক্ত মাটি রূপে গন্য হয়। উদাহরণস্বরূপ fine, mixed, mesic পরিবারের মাটির যথাক্রমে সূক্ষ্ম (fine texture) বিভিন্ন শ্রেণীর কাদাকণার মিশ্রণে গঠিত এবং mesic অর্থাৎ মাটির 50.cm গভীরে তাপমাত্রা 8°-15°C ।

মাটির ক্রমের নাম সাধারণত কোন স্থানের নামের সঙ্গে যুক্ত। যেমন বেলডাঙ্গা ক্রম, পুভার ক্রম ইত্যাদি। যখন ক্রম নামের সঙ্গে মাটির উপরের স্তরের গ্রথনের নাম যুক্ত হয় তখন সেই মাটির নামকরণ হয় গ্রথন অনুসারে। যেমন বেলডাঙ্গা দোআঁশ বা পুভার বেলে ইত্যাদি।

মাটির বর্গের শ্রেণীবিভাগ (Order) : পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মাটি মোট দশটি বর্গভুক্ত। এদের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

এন্টিসল (Entisol) : মাটিতে সুনির্দিষ্ট কোন স্তর থাকে না। অথবা সবে স্তর বিন্যাস শুরু হয়েছে। গভীর ও উর্বর পলিমাটি এবং অগভীর সদ্যসৃষ্ট মাটি এই বর্গের অন্তর্গত। নির্দিষ্ট কোন প্রোফাইলের অনুপস্থিতিই এন্টিসল বর্গের মাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভারটিসল (Vertisol) : ল্যাটিন ভাষায় ভারটো শব্দের অর্থ উল্টানো। জল সিক্ত হলে স্ফীত হয় এমন ধরনের কাদাকণা প্রধান মাটি এই বর্গভুক্ত। শুষ্ক অবস্থায় এ প্রকার মাটিতে গভীর ও চওড়া ফাটল দেখা যায়। এরূপ বৈশিষ্ট্যকে মাটির উল্টানো চরিত্র বলা হয়। এই বর্গের মাটির গ্রথন অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ভিজে অবস্থায় মাটি চট্‌চটে এবং নমনীয় হয়। অথচ শুকিয়ে গেলে খুবই শক্ত হয়ে পড়ে।

ইনসেপ্টিসল (Inceptisol) : ল্যাটিন ভাষার ইনসেপ্টাম্ শব্দের অর্থ শুরু। ইনসেপ্টিসল বর্গের মাটি বয়সে তরুন। প্রোফাইলের বিভিন্ন স্তর পরীক্ষা করলে এর বয়সের নবীনতা ধরা পড়ে। এই প্রকার মাটিতে কোন প্রকার সঞ্চয় দেখা যায় না।

এরিডিসল (Aridisol) : ল্যাটিন ভাষায় এরিডস শব্দের অর্থ শুষ্ক। এই বর্ণের মাটি সাধারণত শুষ্ক অঞ্চলে দেখা যায়। এই প্রকার মাটির প্রায় সবকটি স্তর শুষ্ক থাকে। ফলে মাটির কোন পদার্থ ধৌত হয়ে অপসারিত হয় না। এই মাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রোফাইলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সুবিদত স্তর (ক্যালসিক) বা জিপসম স্তর (জিপসিক) দ্রবনীয় লবণ স্তরের স্যালিক স্তর উপস্থিতি।

মলিসল (Molisol) : চাষবাসের দিক থেকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাটি এই মলিসল বর্গের অন্তর্গত মলিক এপিপেডানের উপস্থিতি এই বর্গের মাটির বৈশিষ্ট্য. এপিপেডন মোটামুটি গাঢ় গভীর কৃষ্মাভ ক্যাটায়ন দ্বারা সমৃদ্ধ। এই বর্গের মাটিতে আরজিলিক অ্যালবিক বা ক্যামবিক স্তর দেখা যায় কিন্তু কোনও অক্সিক বা সোডিক স্তর থাকে না। (এ মাটির উপরের স্তরের গঠন দানাকৃতি। শুষ্ক অবস্থায় মাটি খুব শক্ত হয় না এবং মোটামুটি কোমল থাকে। এজন্য এ মাটির নাম মলিসল। ল্যাটিন ভাষায় মলিস শব্দের অর্থ কোমল।

স্পোডোসল (Spodosol) : স্পোডোসল বর্গের মাটিতে স্পোডিক স্তর দেখা যায়। এই স্তরে জৈব পদার্থ আয়রণ ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3) তুলনামূলক ভাবে বেশী সঞ্চিত এবং সাধারণত অ্যালবিক অর্থাৎ মাটির রঙ সাধারণত ছাই রঙের হয়। এই প্রকার মাটির গ্রথন হালকা এবং অম্লধর্মী। আর্দ্র শীত প্রধান সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনাঞ্চলে এই প্রকার মাটির সৃষ্টি হয়। পাইন জাতীয় গাছের পাতায় ধাতবায়নের পরিমান অপেক্ষাকৃত কম থাকে। ফলে পাতা পচে অম্লত্বের সৃষ্টি হয়। অম্লত্ব বেশী হওয়ায়

আয়রণ ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড দ্রবীভুত হয়ে নীচের স্তরে চলে যায় ও B স্তরে জমা হয়. হিউমাসও দ্রবীভূত হয়ে উপরের স্তর থেকে অপসারিত হয় এবং নিচের B স্তরে সঞ্চিত হয়। এরই ফলে উপরের স্তরের মাটির রঙ ছাই এর ন্যায় হাল্কা হয় বলে এই মাটির নাম স্পোডেসল। গ্রীক ভাষায় স্পোডোস এর অর্থ ছাই।

অ্যালফিসল (Alfisol) : এই প্রকার মাটির প্রোফাইলে মলিক অক্সিক বা সোডিক স্তর দেখা যায় না। এই প্রকার মাটিতে ধূসর থেকে বাদামী রঙের পৃষ্ঠ স্তর দেখা যায়। পৃষ্ঠস্তরে ক্ষারীয় মৌল মাঝারি থেকে বেশী মাত্রায় থাকে অধ:স্তরে কাদাকণা সমৃদ্ধ একটি স্তর লক্ষ করা যায়। কাদাকণা জমার জন্য এই স্তরকে আরজিলিক স্তর বলে। কাদাকণা 35% এর বেশী ক্ষারীয় মৌলে সম্পৃক্ত থাকে। কিন্তু যদি কাদাকণার আয়ন বিনিময় ক্ষমতা 15% এর বেশী সোডিয়াম দ্বারা সম্পৃক্ত থাকে তাহলে ঐ স্তরকে নাট্রিক স্তর বলে। এই অবস্থায় অধ:স্তরে জিম বা স্তম্ভের মত গঠন সৃষ্টি হয়। পুরাতন শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতিতে যে মাটিকে গ্রে ব্রাউন পডসল বলা হত তা এই বর্গের অন্তর্ভূক্ত।

অলটিসল (Ultisol) : এই বর্গের মাটির অধ:স্তরে কাদাকণা সঞ্চিত হয়ে আরিজিলিক স্তর গঠিত হয়। কিন্তু কাদাকণার 35% এর কম আয়ন বিনিময় ক্ষমতা ক্ষারীয় ধাতব মৌলের দ্বারা সম্পৃক্ত থাকে। আলটিসল বর্গের মাটি অ্যালিফিসল এর থেকে বেশী কিন্তু স্পোডোসল এর থেকে কম আম্লিক। এই বর্গের প্রায় সব মাটিরই অধ:স্তরের রঙ লাল বা হলদে হয় কারণ আয়রণ অক্সাইড মুক্ত অবস্থায় থাকে। পূর্বের শ্রেণীভুক্ত রেড ইয়েলো পডসল, রেডিস ব্রাউন ল্যাটেরাইটিক মাটি এই বর্গের অন্তর্ভূক্ত। এই মাটি সাধারণত আর্দ্র উষ্ম গ্রীষ্ম মন্ডলীয় অঞ্চলে দেখা যায়।

অক্সিসল (Oxisol) : এই বর্গের মাটির অধ:স্তরে মোটামুটি গভীর অক্সিস্তরের উপস্থিতি দেখা যায়। এই স্তরে সাধারণত খুব বেশী পরিমাণে আয়রণ ও অ্যালুমিমিয়াম হাইড্রক্সাইড কলয়েড আকারে উপস্থিত থাকে এই স্তর থেকে সিলিকা বিশ্লেষিত হয়ে অপসারিত হয়। অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে আয়রণ ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পড়ে থকে। ল্যাটোসল বা ল্যাটেরাইটিক বলতে যেসব মাটিকে বোঝায় তার অধিকাংশ অক্সিসল বর্গের অন্তর্গত।

হিস্টোসল (Histosol) : এই বর্গের মাটি জলে সম্পৃক্ত এবং স্যাঁতস্যাতে পরিবেশে জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ থাকে। এই বর্গের মাটিতে যদি কাদাকণার পরিমাণ কম থাকে তাহলে 10% জৈব পদার্থ থাকে। এই জৈব পদার্থের মধ্যে অপরিবর্তিত অবস্থায় উদ্ভিজ্জ কলা দেখতে পাওয়া যায়। এইজন্য এই বর্গের মাটিকে হিস্টোসল বলে। গ্রীক ভাষায় হিস্টোস শব্দের অর্থ উদ্ভিজ্জ কলা বা কোষ।

উপবর্গ (Suborder) : উপরিউক্ত বিভিন্ন বর্গের মাটি গুলিকে প্রধান বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কয়েকটি

উপবর্গে (Suborder) ভাগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ভারটিসল (Vertisols) অর্থাৎ ফাটলযুক্ত কাদাকণার মাটিকে আর্দ্রতা অনুসারে নিম্নলিখিত কয়েকটি উপবর্গে বিভক্ত করা হয়। যথা —

উডার্ট (Uderts) সাধারণত আর্দ্র

উসটার্ট (Usterts) অল্প সময়ের জন্য শুষ্ক

জেরার্ট (Xererts) বহু সময়ের জন্য শুষ্ক

টোরার্ট (Torrerts) সাধারণত শুষ্ক

প্রধান গোষ্ঠী (Great Group) : উপবর্গের মাটির শ্রেণীগুলিকে পুনরায় বিশেষ লক্ষণ যুক্ত মাটির স্তরের উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রধান গোষ্ঠীতে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। মাটির প্রধান গোষ্ঠীর লক্ষণযুক্ত স্তর বোঝাতে যে শব্দ ব্যবহার করা হয় সেই শব্দের একাংশ উপবর্গের নামের আগে বসিয়ে ঐ প্রধান গোষ্ঠীর নামকরণ করা হয়। যেমন ক্যালস (Calc) শব্দটি ক্যালসিক স্তরের উপস্থিতিকে নির্দেশ করে।

পরিবার (Family) : প্রধান গোষ্ঠীভুক্ত মাটির শ্রেণীগুলিকে গ্রথন, খনিজ বৈশিষ্ঠ্য ও তাপমাত্রা অনুসারে কয়েকটি উপভাগে ভাগ করা হয় উহাদের প্রত্যেকটিকে পরিবার (Families) বলে। মাটির গ্রথনকে সূক্ষ্ম দোঁয়াশ, বেলে প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা হয়। কাদা খনিজকে মন্টমরিলোনাইট, কেওলিওনাইট, সিলিমিয়াস, ইলাইট প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। তেমনি তাপমাত্রার ক্ষেত্রে ফ্রিজিড মেসিক ও থারমিক উপবিভাগ করা হয়।

ক্রম (Series) : মাটির পরিবার বিভিন্ন ক্রমে বিভক্ত। একই ক্রমের অন্তর্গত বিভিন্ন মাটিতে একই ধরনের স্তর ও তাদের ক্রমবিন্যাস দেখা যায়। এই পর্যায়ে শ্রেণী বিভাগের জন্য প্রোফাইল স্তরের সংখ্যা, গভীরতা, গ্রথন গঠন, রঙ জৈবপদার্থের পরিমাণ ও pH এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

5.3.4 ভারতের মাটির শ্রেণীবিভাগ

ভারতের ন্যায় বৈচিত্র্যপূর্ণ উপমহাদেশে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী, খাদ্য পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি সম্পর্কে যেমন বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় তেমনি প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপকরণ যথা জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, ভূ-প্রকৃতি, ভূতাত্বিক গঠন প্রভৃতি সম্পর্কেও অনুরূপ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত উপাদানের প্রভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে মৃত্তিকা উৎপত্তির বিভিন্ন প্রক্রিয়া কার্যকরী হয় এবং এর ফলে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার উদ্ভিদ হয়েছে। বৃষ্টিবহুল ক্রান্তীয় আর্দ্র অঞ্চলে ও সাভানা অঞ্চলে ল্যাটেরাইট জাতীয় আঞ্চলিক মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে ব্যাসল্ট শিলাস্তরের প্রভাবে কৃষ্ম কার্পাস মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়েছে। এটিও এক প্রকার আঞ্চলিক মৃত্তিকা শুষ্ক মরু অঞ্চলের অবনত ভূমিতে

ক্ষারকীয় ও লবণাক্ত মৃত্তিকার প্রাধান্য দেখা যায়। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ পলিগঠিত গাঙ্গেয় সমভূমিতে পলিমৃত্তিকা সৃষ্টি হয়েছে। হিমালয় পর্বতের বিভিন্ন উচ্চতায় মৃত্তিকা সম্পর্কেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। হিমালয়ের অধিক উচ্চতায় নাতিশীতোষ্ম আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাবে ধূসর বা ছাইরঙের পডজল মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতের মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি বিভিন্ন সময়ের পরিবর্তিত হয়েছে। মানব সভ্যতার উষালগ্নে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের মাটিকে শস্য উৎপাদনের উপযোগী কিনা তার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা হত। এই সময়ে মাটিকে প্রধান দুটি বিভাগে ভাগ করা হত যথা উর্বর এবং অনুর্বর। যে সমস্ত মাটি কৃষিকার্যের পক্ষে উপযোগী সেগুলিকে উর্বর মৃত্তিকা রূপে চিহ্নিত হত এবং কৃষিকাজের পক্ষে অনুপযোগী মাটি অনুর্বর রূপে গণ্য হত। উর্বর মৃত্তিকাকে নির্দিষ্ট শস্যচাষের উপযোগিতা অনুসারে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হত—যেমন, ৪ যব, তিল, প্রভৃতি। অনুর্বর মাটিকে উর্বর বা লবণাক্ত জমি এবং মরু মৃত্তিকা এই দুই ভাগে ভাগ করা হত।

ষোড়শ শতাব্দীতে জমির রাজস্ব আদায়ের তাগিদে মাটির শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঐ সময় মৃত্তিকার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য তথা গ্রথন, বর্গ প্রভৃতি এবং ভূমির ঢাল জলের যোগানের উপস্থিতি প্রভৃতির ভিত্তিতে মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ প্রাধান্য পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উর্বরতা অনুসারে মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে Voelcker এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে Leather ভারতের মৃত্তিকাকে প্রধান চারটি বিভাগে বিভক্ত করেন যথা (1) সিন্ধু গাঙ্গেয় পলি মৃত্তিকা, (2) কৃষ্ম কার্পাস মৃত্তিকা, (3) লাল মৃত্তিকা এবং (4) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা কর্তৃক অল ইন্ডিয়া সয়েল এন্ড ল্যান্ড ইউজ সার্ভে কমিটি গঠিত হয়। অল ইন্ডিয়া সয়েল এ্যন্ড ল্যান্ড ইউজ সার্ভে কর্তৃক ভারতের মৃত্তিকা আটটি বিভাগে বিভক্ত হয় যথা (1) পলি মৃত্তিকা, (2) মরু মৃত্তিকা, (3) লবণাক্ত, (4) ক্ষারকীয় মৃত্তিকা, (5) পিট বা জলাভূমির মৃত্তিকা, (6) লাল মৃত্তিকা, (7) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা ও (8) পার্বত্য মাটি।

1963 খ্রীষ্টাব্দে সর্বভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা যে মৃত্তিকা মানচিত্র তৈয়ারী করে তাতে মৃত্তিকার ২৭টি শ্রেণী উল্লিখিত হয়। এগুলি হল (1) পলি মাটি, (2) অতিরিক্ত চুন সমৃদ্ধ পলিমাটি, (3) উপকূলীয় পলিমাটি, (4) বদ্বীপীয় পলিমাটি, (5) লবণাক্ত ও ক্ষারীয় পলিমাটি, (6) মরু মৃত্তিকা, (7) গভীর কৃষ্ম মৃত্তিকা, (8) মাঝারি গভীর কৃষ্ম মৃত্তিকা, (9) অগভীর কৃষ্ম মৃত্তিকা, (10) লবণ ও ক্ষার প্রভাব মুক্ত কৃষ্ম মৃত্তিকা, (11) পৃথকহীন কৃষ্ম মৃত্তিকা, (12) মিশ্রিত লাল ও কৃষ্ম মৃত্তিকা, (13) লাল মৃত্তিকা, (14) গ্রাভেল যুক্ত লাল মাটি, (15) লাল ও হলুদ মাটি, (16) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা, (17) ল্যাটেলাইট জাতীয় মৃত্তিকা, (18) পর্ণমোচী বৃক্ষ সংশ্লিষ্ট বাদামী মাটি, (19) ধূসর ও ও বাদামী মাটি, (20) পার্বত্য মাটি, (21) পডসল জাতীয় মাটি, (22) বনাঞ্চলের ল্যাটেরাইট মাটি, (23) তরাই অঞ্চলের মাটি, (24) পার্বত্য মেডো সয়েল, (25) পৃথকহীন পার্বত্য মাটি, (26) স্কেলীটাল সয়েল ও (27) পিট বা মাক মাটি।

1980 খ্রীস্টাব্দে ন্যশানাল অ্যাটলাস অ্যান্ড থিস্যাটিক ম্যাপির অর্গানাইজেশন কর্তৃক যে রঙীন মৃত্তিকার মানচিত্র প্রকাশিত হয় তাহাতে 29 টি মৃত্তিকার শ্রেণী উল্লিখিত হয়। এই শ্রেণীগুলি আমেরিকা অ্যাপ্রক্সিমেশন পদ্ধতির আটটি বর্গের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত প্রধান গোষ্ঠীগুলির তুল্য ভারতীয় ধারায় মাটির নামকরণ করা হয়েছে। এই শ্রেণীগুলি হল ঃ

বর্গ	প্রধান গোষ্ঠী ভারতীয় তুল্য নাম
(I) এন্টিসল	1. নবীন পলিমাটি
	2. উপকূলের পলিমাটি
	3. উপকূলের বেলে মাটি
	4. ভাবার মাটি
	5. রেগোসলিক (Regosolic) মরু মাটি
	6. লিথোসলিক (Lithosolic) মরু মাটি
	7. স্কেলিটাল (Skeletal) মাটি
(II) ভারটিসল (Vertisol)	8. গভীর কালো মাটি
	9. মাঝারি গভীর কালোমাটি
(III) ইনসেপ্টিসল (Inceptisol)	10. অগভীর কালো মাটি
	11. ক্যালসিয়াম স্টিরোজেমিক (Calcium sterogemic) পলিমাটি
(IV) অ্যারিডিসল (Aridisol)	12. ধূসর বাদামী মাটি
	13. ক্যালসিয়াম স্টিরোজেমিক (Calcium (sterogemic) মাটি
	14. লবণাক্ত এবং লবণাক্ত ক্ষার মাটি
(V) মলিসল (Molisol)	15. তরাই মাটি
	16. পর্বতের ময়দান (Meadow) মাটি
(VI) অ্যালফিসল (Alfisol)	17. পাদদেশীয় মাটি (Submontane soil)
	18. বদ্বীপের পলি মাটি
	19. প্রাচীন পলি মাটি

	20. লাল কাঁকুরে মাটি
	21. লাল বেলে মাটি
	22. লাল দোঁয়াশ মাটি
	23. লাল কাদা মাটি
	24. মিশ্রিত লাল ও কালো মাটি
(VII) আলটিসল (Ultisol)	25. বাদামী লাল ও হলদে মাটি
	26. লাল ও হলদে মাটি
	27. ল্যাটেরাইট মাটি
	28. ল্যাটেরাইট জাতীয় মাটি
(VIII) হিস্টোসল (Histosol)	29. পীট এবং লবণাক্ত পীট মাটি

5.3.5 ভারতের প্রধান কয়েকটি মৃত্তিকার বিবরণ :

পূর্বে উল্লেখিত ভারতের বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকাকে ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল ভিত্তি অনুসারে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা (A) মালভূমি বহির্ভুত অঞ্চলের (Extrapeninsula) মৃত্তিকা এবং (B) মালভূমি অঞ্চলের (Peninsula) মৃত্তিকা। এই দুই শ্রেণীভুক্ত মৃত্তিকাগুলিকে পুনরায় কয়েকটি উপভাগে ভাগ করা হয়।

(A) মালভূমি বহির্ভুত অঞ্চলের মৃত্তিকা : এই অঞ্চলের মৃত্তিকাকে প্রধানত দুইটি উপভাগে ভাগ করা হয় যথা (a) শতদ্রু গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী বিধৌত সমভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা এবং (b) পার্থক্য অঞ্চলের মৃত্তিকা।

(a) শতদ্রু গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীবিধৌত সমভূমির মৃত্তিকা : এই অঞ্চলের মাটি নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত।

(i) পলি মৃত্তিকা : গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র নদী বিধৌত বিস্তীর্ণ সমভূমিতে পলিমৃত্তিকা পরিলক্ষিত হয়। এই মাটি অত্যন্ত উর্বর ও কৃষিকার্যের উপযোগী। বয়সের তারতম্য অনুসারে পলিমাটিকে দুইভাগে ভাগ করা হয় যথা নবীন পলিমাটি বা খাদার এবং পুরাতন পলিমাটি বা ভাঙ্গার। প্লাবন অধ্যুষিত নদী বাঁক অঞ্চলে নবীন পলি বা খাদার দেখা যায়। ইহা সূক্ষ্ম গ্রথন যুক্ত ও অম্ল প্রকৃতির হয়। এই মাটিতে চুন, হিউমাস ও ফসফরিক অ্যাসিডের পরিমাণ কম থাকে। এই মাটির গ্রথন কাদা বা বেলে দোঁয়াশ প্রকৃতির

হয়। পূর্বোক্ত নদীগুলির বদ্বীপ অঞ্চলেও এই মাটির প্রাধান্য দেখা যায়। প্রাচীন পলি মাটি বা ভাঙ্গারে কাদাকণা ও দানাকৃতি ক্যালসিয়ামের প্রাধান্য দেখা যায়। প্রাচীন পলি মাটি বা ভাঙ্গারে কাদাকনা ও দানাকৃতি ক্যালসিয়ামের প্রাধান্য দেখা যায়। এই মাটির রঙ গাঢ় হয় এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া ক্ষারকীয় হয়।

(ii) মরুমাটি (Desert Soil) : রাজস্থান, হরিয়ানা ও দক্ষিণ পঞ্জাবের মরু বা মরুপ্রায় অঞ্চলে এই মাটি দেখা যায়। মরু মাটি প্রধানত দুটিভাগে বিভক্ত যথা রেগোসল এবং লিথোসল। রেগোসল প্রকৃতির শুষ্ক মাটি রাজস্থানের বারসের ও যোধপুরের কাছে দেখা যায়। দক্ষিণ পশ্চিম রাজস্থানের পোখরান ও জয়শলমীরেও এই মাটি দেখা যায়। এই মাটি বায়ুর দ্বারা সঞ্চিত বালুকণা থেকে সৃষ্ট হয়েছে। লিথোসল প্রকৃতির মরু মাটি অপেক্ষাকৃত অগভীর এবং বেলে পাথর থেকে উদ্ভুত। উভয়শ্রেণির মরুমাটির A ও B স্তর সেরূপ দৃশ্যমান নয়। মাটিতে জৈবপদার্থের পরিমাণ থাকে না বললেই চলে। মাটিতে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ অনেক বেশী থাকে এবং ক্যালসিয়াম কর্বোনেটও বিভিন্ন মাত্রায় থাকে।

(iii) লবণাক্ত ও ক্ষার মাটি : উত্তর প্রদেশ হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের মরুপ্রায় জলবায়ু অঞ্চলে এরূপ মৃত্তিকা দেখা যায়। তাছাড়া গুজরাটের কাম্বে উপসাগর অঞ্চল ও সমুদ্র উপকূলে এরূপ মাটি দেখা যায়। লবণাক্ত মৃত্তিকা সোডিয়াম যুক্ত অবস্থায় থাকে। শুষ্ক ঋতুতে এরূপ মাটির পৃষ্ঠস্তরে লবণস্তর সৃষ্ট হয়। বর্ষা ঋতুতে ঐ লবণ স্তর ধুয়ে যায়। এই মাটি সাধারণত সাদা বা ধূসর রঙের হয়। ক্ষার মাটি বেলে বা দোঁয়াশ বেলে গ্রথন যুক্ত হয়। এই মাটিতে নাইট্রোজেন ও ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কম থাকে এবং অপ্রবেশ্য হয়।

(iv) পিট ও জলাভূমির মৃত্তিকা : প্লাবন ভূমির অবনত অংশে অথবা স্থায়ী জলাশয়ে এই প্রকার মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়। উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানে এই প্রকার মাটি দেখা যায়। তাছাড়া বিহারের উত্তর অংশে ও উত্তর প্রদেশের আলমোড়া জেলায় এবং তামিলনাড়ুর দক্ষিণ পূর্ব উপকূলেও এই মৃত্তিকা দেখা যায়। এই সমস্ত স্থানের নিম্নভূমিতে প্রায় সার বৎসর জল জমে থাকার দরুন অবায়বীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে জৈবাংশ পচে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে হিউমাস সৃষ্টি হয়। এজন্য এই মৃত্তিকার প্রায় শতকরা 15 ভাগ বা তার বেশী হিউমাস থকে। এই দুই প্রকার মৃত্তিকা অতিরিক্ত অম্লধর্মী এবং সূক্ষ্ম গ্রথনযুক্ত।

(v) পাদদেশীয় বা তরাই অঞ্চলের মৃত্তিকা : হিমালয়ের পাদদেশে বা তরাই অঞ্চলে এপ্রকার মাটি দেখা যায়। এই মাটিতে ফসফেটের পরিমাণ কম থাকলেও নাইট্রোজেন ও হিউমাস বেশিমাত্রায় থাকে। এই মাটির গ্রথন সাধারণত বেলে এবং গাঢ় কালো রঙের বা ধূসর কালো রঙের হয়। মাটিতে উদ্ভিদ পুষ্টিমৌলের ঘাটতি দেখা যায় এবং এটি অম্লপ্রকৃতির হয়।

(b) পার্বত্য অঞ্চলের মৃত্তিকা : এই শ্রেণীভুক্ত মৃত্তিকা হিমালয় পর্বতের বিভিন্ন উচ্চতায় দেখা যায় এবং বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিম্নলিখিত উপভাগে ভাগে করা যায়।

(i) বাদামী মাটি : জম্মু কাশ্মীর এবং উত্তর প্রদেশের হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে এই মাটি দেখা যায়। পর্ণমোচী বৃক্ষের প্রাধান্যযুক্ত স্থানেই এই মাটি সৃষ্ট হয়। এই মাটির পৃষ্ঠ স্তরের রঙ বাদামী হয়। ইহা দোঁয়াশ বা পলিকাদা গ্রথন যুক্ত। মাটিতে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ থাকে। p^H সাধারণত 7 এর কম হয়।

(ii) পডজল জাতীয় মৃত্তিকা : হিমালয়ের অধিক উচ্চতায় পাইন জাতীয় বৃক্ষ অধ্যুষিত অঞ্চলে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। এই মৃত্তিকার A_2 স্তর ধূসর ছাই বর্ণের অর্থাৎ পডজল সদৃশ্য। এই স্তর সিলিকা সমৃদ্ধ। এই মৃত্তিকা B স্তরে সেসকুইঅক্সাইজের সঞ্চয় দেখা যায় বলে এর রঙ বাদামী বা লালচে এই মাটি অত্যন্ত অম্লধর্মী হয়। মাটির A_1 স্তরে জৈবপদার্থের পরিমাণও কম থাকে।

(B) মালভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা : এই শ্রেণীভুক্ত মৃত্তিকা নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপভাগে বিভক্ত :

(i) লালমাটি : অন্ধ্র প্রদেশের উত্তর পূর্বে, মধ্যপ্রদেশের পূর্ব অংশে এবং ওড়িশা, ছোটনাগপুর, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের কিয়দংশে এই প্রকার মাটি দেখা যায়। মাটিতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ অক্সাইড থাকে বলে মাটির রঙ লাল হয়। গ্রানাইট, নিস, চার্নোকাইট ও ডায়োবাট শিলাযুক্ত স্থানেই এদের বেশী দেখা যায়। এই মাটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম সিলিকা ও বেশী কাদাকণা থাকে। ইহার বিক্রিয়া নিরপেক্ষ বা অম্ল প্রকৃতির হয় ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের দানাযুক্ত লালমাটির p^H এর কাছাকাছি হয়। গ্রথন অনুসারে লাল মাটি সাধারণত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা লাল কাঁকুরে মাটি, লাল বেলে মাটি, লাল দোআঁশ মাটি ও লাল কাদা মাটি বা রেড আর্থ। লাল মাটিতে প্রধানত কেয়োলিনাইট ও ইলাইট জাতীয় কাদা খনিজের প্রাধান্য থাকে, মন্টমোরিলোনাইট কাদা খনিজ অল্প মাত্রায় থাকে। এ প্রকার মাটি সাধারণত স্থূলগ্রথনযুক্ত, সছিদ্র এবং কর্ষণযোগ্য গঠন বিশিষ্ট হয়।

(ii) ল্যাটেরাইট মাটি : পশ্চিমবঙ্গা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র কেরালা, কর্ণাটক, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যেরকিয়দংশে ল্যাটেরাইট মাটি দেখা যায়। তাছাড়া উড়িষ্যার পর্বতে, তামিলনাড়ুর খাঞ্জাভূর জেলায় ল্যাটেরাইট দেখা যায়। এই মাটির রঙ ইটের ন্যায় লাল অথবা হলদে লাল। এই মাটি থেকে ক্ষারকগুলি ও সিলিকা অপসারিত হয় কিন্তু আয়রণ ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পড়ে থাকে। এজন্য মাটির রঙ লাল হয়। এই মাটিতে নাইট্রোজেন, পটাশ, চুন, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি উপাদান অত্যন্ত কম থাকে।এই মাটির সেসকুইঅক্সাইড ও সিলিকার অনুপাত 1:35 এর কম হয়। মাটির কাদাকণা কেয়োলিনাইট শ্রেণীর হয়। ল্যাটেরাইট মাটিকে এর বৈশিষ্ট্য অনুসারে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় যথা উচ্চ তলের ল্যাটেরাইট (High level laterite) এবং নিম্নতলের ল্যাটেরাইট (Low level laterite)। উচ্চতলের ল্যাটেরাইট

সাধারণত বক্সাইট সঞ্চয় স্তরের উপরে দেখা যায়। এটি সছিদ্রযুক্ত হয়। এটি প্রধানত লালচে বাদামী অথবা লাল ছোপযুক্ত হলুদ রঙের হয়। এটি অত্যন্ত অগভীর এবং গ্রাভেলযুক্ত হয়। নিম্নতলের ল্যাটেরাইট উচ্চতলের ল্যাটেরাইট থেকে উদ্ভুত হয়। উচ্চতলের ল্যাটেরাইট জল বাহিত হয়ে উপত্যকায় সঞ্চিত হয়ে এই ল্যাটেরাইটের সৃষ্টি হয়। পাহাড়ের উচ্চ ঢালে উচ্চতলের ল্যাটেরাইট সৃষ্ট হয়। মালাবার উপকূলে ও পূর্বউপকূলের এবং পার্বত্য উপত্যকায় নিম্নতলের ল্যাটেরাইটের সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

(iii) কৃষ্ম কার্পাস মৃত্তিকা : মহারাষ্ট্র মালভূমিতেই এই মাটির প্রাধান্য দেখা যায়। তাছাড়া মধ্যপ্রদেশের নর্মদা উপত্যকা, জবলপুর ভোপাল জেলার বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতে, অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনুল ওরাঙল জেলার প্রভৃতি স্থানেও এই মৃত্তিকা দেখা যায়। এই মৃত্তিকা রেগুর নামেও পরিচিত। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গাঢ় কৃষ্মবর্ণ। ব্যসল্ট শিলা থেকে এরূপ মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়েছে বলে এর রঙ কালো। অনেকের মতে মূল শিলাখণ্ডে টিটানিয়াম, ম্যাগনেটাইট লৌহযৌগ এবং অন্যান্য কালো রঙের খনিজের উপস্থিতির জন্য এর রঙ কালো।

এই মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর। কারণ এই মৃত্তিকার গ্রথন কর্দমময় এবং মাটিতে প্রচুর পরিমাণে চুনজাতীয় পদার্থ, ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট, লৌহ অক্সাইড, ফেরাস অক্সাইড ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড আছে. তাছাড়া এই মাটি পটাশ ও ফসফেরিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ। এই মাটির উর্বরতার অনুকূল বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক গুণের অধিকারী। মৃত্তিকার কাদাকণা মন্টমরিলোনাইট হওয়ায় ইহার জলধারণ ক্ষমতা অনেক বেশী। আর্দ্র অবস্থায় এই মাটি যথেষ্ট পরিমাণে প্রসারিত হয় এবং শুষ্ক হলে সঙ্কুচিত হয় বলে মৃত্তিকায় টানেরসৃষ্টি হয়। এর ফলে শুষ্ক অবস্থায় মৃত্তিকায় ফাটলের সৃষ্টি হয়। মন্টমরিলোনাইট কাদা কণার পারমানবিক গঠন 2:1 প্রকৃতির হওয়ায় এর প্রসারণ ও সঙ্কোচন ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী। এ জন্য এর জলধারণ ক্ষমতা বেশী হয়। মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশী বলে মাটি দীর্ঘ সময় সরস থাকে। এজন্য জলের যোগান কাম্য অবস্থায় থাকে। এই মৃত্তিকার রাসায়নিক গুণাগুণও উন্নত প্রকৃতির। এটি রাসায়নিক বিক্রিয়া নিরপেক্ষ বা স্বল্প পরিমাণে ক্ষারীয়। মৃত্তিকার p^H 7.2-8.5 এর মধ্যে। মাটির গ্রথন সূক্ষ্ম হওয়ার এর আয়ন বিনিময় ক্ষমতাও অনেক বেশী হয়। এ জন্যও এই মাটি বেশি উর্বর হয়।

গভীরতা অনুসারে এই মাটিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—অগভীর, গভীর এবং মাঝারি গভীর কালোমাটি। তিরিশ সেন্টিমিটার বা তার কম গভীর মাটিকে অগভীর কালো মাটি বলে। 30-100 সেন্টিমিটার গভীর মাটিকে মাঝারি কালো মাটি এবং 100 সেন্টিমিটারের অধিক গভীর মাটিকে গভীর কালো মাটি বলে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে বা উচ্চ ঢালে কৃষ্ম মৃত্তিকা অগভীর হতে দেখা যায়। অগভীর কৃষ্ম মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত হাল্কা রঙের এবং কম উর্বর। মাঝারি গভীর ও গভীর কৃষ্ম মৃত্তিকা নদী উপত্যকায় বেশী দেখা যায়। এই প্রকার কৃষ্ম মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর এবং গাঢ় কাল রঙের হয়।

(iv) পলি মাটি : মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা কাবেরী প্রভৃতি নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে এই মাটি দেখা যায়। এই মাটিতে প্রচুর পরিমাণে পটাশ এবং চুন থাকলেও নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং হিউমাসের পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকে। এই মাটির গ্রথন প্রধানত বেলে বা পলি।

(v) লবণাক্ত ও ক্ষারীয় মাটি : দাক্ষিণাত্য মালভূমির পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে এই প্রকার মাটি পরিলক্ষিত হয়। সমুদ্রের লোনা জলের প্রভাবে মাটি লবণাক্ত বা ক্ষারীয় হয়েছে।

(vi) লাল ও হলুদ মাটি (Red and yellow soil) : মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড় সমভূমি ও মহানদী উপত্যকায় এই মাটি দেখা যায়। এই মাটিতে ফসফরাস ও হিউমাসের পরিমাণ কম থাকে এবং এটি অম্লধর্মী হয়।

5.4 সারাংশ

পৃথিবীপৃষ্ঠে মৃত্তিকা নিয়ন্ত্রকের প্রভাবে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যুক্ত অজস্র মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। একটি মৃত্তিকার সঙ্গে আর একটি মৃত্তিকার হুবহু মিল না থাকলেও, একাধিক মৃত্তিকার মধ্যে কয়েকটি গুণাগুণ সম্পর্কে মূলগত মিল পরিলক্ষিত হয় এবং সেই অনুসারে তাদের পৃথকীকরণ পদ্ধতিকে মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ বলে। এই রূপ শ্রেণীবিভাগের মাধ্যমে কোন একটি শ্রেণীর মৃত্তিকার ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য, গঠন প্রক্রিয়া, ব্যবহার এবং মৃত্তিকার পরিশোষণ বা পুনরুদ্ধার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে সঠিক ধারণা করা যায়।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়েছে। সর্বপ্রথম মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তির বিভিন্নতা অনুসারে মাটির শ্রেণীবিভাগ করা হত। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত ভূতাত্তিক দিক থেকে মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ প্রাধান্য পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মৃত্তিকার উৎপত্তির প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিভাগ শুরু হয়। মৃত্তিকা বিজ্ঞানের জনক ভি. ভি. ডকুচ্যায়েভ মৃত্তিকার উৎপত্তিগত শ্রেণীবিভাগের সূচনা করেন ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। যেহেতু মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়ার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, সেইহেতু একই গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট মৃত্তিকাসমূহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মূলগত সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। এজন্য এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ বর্তমানে প্রাধান্যলাভ করেছে।

উৎপত্তি অনুসারে মৃত্তিকাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা আঞ্চলিক, অনাঞ্চলিক ও অন্তরাঞ্চলিক। সুদীর্ঘ সময় ধরে নির্দিষ্ট জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রভাবে শিলামৃত্তিকার উপর অর্থাৎ আবহবিকার স্থলেই সৃষ্ট হয় এবং জমে থাকা অংশকে আঞ্চলিক মৃত্তিকা বলে। মৃত্তিকা উৎপত্তিস্থল থেকে পরিবাহিত

হয়ে অন্য কোন স্থানে সঞ্চিত হলে তাকে অনাঞ্চলিক মৃত্তিকা বলে। নির্দিষ্ট জলবায়ু অঞ্চলে ভূ-প্রকৃতিগত কারণে অনাঞ্চলিক মৃত্তিকা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক যে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয় তাকে অন্তরাঞ্চলিক মৃত্তিকা বলে। বিভিন্ন মৃত্তিকা বিজ্ঞানী যথা ডকুচ্যায়েভ, মারবাট, শ্লঙ্কা, সিবাটজেভ, ভিলেনেস্কী এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিসংস্থা মৃত্তিকার উৎপত্তিগত শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

(1) ডকুচ্যায়েভ কর্তৃক মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ : ডকুচ্যায়েভ মৃত্তিকার উপর জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রভাবের উপর ভিত্তি করে মৃত্তিকাকে তিনটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করেন যথা স্বাভাবিক বা আঞ্চলিক মৃত্তিকা (Normal soil), পরিবর্তনসূচক মৃত্তিকা (Transitional soil) এবং অস্বাভাবিক মৃত্তিকা (Abnormal soil)।

(2) মারবাট শ্রেণীবিভাগ (Classification by Marbut) : আমেরিকার মৃত্তিকা বিজ্ঞানী সি. এফ মারবাট ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্তিকার ষষ্ঠ পর্যায় ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে মৃত্তিকাকে পেডালফার ও পডোক্যাল এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে পেডোক্যাল মৃত্তিকাকে দুইটি ভাগে ভাগ করেন যথা নাতিশীতোষ্ম ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের পেডোক্যাল মৃত্তিকা এবং পেডালভার মৃত্তিকাকে অনুরূপ দুইটি ভাগে ভাগ করেন যথা পডজল ও ল্যাটেরাই মৃত্তিকা। তৃতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের মৃত্তিকা শ্রেণী গুলিকে উষ্মতা ভিত্তিক আরও কয়েকটি উপভাগে বিভক্ত করেন। চতুর্থ পর্যায় বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে পেডোক্যাল ও পেডালফার মৃত্তিকাকে কয়েকটি উপভাগে ভাগ করেন। চতুর্থ পর্যায়ে মৃত্তিকা পরিলেখের তারতম্য অনুসারে কয়েকটি উপভাগে ভাগ করেন। ষষ্ঠ পর্যায়ে মূলশিলাখণ্ডের প্রকৃতি অনুসারে মৃত্তিকা মূল বিভাগের উপবিভাগ করেন।

(3) ইউ. এস. ডি. এ কর্তৃক শ্রেণীবিভাগ : মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগের সর্বাধুনিক মতবাদ হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি সংস্থা কর্তৃক প্রবর্তিত সেভেন্থ এ্যাপ্রকিসমেশন এই শ্রেণীবিভাগে সাতটি পর্যায়ে মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়। মৃত্তিকায় সমস্ত প্রকার ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণের উপরে ভিত্তি করেই এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। মৃত্তিকার পরিলেখের বিভিন্ন স্তরের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উপর এই শ্রেণীবিভাগে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই শ্রেণীবিভাগ অনুসারে মাটিকে সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয় যথা (ক) বর্গ, (খ) উপবর্গ, (গ) প্রধান গোষ্ঠী, (ঘ) উপগোষ্ঠী, (ঙ) পরিবার, (চ) ক্রম ও (ছ) ফেজ এই মতবাদ অনুসারে মাটি মোট ১০ টি বর্গে বিভক্ত যথা এ্যন্টিসল, ইনসেপ্টিসল, এ্যরিডিসল, মলিসল, সেপাডোসল, অ্যালফিসল, আলিটসল, অক্সিসল, হিস্টোসল। বর্গের মৃত্তিকাগুলিকে নির্দিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কয়েকটি উপবর্গে ভাগ করা হয়। উপবর্গের মাটির শ্রেণীগুলিকে পুনরায় বিশেষ লক্ষণযুক্তস্তরের ভিত্তিতে প্রধান গোষ্ঠিতে বিভক্ত করা হয়। প্রধান গোষ্ঠীর মাটিগুলিকে গ্রথন,

খনিজ বৈশিষ্ট্য ও তাপমাত্রা অনুসারে কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত করা হয়। পরিবার শ্রেণীর মাটিকে বিভিন্ন ক্রমে এবং তাকে আবার ফেজে বিভক্ত করা হয়। এই শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতিতে মাটির নামকরণ করা হয় কয়েকটি শব্দাংশের সাহায্যে। প্রতিটি শব্দাংশ গ্রীক অথবা লাতিন শব্দ থেকে গৃহীত। প্রত্যেকটি পর্যায়ের মাটির নামকরণের মধ্যে পূর্বেকার পর্যায়ের নামকরণের যোগসূত্র থাকে।

ভারতের মাটির শ্রেণীবিভাগ : সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের মাটির শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কৃষিকার্যে মাটির উপযোগিতার ভিত্তিতে মাটিকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হত যথা উর্বর ও অনুর্বর মৃত্তিকা। ষোড়শ শতাব্দীতে মৃত্তিকার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য যথা গ্রথন, বর্ণ প্রভৃতি এবং ভূমির ঢাল, সেচের জলে যোগান প্রভৃতির ভিত্তিতে মাটির শ্রেণীবিভাগ করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উর্বরতা অনুসারে মাটির শ্রেণীবিভাগে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা কর্তৃক নিযুক্ত অল ইন্ডিয়া সয়েল এ্যন্ড ল্যান্ড ইউস সার্ভে কমিটি ভারতের মৃত্তিকাকে মোট আটটি বিভাগে বিভক্ত করেন যথা পলি মৃত্তিকা, মরুমৃত্তিকা, লবণাক্ত মৃত্তিকা, ক্ষারীয় মৃত্তিকা, পিট বা জলাভূমির মৃত্তিকা, লাল মৃত্তিকা, ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা এবং পার্বত্য মৃত্তিকা। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বভারতীয় কৃষি সংস্থা যে মৃত্তিকা মানচিত্র নির্মাণ করে তাতে মৃত্তিকার ২৭টি শ্রেণী উল্লেখিত হয়। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশনাল এটলাস অ্যান্ড থিম্যাটিক ম্যাপিং অর্গানাইজেশান সেভেনথ এ্যাপ্রক্সিমেশান (Seventh Approximation) অনুসারে মৃত্তিকা মানচিত্র নির্মান করে। এই মানচিত্রে ভারতের মৃত্তিকাকে আট বর্গে বিভক্ত করা হয় যথা (1) এন্টিসল, (2) ভারটিসল, (3) ইনসেপ্টিস, (4) অ্যারিডিসল, (5) মলিসল, (6) অ্যালফিসলকে, (7) আলটিসল এবং (8) হিস্টাসল।

বর্তমানে ভারতের মৃত্তিকা যে কয়েকটি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত সেগুলি হল : (1) পলি মৃত্তিকা, (2) মরুমাটি, (3) লবণাক্ত ও ক্ষার মাটি, (4) পিট ও জলাভূমির মৃত্তিকা, (5) পাদদেশীয় বা তরাই অঞ্চলের মৃত্তিকা, (6) পার্বত্য অঞ্চলের মৃত্তিকা, (7) লাল মাটি, (8) ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা, (9) কৃষ্ম কার্পাস মৃত্তিকা ও (10) লাল ও হলুদ মাটি।

5.5 প্রশ্নাবলী

A. প্রতিটি প্রশ্নের মান 10

1. ডকুচ্যায়েভ ও মারবাটের মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করুন।
2. U.S.D.A. কর্তৃক মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি আলোচনা করুন।

3. ভারতের মৃত্তিকার শ্রেণীগুলির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

B. প্রতিটি প্রশ্নের মান 4

4. মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ বলতে কী বোঝায়?
5. মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তা কী?
6. ডকুচায়েভ মৃত্তিকার কীরূপ শ্রেণীবিভাগ করেছেন?
7. মারবাটের মৃত্তিকা শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি ব্যাখ্যা করুন।
8. সেভেনথ এ্যপ্রক্সিমেশান কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
9. বর্গ ও উপবর্গের মাটি বলতে কী বোঝায়?
10. মাটির প্রধাণ গোষ্ঠী ও পরিবার বলতে কী বোঝায়?
11. মৃত্তিকার প্রধান বর্গগুলি উল্লেখ করুন।
12. রেগুর মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
13. ল্যাটেরাইট ও লাল মাটির মধ্যে পার্থক্য কী?
14. ভারতের পলিমাটি ও পার্বত্য মাটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
15. পেনিনসুলা বর্হিভূত ভারতের মৃত্তিকাগুলির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

C. প্রতিটি প্রশ্নের মান 2

16. নরমাল সয়েল বা স্বাভাবিক মৃত্তিকা বলতে কী বোঝায়?
17. মাটির পরিবার বলতে কী বোঝায়?
18. মলিক শ্রেণীর মাটির বৈশিষ্ট্য কী?
19. হিস্টিক স্তর বলতে কী বোঝায়?
20. অ্যামব্রিক কী স্তর নির্দেশ করে?
21. এন্টিসল মাটির বৈশিষ্ট্য কী?
22. খাদার ও ভাঙ্গারের মধ্যে পার্থক্য কী?
23. উচ্চস্তর ল্যাটেরাইট এবং নিম্নস্তর ল্যাটেরাইটের মধ্যে পার্থক্য কী?

5.6 উত্তরমালা

A.

(1) 5.3.1 ও 5.3.2 (2) 5.3.3 (3) 5.3.5

B.

(4) 5.3 অংশে শ্রেণীবিভাগের সংজ্ঞা (5) 5.3 অংশের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদ (6) 5.3.1. (7) 5.3.2 (8) 5.3.3 এর প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ (9) 5.3.3 এর মাটির বর্গের ও উপবর্গ অংশ (10) 5.3.3 এর প্রধান গোষ্ঠী ও পরিবার (11) 5.3.3 এর মাটির বর্গের বর্ণনা অংশটি (12) 5.3.5 এর কৃষ্ম কার্পাস মৃত্তিকা (13) 5.3.5 এর ল্যাটেরাইট ও লাল মাটি। (14) 5.3.5 এর পলিমাটি ও পার্বত্য মাটি। (15) 5.3.5. এর (1) অংশটি

C.

(16) 5.3.1 এর A শ্রেণী বা স্বাভাবিক মৃত্তিকা (17) 5.3.3 এর পরিবার অংশটি (18) 5.3.3 এর মলিক শ্রেণীর মাটি (19) 5.3.3 এর তৃতীয় পরিচ্ছেদের হিস্টিক স্তর (20) 5.3.3 এর তৃতীয় পরিচ্ছেদের অ্যামব্রিক স্তর (21) 5.3.3 এর মাটির বর্গের শ্রেণীবিভাগ অংশে এন্টিসল (22) 5.3.5 এর পলিমাটি (23) 5.3.5 এর ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা।

একক 6 ❑ জীব ভূগোলের ধারণা ; বায়োম—ক্রান্তীয় তৃণভূমি—তৈগা—তুন্দ্রা

গঠন

6.1. প্রস্তাবনা

6.2. জীব-ভূগোলের ধারণা

6.4. বায়োম

6.3.1. ক্রান্তীয় বায়োম

6.3.1.1. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃষ্টি অরণ্য বায়োম

6.3.1.2. ক্রান্তীয় তৃণভূমি বায়োম বা সাভানা বায়োম

6.3.2. নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি বায়োম

6.3.3. তৈগা বা নাতিশীতোষ্ণ সরলবর্গীয় অরণ্য বায়োম

6.3.4. তুন্দ্রা বায়োম

6.4. সারাংশ

6.5. সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

6.6. উত্তরমালা

6.7. গ্রন্থপঞ্জি

6.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

এই অংশটি পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন

- জীব ভূগোল বলতে কী বোঝায়?
- বায়োম বলতে কী বোঝায়?
- ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বায়োমের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে।
- ক্রান্তীয় তৃণভূমি বায়োমের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে।
- তৈগা বায়োমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে।

- তুন্দ্রা বায়োমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে।
- নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি বায়োমের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে।

বর্তমানে 'জীব ভূগোল' ভূগোল বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। 'জীব বৈচিত্র্যের ধ্বংসসাধন' এবং 'পরিবেশ দূষণের ফলে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য হ্রাস' বিশ্বের বিভিন্ন অংশে এত দ্রুত বাড়ছে যে 'জীব-ভূগোল' পাঠের প্রয়োজনীয়তাও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। এই জীব-ভূগোলের একটি অন্যতম দিক হল বায়োম। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে জলবায়ুর তারতাম্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট প্রজাতির উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানুষের সন্ধান মেলে, যারা সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলির পরিবেশগত অবস্থার সাথে অভিযোজন করে বেঁচে থাকে। বর্তমান একটিতে ক্রান্তীয় বায়োমের মধ্যে প্রধান দুটি বায়োম—ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বায়োম ও ক্রান্তীয় তৃণভূমি (সাভানা) বায়োমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি বায়োম, তৈগা বায়োম ও তুন্দ্রা বায়োমের অবস্থান, জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য, উদ্ভিদ, পশুপাখি ও মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

6.2 জীব-ভূগোলের ধারণা (Concept of Bio-Geography)

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে বিশেষ বিশেষ প্রজাতির গাছপালা, পশুপাখি ও মানুষের বসবাস ও বৃদ্ধিকে সেসব অঞ্চলের জলবায়ু, মৃত্তিকা ও অন্যান্য ভৌগোলিক উপাদানগুলির পটভূমিকায় ব্যাখ্যা করা হয় ভূগোলের যে শাখায়, তাকে জীব-ভূগোল বলে।

সম্প্রতি 'জীব-ভূগোল' ভূগোল বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আধুনিক শাখা হিসেবে নিজের স্থান করে নিয়েছে। এই বিষয়টিতে একদিকে যেমন উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানুষের ভৌগোলিক বন্টন সম্পর্কে পাঠ করা হয়। তেমনি বিভিন্ন জীবের সাথে তাদের পরিবেশের সম্পর্ক এবং বিভিন্ন জীবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করা হয়।

পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছিল প্রায় পাঁচ বিলিয়ন বছর আগে। পৃথিবীর প্রায় 197 মিলিয়ন বর্গ কি.মি. আয়তনের প্রায় 71% মহাসাগর দিয়ে আবৃত। প্রায় 3 বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হয়। প্রায় 20,000 ফুট উঁচু পর্বতশৃঙ্গ থেকে সমুদ্রের প্রায় 10,000 মিটার গভীরতা পর্যন্ত বিভিন্ন স্বাভাবিক আবাসে (habitat) প্রাণের অস্তিত্ব দেখা যায়। পুকুরে, জলাশয়ে, শীতল মেরু অঞ্চলে, উষ্ণ মরুভূমিতে, ঘন ক্রান্তীয় অরণ্যে এবং আরও অনেক জায়গায় জীবিত প্রাণীদের বাস করতে দেখা যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন বাস্তুতান্ত্রিক অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের জীব বসবাস করে। এই কারণে সব জীবিত প্রাণী সব জীব-বসবাসকারী অঞ্চলে বাস করে না।

বিবর্তনকারী ইতিহাস, অতীত জলবায়ু, মহাদেশগুলির আকৃতি ও গঠন, অতীত ও বর্তমান বাস্তুতান্ত্রিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলির পারস্পরিক ক্রিয়া জীবের বন্টনকে প্রভাবিত করে। এই সম্পর্কের জটিলতার

ফলে জীব ভূগোলবিদেরা একটি বা দুটি প্রধান বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। ঐতিহাসিক জীব-ভূগোল বলতে প্রাথমিকভাবে জীবগোষ্ঠীর বিবর্তনকারী ইতিহাসকে বোঝায়। জীবগোষ্ঠীর উৎপত্তি কোথায় হয়েছে, কীভাবে এগুলি প্রসারলাভ করেছে এবং তাদের বর্তমান বন্টন অতীত ইতিহাস সম্পর্কে কী ধারণা দেয়—এসব বিষয়ে ঐতিহাসিক জীব-ভূগোল পাঠ করা হয়। বর্তমান প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে জীবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বাস্তুতান্ত্রিক জীব ভূগোলের অন্তর্গত। জীবের ভৌগোলিক বন্টন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা করতে হলে ঐতিহাসিক জীব-ভূগোল ও বাস্তুতান্ত্রিক জীব ভূগোলের একীকরণ (integration) করা অবশ্য প্রয়োজন। বাস্তুতান্ত্রিক জীব-ভূগোল যখন ভূ পৃষ্ঠে, উদ্ভিদের বন্টন সম্পর্কে আলোচনা করে, তাকে 'ফাইটোজিওগ্রাফি' বলে। কোনো স্থানে গাছের জন্ম, বৃদ্ধি ও অবস্থান বেশ কিছু বাস্তুতান্ত্রিক উপাদানের উপর নির্ভর করে। তাছাড়া বিভিন্ন বাস্তুতান্ত্রিক উপাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গাছের সহ্যক্ষমতা ভিন্ন ধরনের হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জীববিজ্ঞানীরা প্রথম 'বাস্তুবিদ্যা' (Ecology) ও 'বাস্তুসংস্থান' (Eco-system) শব্দ দুটির প্রচলন করেন। তাঁদের মতে প্রাণী-পরিবেশ ও উদ্ভিদ-পরিবেশ সম্পর্কে জীব-বিজ্ঞানের যে শাখাটি আলোচনা করে তাকে বাস্তুবিদ্যা বলে। আর যে নিয়মের মাধ্যমে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী জীবসম্প্রদায় এবং ওই স্থানের অজীব উপাদানগুলির পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ায় উদ্ভূত নির্দিষ্ট উপাদানের বিনিময় ঘটে, তাকে বাস্তুসংস্থান বা বাস্তুরীতি বলে। জীববিজ্ঞানে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাস্তুবিদ্যা পাঠ করা হয়। (1) ব্যক্তি বা এককের বাস্তুবিদ্যা—জিন বা বংশগতির ধারা কীভাবে ও কতখানি পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তার পাঠ এবং (2) অনেকগুলি একক নিয়ে গঠিত গোষ্ঠীর পরিবেশ-সম্পর্ক সংক্রান্ত পাঠ। এই পাঠ স্থানীয় বা মহাদেশীয় বা আরও বড়ো কোনো অঞ্চল জুড়ে হতে পারে। এছাড়া জীববিজ্ঞানীরা জীবের বিবর্তন, প্রচরণ, অভিযোজন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়গুলি নিয়ে এবং এমন কি পরিবেশগত বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। 1960 সালে জীববিজ্ঞানের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বাস্তুবিদ্যা গড়ে উঠেছে পূর্ণাঙ্গ একটি বিষয়রূপে। বিজ্ঞানী Odum-এর মতে, 'জৈবিক, প্রাকৃতির ও সামাজিক বিজ্ঞানের যোগসূত্র হল বাস্তুবিদ্যা।'

বাস্তুবিদ্যার বিভিন্ন ধারণাগুলির উন্নতির সাথে সাথে জীবমণ্ডলের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও প্রচুর গবেষণা করতে শুরু করেন। ভূগোল বিষয়টিতেও মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক পাঠ করার সাথে সাথে বিভিন্ন জীব ও তাদের পরিবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধান শুরু হয়। ভূগোল বিষয়ে সর্বপ্রথম বাস্তুসংস্থানের নীতি ও পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করে জীবভূগোল। ক্রমশ ভৌগোলিকেরা মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপকে জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন। মানুষ ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া বিশ্লেষণের জন্য 1910 সালে 'মানবীয় বাস্তুবিদ্যা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতির অন্যান্য জীবের মধ্যে মানুষের স্থান এবং অন্যান্য জীবের মতো মানুষ—প্রকৃতি সম্পর্ক বিষয়ে সমীক্ষা করে

'মানবীয় বাস্তুবিদ্যা' (Human Ecology)। মার্কিন ভৌগোলিক ব্যারোজ—এর (H. H. Barrows) মতে, ভূগোল হল 'মানবীয় বাস্তুসংস্থানের বিজ্ঞান' (Geography is the science of Human Ecology)। ভৌগোলিকেরা সাধারণত 'মানবীয় বাস্তুবিদ্যা' বিষয়টিকে বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করেন। 1960 সাল থেকে এই ধারণাগুলি নতুনভাবে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। আয়ার ও জোনস্ (1966) তাঁদের যৌথ গ্রন্থে 'জিওগ্রাফি অ্যাজ হিউম্যান ইকলজি'-তে ভূগোল বিষয়কে 'মানবীয় বাস্তুবিদ্যা' হিসেবে দেখানোর প্রচেষ্টা করেন। স্টোডার্ট (1965) বাস্তুবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও অগ্রসর করে এতে প্রণালি বিশ্লেষণ প্রয়োগের মূল সূত্র ও পদ্ধতি আলোচনা করেন (Geography and the ecological approach : the ecosystem as Geographic principle and method)। বর্তমানে বাস্তুসংস্থানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে সব ভৌগোলিক গবেষণাগুলি হয়েছে, তাদের প্রায় প্রতিটিতেই বাস্তুতন্ত্রে মানুষের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই 'মানবীয় বাস্তুবিদ্যা' প্রকৃতপক্ষে জীব-ভূগোলেরই একটি শাখা। একসময় বাস্তুসংস্থানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবজগতের প্রক্রিয়াগুলির সাথে সামাজিক প্রক্রিয়ার তুলনা করা হত, কিন্তু বর্তমানে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যুক্ত হয়েছে 'সিস্টেম' বা প্রণালির ধারণা 1973 সালে Chroley বলেন যে, 'মানবীয় ভূগোল কেবলমাত্র জীব-ভূগোলের একটি সরল শাখা নয়, মানবীয় বস্তুসংস্থানের সূত্র ও ধারণাগুলিকে 'প্রণালি বিশ্লেষণের' (System analysis) মাধ্যমে নতুন করে গঠন করতে হবে।

Ecology (বাস্তুসংস্থান) শব্দটি এসেছে দুটি গ্রিক শব্দ [Oikos' (ইকোস) অর্থাৎ গৃহ বা আবাস এবং 'Logos' (লগোস) অর্থাৎ বিজ্ঞান বা বিদ্যা] থেকে। আক্ষরিক অর্থে বাস্তুসংস্থান হল জীবদের আবাস সম্পর্কে পাঠ। ই. পি. ওডাম-এর (1963) ভাষায়, 'Ecology is the study of organisms at home.' ভূপৃষ্ঠে মানুষ, অন্যান্য পশুপাখি, গাছ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবেরা একসাথে বাস করে। এই জীবেরা প্রায় প্রত্যেকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং যে কোনো একটির জন্ম, বৃদ্ধি ও বিকাশের সাথে অন্য একটির কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ মানুষ, গাছ বা পশুপাখি তাদের জীবনধারণের জন্য পরস্পর নির্ভরশীল, স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এছাড়া স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে প্রতিনিয়ত পদার্থ ও শক্তির (energy) এক প্রবাহচক্র কাজ করে চলেছে, যা মানুষের বাস্তুসংস্থান পাঠের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজন। ওডামের ভাষায়, 'Ecology is the study of the structure and function of nature.' বাস্তুসংস্থানে গোষ্ঠী (Community) ও তার অজৈব পরিবেশ একসাথে গড়ে তোলে একটি বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) এবং সমস্ত বাস্তুতন্ত্র নিয়ে একসাথে গড়ে ওঠে পৃথিবীর জীবমণ্ডল (Biosphere)। শিলামণ্ডল, বায়ুমণ্ডল ও বারিমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে জীবমণ্ডল। পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে জীবমণ্ডলের পরিবেশ হয় ভিন্ন ধরনের। সমুদ্রে, নদীতে, হ্রদে বা পুকুরে যেমন বিশেষ ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশ আছে, তেমনি আবার মরু অঞ্চলে, গভীর বনভূমিতে, তৃণভূমি অঞ্চলে বা বায়ুমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশ আছে। এই ভৌগোলিক পরিবেশের পার্থক্য (প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক, জৈব ও অজৈব) বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন জাতের গাছ, পশুপাখি ও মানুষের জন্ম দিয়েছে। এই বাস্তুতন্ত্রগুলির

বিশেষ বিশেষ পরিবেশে বসবাসকারী প্রাণীদের খাদ্যশৃঙ্খল ভিন্ন প্রকৃতির এবং সমস্ত সজীব ও নির্জীব উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ধরনের। তাছাড়া প্রায় সমস্ত বাস্তুতন্ত্রে একটি নির্দিষ্ট পুষ্টিচক্র (Nutrient Cycle) ও শক্তিপ্রবাহ (Energy flow) রয়েছে। উপরিউক্ত প্রায় সমস্ত বিষয়গুলি বর্তমানে জীব-ভূগোল পাঠ্যসূচির অন্তর্গত।

জীবমণ্ডলের বেশির ভাগ জীব-ই থাকে সীমিত একটি অংশে যার সীমা ভূপৃষ্ঠ, ভূপৃষ্ঠের গভীরে কয়েক মিটার এবং জলের গভীরে প্রায় 100 মিটারের মধ্যে। একটি আনুমানিক ধারণা অনুসারে জীবমণ্ডলে প্রায় বারোলক্ষের বেশি পশু প্রজাতি ও চার লক্ষের বেশি উদ্ভিদ প্রজাতি আছে। এই অসংখ্য পশু, পাখি গাছ, মানুষ, জীবাণু প্রভৃতির একত্র অবস্থানকে জীব-বৈচিত্র্য (Bio-diversity) বলে। বাস্তুতন্ত্র গঠনে এই জীবদের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু প্রধানত মানুষের সভ্যতার উন্নতির সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে এবং মানুষের বিভিন্ন অবিবেচনাপ্রসূত কাজের ফলে সম্প্রতি পরিবেশ দূষিত ও কলুষিত হচ্ছে। মানুষের বিভিন্ন কাজের ফলে সম্প্রতি বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং জৈব-বৈচিত্র্যের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। এই সমস্ত সাম্প্রতিক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বর্তমানে জীব ভূগোলের পাঠ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবের পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এবং পরিবেশের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জীব-ভূগোল একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্য পাঠ্য বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে।

জীব ভূগোলে সামগ্রিকভাবে যে পরিবেশের কথা আলোচনা করা হয় তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন অজৈব ও জৈব পরিবেশ। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নির্ভর করে অজৈব বা প্রাকৃতিক পরিবেশকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে করা যায়। যথা (A) কঠিন (B) তরল (C) গ্যাসীয়, যা প্রধানত শিলামণ্ডল, বারিমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডলকে চিহ্নিত করে। অবস্থানগত মাপকাঠিতে এদের আবার পার্বত্য-পরিবেশ, মালভূমি-পরিবেশ, হ্রদ-পরিবেশ, সামুদ্রিক-পরিবেশ, মরু-পরিবেশ প্রভৃতি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

জৈব পরিবেশের প্রধান দুটি উপাদান হল উদ্ভিদ ও প্রাণী। তাই এই পরিবেশকে (A) উদ্ভিজ্জ পরিবেশ ও প্রাণীজ পরিবেশ—এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

সমস্ত জীবের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত ও সভ্য জীব হল মানুষ এবং তাঁদের বেঁচে থাকার জন্য চারপাশে গড়ে ওঠে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ। মানুষ তার শিক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, সৌন্দর্যবোধ, আচারব্যবস্থা, আইন প্রভৃতির ভিত্তিতে গড়ে তোলে এক জ্ঞানবুদ্ধি, রুচি ও চেতনার জগৎ, যা সাংস্কৃতিক পরিবেশ নামে পরিচিত।

জীব-ভূগোল পরিবেশ বলতে বোঝায় সেই অবস্থাকে, যা কোনো জীবকে, প্রধানত মানুষকে বেষ্টন করে আছে এবং যা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে। এই অবস্থাগুলি হল ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মাটি, জল, আলো, পারিপার্শ্বিক উদ্ভিদ, প্রাণী, জীবাণু ইত্যাদি।

ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবা হয় যে, বিভিন্ন ভৌতিক, জীবজ, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়ায় পরিবেশের প্রকৃতি তৈরি হয়। উপরিউক্ত উপাদানগুলির ঘাত-প্রতিঘাতে এবং ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় চার শ্রেণির পরিবেশের উদ্ভব হয়। যথা—(A) ভৌতিক বা অজৈব

পরিবেশ, (B) জৈব পরিবেশ, (C) সাংস্কৃতিক পরিবেশ, (D) সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ। জৈব পদার্থের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে অভিযোজন করার মাধ্যমে পরিবেশে সমতার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমন্বয়ে গঠিত ভারসাম্যমূলক পরিবেশের সুবিশাল ভৌগোলিক অঞ্চলকে বায়োম (Biome) বলে। (যেমন, ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বায়োম, সাভানা বায়োম ইত্যাদি)। বায়োমগুলির মধ্যেকার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমানে জীব-ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

6.2 বায়োম (Biome)

ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন উদ্ভিদগুলির জীবনের আকারের ভিত্তিতে জীবমণ্ডলকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রে বিভক্ত করা হয়। একটি বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুরীতিকে তখনই বায়োম নামে অভিহিত করা যায়, যখন বিশেষ কিছু জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সেখানকার সমস্ত জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও মানুষ এবং সেই অঞ্চলের মৃত্তিকাকে একত্রে পাঠ বা অধ্যয়ন করা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে একটি বায়োম হল পৃথিবীর সেইসব অঞ্চলের সমস্ত উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মৃত্তিকা যেসব অঞ্চলে অধিকাংশ জীবের ন্যূনতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং বায়োমের সমস্ত অঞ্চলে কমবেশি প্রায় একই রকমের পরিবেশগত অবস্থা দেখা যায়। সাধারণত একটি সুবিশাল অঞ্চল জুড়ে এক একটি বায়োম অবস্থান করে। উদাহরণস্বরূপ ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বায়োম, তৈগা বায়োম, সাভানা বায়োম প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

অনেক বিজ্ঞানী মাটিকে বায়োমের অন্তর্ভুক্ত করতে চান না, কারণ মাটির বিবর্তনের হার বা মাত্রা উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর চেয়ে অনেক ধীর। আবার অনেক বিজ্ঞানীদের মতে কেবলমাত্র স্থল—উদ্ভিদ ও জীবজন্তুকে বায়োমের অন্তর্ভুক্ত করা চলে, কারণ সামুদ্রিক বায়ামের সীমা নির্ধারণ করা খুবই অসুবিধাজনক। যদিও বায়োমের মধ্যে উদ্ভিদ ও জীবজন্তু উভয়েই থাকে, সাধারণভাবে সবুজ উদ্ভিদ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সবুজ উদ্ভিদের জীবভর (Biomass) জীবজন্তুর চেয়ে অনেক বেশি।

আই. জি. সিমনস্-এর (1982) মতে, সবচেয়ে বিস্তৃত বাস্তুতান্ত্রিক এককটি বায়োম নামে পরিচিত। যদিও একটি বায়োমকে এর অন্তর্গত উদ্ভিদ ও জীবগোষ্ঠীর ভিত্তিতে পাঠ করা হয়, কিন্তু এটিকে মৃত্তিকা ও জলবায়ুর একটি নির্দিষ্ট বন্টনগত ধরনের ভিত্তিতেও আলোচনা করা হয়। ফলে পৃথিবীর বায়োমগুলি সুবিশাল অঞ্চলব্যাপী দেখা যায় ; যেমন, একটি সম্পূর্ণ মরুভূমি, বনভূমি, তৃণভূমি ইত্যাদি।

উদ্ভিদ-ভূগোলবিদেরা বায়োমের অন্তর্গত সবুজ উদ্ভিদের বিভিন্ন জীবন সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করে। জীবনের বিভিন্ন রূপ বা আকার হল প্রধানত বড়ো গাছ, ঝোপ, লিয়ানা, তৃণজাতীয় গাছ ইত্যাদি, কিন্তু জীবনের অন্যান্য রূপগুলির নির্দিষ্ট বায়োমের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ (এ. এন. স্ট্রলার ও এ. এইচ স্ট্রলার 1976)।

যাই হোক, বায়োম হল প্রকৃতপক্ষে একটি সুবিশাল প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র, যার মধ্যে আমরা উদ্ভিদ ও জীবজন্তু গোষ্ঠীগুলির সমাবেশ (assemblage) সম্পর্কে পাঠ বা বিশ্লেষণ করে থাকি।

6.3.1 ক্রান্তীয় বায়োম (Tropical Biome)

এই অংশটিতে আমরা প্রথমে ক্রান্তীয় বায়োম সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছুটা আলোচনা করার পর ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বায়োম এবং ক্রান্তীয় তৃণভূমি বায়োম বা সাভানা বায়োম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

ক্রান্তীয় বায়োম বলতে নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত স্বাভাবিক উদ্ভিদ, পশুপাখি ও মানুষকে বোঝায়। ক্রান্তীয় বায়োম তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা—

(1) ক্রান্তীয় অরণ্য বায়োম—এই বায়োম আবার ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা (A) চিরহরিৎ বৃষ্টি অরণ্য বায়োম, (B) প্রাক-চিরহরিৎ অরণ্য বায়োম, (C) পর্ণমোচী অরণ্য বায়োম, (D) প্রায় পর্ণমোচী অরণ্য বায়োম, (E) পার্বত্য অরণ্য বায়োম, (F) জলাভূমি অরণ্য বায়োম।

(2) সাভানা বায়োম—এই বায়োম আবার দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা—(A) সাভানা অরণ্য বায়োম ও (B) সাভানা তৃণভূমি বায়োম।

(3) মরু বায়োম—এই বায়োম দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা—(A) শুষ্ক মরু বায়োম ও (B) অর্ধশুষ্ক বায়োম।

$\frac{1°}{2}$ সাধারণত ক্রান্তীয় অঞ্চল বলতে কর্কটক্রান্তি ($23\frac{1°}{2}$ উঃ) ও মকরক্রান্তি (23 দঃ) অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলকে বোঝালে ও বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনার জন্য এই সমীকরণ খুব যুক্তিযুক্ত নয় কারণ ক্রান্তীয় পরিবেশ দুই ক্রান্তীয় রেখার উভয় দিকেও কমবেশি পাওয়া যায়। ফলে ক্রান্তীয় বায়োম বলতে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয়—দুই অঞ্চলকেই বোঝায়, যা 30°-35° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। Furely ও Newey -এর (1983) মতে, ক্রান্তীয় বায়োমের আক্ষরিক অর্থ হল দুই ক্রান্তীয় রেখার মধ্যে বিভিন্ন পারস্পরিক সম্পর্কিত জীবগোষ্ঠীর একত্র অবস্থান। পরবর্তী অংশটিতে ‘ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বায়োম’ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

6.3.1.1 ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃষ্টি অরণ্য বায়োম (Tropical Evergreen Rain-Forest Biome)

‘ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃষ্টি অরণ্য বায়োম’ প্রকৃতপক্ষে ক্রান্তীয় অরণ্য বায়োমের একটি অন্যতম শ্রেণি। ক্রান্তীয় অরণ্য বায়োমের অরণ্যগুলির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য প্রধানত প্রাপ্ত জলের পরিমাণ ও বন্টনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেহেতু ক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রাপ্ত জলের পরিমাণ এবং এর স্থানগত ও সময়গত বন্টনের পার্থক্যের প্রসর (range) অনেক বেশি, তাই এই অঞ্চলে স্বাভাবিক উদ্ভিদের ব্যাপক পার্থক্য ঘটতে

দেখা যায়। ফলে ক্রান্তীয় অঞ্চলে দেখা যায় চিরসবুজ প্রায় চিরসবুজ, পর্ণমোচী অথবা জেরোফাইট জাতীয় উদ্ভিদ। কিন্তু ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বায়োম আলোচনা করতে গিয়ে আমরা চিরসবুজ অরণ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করব।

এই অরণ্যের মাটিতে সারাবছর জল বা রস থাকে বলে গাছের সব পাতা একসঙ্গে ঝরে যায় না, তাই একে চিরহরিৎ অরণ্য বলে, আবার অরণ্য সৃষ্টিতে বৃষ্টিপাতের ভূমিকা খুব বেশি থাকে বলে একে বৃষ্টি অরণ্য বলে। ক্রান্তীয় চিরসবুজ বৃষ্টি অরণ্য বায়োম গাছপালা ও পশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশগত অবস্থা থাকে, কারণ এখানে সারাবছর বেশি বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা দেখা যায়, যা গাছের স্বাভাবিক ও অবিরাম বৃদ্ধিকে নিশ্চিত করে।

অবস্থান — সাধারণত এই বৃষ্টি অরণ্য বায়োম উভয় গোলার্ধের 10° উত্তর ও 10° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে প্রধানত দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকা, মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা, ইন্দোমালয়েশিয়ান অঞ্চলের দক্ষিণ ভারত, সুমাত্রা, জাভা, শ্রীলঙ্কা, বোর্নিও, মালয়েশিয়া ও গিনিতে সবচেয়ে বেশি বিকাশ লাভ করে। এমনকি নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে বহুদূরে ও এই বায়োম দেখা যায়। যেমন, মেক্সিকোর ভেরাক্রুস (19° উ.) পর্যন্ত এবং দক্ষিণ আমেরিকার 30° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত এই বায়োম বিস্তৃত।

চিত্র 1 ঃ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য বায়োমের বন্টন

জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য—ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এতে কোনো বৈচিত্র্য নেই। এখানকার প্রতিদিনকার আবহাওয়া প্রায় একই ধরনের হয়। সারাদিন তাপ খুব বেশি থাকে এবং বিকালে ঝড় ও বজ্রসহ বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চলে সূর্যরশ্মি সারাবছর লম্বভাবে পড়ে এবং দিন ও রাত্রি প্রায় সমান হয়। এখানে কোনো ঋতু পরিবর্তন নেই, এখানকার একমাত্র ঋতু হল আর্দ্র গ্রীষ্ম ঋতু।

এই বায়োমের অধিকাংশ অঞ্চলের বার্ষিক বৃষ্টিপাত 2000 মিঃ মিঃ বা তার বেশি। বছরের 2/3 মাস ছাড়া প্রায় প্রতি মাসে কমপক্ষে 200 সেমি. বৃষ্টি হয়। নিরক্ষরেখা থেকে দূরত্ব অনুসারে কয়েকটি মাসে শুষ্কতা বেড়ে যায়। এখানে সারাবছর তাপমাত্রা খুব বেশি থাকে। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা 20° সে.-এর বেশি হলেও সর্বাধিক তাপমাত্রা প্রায় 30° সেঃ পর্যন্ত হয়ে থাকে। সূর্য সারাবছর মাথার ওপর কিরণ দেয় বলে দিন ও রাত্রির মধ্যে দৈর্ঘ্যের পার্থক্য কম। এখানকার উষ্ণতার বার্ষিক প্রসর মাত্র 1° সেঃ বা তার কম। তবে উষ্ণতার দৈনিক প্রসর হয় 5° থেকে 10° সে:। প্রায় প্রতিদিন বিকাল 2টা থেকে 4টার মধ্যে কিউমুলোনিম্বাস মেঘ থেকে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা সাধারণত 80%-এর বেশি হয়।

দীর্ঘতম গাছগুলির চাঁদোয়ার উপরের দিকে সর্বাধিক সূর্যোলোক পতিত হয় এবং এই পরিমাণ নীচের দিকে কমে যায় এবং তলদেশে সবচেয়ে কম আলো পতিত হয় ও অন্ধকারাচ্ছন্নতার সৃষ্টি হয়। ফলে $\frac{1}{3}$ বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে সূর্যালোক পাবার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সর্বোচ্চ চাঁদোয়াটি ও লতা দিয়ে আবৃত থাকে এবং ফলে ওই চাঁদোয়ার পাতাগুলি সেখানে পৌঁছালে যেটি সূর্যালোকের কেবলমাত্র 25% গ্রহণ করে, আর চাঁদোয়ার নীচের অংশটি যেটি সূর্যালোকের মাত্র 3% গ্রহণ করে।

এমনকি বায়ুর গতি ও উচ্চতম চাঁদোয়া থেকে নীচের দিকে কমে যায়, কিন্তু বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাণ উচ্চতম চাঁদোয়া থেকে নীচের দিকে বাড়ে, কারণ বাষ্পীভবন ক্রমশ নীচের দিকে কমতে থাকে।

সূর্যালোকের অভাবে বনের তলদেশের কাছে বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারাগাছের বৃদ্ধি খুবই ধীরগতিতে হয় এবং গাছে পাতা ও ফুল খুবই কম পাওয়া যায়। উচ্চতম চাঁদোয়া বৃষ্টির জলের ফোঁটাগুলিকে বাধা দেয় এবং ওই জল গাছ বেয়ে মাটিতে নেমে আসে। তবে উচ্চতম স্তরে পতিত মোট জলের মাত্রা   ভাগ মাটিতে নামে, বাকি অংশ পথেই বাষ্পীভূত হয়। এই বায়োমের গাছগুলি সাধারণভাবে নিরক্ষীয় জলবায়ু দ্বারা প্রভাবিত হলেও এমনকি বনের উল্লম্ব স্তরগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম জলবায়ুগত পার্থক্য দেখা যায়।

উদ্ভিদ প্রজাতির গঠন — ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃষ্টি অরণ্য বায়োমে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রজাতির গাছ দেখতে পাওয়া যায়। যদিও এই বায়োমের সর্বত্র উদ্ভিদের গঠন ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মিল বা সঙ্গতি লক্ষ করা যায়, কিন্তু এখানে উদ্ভিদ প্রজাতির গঠনের ক্ষেত্রে বেশ বৈচিত্র্যও রয়েছে। বায়োমটির বিভিন্ন

অংশে অসংখ্য প্রজাতির গাছ রয়েছে। যেমন, পশ্চিম আফ্রিকার কঙ্গো উপত্যকায় প্রায় 600/7000 প্রজাতির সপুষ্পক (flowering) গাছ দেখা যায়। মালয়েশিয়া, ব্রাজিল ও পানামা খাল অঞ্চলে যথাক্রমে 20,000, 40,000 ও 2000 প্রজাতির সপুষ্পক গাছ পাওয়া যায়।

নীচের ছকটির সাহায্যে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃষ্টি অরণ্য বায়োমের বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃষ্টি অরণ্য

- অরণ্য বৃক্ষ
- তৃণজাতীয় গাছ
- লতা গাছ
- পরাশ্রয়ী গাছ বা এপিফাইট
- শ্বাসরোধকারী গাছ
- ছত্রাকজাতীয় গাছ
- পরজীবী গাছ

গাছগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

(1) অরণ্য বৃক্ষ— এই লম্বা গাছগুলি হল ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যের প্রধান স্বাভাবিক উদ্ভিদ। এই অঞ্চলে এত বেশি রকমের বড়ো গাছ দেখা যায় এবং এদের বৈশিষ্ট্য এত বেশি যে, নিরক্ষীয় অঞ্চলের প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় 40 থেকে 100 প্রজাতির গাছ দেখা যায় এবং মোট গাছের প্রায় 70% হল এই ধরনের। রোজউড, আয়রনউড, কোকো, সিঙ্কোনা, আবলুস, রবার, মেহগিনি প্রভৃতি হল অন্যতম কয়েকটি গাছ। এদের কাঠ খুব শক্ত হয়।

(2) তৃণজাতীয় গাছ—এই গাছগুলির স্তর খুব ঘন নয় এবং সূর্যালোক এই স্তরের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে। সাধারণত সবুজ বাদামি রঙের গাছগুলি কোনো নির্ভরতা ছাড়াই বাঁচে। শুষ্ক পাহাড়ি অঞ্চলে তৃণজাতীয় গাছগুলি লম্বা হলেও জলাভূমি ও আর্দ্র অঞ্চলে এগুলি জলজ ও ফার্ন জাতীয়। উন্মুক্ত ভূভাগে অথবা নদীর বুকে বা তীরে এবং যেখানে সূর্যালোক প্রবেশ করে, সেখানে তৃণজাতীয় গাছ বেশি জন্মায়। বেশি ঢালযুক্ত অঞ্চলেও এই গাছ দেখা যায়। এই গাছের পাতাগুলি সাধারণত সরু, পাতলা ও বিভিন্ন আকৃতির হয়।

(3) লতাগাছ— এই বায়োমের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ হলো লতাগাছ। এরা পরনির্ভর এবং Vine শ্রেণির। এগুলি সূক্ষ্ম সুতো জাতীয় লতা থেকে শুরু করে মোটা ও লম্বা তারের মতো দেখতে হয়। আলোর খোঁজে লতাগুলি বিভিন্ন গাছ বেয়ে চাঁদোয়ার সর্বোচ্চ অংশে পৌঁছে যায়। বিভিন্ন গাছের ডালপালা ও পাতাগুলিকে লতাগুলি এমনভাবে জড়িয়ে ফেলে যে, এর মধ্য দিয়ে চলাফেরার রাস্তা বা আলো ঢোকার কোনো সুযোগ থাকে না। পৃথিবীর সমস্ত লতাজাতীয় গাছের প্রায় 90% এই অরণ্যে রয়েছে। পি. ডব্লু. রিচার্ডসের (1952) মতে, লতাগাছগুলি দুই শ্রেণির হয়। যথা

(A) বলের নীচের স্তরের লতাগাছ ও (B) লম্বা কাঠবিশিষ্ট লতা বা লিয়ানা (Liana), যা প্রায় সব স্তরেই থাকে। প্রায় 20 সেমি বা তার বেশি পরিধিবিশিষ্ট এবং প্রায় 240 মিটার বা তার বেশি লম্বা কাঠ জাতীয় লতার পাতাগুলিকে অনেকটা মুকুটের মতো দেখায় এবং বনে আলো ঢুকতে বাধা দেয়।

(4) এপিফাইট বা পরাশ্রয়ী গাছ—এপিফাইটগুলি অন্য কোনো গাছের উপরে বা দেহে জন্মে, কিন্তু এরা পরজীবী নয়। এদের শিকড় সাধারণত মাটিতে প্রবেশ করে না, এবং বায়ুস্তর থেকে এরা খাদ্য সংগ্রহ করে। যে কোনো উদ্ভিদস্তরে, উদ্ভিদদেহের যে কোনো অংশে এরা জন্মে। অনেক সময় উপরের দিকে বেড়ে আলোর খোঁজে এরা সর্বোচ্চ অংশে পৌঁছে যায়। এই এপিফাইটগুলি ছোটো ছোটো অনেক প্রাণীর (যেমন কেঁচো, পিঁপড়ে, উই, ফড়িং, মাকড়সা, গেছোব্যাং, গিরগিটি, সাপ, বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ও তাদের ডিম) আবাসস্থল হিসাবে কাজ করে। অর্কিড জাতীয় গাছ ছাড়া মস, লাইকেন, অ্যালগি প্রভৃতিও এখানে জন্মে। এই প্রজাতির কিছু গাছ অত্যাধিক সূর্যালোকে সর্বোচ্চ স্তরের উপরে, কিছু গাছ মাঝারি সূর্যালোকে সর্বোচ্চ স্তরের নীচের দিকে, আবার কিছু গাছ ছায়াতে জন্ম নেয়।

দৈহিক গঠন অনুসারে এপিফাইটকে চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

(a) হোলো-এপিফাইট—যাদের মূল তলদেশে পৌঁছায় না।

(b) হেমি-এপিফাইট—যেগুলি বেড়ে লতাগাছের রূপ নেয় এবং শিকড় বেড়ে মাটিতে পৌঁছে যায়।

(c) ছদ্ম এপিফাইট—যেগুলি ভূমির উপরে জন্মে, উপরের দিকে বাড়ে এবং গাছের কাণ্ড ও শাখাতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে।

(d) সেমি-এপিফাইট—যারা লতাজাতীয় এবং বিভিন্ন স্বভোজী উদ্ভিদের দেহ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে।

আকার অনুসারে এপিফাইটকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

(a) ম্যাক্রো এপিফাইট— ফার্ন, মোপঝাড় ইত্যাদি

(b) মাইক্রো এপিফাইট—মস, লাইকেন, অ্যালগি ইত্যাদি।

(5) শ্বাসরোধকারী গাছ—এই গাছগুলি এপিফাইট হিসেবে জীবন শুরু করলেও পরে শিকড়কে মাটির মধ্যে স্থাপন করে। অনেক সময় এরা আশ্রয়দাতা গাছকেই মেরে ফেলে। এরা স্বাধীনজীবী গাছ ও পরজীবী গাছের মাঝামাঝি অবস্থায় রয়েছে।

(6) ছত্রাকজাতীয় গাছ—সাধারণত পচনশীল গাছের দেহে এগুলি জন্মায় ও বেঁচে থাকে। বনের নীচে ঘন গাছের ছায়ায় যেখানে প্রচুর মৃত পাতা, ডালপালা প্রভৃতি সঞ্চিত হয় এবং পচে যায়, সেখানে ছত্রাক বেশি জন্ম নেয়। তাছাড়া গাছের দেহের গর্তে বা গাছের

ডালপালার কোণে অথবা পরজীবী গাছের পাশে অনেক ছত্রাক জাতীয় গাছ দেখা যায়।

(7) পরজীবী গাছ— সাধারণত দু ধরনের পরজীবী গাছ এই অরণ্যে দেখা যায়। যথা—(a) শিকড় পরজীবী—এগুলি ভূমি বা মাটির উপরে জন্মায় ও (b) পরজীবী ধরনের গাছ—এগুলি অর্কিড জাতীয় গাছের মতো বড়ো গাছের উপরে জন্মায় এবং ওই আশ্রয়দাতা গাছের দেহ থেকে খাদ্য গ্রহণ বা রস শোষণ করে বেঁচে থাকে। প্রথমটির সংখ্যা কম হলেও দ্বিতীয় শ্রেণির পরজীবী গাছগুলি সংখ্যায় অনেক বেশি ও ঘন হয়।

উদ্ভিদের উল্লম্ব স্তরবিন্যাস ঃ

ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বায়োমের গাছগুলির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল "উলম্ব স্তরবিন্যাস"। প্রধানত জলবায়ুগত কারণে বনের তলদেশ থেকে বড়ো গাছগুলির সর্বোচ্চ অংশ পর্যন্ত উদ্ভিদের কয়েকটি উল্লম্ব স্তর দেখা যায়। যথা—

(1) প্রথম সর্বোচ্চ স্তর—বনের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ও ঝাঁকড়া গাছগুলির উপরের অংশগুলি একটি ছাতা বা চাঁদোয়ার মতো আকৃতির সৃষ্টি করে। এই স্তরটি সবচেয়ে বেশি সূর্যালোক গ্রহণ করে এবং বৃষ্টিকে বাধা দেয়। এই স্তরের গাছগুলির উচ্চতা 30 মিটার থেকে 60 মিটার এবং উপরের তলটি তরঙ্গায়িত। এই স্তরটি ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ-স্তর।

(2) দ্বিতীয় স্তর— সর্বোচ্চ স্তরটির নীচে গঠিত এই চাঁদোয়া স্তরটির (Canopy layer) উচ্চতা প্রায় 25 মিটার থেকে 30 মিটার। এই স্তরটি অরণ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

(3) তৃতীয় স্তর— স্তরটি অপেক্ষাকৃত ছোটো গাছগুলি নিয়ে গঠিত, যাদের চাঁদোয়া মাটি থেকে প্রায় 15-20 মিটার উঁচু। এই স্তরের গাছগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, আগেকার দুটি স্তরের চেয়ে এই স্তরের গাছের পাতাগুলি বড়ো আকারের হয়। এই বড়ো পাতাগুলি অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ সূর্যালোক ধরে রাখতে পারে সাধারণভাবে এই স্তরটিতে যার পরিমাণ বেশ কম থাকে।

(4) চতুর্থ স্তর— এই স্তরটি বিভিন্ন গুল্মের ঝোপ দিয়ে গঠিত এবং আগেকার তিনটি স্তরের নীচে অবস্থিত। এই স্তরটি অবিচ্ছিন্ন নয়, বরং বৈশিষ্ট্যে এই স্তরটি বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত। স্তরটিতে কিছু ছোটো চারাগাছ থাকে। তবে চারাগাছগুলি স্তরটির স্থায়ী সদস্য নয় কারণ এগুলি তাড়াতাড়ি লম্বা হয়ে অন্য স্তরে পৌঁছে যায়। এই তৃণ ও ঝোঁপবিশিষ্ট স্তরটিতে কিছু ক্ষুদ্রাকার গাছ দেখা যায়, যাদের চাঁদোয়ার সর্বাধিক উচ্চতা হল মাটি থেকে প্রায় 5 মিটার।

(5) পঞ্চম বা সর্বনিম্ন স্তর—যেসব গাছ ভূপৃষ্ঠ জন্মায় ও বেড়ে ওঠে, কিন্তু কখনোই 1-2 মিটারের বেশি উচ্চতা বিশিষ্ট হয় না, সেগুলি এই স্তরের অন্তর্গত। বিভিন্ন প্রজাতির তৃণজাতীয় গাছ ও ফার্ণজাতীয় গাছ এই স্তরে জন্মায়। আলোর অভাবে স্তরটিতে উক্ত গাছগুলির ঘনত্ব এবং প্রজাতির সংখ্যা বেশ কম থাকে।

প্রাণীগোষ্ঠী— ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বায়োমের পশুপাখিদের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি অন্যান্য বায়োমে দেখা যায় না। যেমন, (i) সারাবছর ধরে গাছের নিয়মিত বৃদ্ধি এবং এর ফলে জীবজন্তুদের জন্য প্রচুর খাদ্যের নিয়মিত যোগানের অভাব হয় না। খাদ্যের জন্য প্রাণীদের প্রচরণ করতে হয় না, অর্থাৎ এই বায়োমের জীবজন্তুদের সচলতা (mobility) বেশ কম। (ii) সারা দিনরাত্রি জুড়ে (24 ঘণ্টা) বনের মধ্যে জীবজন্তুদের ক্রিয়াকলাপ দেখা যায়। কারণ বনের বিভিন্ন উল্লম্ব স্তরে বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তু বাস করে। কিন্তু প্রাণী দিনের বেলায়, আবার কিছু প্রাণী রাত্রিতে সক্রিয় থাকে। এই বৃষ্টি অরণ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এখানে সবসময় হৈ-হল্লা হতে থাকে এবং বায়োমটি সবসময় জীবন্ত থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকায় দিনের বেলায় বনের তলদেশের জৈব-পরিবেশ বিভিন্ন প্রাণীদের যেমন, ব্রাকেট হরিণ, কোয়াটিমুন্ডিস (শাকাশী প্রাণী) এবং হনুমানের আনাগোনা ও লাফালাফিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। উপরের স্তরটি বিভিন্ন পাখির (tinamous, humming birds প্রভৃতি) কলকাকলিতে জীবন্ত হয় এবং বিভিন্ন রঙিন humming bird ও প্রজাপতি নীচের স্তরের পরিবেশকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া অসংখ্য গিরগিটি ও অন্যান্য আরোহণকারী প্রাণী বিভিন্ন উল্লম্ব স্তরের শাখা ও কাণ্ড দিয়ে ওঠানামা করে। বিভিন্ন পশু যেমন, silky ant eater, wooly opposum, kinkajous, armadillos এবং জাগুয়ার থেকে পেঁচা পর্যন্ত বিভিন্ন শিকারী প্রাণী রাত্রে খাদ্য অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে। সকাল ও সন্ধ্যায় বিভিন্ন পশু, পাখি প্রভৃতি (যেমন হাউলার হনুমান, পায়রা, প্যারকিট, গেছো ব্যাং, অপথোপটেরা প্রভৃতি) প্রচুর শব্দ সৃষ্টি করে এবং বনভূমিকে জীবন্ত করে রাখে।

ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বায়োমের গাছগুলির উল্লম্ব স্তরবিন্যাস বনের বিভিন্ন স্তরের জীবজন্তুকে প্রভাবিত করে। এখানকার অধিকাংশ জন্তু গাছে বসবাসকারী বা Arboreal। কিছু প্রাণী যেমন গেছো ব্যাং, গেছো সাপ, শিয়াল, মাকড়সা প্রভৃতি এখানকার খুব গুরুত্বপূর্ণ জীব। মাটির উপরকার জন্তুগুলি ঘন গাছপালা, ঝোপ ও লতাগাছের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করে। স্তন্যপায় প্রাণীগুলি আয়তনে বড়ো ও শক্ত দেহবিশিষ্ট বলে তারা ঘন জঙ্গল সরিয়ে অগ্রসর হয়। এই প্রাণীগুলির

মধ্যে শিম্পাজী, গরিলা, বাইসন, আফ্রিকান হাতি, চিতাবাঘ, শূকরের বিভিন্ন প্রজাতি অন্যতম। মাটির উপরকার কিছু জীব ছোটো আকারের হয় এবং ঘন বনের মধ্য দিয়ে দ্রুত চলাফেরা করে। তৃতীয় শ্রেণির জীবগুলি হল লুক্কায়িত ছোটো প্রাণী, যেগুলি ক্রিপটোজোয়িক শ্রেণির।

বনের নীচের স্তরের চেয়ে উপরের স্তরগুলিতে সূর্যালোক অপেক্ষাকৃত বেশি পৌঁছায় এবং খাদ্যের যোগান অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। ফলে ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বায়োমে উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে জীবজন্তুর সংখ্যা, ঘনত্ব ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। উদ্ভিদের উল্লম্ব স্তরবিন্যাস এই অরণ্যে প্রাণীদের উল্লম্ব স্তরবিন্যাসের সৃষ্টি করে। জে. এল. হ্যারিসন (1962) এই অরণ্যের জীবজন্তুদের নিম্নলিখিত ছয়টি স্তরে বিভক্ত করেছেন। যথা—

(1) সর্বোচ্চ অংশের প্রাণীগোষ্ঠী—

চাঁদোয়ার সর্বোচ্চ অংশে পতঙ্গভুক পাখি ও বাদুড় থাকে, কিন্তু এদের খুব কম প্রজাতি-ই মাংসাশী পাখিগুলি দ্রুত উড্ডীয়মান প্রজাতির (যেমন, এশিয়ান ফ্যালকোনেট, সুইফটস্, সোভিক্টলেট প্রভৃতি)।

(2) প্রধান চাঁদোয়ার প্রাণীগোষ্ঠী—

সবচেয়ে লম্বা গাছগুলির চাঁদোয়াতে অবস্থানকারী পাখি ও বাদুড়গুলি এই গোষ্ঠীভুক্ত। আমাজন বৃষ্টি অরণ্যের এই অংশের অন্যতম প্রাণীগুলি হল টাউকান, পারাকিট, বারবেট, কটিনগাস, কিউরাসো, বিল পাখি প্রভৃতি। এছাড়া কিছু কাঠবেড়ালি, শাকাশী হনুমান প্রভৃতিও পাওয়া যায়।

(3) মধ্যাঞ্চলের উড্ডীয়মান প্রাণীগোষ্ঠী—

প্রধানত উড়ন্ত পাখি, পতঙ্গভুক বাদুড় প্রভৃতি এই শ্রেণিভুক্ত।

(4) মধ্যাঞ্চলের আরোহণকারী প্রাণীগোষ্ঠী—

প্রাণীগুলি গাছের কাণ্ড ও লতাগাছের মাধ্যমে নীচের স্তর থেকে উপরের স্তরে আরোহণ করে। এখানে শাকাশী ও মাংসাশী—উভয় শ্রেণীর প্রাণী দেখা যায়। ইঁদুর জাতীয় মৃদ্ভেদী প্রাণীদের মধ্যে Squirel ও Civert প্রধান। এগুলি হল স্তন্যপায়ী প্রাণী। প্রায় জালের মতো দেখতে অসংখ্য লতাগাছ বিভিন্ন উল্লম্ব স্তরের মধ্যে ওঠানামা করতে আরোহণকারী প্রাণীদের সাহায্য করে। লতাগাছগুলি কিছু প্রাণীর স্বাভাবিক আবাস হিসেবে কাজ করে।

(5) ভূমির উপরিভাগে বৃহদাকার প্রাণীগোষ্ঠী—

এখানে বৃহদাকার ও শক্তিশালী প্রাণী এবং কিছু পাখি বাস করে। তৃণভোজী

প্রাণীদের সংখ্যা এখানে কম এবং ইঁদুর হরিণ প্রভৃতি এখানকার প্রধান জীব। গাছের মূল খেয়ে অনেক শূকর বেঁচে থাকে। অন্যান্য অঞ্চলের বৃহত্তম প্রাণীর চেয়ে এখানকার বৃহত্তম প্রাণী আকারে বেশ ছোটো, কারণ বড়ো জন্তুগুলি বনের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করতে পারে না। তবে ছোটো হলেও এরা শক্তিশালী হয়। এখানকার হাতিগুলির সাভানা অঞ্চলের হাতিগুলির চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোটো।

(6) ভূমির উপরিভাগে ক্ষুদ্রাকার প্রাণীগোষ্ঠী—

এই অংশে অসংখ্য ছোটো প্রাণী, সূক্ষ্ম জীবাণু ও কীট থাকে। এখানকার বেশির ভাগ প্রাণী হল পতঙ্গভুক (Argus Pheasant, Fowl, Peacock প্রভৃতি।

ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বায়োমের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা অন্যান্যদের চেয়ে বেশি। প্রায় 13% ভৌগোলিক অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করলেও বিশ্বের নিট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতার 40% এই অরণ্যে পাওয়া যায়। বছরপ্রতি প্রতি বর্গ মিটার জমিতে এই বায়োমের গড় নিট প্রাথমিক উৎপাদনের পরিমাণ হল 5000 শুষ্ক গ্রাম (drygram)। মোট জীবভর ও মোট প্রাথমিক উৎপাদনের সর্বাধিক অংশ হল কাঠ। এই বায়োমের উদ্ভিদ প্রজাতিগুলির মধ্যে কমবেশি প্রায় একই বৈশিষ্ট্য এবং একই ধরনের জীবনরূপ দেখা যায়। মানুষ তার ক্রমাগত বৃদ্ধি শীল ও অবিবেচনাপ্রসূত অর্থনৈতিক ও কাজকর্মের মাধ্যমে এই জীবসমৃদ্ধ বায়ুসংস্থানের ক্ষতি করতে শুরু করেছে। আমাজন বৃষ্টি অরণ্যের একটি বড়ো অংশ। খননকাজ, শিল্প ও কৃষিকাজ প্রসারের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাজন বা তার উপনদীগুলির উপরে বড়ো, বাঁধ ও জলাশয় তৈরির ফলে ঘন অরণ্য ধ্বংস পেয়েছে এবং বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য ধ্বংস করেছে। তাছাড়া অন্যান্য বৃষ্টি অরণ্য বায়োমের মধ্যে মানুষের অনুপ্রবেশের ফলে এবং জনপদ প্রসারের ফলে উদ্ভিদ ও জীবজন্তু ধ্বংস হয়ে চলেছে।

6.3.1.2 ক্রান্তীয় তৃণভূমি বায়োম বা সাভানা বায়োম

'সাভানা শব্দটি বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করলেও, 'সাভানা অঞ্চল' বলতে জলবায়ুবিদেরা একটি বিশেষ ধরনের জলবায়ু অঞ্চলকে বুঝিয়েছেন। সাভানা জলবায়ু বলতে বোঝায় ক্রান্তীয় আর্দ্র ও শুষ্ক জলবায়ুকে, যা কোপেন-এর শ্রেণিবিভাগ অনুসারে Aw প্রকৃতির। আবার উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের কাছে সাভানা হল ক্রান্তীয় অঞ্চলের দীর্ঘ ও ঘন সন্নিবিষ্ট তৃণভূমি অঞ্চল। সাধারণ ভাবে সাভানা বায়োম বলতে ক্রান্তীয় অঞ্চলের এমন উদ্ভিদগোষ্ঠীকে বোঝায়, যার তলদেশে কিছু জেরোমরোফিক (Xeromorphic) লতাজাতীয় গাছ রয়েছে, উচ্চ স্তরে রয়েছে কিছু বিক্ষিপ্ত বড়ো গাছ এবং মধ্য স্তরে রয়েছে বিক্ষিপ্ত কিছু ঝোপ।

উভয় গোলার্ধে প্রায় 10°-20° অক্ষাংশের মধ্যে সাভানা বায়োম বিস্তৃত। দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া ও ভেনিজুয়েলার ("ল্যানো"), দক্ষিণ-মধ্য ব্রাজিল ও প্যারাগুয়েতে, মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকায় (প্রধানত

সুদানে), মধ্য আমেরিকার পার্বত্য অঞ্চলে, অস্ট্রেলিয়ায় এবং ভারতের কিছু অংশে সাভানা বায়োম বা ক্রান্তীয় তৃণভূমি বায়োম অবস্থিত।

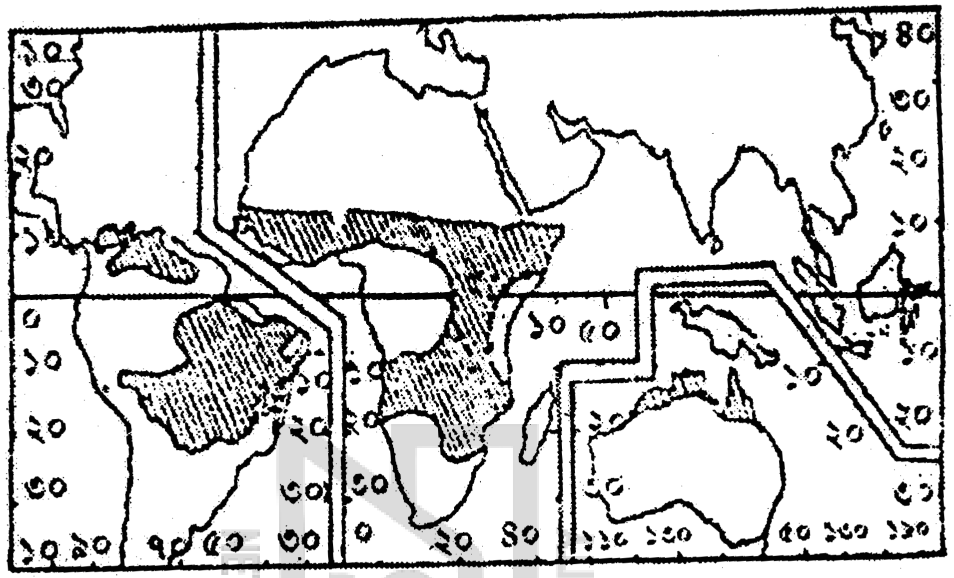

চিত্র 2 : সাভানা বায়োমের বন্টন

ভারতের এই সাভানা অবশ্য প্রকৃত সাভানার মতো নয় এবং পর্ণমোচী বনভূমির মধ্যে মানুষের অনুপ্রবেশের ফলে বৃক্ষচ্ছেদনের মাধ্যমে অরণ্য ধ্বংস হয়েছে ও তৃণভূমির সৃষ্টি হয়েছে।

বেশির ভাগ বিজ্ঞানীদের মতে, বিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের অনুপ্রবেশ, হস্তক্ষেপ ও পরিবর্তনের মাধ্যমে সাভানা বায়োমের সৃষ্টি হয়েছে। বৃক্ষচ্ছেদন, দাবানল, অত্যধিক পশুচারণ প্রভৃতি সাভানা বায়োম সৃষ্টির ও বিবর্তনের প্রধান কারণ। ভারতীয় সাভানা অঞ্চলগুলিতে পৃথিবীর অন্যান্য সাভানা অঞ্চলের মতো ঘাসের প্রাধান্য নেই, বরং ঝোপঝাড়ের প্রাধান্য আছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, সাভানা বায়োম হল বিভিন্ন জটিল উপাদানগত বৈশিষ্ট্যর (যেমন জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য, ভূমিরূপের ইতিহাস, দাবানল, চারণকারী পশুদের উদ্ভব, বিবর্তন এবং প্রধান স্বাভাবিক উদ্ভিদের উপর তাদের প্রভাব এবং সর্বোপরি মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি) সমষ্টিগত ফল।

জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য— সাভানা বায়োম-এর জলবায়ু বলতে সুস্পষ্ট আর্দ্র ও শুষ্ক ঋতুগত বৈচিত্র্যকে বোঝায়। এই জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, প্রায় সারাবছর ধরে গড় তাপমাত্রা খুব বেশি থাকে এবং যথেষ্ট পরিমাণে সৌররশ্মির তাপীয় ফল (insolation) অনুভূত হয়। সাভানা অঞ্চলের মরু সীমান্তে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত হয় প্রায় 250 থেকে 500 মি.মি.। এবং এর নিরক্ষীয় জলবায়ু সীমান্তে হয় প্রায় 1300

থেকে 2000 মি.মি.। বছরের কোনো মাসেই গড় উষ্ণতা 20° সে.মি. এর নীচে নামে না। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার মিলিত প্রভাবের ভিত্তিতে সারাবছর তিনটি ঋতু দেখা যায়। যথা—

(1) শীতল শুষ্ক ঋতু— এই সময়ে দিনের তাপমাত্রা বেশি হয় (26°-32° সেঃ), কিন্তু রাতের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হয় (প্রায় 21° সেঃ)।

(2) উষ্ণ শুষ্ক ঋতু— প্রায় উল্লম্ব সূর্যকিরণের ফলে সূর্যরশ্মির তাপীয় ফল বেশি হয় এবং উষ্ণতা 32° সেঃ থেকে 38° সেঃ হয়।

(3) উষ্ণ আর্দ্র ঋতু— মোট বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রায় 80% থেকে 90% এই ঋতুতে পাওয়া যায়।

বিশ্বের বিভিন্ন সাভানা অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাতের বন্টনগত তারতম্য দেখা যায়। এর প্রধান কারণ দুটি। যথা—(a) নিরক্ষরেখা থেকে দূরত্ব ও (b) ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য। যেমন, ব্রাজিলের সাভানা অঞ্চলের (স্থানীয় নাম 'সেরাডো') উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1300 মি.মি. এবং এখানকার গড় বার্ষিক তাপমাত্রা 20° সেঃ—26° সেঃ এবং গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত 750 মিমি-2000 মি.মি.। কলম্বিয়ার 'ল্যানো'-এর গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত 2000 মি.মি.—4000 মি. মি. (আন্দিজ পর্বতের কাছে) এবং গড় বার্ষিক তাপমাত্রা 22° সেঃ এবং সর্বাধিক তাপমাত্রা 32° সেঃ। আবার ভারতীয় সাভানা অঞ্চলে মে মাসে উষ্ণতা বেড়ে হয় 45° সেঃ—48° সেঃ এবং জানুয়ারি মাসে তা কমে হয় 5° সেঃ বা তার কম এবং মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় 80%–90% হয়। 15ই জুন থেকে 15 সেপ্টেম্বরের মধ্যে (বার্ষিক গড় 15,000 মি. মি.)।

স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য—ঘাসের সাথে কিছু সংখ্যক গাছ জন্মালেও সাভানা বা ক্রান্তীয় তৃণভূমি বায়োম অঞ্চল সাধারণত দীর্ঘ ও ঘন ঘাসে আচ্ছাদিত। সাভানা উদ্ভিদগোষ্ঠীতে ত্রিস্তরীয় গঠন সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। যথা—

(1) সর্বনিম্ন বা ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন স্তর—

এই স্তরে বিভিন্ন ধরনের ঘাস জাতীয় গাছ দেখা যায়। ঘাসগুলি খুব ঘন, শক্ত ও গড়ে প্রায় 40 সে.মি. লম্বা হয়। অবশ্য কিছু কিছু ঘাস প্রায় 350 সে.মি. পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। 'আফ্রিকান এলিফ্যান্ট' নামের এক ধরনের ঘাসের উচ্চতা হয় প্রায় 500 সে.মি.। এই ঘাসের পাতা হয় প্রায় চ্যাপটা আকৃতির, যেগুলি শুষ্ক ঋতুতে ঝরে যায়। আবার আর্দ্র ঋতুতে জন্ম নেয়। সাভানা ঘাসগুলি গুচ্ছাকার হয় এবং ভূমিভাগের সর্বত্র ঘাসে ঢাকা থাকে না। তৃণভূমির মাঝে মাঝে উন্মুক্ত অঞ্চলও দেখা যায়। সাভানা ঘাসের শিকড়গুলি ঘন, সূক্ষ্ম ও গুচ্ছাকার হয় এবং মাটির মধ্যে এমনকি প্রায় 2.5 মিটার পর্যন্ত প্রবেশ করে। সাভানা ঘাসের অন্যতম কয়েকটি প্রজাতি হল

হাইপার হেনিয়া (এলিফ্যান্ট), প্যানিকাম, পেনিসেটাম, অ্যানড্রোপেগন এবং আফ্রিকান ইমপেরাটা সিলিনড্রিকা। শুষ্ক গ্রীষ্ম ঋতুতে ঘাসগুলি দেখতে মরুপ্রায় হয়, কিন্তু আর্দ্র গ্রীষ্ম ঋতুতে এগুলি সবুজ হয়ে ওঠে।

(2) মধ্যবর্তী স্তর— এই স্তরটিতে কিছু ঝোপঝাড় এবং খুব ছোটো বৃক্ষজাতীয় গাছ (Woody plant) দেখা যায়।

(3) সর্বোচ্চ বা চাঁদোয়া স্তর—

এই স্তরটি বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষজাতীয় গাছ (woody plant) নিয়ে গঠিত। যেহেতু জলের প্রাপ্যতার ও আর্দ্রতার উপরে এই গাছগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি (জন্ম, বৃদ্ধি, পাতা ও কাণ্ডের আকার, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি) নির্ভরশীল, তাই সাভানা গাছগুলির শ্রেণিবিন্যাসগত বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং গাছগুলির উচ্চতা সাধারণত 6 মিঃ থেকে 12 মিঃ হয়।

উষ্ণ শুষ্ক ঋতুতে জলের অভাবে সাভানা গাছের পাতা থেকে প্রস্বেদন কম হয়। আবার যেসব গাছ শুষ্কতা সহ্য করতে পারে না, সেগুলি পত্রমোচন করে এবং এক্ষেত্রে পর্ণমোচী গাছের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পরিবেশগত কারণে সাভানা শিকড়গুলি মাটির মধ্যে 5মিঃ থেকে 200 মি.মি. পর্যন্ত প্রবেশ করে। শুষ্ক ঋতুতে ভৌম জলস্তর অনেক নীচে নেমে গেলেও গাছগুলি লম্বা শিকড় দিয়ে জল সংগ্রহ করে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার গাছ ও লতাগাছগুলির বিশেষ ধরনের শিকড় (স্ফীতকন্দ) দেখা যায়, যার মধ্যে জল সঞ্চিত থাকতে পারে এবং যে জল গাছ শুষ্ক সময়ে ব্যবহার করতে পারে।

গাছগুলির উপরের অংশ বা চাঁদোয়া প্রায় চ্যাপটা ধরনের হয়, তবে গাছগুলি বিক্ষিপ্তভাবে বন্টিত থাকে। কাণ্ডের দেহ দিয়ে অনেক ডালপালা বেরিয়ে আসে যেগুলি মধ্যবর্তী স্তরে মিলিত হয়। সাভানা গাছগুলির কয়েকটি আগুন-রোধকারী হয়, কারণ তাদের ছাল ও বীজাধার পুরু হয়। সাভানা বায়োমে উদ্ভিদ-প্রজাতির সংখ্যা খুবই কম হয়। যেমন, তানজানিয়া থেকে সেনেগাল পর্যন্ত একমাত্র গাছ হল বাওবাব এবং আইভরি কোস্ট থেকে সুদানের মধ্যে তাল গাছের প্রাধান্য দেখা যায়। আফ্রিকান সাভানার প্রধান গাছগুলি হল আইসোবারলিনিয়া, বাওবাব ও ডম পাম।

উদ্ভিদ ও তৃণভূমির আনুপাতিক অবস্থান এবং স্বাভাবিক উদ্ভিদের গঠন অনুসারে সাভানা বায়োমকে নিম্নলিখিত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় (Furley ও Newey, 1983)। যথা—

(a) উডল্যান্ড সাভানা— বৃক্ষ ও ঝোপ দিয়ে গঠিত এই সাভানার চাঁদোয়া ঘন হয়। একে 'ক্লোলড্ সাভানা' বলে। উচ্চতম স্তরের চাঁদোয়া খুব ঘন হলেও যথেষ্ট পরিমাণ সূর্যালোক ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়, যা নীচের লতাজাতীয় গাছগুলির প্রয়োজন লাগে। সাধারণত এপিফাইট প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু কিছু লতাগাছ (যাদের শিকড় মাটিতে প্রোথিত) এখানে পাওয়া যায়।

(b) বৃক্ষ সাভানা— বৃক্ষের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত উদ্ভিদের আবরণ এবং বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ঝোপ দেখা যায়। তলদেশ ঘাসে আবৃত থাকে এবং কোনো চাঁদোয়া এখানে গঠিত হয় না।

(c) গুল্ম ও ঝোপময় সাভানা—

এক্ষেত্রে নীচের স্তরে মাস এবং দ্বিতীয় স্তরে গুল্ম ও ঝোপ জন্মে। এখানে বৃক্ষ প্রায় নেই বললেই চলে। এখানকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ দ্বিস্তরীয়।

(d) তৃণ সাভানা— ঘন ঘাসবিশিষ্ট এই শ্রেণিতে কোনো বৃক্ষ, গুল্ম ও ঝোপঝাড় থাকে না। তবে ঘাসের আবরণ অবিচ্ছিন্ন নয়, বরং মাঝে মাঝে ফাঁকা ঘাসহীন ভূভাগ দেখা যায়।

প্রাকৃতিক দাবানল এবং মানুষের দ্বারা ঘাসের দহন সাভানা বায়োমের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। যদিও মানুষের দহনের ফলে কিছু জৈব পদার্থ ধ্বংস হয়, তবুও সাভানা তৃণভূমির দহন বাস্তুসংস্থানিক প্রক্রিয়ার (ecological process) ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা প্রতিবছর ঘাসের পুনর্জন্মে সাহায্য করে। প্রতি বছর মাঝে মাঝে ঘাসের দহন হয় বলে স্বাভাবিকভাবে সাভানা অঞ্চলে কিছু অগ্নি-রোধকারী উদ্ভিদ প্রজাতি ও ঘাসের (imperata spp.) জন্ম হয়।

জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্য—

বিভিন্ন সাভানা অঞ্চল বা ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলে নিম্নলিখিত কারণে বিভিন্ন প্রাণী প্রজাতিগত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যথা (1) উৎপত্তি ও বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সাভানা অঞ্চলে ভিন্ন ধরনের পরিবেশগত অবস্থা দেখা যায় এবং (2) বিভিন্ন সাভানা অঞ্চলে মানুষের অনুপ্রবেশের মাত্রা ভিন্ন ধরনের হয়। পরিবেশগত অবস্থার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ঋতুতে খাদ্যের যোগানের পার্থক্য হয়। আর্দ্র গ্রীষ্মকালে স্বাভাবিক উদ্ভিদের জন্ম ও বিকাশের হার বেশি হয় বলে আর্দ্র ঋতুতে খাদ্যের প্রাচুর্য ও শুষ্ক ঋতুতে খাদ্যের অভাব দেখা যায়। পশুখাদ্যের প্রাপ্যতার এই ঋতুগত তারতম্য এখানকার প্রাণীগোষ্ঠীকে অনেকটা প্রভাবিত করে। তাছাড়া মানুষের পশুশিকারও জীবগোষ্ঠীর সংখ্যাকে প্রভাবিত করে। এসব বাধা সত্ত্বেও ক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলে বিচিত্র প্রজাতির জীবজন্তুর সন্ধান মেলে।

আফ্রিকান সাভানার সবচেয়ে বেশি প্রজাতির মেরুদণ্ডী স্তন্যপায়ী প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পূর্ব আফ্রিকার সাভানা অঞ্চলে প্রায় 40 প্রজাতির বিশালদেহী তৃণভোজী স্তন্যপায়ী (যেমন, আফ্রিকান মহিষ, জেব্রা, জিরাফ, হাতি, হিপোপটো মাস, অ্যান্টিলোপ প্রভৃতি) প্রাণী দেখা যায়। একই স্বাভাবিক আবাসে (habitat) প্রায় 16 প্রজাতির পশুকে একসাথে চরতে দেখা যায়। তবে দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ান সাভানায় চারণকারী স্তন্যপায়ী পশুর খুব বেশি সংখ্যক প্রজাতি পাওয়া যায় না, কিন্তু এই অঞ্চলগুলিতে আফ্রিকান সাভানার মতো অনেক প্রজাতির পাখি দেখতে

পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়ান সাভানাতে মারসুপিয়ান নামের এক স্তন্যপায়ী জীব আছে এবং প্রায় 50 প্রজাতির ক্যাঙারু আছে, যাদের আয়তন মাত্র 30 সে.মি. থেকে (wallaby) প্রায় 1.5 মিটার লম্বা হয়। দক্ষিণ আমেরিকান সাভানায় হরিণ ও Guanaco-এর মতো বড়ো আয়তনবিশিষ্ট চারণকারী স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখা যায়। এছাড়া এখানে অসংখ্য পায়রা, হাঁস, Toucan, Nightjar, Kingfisher, Finches, Parakeets, Wood Pecker প্রভৃতি দেখা যায়।

তৃণভূমি খুব ঘন ঘন বলে সাভানায় বৃহদাকার পশুর জন্ম ও বিকাশ হতে পারে এবং এর মধ্য দিয়ে বড়ো আকারের স্তন্যপায়ী পশু (হাতি, জিরাফ, জেব্রা, গাণ্ডা, অ্যান্টিলোপ ইত্যাদি) খুব সহজে ঘোরাফেরা করতে পারে। বিভিন্ন জাতের পাখিগুলি (যেমন Courses, Bustard, Game bird, অস্ট্রিচ, গর্জিলা, এমু ইত্যাদি) এখানে জন্ম নেয় ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

এই তৃণভূমি অঞ্চলে অনেক অমেরুদণ্ডী পশু ও কীটপতঙ্গ আছে। ফড়িং, পিঁপড়ে, উইপোকা, বিছে, মাকড়সা প্রভৃতি সাভানা অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে বহুসংখ্যায় রয়েছে। পোকা, মাকড়সা, পতঙ্গ প্রভৃতির সংখ্যা শুষ্ক সময়ের তুলনায় আর্দ্র ঋতুতে অনেক বেড়ে যায়। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার অমেরুদণ্ডী পতঙ্গগুলি শুষ্ক ঋতুতে এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার পতঙ্গগুলি আর্দ্র অঞ্চলে দেখা যায়।

যদিও সাভানা অঞ্চলে অসংখ্য প্রজাতির মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও কীটপতঙ্গ রয়েছে (সূক্ষ্ম পতঙ্গ থেকে বৃহৎ জন্তু), জীবজন্তুদের মধ্যে খাদ্যের কোনো প্রতিযোগিতা নেই। কারণ স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এখানকার জীবজন্তুদের বিশেষ ধরনের খাদ্যাভ্যাস আছে। যেমন জিরাফ তার লম্বা গলার সাহায্যে গাছপালার ও ঝোপঝাড়ের সর্বোচ্চ স্তরকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে এবং ঝোপের পাতার মধ্যে ও লম্বা ঘাসের আড়ালে অবস্থান করে। অন্যান্য বন্যপশু মাঝারি উচ্চতার ঘাসকে ব্যবহার করে। কিন্তু হরিণ প্রজাতির প্রাণীগুলি ছোটো ছোটো ঘাসগুলিকে খায়। দেখা যায় যে সাভানা অঞ্চলের উদ্ভিদ প্রজাতির উল্লম্ব স্তরবিন্যাস এবং পশুদের খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

ঋতুগত সচলতার বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে সাভানা বায়োমের জীবজন্তুকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(a) Gazelle, Ziraffe, Hartebeest প্রভৃতি পশুর হয় সামান্য ঋতুগত সচলতা আছে, অথবা প্রায় কোনো ঋতুগত সচলতা নেই।

(b) শুষ্ক ঋতুতে Impala-এর মতো পশুদের আংশিক বা সামান্য সচলতা আছে।

(c) আর্দ্র ঋতুতে Warthog, Dikdik, Waterbuck, Rhino প্রভৃতি। পশুদের ও আংশিক সচলতা আছে।

(d) শুষ্ক ঋতুতে মহিষ, জেব্রা, হাতি, বন্যগাভী, কৃষ্ণসার হরিণ প্রভৃতি পশুর প্রচরণ।

(e) প্রচরণের কাছে মহিষ, হাতি, জেব্রা প্রভৃতি পশুর ব্যবহার।

সাভানা বায়োমের মোট পশুসংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক রয়েছে পূর্ব আফ্রিকার সাভানা অঞ্চলে। সাভানা বায়োমের গড় নিট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (NPP) হলো বছরপ্রতি প্রতি বর্গ মিটারে 900 শুষ্ক গ্রাম, যেখানে পৃথিবীর সব সাভানা অঞ্চলের বছর প্রতি নিট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (NPP) হল 13.5×10^9 টন। উইপোকা হল সাভানা বায়োমের খুব গুরুত্বপূর্ণ কীট কারণ সেগুলি জৈব পদার্থের বিয়োজনে এবং খাদ্যমৌলগুলির পুনরাবর্তনে (Recycling) সাহায্য করে।

মানুষ ও সাভানা বায়োম—

বর্তমান সাভানার বিভিন্ন অংশে মনুষ্যজাতির বিবর্তন ও বিকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ মূল প্রাকৃতিক পরিবেশগত অবস্থাগুলির সাথে মানুষের সবসময় ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে। অবশ্য এক্ষেত্রে জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। নিয়মিত উদ্ভিদের দহনের ফলে বর্ষাকালে বা আর্দ্র ঋতুতে নতুন সবুজ ঘাসের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে বহুসংখ্যক ও বহুপ্রজাতির পশু চরে বেড়ায়। কিন্তু দাবানলের মাধ্যমে উদ্ভিদের এই দহনের ফলে গাছের যে ক্ষতি হয়, তা বৃহদাকার তৃণভোজী পশুর সংখ্যা হ্রাস করে।

গত প্রায় 50 বছরে জনসংখ্যা এত দ্রুত বেড়েছে যে, সাভানা বায়োম অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ জনসংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং তৃণভূমির একটি বড়ো অংশ শস্যজমিতে পরিণত হয়েছে। সবুজবিপ্লবের কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষিজমির ব্যাপক প্রসারের ফলে সাভানা তৃণভূমির সংকোচন হয়েছে। উপরন্তু গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বাড়ায় তৃণভূমির বিশেষ ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া সংক্ষেপে তৃণভূমির পাশে বসবাসকারী মানুষের কার্যকলাপ তৃণভূমির সংকোচনে ভূমিকা পালন করে এবং স্বাভাবিক উদ্ভিদের সংখ্যা হ্রাস করে এবং যা পশুদের খাদ্যের যোগানও হ্রাস করে। ফলে বর্তমান তৃণভূমিতে বসবাসকারী পশুদের কাছে ঘাসের অভাব দেখা দিয়েছে। জীবজন্তুর অনেক প্রজাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং এদের মোট সংখ্যাও প্রতিদিন ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

6.3.2 নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি বায়োম

পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিগুলি মহাদেশগুলির অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং পশ্চিমাবায়ু দ্বারা প্রভাবিত। মহাদেশীয় অবস্থানের ফলে এগুলি পর্যাপ্ত বৃষ্টি পায় না এবং তাই প্রকৃতপক্ষে প্রায় বৃক্ষহীন। দক্ষিণ গোলার্ধের তৃণভূমিগুলি মহাদেশগুলির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থান করে এবং সামুদ্রিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত বলে এগুলি অপেক্ষাকৃত সমভাবাপন্ন। ইউরেশিয়ার নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিগুলি 'স্টেপ' নামে পরিচিত, যা কৃষ্ণসাগরের উপকূল থেকে গ্রেট রাশিয়ান সমভূমির মধ্য দিয়ে আলতাই পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত প্রায় 3200 কি.মি. এর বেশি অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত। স্থানে স্থানে উচ্চভূমি এই তৃণভূমিকে বিভক্ত করেছে। হাঙ্গেরি Pustaz এবং মাঞ্চুরিয়ান তৃণভূমি হল স্টেপ তৃণভূমির কিছু বিক্ষিপ্ত অংশ। উত্তর আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি (কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে) 'প্রেইরি' নামে খ্যাত,

যা পশ্চিমে রকি পর্বত থেকে পূর্বদিকে পর্ণমোচী বায়োম পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়েতে এই তৃণভূমি 'পম্পাস' নামে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভেল্ড নামে, দঃ পূঃ অস্ট্রেলিয়ার মারে-ডার্লিং উপত্যকায় ডাউনস্ নামে এবং নিউজিল্যান্ডে ক্যান্টারবেরি তৃণভূমি নামে পরিচিত।

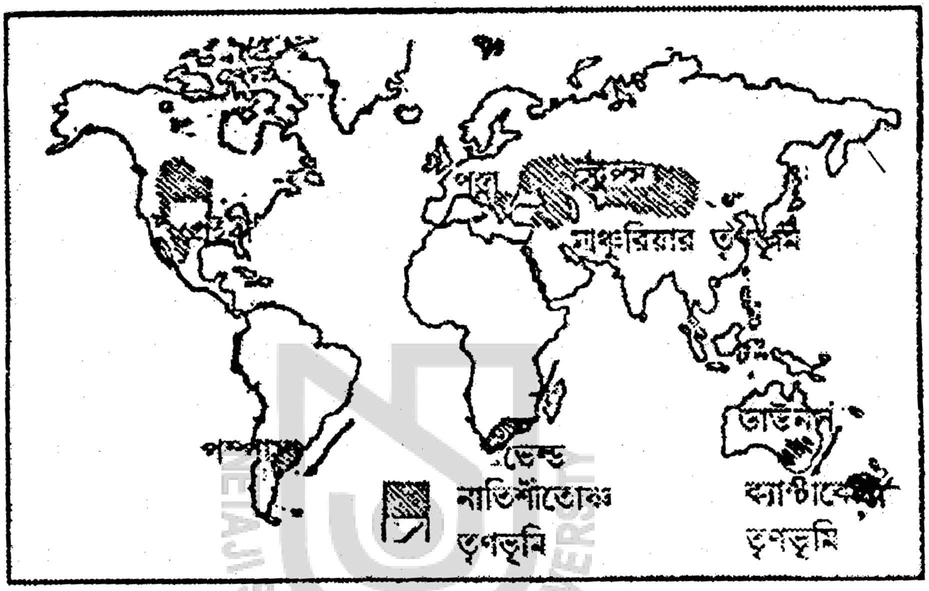

চিত্র 3 ঃ নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি বায়ামের গঠন

জলবায়ুগত অবস্থা

উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিতে প্রধানত মহাদেশীয় জলবায়ু দেখা যায়, যেখানে শীত ও গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রার চরমতা দেখা যায়। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে জলবায়ু হয় সমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মকালে জুলাই মাসে কানাডার উইনগেপে উষ্ণতা হয় 20° সেঃ এর বেশি এবং জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ায় তাপমাত্রা হয় প্রায় 22° সেঃ। উত্তর গোলার্ধে এই তৃণভূমি সমুদ্র থেকে খুব দূরে অবস্থিত বলে শীতের রাত্রে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয় (যেমন উইনিপেগে 20° সেঃ)। সমুদ্র থেকে দূরত্ব কম হওয়ায় দক্ষিণ গোলার্ধে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিতে তাপের তীব্রতা কম ও সমভাবাপন্ন হয়। এখানকার গড় শীতকালীন তাপমাত্রা 1-12° সেঃ হয়।

স্টেপ জলবায়ুর একটি বৈশিষ্ট্য হল, এখানে বার্ষিক তাপমাত্রার প্রসর খুব বেশি। যেমন, উইনিপেগের গড় বার্ষিক তাপমাত্রার প্রসর প্রায় 40° সেঃ। সামুদ্রিক প্রভাবের ফলে গড় বার্ষিক প্রসর উত্তর গোলার্ধের চেয়ে অনেক কম (10–12° সেঃ)। তৃণভূমির বিস্তীর্ণ অংশে গড় বার্ষিক অধঃক্ষেপণ প্রায় 250 মি.মি. থেকে 750 মি. মি. হয়। উত্তর গোলার্ধে শীতকালীন অধঃক্ষেপণ তুষারপাতরূপে ঘটে এবং ইউরেশীয়

স্টেপ তৃণভূমির বেশির ভাগ অংশ কয়েকমাস ধরে বরফাচ্ছাদিত থাকে। এখানকার বেশির ভাগ বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালে হয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদগোষ্ঠী—

উভয় গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে ঘাস হল প্রধান স্বাভাবিক উদ্ভিদ। Gramineae পরিবারভুক্ত ঘাস সারাবছর উভয় গোলার্ধে দেখা যায়। তাছাড়া এই বায়োমে কিছু শাকজাতীয় উদ্ভিদ থাকলেও কোনো বড়োগাছ বা ঝোপঝাড় এখানে নেই। এই বায়োমের বিবর্তনের দুটি ধারণা রয়েছে। যথা—(a) এই অঞ্চলের জলবায়ুগত অবস্থা ও মৃত্তিকার গুণাগুণ নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঘাসের প্রাধান্য এবং ঝোপঝাড় প্রভৃতির অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে প্রধান উপাদানগুলি হল চরম মহাদেশীয় জলবায়ু এবং কম বৃষ্টিপাতের ফলে জলের কম যোগান। (b) নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির জলবায়ুগত উৎপত্তির ধারণাটি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ অনেক বিজ্ঞানীদের মতে, তৃণভূমি হল মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের (প্রধানত উদ্ভিদ দহনের) ফলে।

এই বায়োমে উদ্ভিদের শ্রেণি, মৃত্তিকার শ্রেণি এবং জলবায়ুগত অবস্থাসমূহের ঘন সম্পর্ক, বিশেষত উদ্ভিদ ও প্রাণী গোষ্ঠীর মধ্যে ঘন সম্পর্ক দেখা যায়। নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি বায়োমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, একস্তরীয় গঠনের উদ্ভিদগোষ্ঠী যেখানে ঊর্ধ্ব চাঁদোয়াতে ঘাসের পাতাগুলি থাকে, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য সপুষ্পক বৃন্তগুলি এই চাঁদোয়াতে যুক্ত হয় এবং এই সর্বোচ্চ স্তরের জাঁকজমক বাড়ায়। ফুলগুলিতে পাঁপড়ি প্রায় থাকে না এবং বায়ু ফুলের পরাগমিলনে এবং বীজের বিচ্ছুরণে সাহায্যে করে। বর্তমানে এই তৃণভূমির অনেক স্থান পরিষ্কার করে খাদ্যশস্য চাষে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তৃণভূমিগুলি পৃথিবীর শস্যের আধার ও ডেয়ারি শিল্পের প্রধান অঞ্চল হিসেবে কাজ করছে।

প্রতিটি অঞ্চলের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে আলাদাভাবে আলোচনা করা যায়। যথা—

(1) ইউরেশীয় স্টেপ—

স্টেপ বায়োমের সবচেয়ে বেশি বিস্তার রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে যেখানে এই তৃণভূমি পূর্ব ইউরোপ থেকে পশ্চিম সাইবেরিয়ার মধ্যে এবং উত্তরে তৈগা অরণ্য থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে শুষ্ক মরু অঞ্চলের মধ্যে বিস্তৃত। সোভিয়েত স্টেপকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা— (a) অরণ্য স্টেপ ও (b) তৃণ স্টেপ। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট আয়তনের প্রায় 12% অধিকার করে রয়েছে স্টেপ তৃণভূমি। অরণ্য স্টেপের মধ্যে বনভূমি ও উন্মুক্ত স্টেপের পর্যায়ক্রমিক অবস্থান দেখা যায়। ইউরেশীয় অরণ্য স্টেপের মধ্যে বার্চ, অ্যাসপেন ও উইলো দেখা যায়। উন্মুক্ত স্টেপের মধ্যে প্রবেশ করে রয়েছে তৃণভূমি স্টেপ (meadow Steppe), যার অন্যতম ঘাসগুলি হল Festuca ও Stepa অরণ্য স্টেপের গড় বার্ষিক অধঃক্ষেপণে প্রায় 500–600 মি. মি. এবং তৃণ স্টেপের গড় বার্ষিক অধঃক্ষেপণ

প্রায় 400-500 মি. মি. হয়। সোভিয়েত স্টেপের উত্তর থেকে দক্ষিণে উদ্ভিদের নিম্নলিখিত অনুক্রম লক্ষ করা যায়।

(a) অরণ্য স্টেপ—

সোভিয়েত স্টেপের সবচেয়ে উত্তরে থাকে অরণ্য স্টেপ। এখানকার প্রধান প্রধান গাছগুলি হল ওক, এলম, লহিম, মাপল, বার্চ এবং কিছু অ্যাসপেন ও উইলো। Woodland স্তরগুলির মধ্যে উন্মুক্ত স্টেপ তৃণভূমি দেখা যায়। এখানকার প্রধান মাটি হল চারনোজেম।

(b) তৃণভূমি স্টেপ—

উডল্যান্ড স্তরগুলির মধ্যে অবস্থিত উন্মুক্ত স্টেপকে তৃণভূমি স্টেপ বলে। সুগঠিত গভীর চারনোজেম মাটিতে তৃণভূমি বা 'মিডে' স্টেপ দেখা যায়। কার্পেটের মতো দেখতে ঘাসে (Stipa ও Festuca) আবৃত অঞ্চলে কিছু অপুষ্পক তৃণজাতীয় গাছ (ট্রিফোলিয়াম ও দেইসি) পাওয়া যায়।

(c) তৃণ স্টোপ—

সুগভীর ও সুগঠিত চারনোজেম মাটি এবং গুচ্ছাকার স্টিপা প্রজাতির ঘাস এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এছাড়া জেরোফাইটজাতীয় কিছু Artemisia প্রজাতির সপুষ্পক ঝোপ দক্ষিণদিকের সীমানায় পাওয়া যায়।

(d) অর্ধশুষ্ক জেরোফাইট জাতীয় স্টেপ—

সোভিয়েত স্টেপের সবচেয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম জেরোফাইটা জাতীয় ঘাস (Fescue ও Feather ঘাস), চেস্টনাট মাটি ও অর্ধশুষ্ক জলবায়ুগত অবস্থা (গড় বার্ষিক অধঃক্ষেপণ 300 সেমিঃ — 350 সেমিঃ) প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য। জেরোফাইট জাতীয় তৃণ জাতীয় গাছ (যেমন, আরটিমিনিসয়া) ও কিছু ক্ষণজীবী শক্ত ডাঁটাহীন লতা এখানকার প্রধান উদ্ভিদ।

(2) উত্তর আমেরিকার প্রেইরি—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় রকি পর্বতের নিম্নদেশ থেকে পূর্বদিকে নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী অরণ্য পর্যন্ত এই তৃণভূমি অবস্থিত। পূর্বদিক থেকে (1050 মি.মি.) পশ্চিমদিকে (400 সে.মি.) গড় বার্ষিক অধঃক্ষেপণ এবং নিট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতার (NPP) ভিত্তিতে উত্তর আমেরিকার প্রেইরিকে তিনশ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

(a) লম্বা ঘাসের প্রেইরি—

প্রেইরি তৃণভূমির পূর্বদিকে এই শ্রেণিটি অবস্থিত। এখানে সবচেয়ে লম্বা (1.5-2.5 মিঃ)

ঘাসগুলি হল Bluestem ও Switch ঘাস। এই ঘাসের মধ্যে ওক ও হিকরি গাছের কিছু অংশ দেখা যায়।

(b) মিশ্র প্রেইরি—

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'গ্রেট প্লেনস' অঞ্চলে এই প্রেইরির বিস্তার দেখা যায়। উত্তরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সীমান্তে এবং দক্ষিণ টেক্সাসের মধ্যভাগে এই অঞ্চল অবস্থিত। 0.6 থেকে 1.2 মি. উচ্চতাবিশিষ্ট মাঝারি থেকে ছোটো ঘাস (Bluestem, Neddlegrass, Junegrass ইত্যাদি) এবং কিছু গুচ্ছাকার ঘাস (Buffalow grass Blue gramma) এখানে পাওয়া যায়।

(c) ক্ষুদ্রাকার ঘাসের প্রেইরি—

'গ্রেট প্লেনস' অঞ্চলের পশ্চিমে অবস্থিত এই অংশে কিছু ছোটো ঘাস জন্মে যাদের উচ্চতা 60 সে.মি. এর বেশি হয় না।

(3) দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাস—এই তৃণভূমির বেশির ভাগ অংশে আর্জেন্টিনায় অবস্থিত এবং অন্যান্য নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির তুলনায় পম্পাস অপেক্ষাকৃত আর্দ্র প্রকৃতির। উপকূলীয় পূর্বদিক থেকে (900 মি. মি.) পশ্চিমদিকে (450 মি.মি.) গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত হ্রাস পায়। পম্পাস দুই শ্রেণির হয়। যথা—(a) আর্দ্র পম্পাস ও (b) আর্দ্র প্রায় পম্পাস। আর্জেন্টিনার পূর্বদিকের 'আর্দ্র পম্পাসে' লম্বা ঘাস এবং পশ্চিমদিকের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে অবস্থিত 'আর্দ্র প্রায় পম্পাসে' ক্ষুদ্রাকার ঘাস জন্মায়। Briza, Bromus, Panicum, Paspalum, Lolium প্রভৃতি হল পম্পাসের অন্যতম প্রজাতির ঘাস। এই তৃণভূমির ঘাসগুলি বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত থাকে, যা প্রধানত আর্দ্রতা, মৃত্তিকার প্রকৃতি ও পশুচারণের তারতম্যের ফল। মানুষ এই অঞ্চলে লেগুম প্রজাতির লবঙ্গ জাতীয় গাছের প্রবর্তন করেছে এবং অনেক অংশে ঘাস কেটে পরিষ্কার করে গম খেত তৈরি করা হয়েছে।

(4) আফ্রিকায় ভেল্ড—দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব বিভিন্ন উচ্চতাবিশিষ্ট উঁচু মালভূমিতে (1500 মি.—2000 মি.) 'ভেল্ড' নামের নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি দেখা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত দক্ষিণ ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি রাজ্য ও লিসেথো এর কিছু নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে আফ্রিকান ভেল্ড অবস্থিত। পম্পাস তৃণভূমি দক্ষিণ আমেরিকার অঞ্চলে দেখা গেলেও আফ্রিকান ভেল্ড দেখা যায় 1500-2000 মিঃ এর বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট মালভূমি অঞ্চলে। বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা, শুষ্কতা, রাত্রিতে তুহিনের প্রাধান্য এবং শীতকালে দৈনিক উষ্ণতার অতিরিক্ত প্রখরতা এই অঞ্চলে উদ্ভিদ জন্মানোর পক্ষে প্রধান বাধা। ফলে এখানে চরম তৃণভূমি (Climax Vegetation) জন্মে। ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা, ও জলবায়ুগত অবস্থার তারতম্যের ফলে ঘাসের গঠনগত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। উক্ত বিষয়গুলির ভিত্তিতে আফ্রিকান ভেল্ড বায়োমকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(a) থেমাডা ভেল্ড (Themada Veld)—

1500–1700 মি. উচ্চতায় এবং প্রায় 650-750 মি.মি. অধঃক্ষেপণ বিশিষ্ট অঞ্চলে এই তৃণভূমি জন্মে, যার প্রধান ঘাস হল Red Grass (Themada Triandra)।

(b) সাওয়ার ভেল্ড (Sour Veld)—

অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ঘাসগুলি (Aristida, Eragrostis ও Hyparrhenia ইত্যাদি) এই তৃণভূমিতে জন্মে।

(c) অ্যালপাইন ভেল্ড (Alpine Veld)—

ড্রাকেন্সবার্স পর্বতের অপেক্ষাকৃত বেশি উচ্চতায় (200-2500 মিঃ) Festuca ও Bromus ঘাসের সাথে Themada ঘাস মিশ্র অবস্থায় জন্মে।

(5) অস্ট্রেলীয় ডাউনস—অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে ও তাসমানিয়ার উত্তরে অবস্থিত নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি ডাউনস নামে পরিচিত। এখানকার বৈশিষ্ট্যগুলি হল— (a) উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির চেয়ে অপেক্ষাকৃত উষ্ণতার শীত ঋতু এবং (b) ঘাস ও ইউক্যালিপটাস গাছের মিশ্রণ। দক্ষিণ (1524 মি. মি.) থেকে উত্তরে (635 মি. মি.) গড় বার্ষিক অধঃক্ষেপণ হ্রাসের সাথে তৃণভূমি ও দক্ষিণ (উপকূল) থেকে উত্তরে (মধ্যবর্তী স্থলভাগ) ক্রমশ পরিবর্তিত হয়। ডাউনস-এর মধ্যে আবার তিন ধরনের আলাদা তৃণভূমি দেখা যায়। যথা—

(1) নাতিশীতোষ্ণ দীর্ঘ ঘাসযুক্ত তৃণভূমি—

নিউসাউথ ওয়েলেসের পূর্বদিকের উপকূল থেকে ভিক্টোরিয়া ও পূর্ব-তাসমানিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এই তৃণভূমির প্রধান ঘাসগুলি হল Poatussock ও Themada Australia যা ক্যাঙারুদের কাছে খুবই প্রিয়। একে 'ক্যাঙারু ঘাস' বলে। শুষ্কতর পরিবেশের প্রধান ঘাস হল ডানথোনিয়া পালিডা।

(2) নাতিশীতোষ্ণ ক্ষুদ্র ঘাসযুক্ত তৃণভূমি—

এখানে Danthonia ও Stipa প্রজাতির ক্ষুদ্রাকার ঘাস পাওয়া যায়, যা পূর্বেকার শ্রেণিটির সমান্তরালে অপেক্ষাকৃত উত্তরে অবস্থিত।

(3) জেরোফাইটজাতীয় তৃণভূমি—

আর উত্তরদিকে, নিউসাউথ ওয়েলসের ও কুইনসল্যান্ডের মধ্যভাগের অর্ধশুষ্ক জলবায়ুগত অবস্থায় এই তৃণভূমি অবস্থিত। ঘাসগুলি শুষ্কতা প্রতিরোধকারী এবং Aristide ও Mulga প্রভৃতি হল এখানকার অন্যতম ঘাস। Mulga একটি ঝোপজাতীয় শ্রেণির উদ্ভিদ।

(6) নিউজিল্যান্ডের ক্যান্টারবেরি তৃণভূমি—নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণ দ্বীপের পূর্বাংশে এবং উত্তর দ্বীপের

মধ্যভাগে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অবস্থিত। এখানকার প্রধান ঘাস হল গুচ্ছাকার ঘাস (tussock)। কিন্তু মানুষ তার ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে গত একশ বছরে এই তৃণভূমির প্রধান গঠনকে পরিবর্তিত করেছে। এই বায়োমে দুই ধরনের ঘাসের সন্ধান মেলে। যথা—

(a) ক্ষুদ্রাকার গুচ্ছাকার ঘাস—

প্রধান প্রধান ঘাসগুলি হল Poa, Festuca ইত্যাদি, যা প্রায় 50 সে.মি. লম্বা এবং হলদে-বাদামি রঙের হয়।

(b) **লম্বা গুচ্ছাকার ঘাস—**

এগুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ভূভাগে জন্মে। উদাহরণ—Chinomechloa.

নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি বায়োমের বার্ষিক গড় নিট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (NPP) প্রতি বর্গ মিটারে প্রায় 600 শুষ্ক গ্রাম। এখানে ঘাসের শিকড়গুলি প্রায় 2 মিটার পর্যন্ত মাটিতে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু ঘাসের দেহের সবুজ অংশটির উচ্চতা 0.6 মি. থেকে 1.2 মিটার হয়। অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির শিকড়গুলির জীবভর (প্রতি বর্গ মিটারে 2000 গ্রাম) মাটির উপরের জীবভরের (প্রতি বর্গমিটারে 1600 গ্রাম) চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি।

জীবগোষ্ঠী—

উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিতে বেশ কয়েক প্রজাতির বড়ো আকারের স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখা যায়। উত্তর আমেরিকান প্রেইরির মহিষ ও অ্যান্টিলোপ, ইউরোপীয় স্টেপের বন্য ঘোড়া ও অ্যান্টিপোল, আফ্রিকান ভেল্ডের অ্যান্টিলোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাসের গুয়ানাকো অন্যতম কয়েকটি প্রাণী। এই বৃহদাকার তৃণভোজী প্রাণীগুলি এমন শক্তিশালী যে, তারা শিকারি নেকড়ে বা হায়েনার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ। এই চারণকারী স্তন্যপায়ী জীবগুলি প্রচরণ বা পরিযানের অভ্যাস তৈরি করেছে, যার ফলে ঘাসের অতিরিক্ত ব্যবহার হয় না এবং জীবের খাদ্যসম্পদ সংরক্ষিত হয়।

এই বায়োমের বিভিন্ন অংশে প্রাণীগুলির মধ্যে সাধারণভাবে মিল থাকলেও কিছু আঞ্চলিক পার্থক্য দেখা যায়। যথা—

(1) ইউরেশীয় স্টেপের অন্যতম জীবগুলি হল পশ্চিম স্টেপের সাইনা অ্যান্টিলোপ, পূর্ব স্টেপের মঙ্গোলিয়ান gazelles এবং বিরল প্রজাতির ক্ষুরওয়ালা বন্য ঘোড়া। ইঁদুর, ছুঁচো প্রভৃতি মৃদ্ভেদী প্রাণীগুলি দিনের বেলায় মাটির নীচে দীর্ঘ গর্তের মধ্যে থাকলেও রাত্রে খাবারের খোঁজে বাইরে বেরোয়। শিকারি প্রাণীদের মধ্যে নেকড়ে, ঈগল, খট্টাশ, চিল প্রভৃতি অন্যতম। এরা খাদ্যের জন্য ইঁদুরগুলির ওপর নির্ভর করে।

(2) আমেরিকান প্রেইরির প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে বাইসন ও প্রাগহর্ন অন্যতম, যদিও অত্যধিক শিকারের

ফলে পশুগুলি লুপ্তপ্রায়। তাছাড়া ইঁদুর, গফার, প্রেইরি কুকুর মৃদ্ভেদী প্রাণী মাটির নীচে দীর্ঘ গর্তের মধ্যে বাস করে, তবে বর্তমানে এদের সংখ্যা কমে গেছে। আবার ঈগল, চিল, শিয়াল, নেকড়ে, র‍্যাটল সাপ প্রভৃতি শিকারি প্রাণীগুলি কৃষিজমির প্রসার ও মৃদ্ভেদী প্রাণীদের সংখ্যা হ্রাসের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে কৃষির প্রসার একদিকে যেমন মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণকে বৃদ্ধি করেছে, অন্যদিকে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্যকে নষ্ট করে চলেছে।

(3) দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাসের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বর্তমানে গমখেতে পরিণত হয়েছে এবং বাকি অংশের তৃণভূমির অন্যতম প্রাণীগুলি হল হরিণ, উড়তে অক্ষম Rhea পাখি ও Vischacha Mara প্রজাতির মৃদ্ভেদী ইঁদুর প্রজাতির প্রাণী নেকড়ে, ছোটো ছোটো সরীসৃপ ইত্যাদি। উটপাখির মতো দেখতে Rhea পাখিগুলি শিকারিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য স্থানীয় গাছগুলির মধ্যে নিজেদের লুকিয়ে রাখে। পম্পাসের অন্যতম পরিযায়ী পাখিগুলির মধ্যে সারস, হাঁস, পাতিহাঁস প্রভৃতি অন্যতম।

(4) ভেল্ডের প্রাণীগোষ্ঠী মানুষের কাজকর্মের মাধ্যমে অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। একসময় এখানে অসংখ্য অ্যান্টিলোপ, হায়না, শিয়াল, সিংহ, চিতাবাঘ, জেব্রা প্রভৃতি বাস করতো, কিন্তু এখন আর এই প্রাণীগুলিকে দেখা যায় না। অত্যধিক শিকার হয়ে এদের নিশ্চিহ্ন করেছে, না হয় এদের অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করেছে। বর্তমান এখানে গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পাওয়া যায়। এখনও এই বায়োমে কিছু ইঁদুর ও পাখি দেখা যায়। ইঁদুর প্রজাতির মধ্যে Springhare ও Gerbil এবং মাংসাশী মৃদ্ভেদী প্রাণীদের মধ্যে Yellow Mongoose অন্যতম।

(5) অস্ট্রেলীয় ডাউনসে তিন প্রজাতির ক্যাঙারু দেখা যায়। যথা—(a) লাল ক্যাঙারু, (b) ধূসর ক্যাঙারু, (c) ওয়ালারু। এই বায়োমে গত 100 বছরে ইউরোপীয় খরগোসগুলি এতগুণ বেড়েছে যে এগুলি অন্যান্য পশুর সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। বাণিজ্যিক কারণে ভেড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি ও এখানকার জীবগোষ্ঠীর গঠনকে প্রভাবিত করেছে। Emu হল এই তৃণভূমির একটি অন্যতম বৃহদাকার উড়তে অক্ষম পাখি।

(6) নিউজিল্যান্ডের তৃণভূমি বায়োমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এখানে বিশেষ তৃণভোজী স্তন্যপায়ী পশু নেই, কারণ এই দ্বীপরাষ্ট্রটি মহাদেশীয় স্থলভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং এখানে ওই ধরনের পশুদের বিশেষ পরিযান ঘটেনি। অত্যধিক শিকারের ফলে উড়তে অক্ষম বৃহদাকার Moas পাখিও বর্তমানে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে। বর্তমানে এই তৃণভূমি অঞ্চলে অনেক গৃহপালিত পশু দেখা যায়।

মানুষ ও নাতিশীতোষ্ম বায়োম—

জলবায়ুগত অবস্থা, মৃত্তিকার প্রকৃতি, আঞ্চলিক উদ্ভিদ, প্রাণীগোষ্ঠী এবং অবশ্যই মানুষ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নাতিশীতোষ্ম তৃণভূমি বায়োমের বাস্তুতন্ত্র তৈরি করেছে। কিন্তু মানুষের ক্রিয়াকলাপ ক্রমশ বাস্তুতন্ত্রের প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করছে। ফলে বর্তমানে বিশ্বে কোনো সম্পূর্ণ বা প্রকৃত তৃণভূমি নেই বললেই চলে। কারণ এই তৃণভূমিগুলির অধিকাংশই গৃহপালিত পশুচারণের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।

পৃথিবীর অন্য কোনো বায়োমে মানুষের ক্রিয়াকলাপের প্রভাব এই তৃণভূমি বায়োমের মতো সুস্পষ্ট দেখা যায় না। অধিকাংশ প্রধান তৃণভূমিগুলি বর্তমানে কৃষি খামারে রূপান্তরিত হয়েছে বা হচ্ছে, যা 'পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি' নামে বিখ্যাত। প্রেইরির বেশির ভাগ অংশে গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদন এবং ডেয়ারি শিল্পের প্রচলন দেখা যায়। কাজাকাস্তানের স্টেপ তৃণভূমি গম চাষের জন্য, পম্পাস তৃণভূমি গম চাষ ও খামার তৈরির জন্য এবং অর্ধশুষ্ক নাতিশীতোষ্ম তৃণভূমিগুলি ভেড়া, গরু, মহিষ প্রভৃতি পালনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

নাতিশীতোষ্ম তৃণভূমি বায়োমে কৃষির ব্যাপক প্রসারের ফলে পুরাতন ঘাস ও গাছের সংখ্যা ক্রমশ কমে যায় এবং বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি হয়। যথা—

(1) স্বাভাবিক তৃণভূমির রূপান্তর বা পরিবর্তন বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর স্বাভাবিক আবাসকে (habitat) ধ্বংস করে এবং এভাবে প্রাণী-প্রজাতিগুলি বিলুপ্ত হয়। যেমন, বাইসন প্রাগহর্ন একসময় উত্তর আমেরিকান প্রেইরির প্রধান প্রাণী ছিল, কিন্তু এখন এরা লুপ্তপ্রায়। অনেক নাতিশীতোষ্ম তৃণভূমি থেকে জেব্রা, অ্যান্টিলোপ, সিংহ, হায়না, চিতাবাঘ প্রভৃতি বর্তমানে অন্তর্হিত হয়েছে।

(2) অত্যধিক পশুশিকার কিছু কিছু প্রাণীর সংখ্যাকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে, কিছু প্রাণীর পরিযানে সাহায্য করে এবং কিছু প্রাণীকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে। যেমন, ইউরোপীয় আগমনকারীদের অত্যধিক পশু শিকার জেব্রা, অ্যান্টিলোপ, সিংহ, চিতা, হায়না প্রভৃতিকে অদৃশ্য করে।

(3) বিদেশি প্রাণী-প্রজাতির প্রবর্তন প্রাচীন উদ্ভিদ-গঠনকে সম্পূর্ণ পালটে দেয়। যেমন, ইউরোপীয়দের দ্বারা অস্ট্রেলিয়াতে ভেড়ার প্রবর্তন এদেশের উদ্ভিদগোষ্ঠীর গঠনকে পরিবর্তিত করে, যা প্রাচীন মার্সুপিয়াল প্রাণীগোষ্ঠীর কাছে অতি উপযুক্ত ছিল। ইউরোপীয় ইঁদুরের প্রবর্তন অস্ট্রেলিয়াতে স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও মানুষকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। দ্রুত বৃদ্ধিশীল খরগোসের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য শিকারি শিয়াল প্রবর্তন করা হয়েছে।

(4) এই তৃণভূমি বায়োমে নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ স্থাপনের ফলে আদি প্রজাতির উদ্ভিদের প্রসার বন্ধ হয়েছে অথবা অনেক উদ্ভিদ বিলুপ্ত হয়েছে। যেমন, লেগুম জাতীয় শস্য (ক্লোভার) এবং

ঘাসের কিছু প্রজাতির (Bromus, Hardeum, Ryegrass) প্রবর্তন অনেক আদি বর্ষজীবী ঘাসকে প্রসারলাভ করতে বাধা দিয়েছে।

(5) অর্ধশুষ্ক প্রেইরি অঞ্চলে অতিরিক্ত কৃষিকাজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'গ্রেট প্লেনস্' অঞ্চলে শুষ্ক, আলগা মাটির অপসারণ ঘটায়। এসব অঞ্চলে খরার সময়ে ধূলিঝড়ের উৎপত্তি হয়, যা মিসিসিপি সমভূমিতে শস্য ও মানুষের ধনসম্পদ-বাড়িঘরের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। তীব্র গতিসম্পন্ন ধূলিঝড়ের ফলে পশ্চিম কানসাস, টেক্সাস ও ওকলাহামার অর্ধশুষ্ক অঞ্চলকে 'Dust Bowl' বলে।

(6) কৃষির উদ্দেশ্যে অসংখ্য বৃক্ষচ্ছেদন মাটির আবরণকে দুর্বল ও আলগা করেছে এবং এর ফলে ব্যাপক ভূমিক্ষয় ঘটেছে এবং সুষ্ঠু গঠনযুক্ত উবর্র মৃত্তিকা ধ্বংস পেয়েছে।

6.3.3 তৈগা বা নাতিশীতোষ্ম সরলবর্গীয় অরণ্য বায়োম

তৈগা বা নাতিশীতোষ্ম সরলবর্গীয় বায়োম সাইবেরিয়ান জলবায়ুতে দেখা যায় এবং ইউরেশিয়ার (স্ক্যান্ডিনোভিয়া উপদ্বীপ থেকে পূর্বতন সোভিয়েত সাইবেরিয়া হয়ে বেরিং সাগর পর্যন্ত) বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও উত্তর আমেরিকার প্রায় মেরু অঞ্চল (আলাস্কা থেকে পূর্বে হাডসন উপসাগর পর্যন্ত) এই বায়োমের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া জার্মানি, পোল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য অংশে এবং উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতমালার উচ্চ অংশে সরলবর্গীয় অরণ্য দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে উত্তরদিকে তুন্দ্রা বায়োম এবং দক্ষিণদিকে নাতিশীতোষ্ম তৃণভূমি বায়োমের (ইউরেশীয় স্টেপ ও উত্তর আমেরিকার প্রেইরি) মধ্যভাগে তৈগা বায়োম অবস্থিত। মহাদেশগুলি দক্ষিণ গোলার্ধে সংকীর্ণভাবে অবস্থান করার ফলে তৈগা বায়োম সেখানে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত।

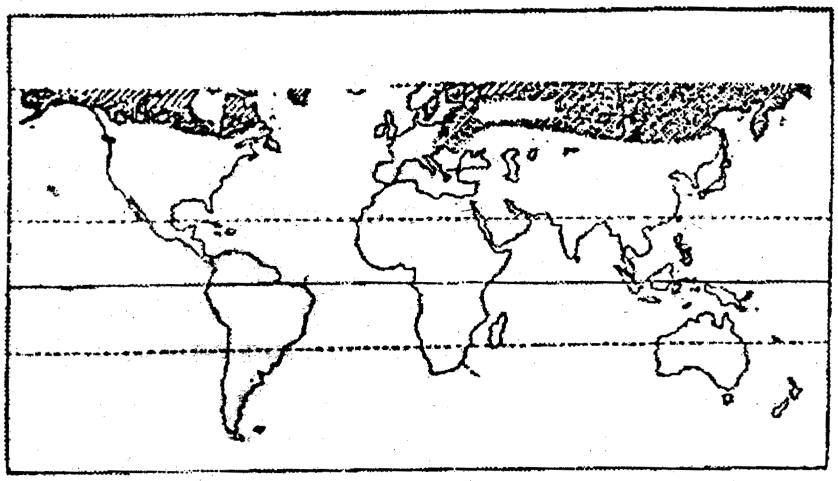

চিত্র 4 ঃ তৈগা বায়োমের বন্টন

তৈগা বা সরলবর্গীয় বনভূমি বায়োমের সাইবেরিয়া জলবায়ু বৈশিষ্ট্যে চরমভাবাপন্ন এবং তীব্র শীতল সুদীর্ঘ শীতকাল ও শীতল স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্ম ঋতু এখানকার প্রধান জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য। গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুর মধ্যে শরৎ ও হেমন্ত হল সংক্ষিপ্ত কাল বা ঋতু। গ্রীষ্মের মাসগুলিতে 10° সে. সমোষ্ণরেখা তৈগা বায়োমের উত্তর সীমা নির্দেশ করে। শীতকালের মাসগুলিতে উষ্ণতা হিমাঙ্কের চেয়ে সবসময় কম। শীতলতম ও উষ্ণতম মাসগুলিতে উষ্ণতা হয় যথাক্রমে 12° সে. ও 20° সে. এবং ফলে বার্ষিক উষ্ণতার প্রখর হয় 32° সে.। সোভিয়েত সাইবেরিয়ার ভারখায়নস্কের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হল 68° সে.। এখানে মাটির মধ্যেকার জল শীতকালের প্রায় 5-7 মাস বরফে পরিণত হয়ে থাকে। গড় বার্ষিক অধঃক্ষেপণ 370 মি.মি. থেকে 600 মি.মি. এর মধ্যে ওঠানামা করে এবং শীতকালে তা তুষাররূপে পতিত হয়। প্রায় সারাবছর অধঃক্ষেপণ কঠিন বা তরলরূপে কমবেশি সমানভাবে বণ্টিত হয়। ফলে বছরের কোনো মাস-ই শুষ্ক নয়।

নাতিশীতোষ্ম সরলবর্গীয় বায়োমের সাইবেরিয়ান জলবায়ুতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। যথা—

(1) অতি তীব্র শীতল ও দীর্ঘ ঋতু (বছরে প্রায় 6 মাস উষ্ণতা 0° সে.) (2) শীত ঋতুতে প্রচুর পরিমাণ তুষারপাত। (3) অতি কম উষ্ণতা এই অঞ্চলে পরিমাফ্রস্ট অবস্থার সৃষ্টি করে। (4) সংক্ষিপ্ত সময়ের গ্রীষ্মকালে তরল আকারে অধঃক্ষেপণ ঘটে এবং পূর্বেকার বরফ গলে যায়। (5) বছরে 50 দিন (উত্তরদিকে) থেকে 100 দিন (দক্ষিণদিকে) স্বাভাবিক উদ্ভিদের জন্ম হয়। (6) বিভিন্ন অংশে বার্ষিক অধঃক্ষেপণের বিশেষ পার্থক্য বা প্রসর দেখা যায় (350 মি.মি.—2000 মি.মি.)। তুষারপাত ও বৃষ্টিপাত—এই দুই উপায়েই অধঃক্ষেপণ হয়। (7) উষ্ণতার বার্ষিক প্রখর গ্রীষ্মকালে 25° সে. ও শীতকালে 40° সে. পর্যন্ত হতে দেখা যায়।

তৈগা বায়োমের উদ্ভিদগত বৈশিষ্ট্য—

তৈগা বনভূমির অধিকাংশ গাছ-ই হল সরলবর্গীয় প্রকৃতির। নরম কাঠের এই অরণ্যের গাছগুলি বাড়িঘর তৈরি, দেশলাই বাক্স, কাগজ ও কাষ্ঠমণ্ড তৈরি, আসবাব নির্মাণ, রেয়ন ও রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত চার প্রজাতির চিরসবুজ সরলবর্গীয় গাছ দেখা যায়। যথা— (1) পাইন (সাদা, লাল ও অন্যান্য রঙের পাইন, স্কটস, পাইন, জ্যাক পাইন, লজপোল পাইন প্রভৃতি)। (2) ফার (ডগলাস ফার, বালসাম ফার প্রভৃতি) (3) স্প্রুস (পিসিয়া) ও (4) লার্চ (ল্যারিক্স)। এছাড়া শক্ত কাঠের নাতিশীতোষ্ম পর্ণমোচী অরণ্য ও এই বায়োমে দেখা যায়। যেখানে মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে সরলবর্গীয় গাছগুলি কেটে পরিষ্কার করে ফেলেছে। এদের Secondary Succession উদ্ভিদ বলে। এই নাতিশীতোষ্ম শক্ত কাঠের গাছ ও চওড়া পাতার পর্ণমোচী গাছগুলির মধ্যে অলডার, বার্চ

ও পপলার অন্যতম। নাতিশীতোষ্ণ সরলবর্গীয় অরণ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাওয়া যায়। যথা—

(1) তৈগা বায়োমের গাছগুলির মধ্যে অন্যতম হল জিমনোস্পারম্ প্রজাতির সরলবর্গীয় গাছ। (2) সরলবর্গীয় অরণ্যগুলি মাঝারি ঘনত্বের হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের মতো ঘন অরণ্য, প্রজাতিগত বৈচিত্র্য ও গাছগুলির উচ্চতার পার্থক্য নাতিশীতোষ্ণ সরলবর্গীয় অরণ্য বায়োমে দেখা যায় না এবং এই অরণ্যের গাছগুলি সোজা ও লম্বা হয়। (3) বেশির ভাগ সরলবর্গীয় গাছ চিরসবুজ হয় কারণ পর্ণমোচী গাছের মতো এদের পাতাগুলির বার্ষিক পতন হয় না। (4) গাছগুলি শঙ্কু আকৃতির হয় বলে গাছের পাতায় ও শাখায় তুষার জমতে পারে না এবং এই আকৃতি বরফকে গড়িয়ে নেমে যেতে সাহায্য করে। (5) গাছের পাতাগুলি ছোটো, ঘন, চমড়ার মতো এবং সূঁচালো হয়, যার ফলে অতিরিক্ত বাষ্পমোচন নিয়ন্ত্রিত হয়। (6) সরলবর্গীয় বনভূমির তলদেশে খুব কম ঝোপঝাড় জন্মায় কারণ অতিরিক্ত ধৌত পডসলজাতীয় আম্লিক মাটিতে লম্বা সরলবর্গীয় গাছগুলির নীচের অংশ গাছপালা জন্মাবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। (7) এই গাছের বীজগুলির বাইরের খোলস বন্ধ থাকে ও শঙ্কু আকৃতির হয়। (8) জলবায়ুগত অবস্থা, ভূপ্রকৃতি ও মাটির স্থানগত পার্থক্য দেখা যায়। (9) গাছগুলি সাধারণত লম্বা হয় এবং গাছগুলির গড় উচ্চতা 12 থেকে 15 মিটার হয়। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে গাছগুলি অনেক সময় প্রায় 100 মিটার লম্বা হয়। (10) এই অংশে প্রধানত পডসল মাটি দেখা যায়। এই মাটি খুব আম্লিক প্রকৃতির হয় এবং খনিজ দ্রব্য ধৌত হবার ফলে মাটি অনুর্বর হয়। উদ্ভিদগোষ্ঠীদের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে যে আঞ্চলিক তারতম্য, তার ভিত্তিতে নাতিশীতোষ্ণ সরলবর্গীয় অরণ্য বায়োমকে প্রধান দুভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(1) **উত্তর আমেরিকার সরলবর্গীয় অরণ্য বায়োম—**

আমেরিকার আলাস্কা থেকে পূর্বদিকে কানাডার লাব্রাডর উপকূলের মধ্যভাগে এই বায়োম অবস্থিত। উত্তরদিকে Arctic Tree Line এবং দক্ষিণদিকে নাতিশীতোষ্ণ শক্ত কাঠের পর্ণমোচী অরণ্যের উত্তর সীমার মধ্যে এই বায়োম অবস্থিত। উত্তর থেকে দক্ষিণে জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি ও মাটির ভিত্তিতে উদ্ভিদ গোষ্ঠীগুলির পরপর নিম্নলিখিত তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা,

(a) এই নাতিশীতোষ্ণ সরলবর্গীয় অরণ্য বায়োমের সবচেয়ে উত্তরের অংশে জলবায়ুর দিক থেকে চরম প্রকৃতির। একে অরণ্য তুন্দ্রা (Forest Tundra type) বলে, যার মধ্যে সরলবর্গীয় ও তুন্দ্রা বায়োমের মিলিত ব্যবস্থা দেখা যায়। এখানে লার্চ ও স্প্রুস জন্মে।

(b) তুন্দ্রা অরণ্যের ঠিক দক্ষিণে উডল্যান্ড সাবজোন দেখা যায় এবং এখানে সাদা ও কালো সরলবর্গীয় স্প্রুস জন্মে। তলদেশে কিছু ঝোপঝাড়, মস, লাইকেন প্রভৃতিও এখানে জন্মে।

(c) আরও দক্ষিণে সরলবর্গীয় গাছের ঘন অরণ্য পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে সাদা ও কালো স্প্রুস, বালসাম ফার ইত্যাদি জন্মে।

ওই বায়োমে গাছের প্রকৃতি ও মাটির প্রকৃতির মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কারণ ভালো জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর মাটিতে উন্নতমানের সাদা স্প্রুস ও বালসাম ফার জন্মে। তাছাড়া বেলেমাটিতে জ্যাক পাইন এবং জলা ও অবনমিত অঞ্চলে কালো স্প্রুস জন্মে। তাছাড়া কানাডার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে চিরহরিৎ সরলবর্গীয় এবং চওড়া পাতার পর্ণমোচী গাছের (হেমলক, ম্যাপল, এলম, সাদা পাইন ইত্যাদি) মিশ্র প্রকৃতির অরণ্য দেখা যায়। স্থানীয় জলবায়ুগত অবস্থার ভিত্তিতে এই বৈচিত্র্য ঘটে।

(2) ইউরেশিয়ার নাতিশীতোষ্ম সরলবর্গীয় অরণ্য বায়োম—

পশ্চিমদিকে উত্তর স্কটল্যান্ড থেকে স্ক্যান্ডিনোভিয়ার মধ্য দিয়ে, ইউরোপীয় রাশিয়া ও সাইবেরিয়া হয়ে পূর্বদিকে বেরিং সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই বায়োম উত্তর-দক্ষিণে সর্বাধিক প্রায় 1600 কিমি চওড়া। এখানেও তিনটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে দেখা যায়। যথা—(a) অরণ্য তুন্দ্রা, (b) উডল্যান্ড সাবজোন ও (c) প্রকৃত বা আদর্শ সরলবর্গীয় অরণ্য। প্লিস্টোসিন যুগে হৈমবাহিক মাটির অসম বণ্টন এই বায়োমে উদ্ভিদের বণ্টনকে প্রভাবিত করে। কাদা ও দোআঁশ মাটি স্প্রুস গাছের জন্য এবং বেলেমাটি পাইন গাছের জন্য অনুকূল। সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে প্রধানত অবনমিত অংশ ও হ্রদের সীমানায় অলডার, বার্চ, উইলো প্রভৃতি ভালো জন্মে। পশ্চিম সাইবেরিয়াতে ফার, স্প্রুস, পাইন ও লার্চ বেশি জন্মে, আর অতিশীতল মধ্য সাইবেরিয়াতে নাতিশীতোষ্ম পর্ণমোচী গাছ হল অন্যতম প্রধান উদ্ভিদ।

জলবায়ুগত ও মৃত্তিকাগত কারণে ক্রান্তীয় অঞ্চলের মতো এই বায়োমে কোনো উল্লম্ব স্তরবিন্যাস দেখা যায় না। ঘন ও বেষ্টিত সরলবর্গীয় অরণ্যের তলদেশে ঝোপঝাড়ের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু উন্মুক্ত অরণ্যগুলিতে কয়েক ধরনের ঝোপঝাড় ও কিছু তৃণজাতীয় গাছ দেখা যায়। একই প্রজাতির গাছ থাকার ফলে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে সরলবর্গীয় অরণ্যের গাছগুলি সহজেই কাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তৈগা বায়োমের প্রাণীসমূহ—

কার্যাবলি অনুসারে ও খাদ্যের অভ্যাস অনুসারে তৈগা বায়োমের পশুগুলিকে দুটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—(1) রসশোষণকারী জন্তু—এই জন্তুগুলি গাছের শাখাপ্রশাখা কাণ্ড থেকে রস শোষণ করে (যেমন Aphid) এবং (2) বিচরণকারী ও মৃদ্ভেদী প্রজাতির জীবজন্তু—যেসব জন্তুগুলি বিচরণ করে এবং ঘাস ও চারাগাছগুলিকে খায় তারা এই শ্রেণিভুক্ত। জীবজন্তুগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে গাছের ক্ষতি করে। যথা—(a) রসশোষণের ফলে গাছের পাতা ঝরে পড়ে এবং সালোকসংশ্লেষ কমে গিয়ে খাদ্য উৎপাদনের ব্যাঘাত হয়। (b) তৃণভোজী প্রাণীরা গাছের পাতা ও চারাগাছকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। (c) ফুল ও ফল খেয়ে গাছের বংশবৃদ্ধি ও প্রজননের ক্ষতি করে। (d) কিছু গাছ সম্পূর্ণ

খেয়ে নেবার ফলে সেগুলি ধ্বংস বা অবলুপ্ত হয়। ভি. ই. শেলফোর্ড (1963) তৈগা বায়োমের জন্তুগুলিকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা—

(1) সর্বোচ্চ প্রভাবশালী জীবজন্তু—

সর্বোচ্চ প্রভাবশালী জীবজন্তু বলতে বড়ো তৃণভোজী প্রাণীকে বোঝায়। যেমন—চমরি গাই। গাছের পাতা, শাখা ও নতুন চারাগাছকে খায় এবং তাদের পদচারণায় মাটি শক্ত হয়। ক্ষতিকর প্রজতির কীটপতঙ্গও এই শ্রেণিভুক্ত।

(2) প্রভাবশালী জীবজন্তু—

মানুষসহ মেরুদণ্ডী মাংসাশী প্রাণী এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কারণ মানুষ বর্তমানে অরণ্যের প্রধান ধ্বংসকারী জীব।

(3) সামান্য প্রভাবশালী জীবজন্তু—

প্রধানত অমেরুদণ্ডী ক্ষুদ্রাকার মাংসাশী প্রাণী ও পরজীবী প্রাণী এর অন্তর্ভুক্ত। ক্যারিবো হরিণ ও চমরি গাই হল তৈগা বায়োমের গুরুত্বপূর্ণ তৃণভোজী প্রাণী। এদের বিভিন্ন খাদ্যাভাস আছে এবং এরা বায়োমের মধ্যে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে। এখানকার অন্যতম একটি শিকারি মাংসাশী প্রাণী হল Blackfly, যা স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পাখিদের দেহ থেকে রক্ত শোষণ করে। অন্যান্য শিকারি মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে নেকড়ে, বনবিড়াল, ভল্লুক প্রভৃতি অন্যতম। কম প্রভাবশালী স্তন্যপায়ী জীব ও পাখিদের মধ্যে লাল কাঠবিড়াল, জংলি হাঁস, ক্রুসবিল ইত্যাদি এবং শিকারি জন্তুদের মধ্যে নেউল, পেঁচা, বাজপাখি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ।

তৈগা বায়োমে কিছু জীবজন্তু মরশুমি পরিযান করে। তীব্রশীতে কিছু প্রাণী দক্ষিণে তৃণভূমি ও পর্ণমোচী অরণ্যে চলে আসে এবং গ্রীষ্মে কিছু প্রাণী উত্তরদিকে তুন্দ্রা বায়োমে চলে যায়। তীব্র শীত সহ্য করার জন্য প্রাণীদের দেহের চামড়া মোটা হয় এবং লম্বা ও ঘন চুল ও লোমে ঢাকা থাকে। শীতকালে ছোটো ছোটো গাছ ও ঘাসগুলি বরফে ঢাকা থাকে বলে খাদ্যের অভাবে প্রাণীগুলি দক্ষিণদিকে পরিযান ও প্রচরণ করে। আবার কিছু প্রাণী শীতে মাটির নীচে চলে যায় এবং মৃতপ্রায় অবস্থায় গ্রীষ্মের জন্য অপেক্ষা করে।

মানুষ ও তৈগা বায়োম—

নাতিশীতোষ্ম সরলবর্গীয় অরণ্য বায়োম বা তৈগা বায়োমে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নরম কাঠ পাওয়া যায় বলে মানুষ তার বাণিজ্যিক প্রয়োজন মেটাতে তৈগা বায়োমে প্রবেশ করেছে। এই অরণ্য মানুষের অনুপ্রবেশের ফলে ধ্বংস হওয়ায় পরবর্তীকালে নাতিশীতোষ্ম পর্ণমোচী অরণ্যের সৃষ্টি হয়। কৃষির প্রয়োজনে অরণ্য কেটে পরিষ্কার করলেও বিশ্বের অর্থনৈতিক সাফল্য পাওয়া যায়নি কারণ

এখানকার স্পোডোসল মাটি খুব উর্বর নয় এবং যথেষ্ট পরিমাণ রাসায়নিক সার ছাড়া উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব নয়। সাইবেরীয় তৈগার পডসল মাটিও কৃষির অনুকূল নয়। এই কারণে উত্তর আমেরিকার মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় অঞ্চলে প্রাথমিকভাবে ইউরোপীয়দের দ্বারা যেসব অরণ্য কেটে কৃষিকাজ হয়েছিল, কৃষিপণ্য উৎপাদনের পরিমাণ কম হবার ফলে সেগুলিকে আবার অরণ্যভূমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

6.3.4 তুন্দ্রা বায়োম (Thundra Biome)

অবস্থান—

তুন্দ্রা শব্দটি একটি 'ফিনিশ' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ হল 'উদ্ভিদহীন অনুর্বর জমি'। ফলে তুন্দ্রা অঞ্চল হল উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার মেরু জলবায়ুতে অবস্থিত প্রায় উদ্ভিদহীন অঞ্চল, যার উত্তর সীমায় রয়েছে চিরতুষারাবৃত অঞ্চল এবং দক্ষিণ সীমায় রয়েছে তৈগা সরলবর্গীয় অরণ্য। তুন্দ্রা বায়োম বলতে আলাস্কার অংশবিশেষ, কানাডার সবচেয়ে উত্তরে অবস্থিত অংশ, গ্রিনল্যান্ডের উপকূল, উত্তর সাইবেরিয়া এবং ইউরোপীয় রাশিয়ার মেরুসাগরের তীরভাগকে বোঝায়। এছাড়া সুমেরুদেশীয় দ্বীপগুলিতে ও তুন্দ্রা বায়োম দেখা যায়।

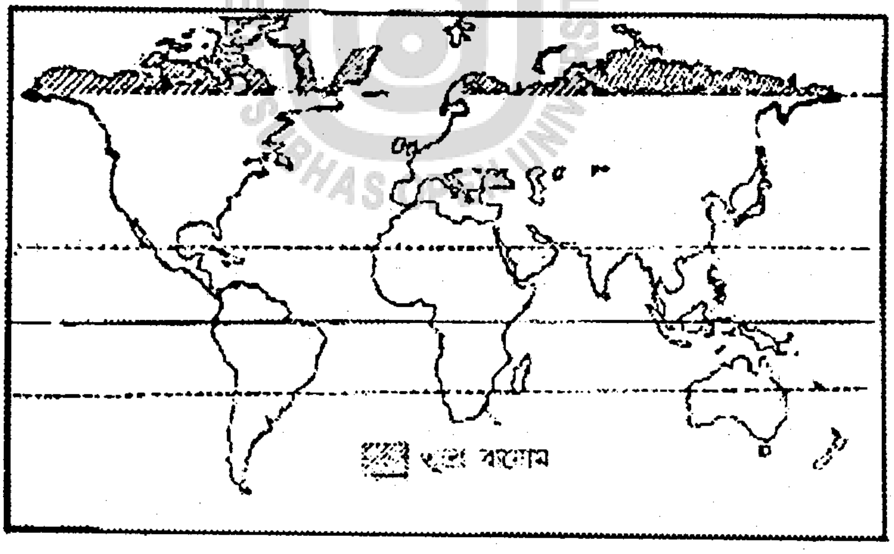

চিত্র 5 : তুন্দ্রা বায়োমের বন্টন

Tree line বা উদ্ভিদরেখার উত্তরদিকে জলবায়ুর চরমতা বাড়ার ফলে উদ্ভিদের পরিবর্তন হয়। সুমেরুদেশীয় তুন্দ্রা বায়োমে উদ্ভিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে দক্ষিণ থেকে উত্তরে তিনটি অঞ্চল পাওয়া যায়। যথা—(a) নিম্ন সুমেরুদেশীয় তুন্দ্রা, (b) মধ্য সুমেরুদেশীয় ও (c) উচ্চ সুমেরুদেশীয় তুন্দ্রা। এই বিভাগগুলি অক্ষাংশের ভিত্তিতে নিম্ন সুমেরুদেশীয় তুন্দ্রা বলতে সুমেরুদেশীয়

তুন্দ্রার দক্ষিণ অংশকে বোঝায়, যার মধ্যে রয়েছে উত্তর কানাডার বড়ো অংশ, উত্তর আলাস্কা, কানাডীয় দ্বীপগুলির (ব্যাংকস, ভিক্টোরিয়া ও ব্যাফিন) দক্ষিণ অংশ, গ্রিনল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূল ও সাইবেরীয় উপদ্বীপ। উচ্চ সুমেরুদেশীয় তুন্দ্রার মধ্যে রয়েছে কানাডীয় দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে অবস্থিত দ্বীপসমূহ (যেমন—কুইন এলিজাবেথ দ্বীপগোষ্ঠী)। এই অঞ্চলটির মস, লাইকেন ও ওষধির (যেমন, Avens ও Sexifrages) মতো উদ্ভিদ ছাড়া প্রায় উদ্ভিদহীন বললেই চলে। মধ্য সুমেরুদেশীয় তুন্দ্রা পূর্বেকার দুটি শ্রেণির মধ্যভাগে অবস্থিত। সামগ্রিক তুন্দ্রা বায়োম প্রধান দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা—(1) সুমেরুদেশীয় তুন্দ্রা বায়োম ও (2) আল্পীয় তুন্দ্রা বায়োম।

জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য—

তুন্দ্রা বায়োম জলবায়ু ও মেরুদেশীয় জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সূর্যরশ্মির তাপীয় ফল সূর্যালোকের অভাব এবং সারা বছর ধরে কম তাপমাত্রা। জলবায়ুর এই চরম অবস্থা বেশি সংখ্যক উদ্ভিদ জন্মানোর পক্ষে অনুকূল নয়। ফলে অধিকাংশ তুন্দ্রা অঞ্চল উদ্ভিদহীন। প্রতি বছর 7-8 মাস ভূপৃষ্ঠ বরফে ঢাকা থাকে। তাপমাত্রা বছরের বেশির ভাগ সময় হিমাঙ্কের নীচে থাকে। অঞ্চলটির উপর দিয়ে তীব্রগতিসম্পন্ন ঠান্ডা পাউডার জাতীয় ঝড় (Blizzard) দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়। বছরে উৎপাদনকারী সময় (Growing Season) হল মাত্র 50 দিন। ভূমিভাগটি প্রায় স্থায়ীভাবে তুষারাবৃত এমনকি মাটির মধ্যেও সারাবছর বরফ জমে থাকে (Permefrost)। গড় বার্ষিক অধঃক্ষেপণ (প্রধানত তুষারপাত) প্রায় 400 মি.মি. এর কম হয়। শীতকালগুলি দীর্ঘ হয় এবং শীত খুব তীব্র হয়। অন্যদিকে গ্রীষ্মকালগুলি সংক্ষিপ্ত, মাঝারি শীতল ও আরামদায়ক। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে গড় তাপমাত্রা হয় –35º সে. থেকে – 40º সে.। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মকালে গড় উষ্ণতা হল 10º সে.। গ্রীষ্মকালে প্রায় 2-3 দিন এই বায়োমে রাত্রি হয় না। অর্থাৎ এই বায়োমে রাত্রি হয় না, অর্থাৎ সূর্য অস্ত যায় না। আবার সূর্য তির্যকভাবে কিরণ দেয় বলে স্থলভাগ বিশেষ উত্তপ্ত হয় না। তেমনি শীতকালে প্রায় কয়েকমাস সূর্য উদিত হয় না এবং ভূপৃষ্ঠ সবসময় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। গ্রীষ্মকালে ঘূর্ণবাতের ফলে কম পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। যার গড় পরিমাণ মাত্র 20-25 সে.মি.।

তুন্দ্রা বায়োমের উদ্ভিদগোষ্ঠী—

অত্যধিক ঠান্ডা বলে তুন্দ্রা বায়োমে গুল্ম, শৈবাল ও ঝোপজাতীয় গাছ দেখতে পাওয়া যায়। তুন্দ্রা বায়োমে মাটির আর্দ্রতার সাথে উদ্ভিদের একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক আছে। এখানকার লিথোসলে (উত্তর জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত) কেবলমাত্র লাইকেন ও মস পাওয়া যায়। সুমেরুদেশীয় ধূসর মাটিতে ক্ষুদ্রাকার তৃণজাতীয় গাছ জন্মে এবং জলাভূমিতে মস, হোগলাজাতীয় গাছ, জলজ ঘাস প্রভৃতি জন্মে ও বৃদ্ধি

পায়। অত্যধিক ঠান্ডার জন্য এবং সর্বনিম্ন পরিমাণের সৌরবিকিরণ ও সূর্যালোক প্রাপ্তির জন্য পৃথিবীর মোট উদ্ভিদ প্রজাতির মাত্র তিন শতাংশ (3%) এখানে পাওয়া যায়।

এন. পল্যুমিন (1959) এর মতে, আর্কটিক বা সুমেরুদেশীয় তুন্দ্রা বায়োমে প্রায় 66 প্রজাতির ব্রয়োফাইট (ঠান্ডা সহ্যকারী উদ্ভিদ) আছে এবং উত্তরদিকে শীতের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে উদ্ভিদপ্রজাতির সংখ্যা এবং উদ্ভিদের সংখ্যা কমতে থাকে। বেশির ভাগ গাছ ছোটো আকারের হয় এবং এদের উচ্চতা হয় 5 থেকে 8 সে.মি.। গাছগুলির অধিকাংশ প্রায় মাটির সাথে লেগে থাকে কারণ মাটির উপরকার বায়ুস্তরের চেয়ে মাটির তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। তৃণজাতীয় গাছগুলি এমন জায়গায় জন্মায় যেখানে বরফের স্তূপ অতিশীতল ঝড়ের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা। এই গাছগুলির মধ্যে উইলো (Salixherbacea ও Salix arctica) অন্যতম। গাছগুলির কাণ্ড ও পাতাগুলি ভূপৃষ্ঠের খুব কাছে থাকে (সর্বাধিক মাত্র কয়েক সে.মি. উচ্চতা) যদিও এই গাছগুলির বৃদ্ধির মাত্রা খুবই কম বা ধীর, কিন্তু এদের বেঁচে থাকার সময়ের দৈর্ঘ্য অবিশ্বাস্যভাবে বেশি (150 থেকে 300 বছর) হয়।

প্রধানত স্বল্পস্থায়ী শীতল গ্রীষ্মকালে চিরসবুজ সপুষ্পক গাছগুলি ভুমির উপরে অনেকটা কুশনের মতো অবস্থান করে। এই সপুষ্পক ওষধি গাছগুলির মধ্যে Moss Compion অন্যতম। অনেক গাছ কৃত্রিম গোলাপের আকৃতি নেয়, যাতে গাছের পাতাগুলি একটি নির্দিষ্ট অংশ থেকে বিকিরিত হয় এবং পাতাহীন সপুষ্পক বৃন্তগুলি উপরের দিকে বৃদ্ধি পায়। স্যাক্সিফ্রেগাস নিভালিস হল এক বিশেষ প্রজাতির কৃত্রিম গোলাপজাতীয় গাছ (rosette)। কিছু গাছ মোটা ও মাংসল পত্রবিশিষ্ট, ঘন চামড়াবিশিষ্ট ও লোমে আবৃত হয়। কয়েকটি গাছ ভুমির উপরে গুচ্ছাকারে জন্মে, আবার কিছু অনুভূমিকভাবে মাদুর বা কার্পেটের মতো অবস্থা করে (যেমন, ড্রায়াস অক্টোপি টালা)। তুন্দ্রা বায়োমে গাছগুলি বৃদ্ধির জন্য সারাবছরের মধ্যে স্বল্পস্থায়ী শীতল গ্রীষ্মকালে মাত্র 50 দিন সময় পাওয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে গাছগুলির জীবনচক্র সম্পন্ন হয়।

তুন্দ্রা বায়োমের জীবজন্তু—

আর্কটিক তুন্দ্রা বায়োমের জীবজন্তুদের দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—(1) বসবাসকারী জন্তু ও (2) প্রচরণকারী জন্তু। শীতকালে তীব্র শীতের হাত থেকে বাঁচতে বেশির ভাগ জীবজন্তু আর্কটিক তুন্দ্রা থেকে দক্ষিণদিকে বাঁচতে বেশির ভাগ জীবজন্তু আর্কটিক তুন্দ্রা থেকে দক্ষিণদিকে চলে আসে। অধিকাংশ বৃহদায়তন বসবাসকারী জীবজন্তুর দেহে ঘন কোটের মতো লোম বা পালক থাকে, যা তীব্র শীতের সময় জীবজন্তুর দেহে উত্তাপ দেয়। আমেরিকান মাস্ক যাঁড় এই ধরনের জন্তুর প্রধান উদাহরণ। আর্কটিক তুন্দ্রার অন্তর্গত আলাস্কা, গ্রিনল্যান্ড ও উত্তর কানাডায় এই সুবিশাল তৃণভোজী প্রাণীটির দেহে

ঘন ও নরম লোমের কোটজাতীয় আবরণ দেখা যায়। লোমগুলি এত লম্বা হয় যে, অনেক সময় এগুলি মাটিকে স্পর্শ করে। এই ঘন লোমশ আবরণ শীত ও আর্দ্রতা থেকে ষাঁড়গুলিকে রক্ষা করে। গ্রীষ্মকালে এই Mask ষাঁড় অপেক্ষাকৃত উষ্মতর পরিবেশের সাথে সমতা রাখার জন্য এই ভারী লোমশ কোটজাতীয় আবরণ ত্যাগ করে। ঘন চুল ও উল জাতীয় আবরণ ত্যাগ করার পর এই প্রাণীগুলির দেহ বন্ধুর ও কর্কশ হয়। আবার পরবর্তী শীতে একইভাবে পশুদেহে লোমের আবরণের সৃষ্টি হয়। সুমেরুদেশীয় শিয়ালের দেহে দ্বিগুণ ঘন ফারের কোটের মতো আবরণ গঠিত হয় এবং ফলে তা হিমাঙ্কের অনেক কম তাপমাত্রা (–50° সে) সহ্য করতে পারে। শীতকালেও এই প্রাণীগুলি কাজ করতে সক্ষম এবং শিকার (লেমিংস খরগোস) ধরতেও সক্ষম। বসবাসকারী একধরনের পাখিদের পালক আছে (যেমন Ptarmigan পাখি) যেগুলি দিয়ে তৈরি বস্ত্র তীব্র শীতের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে। পালকগুলির কম্পন ও ঝাঁকুনির দ্বারা হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে। আর্কটিক তুন্দ্রা বায়োমের কিছু বসবাসকারী জীবজন্তু তাদের রং পর্যন্ত প্রতি ঋতুতে পরিবর্তন করে। যেমন Ptarmigan পাখি বছরে প্রায় তিনবার তাদের রং পরিবর্তন করে। ফারের আবরণবিশিষ্ট সুমেরুদেশীয় শিকারি শিয়াল ও নকুল বা বেজি গ্রীষ্মকালে বাদামি রঙের এবং শীতকালে সাদা রঙের হয়।

ক্রান্তীয় অঞ্চলে যেখানে প্রায় 69 প্রজাতির জীবজন্তু দেখা যায়, তুন্দ্রা অঞ্চলে সেখানে মাত্র 8টি প্রজাতির পশু দেখা যায়। এদের মধ্যে বলগা হরিণ, কস্তুরী হরিণ, সাদা ভল্লুক, মেরু শিয়াল, কস্তুরী, ইঁদুর প্রভৃতি অন্যতম। এখানে প্রায় 160 প্রজাতির পাখি দেখা যায় যাদের মধ্যে প্রায় 114টি সামুদ্রিক এবং বাকিরা ডাঙায় বিচরণকারী। নেকড়ে, ক্যারিবো হরিণ প্রভৃতি পশুর লোমহীন পা রয়েছে যা তাপ নিরোধক হিসাবে কাজ করে এবং দেহের তাপকে বাইরে বেরোতে দেয় না। কিছু ছোটো ছোটো প্রাণী, যেমন ইঁদুর, লেমিস, অন্যান্য ছোটো পতঙ্গভুক প্রাণী প্রভৃতি শীতকালে তীব্র শীতের হাত থেকে এবং শিকারি প্রাণীর হাত থেকে বাঁচার জন্য গর্তে ও সুড়ঙ্গে বাস করে।

এই বায়োমের দ্বিতীয় শ্রেণির পশু হল প্রচরণকারী (migratory) পশু, যারা শীতের শুরুতে দক্ষিণের উষ্মতর অঞ্চলে প্রচরণ করতে শুরু করে এবং আবার বসন্তকালে তাদের নিজস্ব স্থানে ফিরে আসে। বিভিন্ন পাখি যেমন, হাঁস, বেলে হাঁস, জলকুক্কুট প্রভৃতি হেমন্তের আগমনের সাথে সাথে নিজস্ব স্থান প্রথমে ত্যাগ করে এবং বসন্ত বা গ্রীষ্মের আগমনে আবার নিজস্ব স্থানে ফিরে যায়। স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মের মধ্যে পাখিগুলিকে বাসা বাঁধা, ডিম পাড়া, শাবকদের পালন প্রভৃতি কাজগুলি করতে হয়। কিছু পাখিকে প্রচরণের সময় অনেক লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। সুমেরুদেশীয় টার্ন হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচরণকারী পাখি এবং এগুলি দক্ষিণে প্রায় অ্যান্টার্কটিকা পর্যন্ত চলে যায়। গ্রীষ্মকালে মশা, ডাঁশ, কেঁচো প্রভৃতি পতঙ্গগুলিকে পুকুর, হ্রদ ও জলাভূমিতে দেখা যায়। পাখিগুলি পুকুর, জলা ও মাটি থেকে পতঙ্গ, কেঁচো, শামুক তুলে শাবকদের খাওয়ায়।

বলগা হরিণ ও ক্যারিবো হরিণ বৃহদাকার প্রচরণকারী পশুদের মধ্যে অন্যতম। এই স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলি শীতকালে তাদের দক্ষিণে তৈগা বায়োমে অবস্থান করে এবং গ্রীষ্মে আবার নিজস্ব বায়োমে প্রবেশ করে। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যে এই পশুগুলি প্রায় কয়েকশো কি.মি. দূরত্ব অতিক্রম করে। প্রধানত জলবায়ুর চরমতা ও খাদ্যের অভাব তাদের প্রচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রচরণের সময় শিকারি পশুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তুন্দ্রা অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন বসবাসের সময় মশা, মাছি ও রক্তশোষক কীটপতঙ্গের দ্বারা এই বড়ো পশুগুলি আক্রান্ত হয়।

মানুষ ও তুন্দ্রা বায়োম—

তুন্দ্রা বায়োমের বিভিন্ন জীবজন্তুর সাথে সেখানকার অধিবাসীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে কারণ স্থলজ ও জলজ উভয় স্বাভাবিক আবাসের (habitat) জীবজন্তুর উপরে মানুষের বসবাস নির্ভর করে। প্রায় 50 বছর আগে গ্রিনল্যান্ড, উত্তর কানাডা ও আলাস্কার এস্কিমো, উত্তর ফিনল্যান্ড ও স্ক্যান্ডিভেিয়ার ল্যাপ, সাইবেরিয়ারপ স্যামেয়েদ, লেনা উপত্যকার ইয়াকুটস এবং উত্তর পূর্ব এসিয়ার কোরিয়াক ও চুকচি প্রভৃতি জাতির মানুষের সম্পূর্ণ যাযাবর জীবন যাপন করতো। এরা প্রধানত নির্ভরশীল ছিল মাছ, সিল, মেরু ভাল্লুক প্রভৃতি প্রাণী থেকে তৈরি খাদ্যের উপর এবং ক্যারিবো হরিণ, বলগা হরিণ ও অন্যান্য লোমশ প্রাণীদের থেকে পাওয়া দ্রব্যগুলির উপর। এভাবে প্রাথমিক যাযাবর তুন্দ্রা মানুষেরা শিকারের মাধ্যমে তুন্দ্রা জীবজন্তুদের বিশেষ ক্ষতিসাধন করে। বর্তমানে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে তুন্দ্রা বায়োমের অনেক মানুষ এখন স্থায়ী ও অর্ধযাযাবর জীবনযাপন করা শুরু করেছে। এস্কিমোরা স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে এবং ক্যারিবো হরিণ ও লোমশ প্রাণীদের গৃহপালিত করে তুলেছে। এস্কিমোদের সন্তানেরা এখন স্কুলশিক্ষা গ্রহণ করছে এবং বাসিন্দারা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে। যেমন পুরানো দিনের হারপুন অস্ত্রের বদলে রাইফেল ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যান্য বায়োমের মতো আধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত আধুনিক এস্কিমোরা বর্তমান তুন্দ্রা-বাস্তুসংস্থানকে ধ্বংস করে চলেছে। ইউরেশীয় তুন্দ্রার স্যামোয়েদ ও অন্যান্য উপজাতি নতুন জীবনের পথ বেছে নিয়েছে। অনেকেই স্থায়ী বসতি স্থাপন করে জীবনযাপন করছে। এরা বলগা হরিণ ও লোমশ প্রাণীদের পালন করে এবং এমনকি সাইবেরিয় তুন্দ্রায় গমের মতো খাদ্যশস্য ও উৎপন্ন করে। আবার এখনও এই বায়োমের ইউরেশীয় অংশে উপজাতির মানুষেরা প্রধানত ঘাসের খোঁজে বলগা হরিণ ও অন্যান্য পালিত পশুগুলিকে নিয়ে চলাচল করে।

তুন্দ্রা বায়োমের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (Primary productivity) বেশ কম হয়, কারণ (i) এখানে সূর্যরশ্মির তাপীয় ফল (insolation) কম হয়, এবং জলবায়ু চরম প্রকৃতির হয়, (ii) গুল্ম তৃণ ও গাছের পাতা পরে পিট তৈরি হয় এখানে মাটি অনুর্বর ও অপরিণত হয়, (iii) বৃষ্টিপাতের অভাবে

মাটিতে পুষ্টিমৌলের (নাইট্রোজেন ও ফসফরাস) কার্যকারিতার অভাব এবং আর্দ্রতা ও ধৌত প্রক্রিয়ার অভাব থাকে, (iv) ভুভাগ চিরতুষারাবৃত থাকে এবং বছরপ্রতি শস্য উৎপাদনের সময়ের দৈর্ঘ্য হয়।

6.4 সারাংশ

আলোচিত এককটির প্রথমে 'জীব ভূগোল' বিষয়ের ধারণাটি ভূগোল বিষয়ে কীভাবে এলো তা আলোচনা করা হয়েছে। এরপর 'বায়োম' বলতে আমরা কী বুঝি তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশ্বের বায়োমগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আমরা এখানে আলোচনা করেছি। ক্রান্তীয় বায়োমগুলির মধ্যে আমরা ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃষ্টি অরণ্য বায়োম ও ক্রান্তীয় তৃণভূমি বায়োম—এই দুটি বায়োম ব্যাখ্যা করেছি। এই দুটি বায়োম ছাড়া ও নাতিশীতোষ্ণ সরলবর্গীয় অরণ্য বায়োম (তৈগা), নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি বায়োম, তুন্দ্রা বায়োম প্রভৃতির অবস্থান, জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুদের বৈশিষ্ট্য এবং মানুষের অবস্থান ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই এককটিতে করা হয়েছে। প্রতিটি বায়োমের ক্ষেত্রে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে, বিশেষ কিছু জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বিশেষ ধরনের মৃত্তিকা, উদ্ভিদগোষ্ঠী ও প্রাণীগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এইসব অঞ্চলে মানুষের ক্রিয়াকলাপ যেমন উক্ত উপাদানগুলির উপর নির্ভরশীল, তেমনি আবার মানুষের ক্রিয়াকলাপ অথবা বায়োমের মধ্যে মানুষের অনুপ্রবেশ বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বা সমতাকে বিনষ্ট করে।

6.5 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

আলোচিত বিষয়বস্তুর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন—

প্রশ্ন— 1. জীবভূগোল কাকে বলে?

2. বাস্তুরীতি কী?

3. বায়োম বলতে কী বোঝায়?

4. এপিফাইট গাছ বলতে কী বোঝায়?

5. ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যবায়োমের সর্বোচ্চস্তরের উচ্চতা কত?

6. ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যের কয়েকটি জীবজন্তুর নাম করুন।

7. 'সাভানা' বলতে কী বোঝায়?

8. সাভানা বায়োমে তিনটি ঋতু কী কী?

9. অস্ট্রেলিয়ান সাভানার পশুপাখি সম্পর্কে ধারণা দিন।

10. নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি বিশ্বের কোন কোন অংশে কী কী নামে পরিচিত?
11. 'পম্পাস' তৃণভূমি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
12. সংক্ষেপে তৈগা বায়োমের জলবায়ু উল্লেখ করুন।
13. ভি. ই. শেলফোর্ড কৃত তৈগা, বায়োমের জীবজন্তুদের শ্রেণিবিভাগ করুন।
14. সুমেরুদেশীয় তুন্দ্রা বায়োমকে উদ্ভিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের তারতম্য অনুসারে কতভাগে ভাগ করা যায়?
15. তুন্দ্রা বায়োমের পশুপাখিদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

6.6 উত্তরমালা

1. 6.2 অংশ দেখুন।
2. 6.3 অংশ দেখুন।
3. 6.3 অংশ দেখুন।
4. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃষ্টি অরণ্যের বৈচিত্র্য অংশটি দেখুন।
5. ক্রান্তীয় বায়োমের 'উল্লম্ব স্তরবিন্যাস' অংশ দেখুন।
6. ক্রান্তীয় বায়োমের 'প্রাণীগোষ্ঠী' অংশ দেখুন।
7. সাভানা বায়োমের প্রথম অংশ দেখুন।
8. এই বায়োমের 'জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য' অংশ দেখুন।
9. সাভানা বায়োমের 'জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্য' অংশ দেখুন।
10. নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির প্রথম অংশ দেখুন।
11. নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি বায়োমের 'স্বাভাবিক উদ্ভিদ গোষ্ঠী' অংশ পড়ুন।
12. তৈগা বায়োমের 'জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য' অংশ পড়ুন।
13. তৈগা বায়োমের প্রাণীসমূহ অংশটি দেখুন।
14. তুন্দ্রা বায়োমের অবস্থান অংশটি পড়ুন।
15. 'তুন্দ্রা বায়োমের জীবজন্তু' অংশটি পড়ুন।

6.7 গ্রন্থপঞ্জি

1. Arora, M. P. 1997 : Ecology, Himalaya Publishing House, Mumbai, Delhi.
2. Sharma, P.D. 1984 : Elements of Ecology ; Rastogi Publications ; Meerut.
3. Singh, S. 1991 : Environmental Geography ; Prayag Pustak Bhawan, Allahabad.
4. মিত্র দেবব্রত, গুহ জীবেশ 1986 : উদ্ভিদ বিজ্ঞান (দ্বিতীয় খণ্ড) ; মৌলিক লাইব্রেরি, কলিকাতা।
5. সান্যাল, ভূপেন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়,

   অসীমকুমার 1997 : জীববিদ্যা (প্রথম খণ্ড) ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

একক 7 ❑ বাস্তুতন্ত্র, বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহ, জীবগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়—বিভিন্ন গোষ্ঠীর জীবদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

গঠন

7.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

7.2 বাস্তুতন্ত্র কী?

- **7.2.1.** বাস্তুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য
- **7.2.2.** মানবীয় বাস্তুতন্ত্র
- **7.2.3.** বাস্তুতন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ
- **7.2.4.** বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলি সম্পর্কে ধারণা
- **7.2.5.** বাস্তুতন্ত্রের বা ইকোসিস্টেমের ক্রিয়াপদ্ধতি

7.3 বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহের ব্যাখ্যা

7.4 জীব সম্প্রদায়

- **7.4.1.** জীব সম্প্রদায়ের শ্রেণিবিভাগ
- **7.4.2.** উদ্ভিদের শ্রেণিবিভাগ
- **7.4.3.** উদ্ভিদগোষ্ঠীর অন্যান্য শ্রেণিবিভাগ
- **7.4.4.** উদ্ভিদগোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ—
- **7.4.5.** জীবনের আকারের ভিত্তিতে উদ্ভিদের শ্রেণিবিভাগ
- **7.4.6.** স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী
- **7.4.7.** উদ্ভিদ গোষ্ঠীগুলির উল্লম্ব স্তরবিন্যাস
- **7.4.8.** গোষ্ঠী উন্নয়ন
- **7.4.9.** প্রাণীরাজ্যের শ্রেণিবিভাগ

7.5 উদ্ভিদ ও প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ

7.6 সারাংশ

7.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

7.8 উত্তরমালা

7.9 গ্রন্থপঞ্জি

7.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা—জীব ভূগোল পাঠক্রমের অন্যতম একটি বিষয় হল বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুরীতি, তার শ্রেণিবিভাগ, ক্রিয়াপদ্ধতি এবং উপাদানসমূহের ব্যাখ্যা। বিভিন্ন সজীব অজীব ও শক্তি উপাদানগুলি বাস্তুতন্ত্রের উপাদান হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জীবগোষ্ঠী বা জীব সম্প্রদায় এবং তার শ্রেণিবিভাগ, উদ্ভিদগোষ্ঠী ও তার শ্রেণিবিভাগ এবং প্রাণীগোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ পৃথিবীতে জীবনের বন্টন ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে। এই এককটিতে বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলির সাথে বিভিন্ন উদ্ভিদগোষ্ঠী ও প্রাণীগোষ্ঠীগুলির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য—বর্তমান এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- বাস্তুতন্ত্র কী?
- বাস্তুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ ;
- বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহের বিবরণ ;
- জীব সম্প্রদায় ও তার শ্রেণিবিভাগ ;
- উদ্ভিদগোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ ;
- প্রাণীগোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ ;
- উদ্ভিদ ও প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলগুলির বিবরণ।

7.2 বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুরীতি (Ecosystem) বলতে কী বোঝো?

বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুরীতি হল পরিবেশের এমন একটি কার্যকরী একক, যা পরিবেশের সজীব ও জড় উপাদানগুলির সমন্বয়ে গঠিত এবং এই উপাদানগুলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যেখানে জীব সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকতে পারে।

বাস্তুতন্ত্রের ইংরাজি প্রতিশব্দ Ecosystem শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন এ. ডি. ট্যানসলে (1935)। এর আক্ষরিক অর্থ হল Eco=পরিবেশ এবং System=বিভিন্ন উপাদানের যৌথ ও ধারাবাহিক মিথস্ক্রিয়ায় উৎপন্ন ব্যবস্থা বা প্রণালি। ট্যানসলের মতে, Ecosystem দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা, বায়োম (একটি নির্দিষ্ট স্থানিক এককের সমস্ত গাছপালা ও জীবজন্তু) এবং হ্যাবিট্যাট (ভৌত পরিবেশ)। বায়োম ও হ্যাবিট্যাট এর মধ্যে জীব ও জড় উপাদানের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্ত প্রণালি বা রীতি (system) রক্ষিত হয়।

এফ. আর. ফসবার্গ (1963) এর মতে, ইকোসিস্টেম বলতে বোঝায় একটি ক্রিয়াশীল এবং মিথস্ক্রিয়াশীল প্রণালি, যার মধ্যে একটি বা তার বেশি জীব এবং তাদের কার্যকরী পরিবেশ (ভৌত ও জৈব) থাকে। আর. এল. লিন্ডেম্যান (1942) এর মতে, ইকোসিস্টেম হল এমন রীতি বা প্রণালি (system) যেখানে যে কোনো মাত্রার স্থান কালের ভিত্তিতে ভৌত-রাসায়নিক জৈব প্রক্রিয়া কাজ করে। ই. পি. ওডামের (1971) মত হল 'জীবিত প্রাণী এবং তাদের অজীব পরিবেশ পারস্পরিক সম্পর্কিত এবং পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে।

7.2.1 বাস্তুতন্ত্রের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

1. যে কোনো প্রদেয় স্থান কাল এককের বাস্তুরীতি হল সমস্ত জীবিত প্রাণী এবং ভৌত পরিবেশের যোগফল।
2. বাস্তুরীতিতে তিনটি উপাদান থাকে। যথা, শক্তি উপাদান, সজীব উপাদান ও অজীব উপাদান।
3. ভূপৃষ্ঠের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল নিয়ে বাস্তুতন্ত্র গঠিত।
4. এটি একটি নির্দিষ্ট সময়-এককের ভিত্তিতে গঠিত।
5. একদিকে সজীব ও অজীব উপাদানগুলির পরস্পরের (শক্তি উপাদান সহ) মধ্যে, অন্যদিকে জীবগুলির নিজেদের মধ্যে জটিল মিথস্ক্রিয়া লক্ষ করা যায়, অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্র সবসময় ক্রিয়াশীল থাকে।
6. এটি হল একটি উন্মুক্ত প্রণালি বা Open system যার মধ্যে সবসময় বস্তু ও শক্তির যোগান (input) ও Output উৎপাদন দেখা যায়।
7. বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন শক্তির উৎস থাকলে ও সূর্যালোক হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
8. এটি হল একটি ক্রিয়াশীল একক, যার মধ্যে জীবজ উপাদানগুলি (গাছ, জীবজন্তু, মানুষ ও সূক্ষ্ম প্রাণী এবং অজীবজ উপাদানগুলি (শক্তি উপাদান সহ) অনেক ধরনের চক্রীয় পদ্ধতির সাহায্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।
9. বাস্তুতন্ত্রের নিজস্ব উৎপাদনশীলতা আছে, যা শক্তির পরিমাণের প্রাপ্যতার উপর নির্ভরশীল। উৎপাদনশীলতা হল একটি নির্দিষ্ট একক জমিতে প্রতি একক সময়ে জৈবপদার্থের বৃদ্ধির মাত্রা।
10. বাস্তুতন্ত্র স্থানিক অবস্থানের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। এমনকি একটি ছোটো গাছ ও ছোটো জীবদের নিয়ে একটি বাস্তুতন্ত্র গঠিত হতে পারে। আর বাস্তুতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হল সমস্ত জীবমণ্ডল।
11. বাস্তুতান্ত্রিক উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায় আছে। পরিবেশগত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা আছে।

12. বাস্তুতন্ত্র হল প্রাকৃতিক সম্পদ প্রণালি বা 'Natural resource sysmte' এবং অন্যান্য প্রণালির বৈশিষ্ট্যগুলিকেও বাস্তুতন্ত্র ধারণ করে।
13. বাস্তুতন্ত্রের একটি বিশেষ গঠন বা Structure থাকে।

7.2.2 মানবীয় বাস্তুতন্ত্র

পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ভৌত রাসায়নিক ও জৈব উপাদানগুলির সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের একটি প্রণালি বা ব্যবস্থাকে বলে মানবীয় বাস্তুতন্ত্র। বাস্তুতন্ত্রে মানুষ হল সবচেয়ে ক্রিয়াশীল একক এবং বর্তমানে পরিবেশের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। তাই মানবীয় বাস্তুতন্ত্র একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

7.2.3 বাস্তুতন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ

বিভিন্ন প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বাস্তুতন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ করা যায়।

আবাস বা বাসস্থানের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ—বিভিন্ন ভৌত পরিবেশগত অবস্থা জীব সম্প্রদায়ের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে নির্ধারণ করে এবং ফলে এদের স্থানিক পার্থক্য দেখা যায়। বিশ্বের প্রধান দুটি বাস্তুতন্ত্র হল—(1) স্থলজ বাস্তুতন্ত্র ও (2) জলজ বাস্তুতন্ত্র।

প্রথমটি (অর্থাৎ স্থলজ বাস্তুতন্ত্র) (a) পার্বত্য, (b) নিম্নভূমি, (c) উষ্ম মরু (d) শীতল মরু বাস্তুতন্ত্রে বিভক্ত। বিশেষ উদ্দেশ্যে এদের আর কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(1) স্বাদু বা মিষ্ট জলের বাস্তুতন্ত্র। ও (2) সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র। এদের মধ্যে প্রথমটি (a) নদী বাস্তুতন্ত্র (b) হ্রদ বাস্তুতন্ত্র, (c) পুকুর বাস্তুতন্ত্র ও (d) জলাভূমি বাস্তুতন্ত্র—এই শ্রেণিগুলিতে বিভক্ত এবং দ্বিতীয়টি (a) উন্মুক্ত মহাসাগরীয় বাস্তুতন্ত্র, (b) উপকূলীয় খাঁড়ি বাস্তুতন্ত্র (c) প্রবাল প্রাচীর বাস্তুতন্ত্র প্রভৃতি শ্রেণিতে অথবা, মহাসাগরীয় পৃষ্ঠদেশ বাস্তুতন্ত্র এবং মহাসাগরীয় পৃষ্ঠদেশ বাস্তুতন্ত্র এবং মহাসাগরীয় তলদেশে বাস্তুতন্ত্র—এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

স্থানিক স্কেলের ভিত্তিতে—এই ভিত্তিতে বাস্তুতন্ত্রের দুটি বিভাগ হল

(a) মহাদেশীয় বাস্তুতন্ত্র ও

(b) মহাসাগরীয় বাস্তুতন্ত্র

স্থানিক স্কেল মহাদেশের মতো বড়ো মাত্রা থেকে একটি গাছ বা জন্তু পর্যন্ত ছোটো মাত্রাবিশিষ্ট হয়।

ব্যবহার-এর ভিত্তিতে—ফসল কাটার পদ্ধতি এবং নিট প্রাথমিক উৎপাদনের ভিত্তিতে ই. পি. ওডাম (1959) বিশ্বের বাস্তুতন্ত্রকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা—

(a) কর্ষিত বাস্তুতন্ত্র

(b) প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র

এমনকি প্রধান প্রধান শস্যের ভিত্তিতে বাস্তুতন্ত্রকে

(a) গম-জমি বাস্তুতন্ত্র

(b) ইক্ষু জমি বাস্তুতন্ত্র প্রভৃতি বিভাগে ভাগ করা যায়। অকর্ষিত প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রগুলি হল অরণ্য বাস্তুতন্ত্র, মরুভূমি বাস্তুতন্ত্র প্রভৃতি।

শক্তি উৎস ও মাত্রার ভিত্তিতে—

শক্তির উৎস, শ্রেণি ও পরিমাণের ভিত্তিতে বাস্তুতন্ত্রকে ভাগ করা যায়।

7.2.4 বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলি সম্পর্কে ধারণা

বাস্তুতন্ত্রের তিনটি উপাদান হল—1. শক্তি উপাদান, 2. অজীবজ বা ভৌত উপাদান ও 3. জীবজ বা জৈব উপাদান।

শক্তি উপাদান বলতে প্রধানত সৌরশক্তিকে বোঝায়। অজীবজ বা ভৌত উপাদান বলতে ভূমিভাগ অর্থাৎ শিলা ও মাটি, জল, বায়ু, সূর্যালোক প্রভৃতিকে বোঝায়। এছাড়া বিভিন্ন জীবের জীবনধারণের জন্য কিছু জৈব পদার্থ (যেমন—কার্বহাইড্রেট, ফ্যাট প্রভৃতি) এবং জীবসম্ভূত কিছু পদার্থ (যেমন—কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, ফসফরাস প্রভৃতি) বেশি পরিমাণে এবং খনিজ পদার্থগুলি (যেমন—লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, কোবাল্ট প্রভৃতি) কম পরিমাণে প্রয়োজন হয়।

বাস্তুতন্ত্রের জৈব উপাদানের মধ্যে রয়েছে গাছপালা, জীবজন্তু ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রাণীসমূহ। কাজের ভিত্তিতে জৈব বা জীবজ উপাদানগুলিকে দুটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

1. স্বভোজী উপাদান—যেসব গাছপালা তাদের নিজেদের খাদ্য Photosynthesis ও Chemosynthesis-এর মাধ্যমে তৈরি করে তাদের স্বভোজী উপাদান বলে। ফলে এই উপাদানগুলি হয় (a) ফটোট্রফ—যারা সূর্যালোক ব্যবহার করে খাদ্য তৈরি করে এবং (b) কেমোট্রফ—যারা অজৈব পদার্থ থেকে অক্সিডেশান বা জারণের মাধ্যমে কোমোসিন্থেসিস প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। স্বভোজীরা হল বাস্তুতন্ত্রের প্রাথমিক উৎপাদক।

2. **পরভোজী উপাদান**—এরা হল এমন জীব যারা প্রাথমিক খাদক বা স্বভোজীদের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া কিছু পরভোজী প্রাণী আছে যারা জৈব পদার্থগুলিকে বিয়োজিত বা পুনঃসজ্জিত করে। খাদ্যগ্রহণ বা খাদ্যপ্রাপ্তির অবস্থার ভিত্তিতে পরভোজীদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা—

(a) স্যাপ্রোফাইট—মৃত গাছপালা ও প্রাণীদের থেকে পাওয়া তরল জৈব পদার্থের উপর নির্ভরশীল প্রাণী।

(b) প্যারাসাইট—জীবিত প্রাণীদের উপর নির্ভরশীল প্রাণী।

(c) হোলোজানিক—যেসব জীব নিজেদের মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করে (মানুষসহ বিশালাকায় প্রাণী)।
কার্যাবলির ভিত্তিতে বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলিকে চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(a) **অজীবজ উপাদান**—অজীবজ ও মৃত জৈব উপাদান।

(b) **উৎপাদক**—জৈব ও অজৈব সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী অংশে ক্রিয়াশীল সবুজ গাছ।

(c) **খাদক**—মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণী, যারা জৈব পদার্থ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে।

(d) বিয়োজক—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীব যারা মৃত গাছপালা ও প্রাণীদেহ এবং অন্যান্য জৈব পদার্থকে বিয়োজিত করে। এই বিয়োজনের সময় এরা নিজেদের খাদ্য গ্রহণ করে এবং জৈব পদার্থকে পুনসজ্জিত করে। যাতে এগুলি প্রাথমিক উৎপাদকের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য হয়।

7.2.5 বাস্তুতন্ত্রের বা ইকোসিস্টেমের ক্রিয়াপদ্ধতি

বাস্তুতন্ত্রের ক্রিয়া প্রধানত নির্ভর করে শক্তিপ্রবাহের ধরনের উপর কারণ একটি বাস্তুতন্ত্রের সমস্ত জীবিত উপাদানগুলি নির্ভর করে শক্তিপ্রবাহের উপর, যা বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে জৈব ও অজৈব বস্তুগুলির বন্টনে ও আবর্তনে সাহায্য করে। শক্তি প্রবাহ একটি নির্দিষ্ট দিকে (unidirectional) অগ্রসর হলেও বস্তুর আবর্তন চক্রাকার পথ অনুসরণ করে।

শক্তির ধরন ও প্রবাহ thermodynamics বা তাপগতিবিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় নীতি অনুসরণ করে। প্রথম নীতিতে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে শক্তির উৎপাদন বা ধ্বংস হয় না, বরং এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয় (যেমন ইলেকট্রিকাল শক্তি মেকানিক্যাল শক্তিতে পরিণত হয়)। এক্ষেত্রে শক্তি প্রবাহের imput বাস্তুতন্ত্র থেকে শক্তির নির্গমনের সাথে সমতা বা ভারসাম্যের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় নীতিতে বলা হয় যে, যখন কাজ শেষ হয়, বাস্তুতন্ত্রে শক্তির একটি রূপ অন্য একটি রূপে পরিবর্তিত হয়। বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি ট্রফিক স্তরে শক্তি নষ্ট হয় এবং এই শক্তি আর ফিরে পাওয়া যায় না।

বাস্তুতন্ত্র অনুপ্রবেশকারী শক্তিগুলির মধ্যে সৌরবিকিরণ হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই শক্তি সবুজ গাছের মাধ্যমে জীবজগতে আসে। গাছের গৃহীত সৌরশক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং বাস্তুতন্ত্র থেকে গাছপালার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে ও হারিয়ে যায়। বিকিরিত সৌরশক্তির খুব সামান্য অংশ গাছের সালোকসংশ্লেষ বা খাদ্য তৈরির কাজে লাগে। এভাবে সবুজগাছ, সৌরশক্তির একটি অংশকে খাদ্যশক্তি বা রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে। এই শক্তি গাছের দেহ কোষের বৃদ্ধি ঘটায় এবং ট্রফিক স্তরের সবচেয়ে নীচের স্তরে স্বভোজী বা প্রাথমিক খাদক দেহে সঞ্চয় করে। প্রথম ট্রফিক স্তরে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি খাদ্যশৃঙ্খলের দ্বিতীয় স্তরে থাকা তৃণভোজী প্রাণীদের শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। প্রথম ট্রফিক স্তর থেকে কিছু শক্তি শ্বসনের মাধ্যমে নষ্ট হয়, আর কিছু অংশ দ্বিতীয় স্তরের তৃণভোজীদের দেহে সঞ্চারিত হয়। গাছের জৈব কোষে খাদ্য হিসাবে গ্রহণের মাধ্যমেই শক্তির এই স্থানান্তর হয়। আবার দ্বিতীয় স্তরে সঞ্চিত শক্তি তৃতীয় স্তরের মাংসাশী প্রাণীদের শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। রাসায়নিক শক্তির অনেকখানি তৃতীয় ট্রফিক স্তরে মাংসাশী প্রাণীদের শ্বসনের সময় নির্গত হয়, কারণ এইস্তরে বিভিন্ন কজের জন্য অনেক শক্তির প্রয়োজন হয়। কিছু পরিমাণ potential রাসায়নিক শক্তি তৃতীয়

থেকে চতুর্থ ট্রফিক স্তরে সর্বভুক প্রাণীদের (মানুষ) কাজে ব্যবহৃত হয়। সর্বভুকেরা দ্বিতীয় ও প্রথম স্তর থেকেও খাদ্য সংগ্রহ করে, সর্বভুকেরাও কিছু শক্তি শ্বসনের মাধ্যমে মুক্ত করে। গাছপালা ও প্রাণীদেহে সঞ্চিত বাকি রাসায়নিক শক্তি মৃত্যুর পরে বিয়োজকের দেহে স্থানান্তরিত হয়। বিয়েজকেরা শ্বসনের সময় বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি ত্যাগ করে। দেখা যায় যে প্রতি ট্রফিক স্তরে শক্তি ব্যবহারের ফলে ক্রমশ উপরের স্তরগুলিতে potential রাসায়নিক স্থানান্তরের পরিমাণ কমে যায়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, শ্বসনের ফলে বায়ুমণ্ডলে শক্তির নির্গমন ছাড়াও বাকি শক্তি বিভিন্ন খাদ্য স্তরে স্বভোজী থেকে পরভোজী ও সর্বভুকদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সবশেষে সমস্ত শক্তি ডেট্রিভোর বা বিয়োজক প্রাণীদের মধ্যে সঞ্চিত হয় (Furley Newey 1983)।

শক্তিপ্রবাহের দ্বারা জৈব ও অজৈব বস্তু বা উপাদানের আবর্তন সম্ভব হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন জীবজ উপাদানের ক্ষেত্রে শক্তি প্রবাহ হল পুষ্টিখাদ্যের আবর্তনে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জীবমণ্ডল, বারিমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল ও অশ্মমণ্ডলে জৈব ও অজৈব বস্তুগুলি বিভিন্ন Closed system এর মাধ্যমে এমন ভাবে পরস্পরের বিপরীত দিকে অগ্রসর হয় যে, এই বস্তুগুলির মোট ভর একই থাকে এবং জীব সম্প্রদায়ের কাছে সহজলভ্য হয়। বাস্তুতন্ত্রের চক্রে ব্যবহৃত বস্তু বা পুষ্টিদ্রব্যগুলি দুই শ্রেণিতে বিভক্ত থাকে। যথা—(i) প্রধান উপাদান—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, কার্বন ও হাইড্রোজেন এর মতো যেসব দ্রব্য গাছের বেশি পরিমাণে প্রয়োজন হয়, (ii) অপ্রধান উপাদান—প্রায় 100 টি পদার্থ খুব কম পরিমাণে গাছের বৃদ্ধির কাজে লাগে। যেমন—লোহা, জিঙ্ক, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি। এই অজৈব রাসায়নিক উপাদানগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি জৈব পদার্থ আছে। যার মধ্যে থাকে—(i) জীবিত বা মৃত পদার্থের বিয়োজিত অংশ, (ii) জীবের দ্বারা নির্গত বর্জ্য পদার্থ।

কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ এনজাইম হিসেবে কাজ করে, কারণ এরা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। এই রাসায়নিক উপাদানগুলি হল হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন যেগুলি গ্যাসীয় পর্যায়ে যুক্ত, ফসফেট, ক্যালসিয়াম ও সালফার যা পলল পর্যায়ে যুক্ত এবং আবহবিকার দ্বারা আক্রান্ত শিলা ও মাটি যা পাললিক সঞ্চয়ের সৃষ্টি করে।

উপরিউক্ত উপায়ে এ উপাদানগুলি বায়ুমণ্ডল ও পাললিক সঞ্চয় থেকে পাওয়া যায় এবং মাটিতে সঞ্চিত হয়। যেখান থেকে গাছপালাগুলি দ্রবীভূত অবস্থায় শিকড় অভিস্রবণের (root osmosis) মাধ্যমে এদের গ্রহণ করে। গাছগুলি এই উপাদানগুলিকে এমন রূপে পরিবর্তিত করে, যা গাছের কোষবৃদ্ধিতে এবং জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ফলে যেসব পুষ্টি উপাদানগুলি শক্তিপ্রবাহ পথ দিয়ে ধাবিত হয়ে জৈব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়, তাকে বলে জৈব ভূরাসায়নিক চক্র।

বেশ কয়েকটি উপায়ে গাছপালা ও জীবজন্তুদের জৈব উপাদানগুলি যুক্ত বা নির্গত হয়। যথা—

1. বিয়োজকের দ্বারা গাছের পাতা মৃত গাছ ও জীবজন্তুর বিয়োজন এবং দ্রবণীয় অজৈব পদার্থে রূপান্তর, 2. বজ্রপাত, দাবানল এবং মানুষের ইচ্ছানুযায়ী ক্রিয়ায় গাছের দহন। দহনের ফলে জৈব বস্তুগুলি বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয় এবং আবার মাটিতে পতিত হয়ে বৃষ্টিপাতের প্রভাবে দ্রবণীয় অজৈব পদার্থরূপে মাটির মধ্যে সঞ্চিত হয়, আবার ছাইরূপে থাকা কিছু অংশ ব্যাকটিরিয়ার কাজের মাধ্যমে বিয়োজিত হয়ে মাটির সঞ্চয়ে যুক্ত হয়। 3. জীবজন্তুদের বর্জ্য পদার্থগুলি ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা বিয়োজিত হয়ে দ্রবণীয় অজৈব উপাদানরূপে মাটির সঞ্চয়ে জমা হয়। এভাবে জৈব ভূরাসায়নিক চক্রগুলির মূল বৈশিষ্ট্য হল দ্রবণীয় অজৈব উপাদান বা পুষ্টিদ্রব্যের চলন ও আবর্তন। এই বস্তুগুলি অজৈব পদার্থের পলল ও বায়বীয় পর্যায়ে থেকে জীবজ পর্যায়ের মাধ্যমে এবং শেষকালে অজৈব অবস্থায় পরিণত হয়। জৈব ভূরাসায়নিক চক্র দুটি মাত্রায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করা যায়। যথা—1. সব উপাদানগুলির একত্র আবর্তন অথবা, 2. প্রতিটি দ্রব্যের আবর্তন যেমন, কার্বন চক্র, অক্সিজেন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, ফসফরাস চক্র, সালফার চক্র ইত্যাদি। আরে বিস্তারিতভাবে ভূরাসায়নিক চক্রের মধ্যে জলচক্র, খনিজচক্র প্রভৃতিকেও যুক্ত করা হয়।

7.3 বাস্তুতন্ত্রর উপাদানসমূহের ব্যাখ্যা

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে জীবমণ্ডলের পরিবেশ ভিন্ন ধরনের। নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিবেশে অবস্থিত সব সজীব ও সব অজীব উপাদনাগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হল বাস্তুতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমস্ত ধরনের গাছপালা ও জীবজন্তুর সমন্বয়ে তৈরি জীবগোষ্ঠী হল সজীব ও জীবজ (Biotic) উপাদন এবং সব জড় পদার্থগুলি হল অজীব বা অজীবজ উপাদান।

বিজ্ঞানী ওডাম 1971 বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলিকে প্রথমে দুটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা—

1. **অজীবজ উপাদান (abiotic components)**—বাস্তুতন্ত্রের ভৌত ও রাসায়নিক উপাদানগুলিকে অজীবজ উপাদান বলে। এই উপাদনগুলি আবার তিন ধরনের হয়। যথা,

(a) **অজৈব পদার্থ**—অক্সিজেন, নাইট্রাজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসীয় উপাদানগুলি এবং কালসিয়াম, পটাসিয়াম, মাগনেসিয়াম প্রভৃতি খনিজ লবণগুলি অজৈব পদার্থের অন্তর্গত। এগুলি হল সবুজ গাছপালার খাদ্য উপাদান এবং গ্যাসীয় ও খনিজ চক্রের মাধ্যমে সবসময় পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য বা সমতা বজায় থাকে।

(b) **জৈব পদার্থ**—মাটিতে মৃত গাছপালা ও জীবজন্তুর দেহের মিশ্রিত গলিত পদার্থ যেমন, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ইউরিয়া জাতীয় বিভিন্ন প্রাণিজ বর্জ্য পদার্থ প্রভৃতি জৈব বস্তু থেকে পাওয়া দ্রব্যগুলি বাস্তুতন্ত্রের অজীবজ উপাদনের অন্তর্ভুক্ত।

(c) **ভৌত পদার্থ**—কোনো অঞ্চলের জল, মাটি, সূর্যালোক, তাপ, বায়ু প্রভৃতি হল পরিবেশের কয়েকটি ভৌত উপাদান। এদের মধ্যে সৌরশক্তিই হল প্রধানতম ভৌত উপাদান। এই উপাদানগুলি

বাস্তুতন্ত্রে জীব বা জীবগোষ্ঠীর প্রাণপ্রবাহ অব্যাহত রাখে। এছাড়া কার্বন ডাই-অক্সাইড, ক্যালসিয়াম, ফসফেট, কার্বোনেট প্রভৃতি এবং ভূসংস্থানিক প্রকৃতি প্রভৃতি বাস্তুতন্ত্রের জড় উপাদানগুলির ভৌত অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। কোনো পরিবেশে সূর্যালোক, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর চাপ, আর্দ্রতা, উষ্মতা, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত প্রভৃতি একযোগে বিশেষ কোনো আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। ঠিক তেমনি কোনো একটি পরিবেশের মাটিতে জলের পরিমাণ, মাটিতে কণাসমূহের আয়তন, মাটির উষ্মতা, বায়ু অম্লত্ব, ক্ষারত্ব প্রভৃতি মাটির প্রকৃতিকে নির্ধারণ করে। আবার কোনো স্থানের উচ্চতা, আলোকপ্রাপ্তি, ভূমির ঢাল প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর সেই পরিবেশের ভূসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ভর করে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবেশের ভৌত উপাদানের নির্ধারক।

2. **সজীব (biotic) উপাদান**—সজীব উপাদান বলতে সপ্রাণ বা জীবিত পদার্থকে বোঝায়। সজীব উপাদানগুলি প্রধানত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা—(a) স্বভোজী (autotrophic) ও (b) পরভোজী (heterotrophic)।

(a) **স্বভোজী উপাদান**—যেসব উপাদানগুলি সাংলোকসংশ্লেষ করতে পারে অর্থাৎ জল ও কার্বন ডাই অক্সাইডকে প্রধান উপাদন হিসেবে ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে বা শর্করাজাতীয় খাদ্যে পরিণত করে এবং বাস্তুতন্ত্রে আবদ্ধ করে, তাদের স্বভোজী উপাদন বা মুখ্য উৎপাদক বলে।

স্বভোজী বলেত আমরা সবুজকণা বা ক্লোরোফিলযুক্ত গাছকে বুঝি। গাছাপালা, ঘাস, জলে নিমজ্জিত ভাসমান গাছ, প্লাংক্টন, শ্যাওলা, কেমোসিন্থেটিক ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি এই গোষ্ঠীভুক্ত।

স্বভোজী উপাদনের খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া সালোকসংশ্লেষের সমীকরণটি হল—

$$\underset{\text{কার্বন ডাই অক্সাইড}}{6CO_2} + \underset{\text{জল}}{6H_2O} \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{6O_2}$$

উপরিউক্ত জটিল শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তৈরি করার সময় গাছ CO_2 গ্রহণ করে এবং O_2 ত্যাগ করে। এই অক্সিজেন বিভিন্ন জীবের শ্বসনের প্রধান উপাদান হিসেবে কাজে লাগে। সালোকসংশ্লেষে সূর্যরশ্মি বিক্রিয়া ঘটায় এবং আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে কঠিন যৌগিক উপাদানে সন্নিবেশিত হয়।

(b) **পরভোজী উপাদান**—বাস্তুতন্ত্র যেসব জীব নিজেদের খাদ্য তৈরি করতে পারে না এবং খাদ্যের জন্য সবুজ গাছ বা উৎপাদকের তৈরি খাদ্যের উপর নির্ভরশীল, তাদের পরভোজী উপাদান বা খাদক বলে।

পরভোজী উপাদানের শ্রেণিবিভাগ—সমস্ত ধরনের জীবজন্তু ও মানুষ হল বাস্তুতন্ত্রের পরভোজী বা খাদক উপাদান। খাদক দুই শ্রেণির হয়। যথা—(i) প্রধান খাদক বা ম্যাক্রোকনজিউমার এবং (ii) বিয়োজক বা মাইক্রোকনজিউমার।

(i) **প্রধান খাদক বা ম্যাক্রোকনজিউমার**—যেসব প্রাণী তাদের খাদ্যের জন্য সরাসরি গাছ বা অন্য জীবজন্তুর উপর নির্ভরশীল, তাদের প্রধান খাদক বলে। এরা খাদ্য তৈরি করতে পারে না এবং অন্য কোনো জীব বা উদ্ভিদেহের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভর করে। এরা আবার তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা—(a) **প্রাথমিক খাদক**—গোরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি তৃণভোজী (herbivore) প্রাণীগুলি এই ধরনের খাদক। এরা খাদ্যের জন্য সবুজ গাছের উপর নির্ভরশীল। (b) **গৌণ খাদক**—যেসব খাদকেরা তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাদের গৌণ খাদক বলে। কুকুর, বিড়াল, টিকটিকি প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী এই ধরনের খাদক। (c) **প্রগৌণ খাদক**—যেসব খাদকেরা খাদ্য হিসাবে গৌণ খাদকদের গ্রহণ করে তাদের বলে প্রগৌণ বা তৃতীয় সারির খাদক। সাপ, বাঘ, সিংহ, হাঙর প্রভৃতি হল এই ধরনের খাদক। (d) **চতুর্থ সারির খাদক**—যেসব খাদকেরা তৃতীয় সারির খাদকদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে সেগুলি এই বিভাগের মধ্যে পড়ে। বাজপাখি, ময়ূর প্রভৃতি হল এই ধরনের খাদক।

উপরিউক্ত খাদকগুলির মধ্যে প্রাথমিক খাদকেরা হল হারবিভোর বা তৃণভোজী। গৌণ, প্রগৌণ ও চতুর্থ সারির খাদকেরা হল কারনিভোর বা মাংসাশী। এরা শিকারি, মৃতদেহ ভক্ষণকারী ও পরজীবী হয়। তাছাড়া কিছু প্রাণী আছে যারা গাছপালা ও জীবজন্তু উভয়কেই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এদের সর্বভুক বা ওমনিভোর প্রাণী বলে। মানুষ এই ধরনের প্রাণীর অন্যতম উদাহরণ।

(ii) **বিয়োজক বা মাইক্রোকনজিউমার**—যেসব আণুবীক্ষমিক জীব গাছপালা ও জীবজন্তুদের রেচন পদার্থ ও দেবহাবশেকে, অর্থাৎ জীবদেহকলার জটিল যৌগগুলিকে বিশ্লিষ্ট ও বিয়োজিত করে, কিছু অংশ বিয়োজকেরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং বাকি অংশগুলিকে সরল যৌগে বা মৌলিক উপাদানে পরিবর্তিত করে প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দেয়। এদের বিয়োজক বা রূপান্তরকারী বলে। এভাবে মৌলিক উপাদনের বা অজৈব লবণের ভারসাম্য সৃষ্টি করে এবং ফলে উৎপাদকেরা তা গ্রহণ করে আবার খাদ্য তৈরি করে।

বাস্তুতন্ত্রে উপরিউক্ত রূপান্তরকারী বা বিয়োজকেরা হল বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া। এসব জীবাণু বিভিন্ন ধরনের উৎপাদক ও খাদকের মৃত জীবদেহগুলিকে বিয়োজিত করে এবং এর জটিল যৌগিক পদার্থগুলিকে সরল করে। পরে ওই সরল পদার্থগুলির গ্যাসীয় অংশ বায়ুমণ্ডলে এবং অন্যান্য পদার্থগুলি এক ধরনের ব্যাকটিরিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে অজৈব দ্রব্য হিসাবে মাটিতে মিশে যায়। এক সময় এই পদার্থগুলি আবার নানা উৎপাদকের মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদজগতে চলে আসে।

উপাদানগুলির কিছু অংশ বিয়োজকেরা নিজের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। একই দেহকলার বিয়োজন ঘটানোর জন্য নানা ধরনের বিয়োজক প্রয়োজন হতে পারে বলে বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের বিয়োজক ঘটতে দেখা যায়। সাধারণত বিয়োজকেরা দেহকোষগুলির পচন ঘটানোর জন্য নানা উৎসেচক নিঃসরণ করে।

উপরিউক্ত উপাদানগুলি নিয়ে প্রকৃতিতে নানা খাদ্যশৃঙ্খল গড়ে ওঠে। (যেমন ১) পুকুরের বাস্তুশৃঙ্খল

ফাইটোপ্লাংক্টন ⟶ জুপ্লাংক্টন ⟶ ছোটো মাছ ⟶ বড়ো মাছ

উৎপাদক প্রাথমিক খাদক পরবর্তী খাদক গৌণ খাদক

2. **বনভূমির খাদশৃঙ্খল**—

সবুজ গাছ ⟶ হরিণ ⟶ সিংহ

(উৎপাদক) (প্রাথমিক খাদক) (গৌণ খাদক)

উপাদানগুলি মধ্যে উৎপাদক, খাদক ও বিয়োজকদের সামগ্রিকভাবে 'প্রকৃতির কার্যকরী রাজ্য' [functional kingdom of nature] বলে।

7.4 জীব সম্প্রদায় (Biotic Community)—

বাস্তুতন্ত্রে সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী বলতে জীব সম্প্রদায় (Biotic Community) কে বোঝায়। গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বলতে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভিন্ন জীবের সামগ্রিক জনসংখ্যাকে বোঝায়। সম্প্রদায় বলেত কেবলমাত্র উদ্ভিগোষ্ঠী বা কেবলমাত্র প্রাণীগোষ্ঠী বা দুই-ই হতে পারে। সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী খুব বড়ো হতে পারে। যেণ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ উদ্ভিদ গোষ্ঠী, অথবা খুব ছোটো হতে পারে যেমন পচনশীল গাছের গুঁড়িতে ছত্রাকের গোষ্ঠী। পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগের বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন প্রজাতির গোষ্ঠী বাস করে। একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জীব এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সেই অঞ্চলের পরিবেশে সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা দেয়। একই বাসস্থানে স্বাভাবিক আবাসে (habitat) গাছপালা প্রাণী, ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাক পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পাশাপাশি বাস করে। তাই সামগ্রিকভাবে এদের জৈব সম্প্রদায় বা Biotic community বলে। যে সম্প্রদায় বাসস্থানের (habitat) ও পরিবেশের সাথে মিথস্ত্রিয়া করে একটি একক হিসেবে বসবাস করে তাদের বলে মুখ্য সম্প্রদায় (major community)। এই সম্প্রদায়ের কাছে সৌরশক্তির ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন। মুখ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌণ সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত হলে তাদের বলে গৌণ সম্প্রদায় (minor community) বা সোসাইটি। এই গৌণ সম্প্রদায় শক্তি প্রবহণের জন্য মুখ্য সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই গৌণ সম্প্রদায়গুলি সুস্পষ্ট একক হিসেবে কাজ করতে পারে না।

একটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী এবং তার অজৈব পরিবেশ একসাথে একটি অখণ্ড বা সামগ্রিক একক

হিসেবে কাজ করে এবং একটি বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলে। সমস্ত বাস্তুতন্ত্রগুলি যৌথভাবে গড়ে তোলে পৃথিবীর জীবমণ্ডল (Biosphere)। পৃথিবীর শিলামণ্ডল বারিমণ্ডল ও লাগোয়া বায়ুমণ্ডলে বাস করে অসংখ্য ছোটো বড়ো-মাঝারি গাছপালা জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, পাখি, জীবাণু ইত্যাদি। জল-স্থল ও অন্তরীক্ষের সমস্ত জীবদের নিয়ে তৈরি হয় জীবমণ্ডল।

7.4.1 জীব সম্প্রদায়ের শ্রেণিবিভাগ

জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান দুই ধরনের শ্রেণি হল উদ্ভিদ সম্প্রদায় ও প্রাণী সম্প্রদায়।

জীবমণ্ডলে উদ্ভিদ হল প্রাথমিক উৎপাদক, তাই এরা বাস্তুতন্ত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং মানুষসহ সমস্ত স্থলজ ও জলজ প্রাণীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্য সরবরাহ করে। উদ্ভিদ, প্রজাতির সামাজিক দলবদ্ধ তাকে বলে 'উদ্ভিদ সম্প্রদায়' যার প্রধান একক হল উদ্ভিদ। গাছ সরাসরি সূর্যালোক গ্রহণ করে এবং সাংলোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সূর্যালোকের সাহায্যে তাদের নিজেদের খাদ্য তৈরি করে। এভাবে সৌরশক্তি খাদ্য বা রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন ট্রফিক স্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাণী ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুতে পরিবাহিত হয়। ফলে উদ্ভিদ হল পরিবেশের জীবজ ও অজীবজ উপাদানসমূহের মধ্যবর্তী এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

উদ্ভিদজগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল উদ্ভিদ বৈচিত্র্য (Plant diversity)। বিভিন্ন অনুসন্ধান ও গবেষণা থেকে জানা যায় যে গাছের প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল জলজ পরিবেশ। পরে গাছাপালা বিভিন্ন জলবায়ুগত অবস্থায় (উষ্ম আর্দ্র নিরক্ষীয় জলবায়ু থেকে শীতল মেরু জলবায়ুতে), বিভিন্ন বাসস্থানে (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সুউচ্চ পর্বতে এবং স্থলভাগ থেকে জলভাগে) নিজেদের মানিয়ে নেয়। ফলে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশগত অবস্থায় বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ প্রজাতি জন্ম নেয়।

আয়তন বা আকৃতির দিক থেকেও ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ প্রজাতির পার্থক্য দেখা যায়। এককোষী অ্যালগি ও সামগ্রিক ডায়াটিসের মতো ছোটো প্রাণী থেকে শুরু করে ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ম অঞ্চলের দীর্ঘাকাল সপুষ্কক ও সজীব উদ্ভিদ ও বিশালদেহের জীবজন্তুর সন্ধান মেলে। আয়তন, গঠন, ক্রিয়া ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সারা পৃথিবীতে গাছপালার এত পার্থক্য দেখা যায় যে তাদের শ্রেণিবিভক্ত করা একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। এমনকি নানা কারণে স্থলজ ও জলজ বাস্তুতন্ত্রের সমস্ত গাছপালা সম্পর্কে এখনও বিশেষ কিছু জানা যায় নি। প্রায় 300 কোটি বছর আগে প্রথমে সমুদ্রে শেওলা ও ব্যাকটেরিয়া জন্মের পর, প্রায় 55 কোটি বছর আগে স্থলভাগে ফার্ণ ও শেওলারূপে উদ্ভিদ আত্মপ্রকাশ করে। পরে 17 কোটি বছর আগে সপুষ্পক গাছ জন্ম নেয় এবং আজ পৃথিবীতে মোট 14 লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছে। উদ্ভিদবিদেরা এখন পর্যন্ত মাত্র চার লক্ষ প্রজাতির গাছকে চিহ্নিত করতে

পেরেছেন যা প্রকৃত সংখ্যার সামান্য অংশ বলে মনে করা হয়। কেবলমাত্র ক্রান্তীয় অঞ্চলেই এখন পর্যন্ত হাজার হাজার উদ্ভিদ প্রজাতিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি বলে উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা মনে করেন।

7.4.2 উদ্ভিদের শ্রেণিবিভাগ

দৈহিক গঠনের ভিত্তিতে সমস্ত উদ্ভিদজগৎকে দুই প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

1. অপুষ্পক উদ্ভিদ বা ক্রিপটোগ্যামস্ 2. সপুষ্পক উদ্ভিদ বা ফ্যানেরোগামস্

1. **অপুষ্পক উদ্ভিদ—**

ফুল ও বীজ না ধারণ করলে গাছকে অপুষ্পক উদ্ভিদ বলে। এইসব গাছের জন্ম প্রক্রিয়া কাজ করে দেহে লুকানো spore বা ছিদ্রের মাধ্যমে। এদের দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন খুবই সরল অপুষ্টক উদ্ভিদকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা,

(a) থ্যালোফাইটা (b) ব্রায়োফাইটা ও (c) টেরিডোফাইটা

(a) **থ্যালোফাইটা বা সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ—**যেসব গাছের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতা বিভাজিত অবস্থায় থাকে না, তাদের বলে থ্যালোফাইটা। এদের দেহ এক বা একাধিক কোষ দিয়ে তৈরি এবং দেহকে থ্যালাস বলে। এদের জনন প্রক্রিয়া খুবই সরল, কিন্তু বিচিত্র। থ্যালোফাইটা আবার চারভাগে বিভক্ত। যথা—

(i) **অ্যালগি বা শৈবাল—**এদের দেহ কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট বা ক্লোরোপ্লাসটিড সবুজ কণিকা থাকে, তাই এদের সবুজ দেখায়। এরা প্রধানত জলজ উদ্ভিদ, তবে কিছু শৈবাল অর্ধজলজ পরিবেশে (যেমন ভিজে প্রাচীরের গায়ে বা ভেজা গাছের বাকলে) জন্মে। শৈবালের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- ক্লোরোফিলযুক্ত নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদ
- এককোষী/বহুকোষী
- স্বভোজী
- কোষ প্রাচীর দ্বিস্তরীয়
- তিন প্রকৃতির জনন—অঙ্গজ, যৌন ও অযৌন
- কার্বোহাইড্রেট প্রধান খাদ্যরূপে দেহকোষে সঞ্চিত থাকে
- অ্যালগি সবুজ ছাড়াও নীল বাদামি ও গোলাপি হয়। উদাহরণ স্পাইরোগাইরা, করো, থিউকাস ভলভর ইত্যাদি।

(ii) **ছত্রাক বা ফাংগি—**নানা আকারের ও আয়তনের, আদর্শ নিউক্লিয়াসযুক্ত ক্লোরোফিলবিহীন, পরভোজী, সমাঙ্গদেবী, সরল উদ্ভিদকে ছত্রাক বলে। প্রায় সর্বত্রই এদের বাস। এদের দেহে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না, ফলে এদের রং সবুজ নয়। তাই এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না। তরকারি,

রুটি, কাঠ, মৃত জীবদেহ, ভিজে মাটি প্রভৃতি সর্বত্রই এদের দেখা যায়। মিউকর, পেনিসিলিয়াম, ঈস্ট প্রভৃতি হল ফাংগির উদাহরণ।

ব্যাকটিরিয়া—কিছু ব্যাকটেরিয়া প্রাণীদের শ্রেণিভুক্ত, আবার কিছু উদ্ভিদ শ্রেণিভুক্ত। উদ্ভিদ ব্যাকটিরিয়াগুলি এককোষী গাছ এবং এদের স্কিজোফাইটা বলে, কারণ কোষকে দুভাগে বিভক্ত করে এরা পরবর্তী ব্যাকটিরিয়া গঠন করে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাকটিরিয়া হল পরজীবী বা স্বাধীন অতি ক্ষুদ্র এককোষী জীবাণু। এদের দেহেও ক্লোরোপ্লাস্ট নেই, ফলে নিজেদের খাদ্য তৈরি করতে পারে না। কোনো কোনো ব্যাকটিরিয়া জীবদেহে রোগ তৈরি করতে পারে। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে বন্ধু ব্যাকটিরিয়াও পাওয়া যায়। খাদ্য তৈরি ও খাদ্যাভ্যাসের ভিত্তিতে উদ্ভিদ ব্যাকটিরিয়াকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—(a) অটোট্রফিক বা স্বভোজী (b) হেটেরোট্রফিক বা পরভোজী ব্যাকটিরিয়া।

স্বভোজী ব্যাকটিরিয়া সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে, আর পরভোজী ব্যাকটিরিয়া খাদ্যের জন্য অন্য জীবের উপর নির্ভর করে এবং জীবমণ্ডলে জৈব পদার্থের পচন ও recycle কে সাহায্য করে।

(a) **লাইকেনস্**—এরা উদ্ভুত জীব, ছত্রাক ও শেওলার (নীল-সবুজ বা সবুজ) সমন্বয়ে এরা গঠিত। এরা অ্যাসকোমাইসেটস শ্রেণির এবং উঁচু গাছে পাহাড়ে এবং মাটির উপর এদের জন্মাতে দেখা যায়। কোরা, উসনিয়া ফিসকিয়া প্রভৃতি হল বিভিন্ন ধরনের লাইকেন। একে মিশ্র বা যৌগিক উদ্ভিদ বলে কারণ অ্যালগি ও ফ্যাংগিকে একই উদ্ভিদের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ধারণ করে।

(b) ব্রায়োফাইটা—এক্ষেত্রে উদ্ভিদের কোনো বিশেষ আভ্যন্তরীণ গঠনের সৃষ্টি হয় না। যা উদ্ভিদ দেহের এক অংশে থেকে অন্য অংশে দ্রব্য পরিবাহিত ও চালিত করে। বিভিন্ন ধরনের মসগুলি এই শ্রেণির উদ্ভিদ। সাধারণত এদের মূল নেই, কিন্তু কিছু ব্রায়োফাইটার কাণ্ড ও পাতা আছে (যেমন মারক্যানসিয়া, পেগোনেটাম ইত্যাদি)। সাধারণত স্যাঁতসেঁতে ছায়াযুক্ত স্থানে এরা জন্মে। মাটি ও পাহাড়ে এদের দেখা যায়।

(c) টেরিডোফাইটা—এদের দেহে মূল, পাতা ও কাণ্ড আছে, এদের ফুল হয় না। সমতল মাটিতে ও পাহাড়ে এদের দেখা যায়। টেরিস, মারসিলিয়া, ড্রায়াপটেরিস, লাইকোপডিয়াম প্রভৃতি উদ্ভিদ এই শ্রেণির। এরা Vastular উদ্ভিদ, এবং এরা চারাগাছগুলিকে দেহের ছিদ্রের সাহায্যে তৈরি করে। এই উদ্ভিদগুলি ও ফার্ন জাতীয় সরল গঠন সম্পন্ন, অপুষ্পক, স্বভোজী এবং কাণ্ড শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হয়।

(ii) সপুষ্পক উদ্ভিদ (Phanerogams)—যেসব উদ্ভিদের ফুল, ফল, বীজ গঠিত হয় তাদের সপুষ্পক উদ্ভিদ বলে। এরা প্রধান দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা,

(a) **জিমনোস্পারম বা ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ**—যে উদ্ভিদের বীজ অনাবৃত থাকে, পাতাগুলি সুঁচালো হয় তাদের জিমনোস্পারম বলে। এদের দেহ, মূল, কাণ্ড, পাতা ও বীজে বিভাজিত থাকে, কাণ্ড শক্ত ও শাখাবিশিষ্ট হয় এরা স্থজল, প্রধানত চিরহরিৎ হয়। সাইকাস, পাইন, নিটাম এবং মেডেনহেয়ার উদ্ভিদগুলি এই শ্রেণির। পাহাড়ে, উঁচু ও সমতল জমিতে এই গাছগুলি জন্মে।

(b) **অ্যানজিওস্পারম বা গুপ্তবীজী উদ্ভিদ**—বর্তমানে সবচেয়ে সুগঠিত ও উন্নত প্রকৃতির সপুষ্পক শ্রেণির উদ্ভিদ হল গুপ্তবীজী উদ্ভিদ। এই শ্রেণির সব গাছের ফল হয় এবং ফলের মধ্যে এক বা একাধিক বীজ থাকে এবং বাইরের থেকে এইসব বীজগুলি দেখা যায় না। এরা প্রায় সব পরিবেশেই জন্মে। পৃথিবীতে প্রায় তিন লক্ষ প্রজাতির গুপ্তবীজী উদ্ভিদ পাওয়া যায়। বিচিত্র গুল্ম, বীরুৎ, (Shrub) বৃক্ষ, পত্রাশ্রয়ী এমনকি ক্লোরোফিলবিহীন পরজীবী গাছগুলি এই শ্রেণির।

এইসব গাছের বীজে উপস্থিত বীজপত্রের সংখ্যার ভিত্তিতে এদের দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা,

(i) **একবীজপত্রী উদ্ভিদ**—এই ধরনের বীজে মাত্র একটি করে বীজপত্র থাকে। ধান, গম, বাঁশ, কলা, নারকেল, কচু প্রভৃতি এই শ্রেণির গাছ। এদের কাণ্ড সাধারণত শাখাহীন হয়, কাণ্ডগুলি অনেক সময় গ্রন্থিযুক্ত হয়, বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় বীজ কখনও মাটির উপরে উঠে আসে না। এরা প্রধানত গুল্মজাতীয় ও একবর্ষজীবী হয়। তবে অনেকক্ষেত্রে বীরুৎ কাষ্ঠল ও পরাশ্রয়ী শ্রেণির ও হয়।

(ii) **দ্বি বীজপত্রী উদ্ভিদ**—এই ধরনের গাছের বীজে দুটি করে বীজপত্র দেখা যায়। যেমন, আম, জাম, বট, জবা, গোলাপ, মটর প্রভৃতি। এদের শাখা-প্রশাখাযুক্ত প্রধান মূল থাকে, কাণ্ড বিস্তৃত শাখা-প্রশাখাযুক্ত ও গ্রন্থিযুক্ত হয়। এই গাছগুলি গুল্ম, বীরুৎ, বৃক্ষ প্রভৃতি সব শ্রেণির হয় এবং এরা একবর্ষ, দ্বিবর্ষ ও বহুবর্ষজীবী হয়। অঙ্কুরোদগমের সময় এদের বীজপত্রসহ বীজটি মাটির উপরে উঠে আসে।

7.4.3 উদ্ভিদগোষ্ঠী অন্যান্য শ্রেণিবিভাগ

বিভিন্ন উদ্ভিদবিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভিদগোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

খাদ্যগ্রহণের তারতম্যের ভিত্তিতে—খাদ্যগ্রহণের পদ্ধতির পার্থক্য অনুসারে নিম্নলিখিত শ্রেণিগুলিতে উদ্ভিদকে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(1) **অটোফাইটস (স্বভোজী)**—এরা নিজেদের খাদ্য সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে নিজেরা তৈরি করে।

(2) **এপিফাইটস (পরাশ্রয়ী)**—এরাও স্বভোজী, কিন্তু অন্য কোনো শক্ত বা উঁচু গাছে এরা জন্মে। যেমন, ডিসকিডিয়া র‍্যাফ্লেসিয়ানা গাছের পাতা কলসীর মতো, যাতে বৃষ্টির জল ধরে রাখে এবং কাণ্ডের যেখান থেকে পাতা বেরোয়, সেখান থেকে মূল ও বেরোয়।

(3) **হেটেরোফাইট (পরভোজী)**—এদের দেহে ক্লোরোফিল, থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। এরা অনেক ধরনের হয়। যেমন—

(a) **প্যারাসাইটস (পরজীবী)**—এরা অন্য জীবিত গাছ থেকে নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে।

(b) **স্যাপরোফাইটস (মৃতজীবী)**—মৃত গাছপালা বা আর্দ্র অঞ্চলে উৎপন্ন নানা ধরনের ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি এই শ্রেণির।

(c) **কার্নিভোরাস (মাংসাশী উদ্ভিদ)**—এরা প্রায় সম্পূর্ণ রূপে মূলবিহীন বা দুর্বল মূল যুক্ত। যদিও এদের সবুজ পাতা আছে, তবু এরা বিভিন্ন ধরনের হয়। এরা নিজ ফাঁদের সাহায্যে পতঙ্গ ধরে খায়। যেমন—কলসপত্রী, সূর্যশিশির, ঝাঁঝি ইত্যাদি।

(d) **সিমবায়ন্টস (অন্যোন্যজীবী)**—দুটি ভিন্ন ধরনের জীব পরস্পরের সান্নিধ্যে ও সাহায্যে যখন বেঁচে থাকে তাদের বলে সিমবায়ন্টস। যেমন—লাইকেন, মটরশুঁটি ইত্যাদি।

7.4.4 উদ্ভিদগোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গাছের শ্রেণিবিভাগ করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে থাকেন। যথা—

(i) বহিরাকৃতি—গাছের বাহ্যিক আকৃতি বা গঠনের ভিত্তিতে তাদের ভাগ করা হয়। যথা, তৃণ, অরণ্য প্রভৃতি।

(ii) বাস্তুক্ষেত্র বা আবাস—আবাসের (habitat) প্রভৃতি অনুসারে বিভিন্ন উদ্ভিদগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। যথা, জলজ, স্থলজ, শুষ্ক অঞ্চলের উদ্ভিদগোষ্ঠী ইত্যাদি।

(iii) প্রজাতিগত প্রাধান্য ও সংখ্যা—যেমন ওক অরণ্য, পাইনের বন ইত্যাদি।

এফ. ই. ক্লিমেন্ট (F. E. Clement 1916) উদ্ভিদের ক্রমপর্যায়, প্রজাতি, প্রাধান্য, স্থিরতা, প্রভৃতি বিষয়ের ভিত্তিতে কয়েকটি শ্রেণিবিন্যাসগত উদ্ভিদ এককের উল্লেখ করেন। যথা—

1. ফরমেশন (Formation)—এটি হল একটি অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো উদ্ভিদ একক যা প্রধানত উদ্ভিদের প্রকার অনুযায়ী নির্ধারিত হয় এবং জলবায়ু ও সামগ্রিকভাবে পরিবেশের দ্বারা উদ্ভিদ ফরমেশন নিয়ন্ত্রিত হয়। দানসারু (Dansereau, 1958) নিম্নলিখিত 10 ধরনের উদ্ভিদ ফরমেশনের কথা বলেছেন যথা—

(a) অরণ্য (Forest)—প্রধানত বৃক্ষ দিয়ে গঠিত। যেমন, ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য।

(b) বনভূমি (Woodland)—বৃক্ষগুলি বিক্ষিপ্ত এবং অরণ্যের চেয়ে বৃক্ষের উচ্চতা বেশি হয়।

(c) সাভানা (Savannah)—বৃক্ষগুলি কম উঁচু (১০ মি. এর কম) চ্যাপ্টা মাথাযুক্ত, ঝোপ এবং তৃণ দিয়ে আবৃত।

(d) ঝোপজঙ্গাল (Serub)—ঘন ঝোপ ধরনের উদ্ভিদ একত্রে জঙ্গালের মতো থাকে। মাঝে মাঝে উদ্ভিদহীন অঞ্চল এবং বীরুৎশ্রেণীর উদ্ভিদ থাকে।

(e) প্রেইরি (Prairie)—ঘন কার্পেটের মতো ঘাস অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে। মাঝে মাঝে কিছু ঝোপজাতীয় গাছ দেখা যায়।

(f) তৃণভূমি (Meadow)—বীরুৎ জাতীয় তৃণগোত্রীয় উদ্ভিদ অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে, কাষ্ঠল উদ্ভিদ থাকে না।

(g) স্টেপ (Steppe)—গুচ্ছাকৃতি ঘাস এবং মাঝে মাঝে ঝোপ সহ উন্মুক্ত ফরমেশন।

(h) মরু উদ্ভিদ—স্থায়ী উদ্ভিদ খুবই কম, কাঁটাজাতীয় ঝোপ ও সর্বোচ্চ গাছ।

(i) তুন্দ্রা—বিক্ষিপ্ত স্বল্পোচ্চ উদ্ভিদ, ক্ষুদ্র ঝোপ, মস এই ফরমেশনের প্রধান গাছ।

(j) ভূপৃষ্ঠদেশের উদ্ভিদ (Crust)—শিলা বা মাটির পৃষ্ঠে অ্যালগি, ফাংগি, লাইকেন প্রভৃতি উদ্ভিদ।

2. অ্যাসিসিয়েশন—প্রতিটি চরম ফরমেশন দুই বা ততোধিক ক্ষুদ্রতর একক নিয়ে গঠিত। এই ক্ষুদ্রতর এককগুলিকে অ্যাসেসিয়েশন বলে।

3. ফ্যাসিয়েশন (Feciation)—একটি অ্যাসোসিয়শন আবার কয়েকটি উদ্ভিদ উপর এককের দ্বারা গঠিত, যাদের ফ্যাসিয়েশন বলে।

4. কনসোসিয়েশন (Consociation)—যখন কোনও চরম উদ্ভিদগোষ্ঠীতে একটিমাত্র প্রধান প্রজাতি থাকে তাকে কনসোসিয়েশন বলে। এটি হল উদ্ভিদগোষ্ঠীর ক্ষুদ্রতর একক। যেমন ওক-বিচ অ্যাসোসিয়েশনের ওক কনসোসিয়েশন।

5. সোসাইটি (Society)—স্থানীয় বাস্তুতান্ত্রিক পার্থক্যের ভিত্তিতে কনসোসিয়েশনকে আবার উপ এককে ভাগ করা হয় ; যাদের সোসাইটি বলে।

6. ক্ল্যান (Clan)—একটি সোসাইটিতে দুই বা ততোধিক ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদ একক লক্ষ করা যায়, যাদের ক্ল্যান বলে। এটি হল একটিমাত্র প্রজাতিবিশিষ্ট স্থানীয় উদ্ভিদ গোষ্ঠী।

7.4.5 জীবনের আকার-এর ভিত্তিতে উদ্ভিদের শ্রেণিবিভাজন

সি. রাউনকিয়ার জীবনের আকারের ভিত্তিতে উদ্ভিদের শ্রেণিবিভাগ করেছেন, যা গাছের জীবন ও জলবায়ুগত উপাদানের সম্পর্কের ফল। এর পাঁচটি ভাগ হল—

(i) ফানেরোফাইটস—এই প্রজাতি বলতে লম্বা কাষ্ঠল গাছকে (পর্ণমোচী ও চিরহরিৎ) ও লম্বা ঝোপকে বোঝায়। এই গাছগুলির কুঁড়িগুলি মাটি থেকে 2.5—30 মি: উচ্চতাবিশিষ্ট হয়।

(ii) কামাইফাইটস—তৃণজাতীয় ঝোপ (চিরহরিৎ) যাদের কুঁড়ি মাটি থেকে 2.5 মি. উচ্চতায় থাকে।

(iii) হেমিক্রিপটোফাইটিস—যাদের কুঁড়িগুলি মাটির পৃষ্ঠে অবস্থান করে। কুঁড়ি হয় পাতা দিয়ে ঢাকা থাকে অথবা এরা মাটির মধ্যে থাকে এবং প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে বাঁচায়।

(iv) ক্রিপটোফাইটস—এগুলি হল এমন গাছ যাদের কুঁড়িগুলি হয় মাটির নীচে লুকোনো থাকে

অথবা জলের নীচে থাকে এবং পরিবেশগত অবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করে। স্থলজ ও জলজ ক্রিপটোফাইটগুলিকে যথাক্রমে জিওফাইটস ও হাইড্রোফাইটস বলে।

(v) থেরোফাইটস—এই গাছগুলির জীবন বছরের মাত্র একটি ঋতু পর্যন্ত বাঁচে। এদের 'অ্যানুয়াল প্ল্যান্ট বলে। অর্থাৎ এদের জীবনচক্র বীজ থেকে বীজ পর্যন্ত একটি বছরের মধ্যে শেষ হয়।

আর. এইচ. হুইটটেকার (1975) উদ্ভিদ সম্প্রদায়কে জীবনের আকারের ভিত্তিতে ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা—

(i) গাছ (Tree)— 3 মিটারের বেশি উঁচু।

(ii) ঝোপ—3 মিটারের কম উঁচু।

(iii) লতা—

(iv) এপিফাইট গাছের পরে জন্মে।

(v) তৃণজাতীয় গাছ — কোনো কঠিন কাণ্ডবিহীন, মাটির সাথে সংশ্লিষ্ট।

(vi) থালোফাইটস—লাইকেন, মস লাইভওয়ারটস।

7.4.6 স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী

একটি নির্দিষ্ট স্বাভাবিক আবাসে (habitat) একত্রে বসবাসকারী উদ্ভিদের বিভাগকে 'উদ্ভিদ গোষ্ঠী' বা Plant Community বলে, যার মাধ্যমে কেবলমাত্র উদ্ভিদের সংগ্রহকে বোঝায় না, এদের পারস্পরিক সম্পর্ককেও বোঝায়।

একটি স্থানীয় অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির গাছগুলির একটি বিভাজন যেগুলি পরস্পর ক্রিয়া করে, তাদের বলে 'ইকোলজিকাল কমিউনিটি' (বি. ডি. বটকিন ও ই. এ. কেলার 1982)। একটি স্বাভাবিক আবাসের উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের তিনটি প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হল—

(i) একটি সম্প্রদায় দুই বা তার বেশি প্রজাতির গাছ নিয়ে গঠিত হবে।

(ii) একটি উদ্ভিদ সম্প্রদায়ে বসবাসকারী এই প্রজাতিগুলির মধ্যে বাস্তু পরিবেশে সম্বন্ধীয় সম্পর্ক আছে এবং একই আবাসে (habitat) বসবাসও বৃদ্ধি পেতে পারে।

(iii) একটি উদ্ভিদ সম্প্রদায় হল ভালোভাবে সংগঠিত। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে নিরন্তর ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে এবং সময়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি এবং ভৌত পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদ সম্প্রদায়টির একটি নির্দিষ্ট গঠনের সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগুলিকে একত্রে Vegetation বলে। অন্যভাবে গেলে সমস্ত গাছপালা যেগুলি একসাথে এক জায়গায় জন্মে এবং যার বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র বিভিন্ন প্রজাতির গাছের উপর নির্ভর করে না বরং বিভিন্ন প্রজাতির আপেক্ষিক আনুপাতিক সংখ্যার উপর নির্ভর করে তাদের Vegetation

বলে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় দুটি স্বাভাবিক আবাসে একই ধরনের গাছপালা থাকতে পারে। আবার দুটি একই ধরনের স্বাভাবিক আবাসে ঘাস ও শাল গাছ থাকলে প্রথম স্বাভাবিক আবাসে ঘাসের পরিমাণ বেশি ও শাল গাছ কম থাকতে পারে, আবার অন্যটিতে বিক্ষিপ্তভাবে ঘাসের অবস্থান ও ঘন শাল গাছের বন থাকতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথম স্বাভাবিক আবাসের vegetation বলতে ঘাসকে এবং দ্বিতীয় স্বাভাবিক আবাসের উদ্ভিদ বলতে শাল গাছকে বোঝায়।

7.4.7 উদ্ভিদ গোষ্ঠীগুলির উল্লম্ব স্তরবিন্যাস

একটি আবাসে বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির জন্ম হয়। উদ্ভিদগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রজাতির বৃদ্ধি হয় অভিযোজন, প্রতিযোগিতা এবং প্রাকৃতিক বাছাইয়ের মতো প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে। এর ফলে গাছের মাটির পৃষ্ঠদেশ থেকে গাছের চাঁদোয়ার শীর্ষদেশ পর্যন্ত বিভিন্ন উল্লম্ব স্তরের সৃষ্টি হয়। এই স্তরবিন্যাসের সৃষ্টি হয় উদ্ভিদগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রজাতির গাছের মধ্যে সূর্যালোক সংগ্রহের প্রতিযোগিতার ফলে।

নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী অরণ্যে উদ্ভিদগোষ্ঠীর চারটি উল্লম্ব স্তর থাকে। যথা—

(i) প্রধান স্তর — সুদীর্ঘ কাষ্ঠল গাছ।

(ii) দ্বিতীয় স্তর — ঝোপ বিশিষ্ট গাছ।

(iii) তৃতীয় স্তর — তৃণজাতীয় ও ওষধি গাছ।

(iv) চতুর্থ স্তর — মসজাতীয় গাছ।

7.4.8 গোষ্ঠী উন্নয়ন

একটি হ্যাবিটেটে বিশেষ একটি উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের দ্বারা অন্য একটি উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের স্থান পরিবর্তনকে বলে পর্যায়ক্রমিক উত্তরাধিকার বা succession। সময় বা কালের ভিত্তিতে সমস্ত বাস্তুতন্ত্রে উদ্ভিদগোষ্ঠীর পর্যায়ভিত্তিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে succession বলে। একটি 'ইকোলজিকাল সাকসেশন' বলতে বাস্তুতন্ত্রে বাস্তুপরিবেশগত গোষ্ঠীর পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। উদ্ভিদগোষ্ঠীর উন্নয়নের এই পর্যায়গুলিকে SERE বলে।

এফ. ই. ক্লিমেন্টস (1916) একটি স্বাভাবিক আবাসের নির্দিষ্ট পরিবেশে উদ্ভিদগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার ভিত্তিক বা successional উন্নয়নের পাঁচটি পর্যায়ের কথা বলেছেন। যথা—

(a) Nudation (অনাবরণ) পর্যায় :— উদ্ভিদহীন উন্মুক্ত অনাবৃত অঞ্চল,

(b) Migration (স্থানান্তর) এর পর্যায় :—উন্মুক্ত অঞ্চলে বীজের আগমন,

(c) Ecesis (সংস্থাপন) এর পর্যায় :—বীজের অঙ্কুরোদগম ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি,

(d) Reaction (প্রতিক্রিয়া) এর পর্যায় :—একদিকে গাছগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে ভৌত পরিবেশের সাথে গাছের মিথস্ক্রিয়া।

(e) Stabilisation (দৃঢ়ীকরণ) এর পর্যায় :—স্থানীয় পরিবেশের উদ্ভিদ প্রজাতিগুলির সংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য হয়।

7.4.9 প্রাণীরাজ্যের শ্রেণিবিভাগ

পৃথিবীর অন্যতম প্রাণীগুলি সম্পর্কে নীচে একটি ধারণা দেওয়া হল—

প্রোটোজোয়া : অতি ক্ষুদ্র এক ধরনের এককোষী প্রাণী হল প্রোটোজোয়া। মিষ্টি ও নোনা উভয় জলেই এরা বাস করে। বর্তমানে এদের জীবিত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 50,000 এর বেশি। বহুকোষী প্রাণী হিসাবে আছে প্যারাজোয়া এবং এন্টারোজোয়া।

কো-এলেনটেরাটা : এই ধরনের প্রাণীর পাকস্থলী নেই। এরা হল জলজ প্রাণী। জেলিফিস, মেডুসা, প্রবাল প্রভৃতি এই বর্গের প্রাণী। এদের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 9,600।

প্লাটিহেলমিথিস : বিভিন্ন ধরনের কীট ও কৃমি এই বর্গের প্রাণী। এরা মিষ্টি জলে বাস করে। এদের প্রজাতি সংখ্যা 15,000।

আনেলিডা : এরাও এক ধরনের কীট ও কৃমি, তবে এদের রক্ত লাল এবং শরীরে আছে অসংখ্য রিং-এর মতো। এরা জলজ এবং এদের চোখ ও উপাঙ্গ আছে। প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 7,000।

আর্থাপডা : এই বর্গের প্রাণী জল ও মাটি উভয় বাসস্থানেই থাকে। এদের দেহেও অসংখ্য রিং আছে, তবে এদের পা আছে। এই বর্গের প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 7,65,000। ক্রাস্টসিয়া, মিলিপেডস, সেন্টিপেডস প্রভৃতি হল এই বর্গের প্রাণী।

মলস্ক : এরা হল শামুক জাতীয় কোমল অঙ্গের প্রাণী। এদের দেহ কঠিন খোলসের মধ্যে থাকে। এদের প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ।

একাইনোডামাটা : এই বর্গের প্রাণী মাংসাশী স্তন্যপায়ী এবং তৃণভোজী উভয় প্রজাতির হয়। সমুদ্রের সব গভীরতায় এরা বাস করে। এদের সংখ্যা প্রায় 5,700। স্টারফিস, সি-লিলি, আর্চিন প্রভৃতি এই বর্গের প্রাণী।

কর্ডাটা : মেরুদণ্ডী প্রাণীরা এই বর্গের। এদের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 45,000 এবং এদের দেহের মধ্যে স্পষ্টভাবে দেহগহ্বর আছে। জীবনের কোনো এক সময়ে এদের লেজ থাকে। এই বর্গের প্রাণীরা পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যেমন—

পিসিজ : এরা জলজ প্রাণী এবং এদের রক্ত ঠাণ্ডা। উদাহরণ মাছ।

আম্ফিপ্রিয়া : এরা উভচর। নানা ব্যাং এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত।

রেপটিলিয়া : এই সরীসৃপগুলির অন্তঃকঙ্কাল অস্থিময়। এরা ডাঙায় ডিম পাড়ে। টিকটিকি, সাপ, কুমির, প্রভৃতি। এরা ডাঙায় পেটে ভর দিয়ে চলে এবং জলে সাঁতার দিয়ে চলে।

আভিস বা পাখি : শ্বাস গ্রহণকারী মেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের রক্ত গরম। সমস্ত পাখি এবং অন্তর্ভুক্ত।

ম্যামেলিয়া : এই প্রজাতির রক্ত গরম, চতুষ্পদী। এরা শ্বাস গ্রহণকারী মেরুদণ্ডী এবং দেহ লোমে আবৃত। এদের দাঁত আছে এবং জলে স্থলে গাছে মাটির নীচে বাস করতে পারে ও উড়তে পারে। এদের আবার তিনটি বিভাগ আছে। যথা—

(i) **প্রোটোথেরিয়া :** এরা ডিম পাড়ে, ডিম থেকে এদের বাচ্চা হয়।

(ii) **মেটাথেরিয়া :** এরা বাচ্চা প্রসব করে। ক্যাঙারু এই বর্গের।

(iii) **প্ল্যাসেন্টালস বা ইউথেরিয়া :** এদের প্ল্যাসেন্টা থাকে মানুষ, গোরু, ছাগল, বাঘ, হাতি প্রভৃতি। এরা বাচ্চা প্রসব করে।

7.5 উদ্ভিদ ও প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ

উপরিউক্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী গোষ্ঠীগুলি পৃথিবীর সর্বত্র একত্রে বাস করে না। বিভিন্ন অংশে বিশেষ ধরনের অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিশেষ ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদগোষ্ঠীর সন্ধান মেলে।

সক্লেটার : ওয়ালেস প্রদত্ত খসড়া অনুসারে ছয়টি প্রাণী-ভৌগোলিক অঞ্চল পাওয়া যায়। যথা, পলিআর্কটিক, নিয়ার্কটিক, ওরিয়েন্টাল, ইথিওপিয়ান, নিওট্রপিকাল ও অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল। এই প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলগুলির অবস্থান এবং প্রাণী ও উদ্ভিদসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে আলোচনা করা হল।

I. পলিআর্কটিক অঞ্চল : কর্কটক্রান্তিরেখার উত্তরে ইউরেশিয়া মহাদেশের সমগ্র অংশ নিয়ে (আরব উপদ্বীপের অংশ এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম ছাড়া) অঞ্চলটি গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের পূর্ব (চীন) ও পশ্চিমাংশ (ইউরোপ) পর্ণমোচী অরণ্যে ঢাকা এবং উত্তরাংশে নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য ও তুন্দ্রা বনভূমি দেখা যায়। এশিয়ার অভ্যন্তরে তৃণভূমি এবং উচ্চ মালভূমিতে মরুভূমি অবস্থিত। এই অঞ্চলে তিনটি বৈশিষ্ট্য হল—

1. অধিকাংশ প্রাণী পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেখা যায়।
2. মেরু অঞ্চলকে বেষ্টন করে থাকে।
3. অধিকাংশ প্রাণী প্রাচীন পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলে সৃষ্ট।

বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণী— (a) মাছ—সাইপ্রিনিড, পার্চ, সাকার, প্যাডেলফিস প্রভৃতি প্রজাতি।

(b) উভচর—স্যালামাণ্ডার, নিউট, হেলবেণ্ডার, প্রোটিয়াস প্রভৃতি।

(c) সরীসৃপ—এই অঞ্চলে সরীসৃপ যথেষ্ট কম, কচ্ছপ পাওয়া যায় না।

(d) পক্ষী—বাজপাখি, কাঠঠোকরা, সোয়ালো, ফিঞ্চ, গ্রাউস, লার্ক, কোকিল পায়রা, চড়াই ইত্যাদি।

(e) স্তন্যপায়ী—32টি জাতির স্তন্যপায়ীদের মধ্যে ভেড়া, ছাগল, হরিণ, নেকড়ে, বিড়াল, চমরি গাই, বানর ইত্যাদি।

প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অঞ্চলটি পাঁচটি অংশ বিভক্ত যথা—

(a) তুন্দ্রা অঞ্চল—উদ্ভিদ কম, মস লাইকেন প্রভৃতি। ক্যারিবো, লেমিং, কস্তুরি মৃগ, নেকড়ে, মেরু শৃগাল, মেরু ভল্লুক ইত্যাদি প্রধান প্রাণী।

(b) নাতিশীতোষ্ণ সরলবর্গীয় অঞ্চল—এখানে সরলবর্গীয় গাছ, যেমন, পাইন, ফার, স্প্রুস, বার্চ প্রভৃতি অন্যতম। প্রধান প্রাণীগুলি হল হরিণ, খচ্চর, লিংকস ইত্যাদি।

(c) নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল—স্টেপ তৃণভূমি অঞ্চলে বন্য গাধা, ঘোড়া, উট, খেঁকশিয়াল প্রভৃতি জীবজন্তু দেখা যায়।

(d) পর্ণমোচী অরণ্য অঞ্চল—এখানে শীতকালে পাতাঝরা গাছগুলি অবস্থান করে। লাল শৃগাল, কালো ভল্লুক, রেকুন প্রভৃতি প্রধান প্রাণী।

(e) মরু অঞ্চল—এখানে কাঁটা জাতীয় জেরোফাইট দেখা যায়। গিরগিটি, সাপ, ইঁদুর, জারবোয়া, হেজহগ প্রভৃতি প্রধান প্রাণী।

II. নিয়ার্কটিক অঞ্চল—সমগ্র উত্তর আমেরিকা ও গ্রিনল্যান্ড দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলের উত্তরে তুন্দ্রা, অরণ্য, পূর্ব ও পশ্চিমের উপকূল অঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য, মধ্যবর্তী অঞ্চলে তৃণভূমি ও মরুভূমির অবস্থান। রকি পার্বত্য অঞ্চল অরণ্যে ঢাকা।

বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণী—

(a) **মৎস্য**—সাইপ্রিনিড, সাকার, প্যাডেলফিস, পার্চ, সিচপিড, বাওফিন ইত্যাদি।

(b) **উভচর**—স্যালামান্ডার, গেছো ব্যাং রাণিড, সাইরেন প্রভৃতি।

(c) **সরীসৃপ**—বোড়ো, র‍্যাটল সাপ, পাইথন, বিষাক্ত সাপ, কচ্ছপ ও কুমির।

(d) **পাখি**—পাতিহাঁস, পায়রা, বাজপাখি, মাছরাঙা, সোয়ালো, ফিঞ্চ, গ্রাউস, ক্রিপার, হামিং বার্ড ইত্যাদি।

(e) **স্তন্যপায়ী**—প্রেইরি কুকুর, সজারু, ছুঁচো, বাদুড়, খরগোস, কাঠবেড়ালি, বিভার ইত্যাদি।

প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নিয়ার্কটিক অঞ্চলটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত। যথা—

(a) **তুন্দ্রা অঞ্চল**—বরফাচ্ছাদিত এই অঞ্চলে মস, লাইকেন ছাড়া বিশেষ উদ্ভিদ নেই। ক্যারিবো, লেমিং, মেরু শৃগাল, মেরু ভল্লুক ইত্যাদি প্রধান প্রাণী।

(b) **নাতিশীতোষ্ণ সরলবর্গীয় অরণ্য অঞ্চল**—পাইন, ফার, বার্চ, স্প্রুস প্রভৃতি সরলবর্গীয় গাছ এবং হরিণ, লিংস, খচ্চর, মুস প্রভৃতি প্রাণী।

(c) **নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল**—প্রেইরি তৃণভূমি অঞ্চলে বাইসন, প্রাংহর্ন, খরগোস, প্রেইরি কুকুর, শিয়াল প্রভৃতি প্রাণী।

(d) **পর্ণমোচী অরণ্য অঞ্চল**—পর্ণমোচী উদ্ভিদবিশিষ্ট এই অঞ্চলের প্রধান প্রাণীগুলি হল অপসাম, র‍্যাকুন, লাল শৃগাল, কালো ভল্লুক ইত্যাদি।

(e) **মরু অঞ্চল**—কাঁটা ঝোপবিশিষ্ট এই অঞ্চলে টিকটিকি, সাপ, জারবোয়া, হেজহগ প্রভৃতি প্রাণী উল্লেখযোগ্য।

III. ইথিওপিয়ান অঞ্চল : প্রধানত ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত মধ্য সাহারার দক্ষিণে আফ্রিকার বাকি অংশ এবং আরব উপদ্বীপ নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলে ঝোপ ও তৃণভূমি দেখা যায়।

বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণী—

মৎস্য—সাইনপ্রিড, লাংফিস, কারাসিন, সিচলিড প্রভৃতি।

উভচর—সোনা ও কুনো ব্যাং সিসিলিয়ান, র‍্যানিড প্রভৃতি প্রাণী।

সরীসৃপ—বোড়া, বোয়া পাইথন, কেউটে, ভাইপার প্রভৃতি সাপ এবং টিকটিকি, কচ্ছপ, কুমির প্রভৃতি।

পাখি—পেঁচা, মাছরাঙা, বাজপাখি, সোয়ালো, ঈগল, উটপাখি, ফ্ল্যাইক্যাচার, ব্রডবিল, হর্নবিল প্রভৃতি।

স্তন্যপায়ী—জলহস্তী, জিরাফ, অ্যান্টিলোপ, সিংহ, চিতাবাঘ, শিয়াল, শিম্পাঞ্জি, গরিলা, বানর, হাতি, জেব্রা, ঘোড়া প্রভৃতি।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ভিত্তিতে ইথিওপিয়ান অঞ্চলকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। যথা—

(i) **মরু অঞ্চল—**শুষ্ক প্রায় উদ্ভিদহীন অঞ্চলে সজারু, জারবোয়া, স্প্রিংবক প্রভৃতি পাওয়া যায়।

(ii) **সাভানা অঞ্চল**—দীর্ঘাকায় তৃণ, ঝোপ প্রভৃতি উদ্ভিদবিশিষ্ট অঞ্চলের প্রাণীগুলি হল জেব্রা, কৃষ্ণসার, হ্যারট, হরিণ, জিরাফ, হাতি, উটপাখি, সিংহ ইত্যাদি।

(iii) **ক্রান্তীয় অরণ্য অঞ্চল**—কিছু পর্ণমোচী ও কাঁটাজাতীয় গাছ এবং গরিলা, শিম্পাঞ্জি, হনুমান, বুনো হাতি প্রভৃতি প্রাণী উল্লেখযোগ্য।

IV. ওরিয়েন্টাল অঞ্চল—প্রধানত ক্রান্তীয় এশিয়ার ইরান উপদ্বীপ থেকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত। থর মরু ও কিছু অর্ধমরু অঞ্চল ছাড়া অঞ্চলটি মোটামুটি অরণ্যাবৃত।

বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণী—

মৎস্য—সাইপ্রিনিফর্ম প্রধান, লোচ, ক্যাটফিস, পার্চ, রুই, মৃগেল, কাতলা, কার্প, শোপ, মাগুর, বোয়াল ইত্যাদি।

উভচর—কুনো, সোনা ও গেছো ব্যাং, স্যালামান্ডার, ইকথিওফিস ইত্যাদি।

সরীসৃপ—টিকটিকি, গিরিগিটি, গোসাপ, কচ্ছপ, কেউটে, বোড়ো, ড্রাকো প্রভৃতি।

পাখি—কাঠঠোকরা, পায়রা প্রধান। ফ্রগমাউথ, উড সোয়ালো, ময়ূর, শ্যামা, ফিঙে, চড়ুই, সারস, কাক ইত্যাদি।

স্তন্যপায়ী—ভারতীয় হাতি, সিংহ ও বাঘ, গণ্ডার, নেকড়ে, চিতা, বানর, শিয়াল, বন্য কুকুর, বন্য বিড়াল ইত্যাদি।

V. নিউট্রাপিক্যাল অঞ্চল—মেক্সিকো, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা নিয়ে গঠিত। দুই তৃতীয়াংশ ক্রান্তীয় জলবায়ু অন্তর্গত। উচ্চ মালভূমিও পার্বত্য অংশে শীতল জলবায়ু। আমাজন অববাহিকা ও পূর্ব উপকূলে বৃষ্টি অরণ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার অভ্যন্তরে ঝোপ জঙ্গল ও তৃণভূমি দেখা যায়।

মেরুদণ্ডী প্রাণী—

মৎস্য—ওস্টিওগ্লোসিড এবং লাংফিস, কারাসিন, সিচলিড, নানডিড, ক্যাটফিস, ইল, গারপাইক ইত্যাদি।

উভচর—হাইলিড ও লেপ্টোডাক্টিলিড সর্বত্র পাওয়া যায়। স্যালামান্ডার, বিউফো, রানা, পিপিড ও গেছো ব্যাং ইত্যাদি।

সরীসৃপ—চেলিড্রা, টেস্টুডো, কচ্ছপ, কুমির, তক্ষক, বোয়া, পিট বোড়া কলুব্রিড সাপ, অ্যালিগেটর প্রভৃতি।

পাখি—অসংখ্য পাখি দেখা যায় বলে দক্ষিণ আমেরিকাকে 'পাখির মহাদেশ' নাম দেওয়া হয়েছে। হামিং বার্ড, টুকান, চ্যাটার, পাতিহাঁস থ্রাস, টোড়ি, টিনামাস, উটপাখি, সানবিটার্ন ইত্যাদি।

স্তন্যপায়ী— অপসাস, সিনোলিস্টিড ক্যাঙারু, বানর, ভল্লুক, বাদুড়, খরগোস, উটপাখি, কাঠবেড়ালি, উট, কুকুর, নেকড়ে, শিয়াল রক্তচোষা বাদুড় প্রভৃতি।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অবস্থানের ভিত্তিতে নিওট্রাপিক্যাল অঞ্চলকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

(i) **নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল**—ডাউনস, তৃণভূমি অঞ্চলের প্রাণীগুলি হল গুয়ানাকো, রিয়া, ভিসকাচা, খেঁকশিয়াল প্রভৃতি।

(ii) **মরু অঞ্চল**—শুষ্ক ঝোপবিশিষ্ট গাছপালাবিশিষ্ট অঞ্চলে গুয়ানাকো, রিয়া, শকুন, আর্মাডিলো প্রভৃতি প্রাণী।

(iii) **ক্রান্তীয় অরণ্য অঞ্চল**—কিছু চিরহরিৎ বৃষ্টি অরণ্য এবং পর্ণমোচী উদ্ভিদবিশিষ্ট এই অঞ্চলের প্রধান প্রাণীগুলি হল বানর, শ্লথ, গেছো সাপ, হামিংবার্ড, টিয়া প্রভৃতি।

VI. অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল—অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্তী দ্বীপগুলি এবং তাসমানিয়া দ্বীপ নিয়ে অঞ্চলটি গঠিত।

এই অঞ্চলে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু আছে এবং মহাদেশের 75% তৃণভূমি ও মরুভূমি দিয়ে ঢাকা। দক্ষিণ পূর্বের ইউক্যালিপটাস অরণ্য এখানকার স্থানীয় স্বাভাবিক উদ্ভিদ। নিউগনিতে বৃষ্টি অরণ্য দেখা যায়। অধিকাংশ প্রাণী আদিম ও স্থানীয়, তবে কিছু প্রাণী ওরিয়েন্টাল অঞ্চল থেকে স্থানান্তরিত।

মেরুদণ্ডী প্রাণী—

মৎস্য—এই অঞ্চলে মৎস্যের সংখ্যা কম। অস্টিওগ্লসিড ও নিওসেরাটোডাস নামের লাংফিস প্রধান মাছ।

উভচর—ব্যাং প্রধান উভচর প্রাণী (90%)।

সরীসৃপ—কুমির, কচ্ছপ, কলুব্রিড সাপ, টিকটিকি, গিরগিটি, পাইথন ইত্যাদি।

পাখি—ট্রেগান, মাছরাঙা, বাজপাখি, তোতা, কোকিল, লোরিস, কাঠ চড়ুই ইত্যাদি।

স্তন্যপায়ী—মারসুপিয়াল এখানকার প্রধান স্তন্যপায়ী প্রাণী। মনোস্ট্রিম, বাদুড়, ইঁদুর, ছুঁচো, ডিঙো কুকুর, খরগোস প্রভৃতি।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অবস্থানের ভিত্তিতে তিনটি অংশে অঞ্চলটি বিভক্ত—

যথা—(i) **মরু অঞ্চল**—এই শুষ্ক অঞ্চলে মারসুপিয়াল, খচ্চর, জারবোয়া, টিকটিকি প্রভৃতি প্রধান প্রাণী।

(ii) **সাভানা অঞ্চল**—এমু, লাল ক্যাঙারু, কাকাতুয়া, টিয়া ইত্যাদি এই অঞ্চলের প্রাণী। তৃণ ও ঝোপবিশিষ্ট বিক্ষিপ্ত কিছু গাছ এখানকার অন্যতম উদ্ভিদ।

(iii) **ক্রান্তীয় অরণ্য**—পর্ণমোচী উদ্ভিদবিশিষ্ট এই অঞ্চলে ক্যাঙারু, অপসাম, ওয়ালাবি কোয়েলা প্রভৃতি হল অন্যতম প্রাণী।

7.6 সারাংশ

এই এককে আমরা প্রথমে বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুরীতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। প্রথমে আমরা বাস্তুতন্ত্রের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য জেনেছি। এরপর বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন শ্রেণিগুলি সম্পর্কে জানবার পর বাস্তুতন্ত্রের ক্রিয়াপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা সংগ্রহ করেছি। বাস্তুতন্ত্রের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলির বিবরণ। জীবভূগোলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জীবগোষ্ঠী বা জীব সম্প্রদায়। জীবগোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগের পর প্রথমে আমরা উদ্ভিদগোষ্ঠীর শ্রেণিগুলি সম্পর্কে নিজেদের ধারণা পরিস্ফুট করেছি। উদ্ভিদগোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এবং উল্লম্ব স্তরবিন্যাস সম্পর্কে এই এককে সংক্ষিপ্তভাবে আমরা ব্যাখ্যা করেছি। এরপর আমরা প্রাণীগোষ্ঠীর শ্রেণিগুলি সম্পর্কে

আলোচনা করেছি এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বন্টনের ভিত্তিতে ভৌগোলিক অঞ্চলগুলির বন্টন সম্পর্কে ধারণা সংগ্রহ করেছি। অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণী গোষ্ঠীদের পারস্পরিক সম্পর্ক এই এককে আলোচিত হয়েছে।

7.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. বাস্তুতন্ত্রের ইংরাজি প্রতিশব্দ কি এবং সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন?
2. ওডাম বর্ণিত বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও।
3. মানবীয় বাস্তুতন্ত্র কাকে বলে?
4. বাস্তুতন্ত্রে প্রধান তিনটি উপাদান কি কি?
5. মাইক্রোকনজিউমার বা বিয়োজক কাদের বলে?
6. জীব সম্প্রদায় বলতে কি বোঝায়?
7. মুখ্য সম্প্রদায় ও গৌণ সম্প্রদায় কাকে বলে?
8. অপুষ্পক উদ্ভিদ কাকে বলে?
9. ব্রায়োফাইটা কি?
10. গুপ্তবীজী উদ্ভিদ কি? উদাহরণ দাও।
11. সিমবায়টিক উদ্ভিদ কাকে বলে?
12. 'ইকলজিকাল কমিউনিটি' কাকে বলে?
13. মলাস্কা ও কর্ডাটা প্রাণী কাদের বলে? উদাহরণ দাও।
14. অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলে স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ড প্রাণীর দুটি উদাহরণ দাও।

7.8 উত্তরমালা

1. 7.2 একক দেখুন।
2. 7.2 একক দেখুন।
3. 7.2.2 একক দেখুন।
4. 7.2.4 একক দেখুন।
5. 7.3 একক দেখুন।
6. 7.4 একক দেখুন।
7. 7.4 একক দেখুন।
8. 7.4.2 একক দেখুন।
9. 7.4.2 একক দেখুন।
10. 7.4.3 একক দেখুন।
11. 7.4.3 একক দেখুন।
12. 7.4.6 একক দেখুন।
13. 7.4.9 একক দেখুন।
14. 7.5 একক দেখুন।

7.9 গ্রন্থপঞ্জি

ওডাম, ই. পি. 1996 : ফানডামেন্টাল অফ ইকোলজি, নটরাজ পাবলিকেশনস, দেরাদুন

সিং সবীন্দ্র 1991 : এনভায়রনমেন্টাল জিওগ্রাফি, প্রয়াগ পুস্তক ভবন, এলাহাবাদ

লাহিড়ী দত্ত, কুন্ডলা 2000: পরিবেশ সমীক্ষণ, দি ওয়ালর্ড প্রেস প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
ও দে, বাসুদেব

সাঁতরা, এস. সি. 2001 : এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স—নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক 8 ❑ খাদ্যস্তর—খাদ্যশৃঙ্খল, শক্তিপ্রবাহ, ইকোলজিকাল পিরামিড

গঠন

8.1. প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

8.2. খাদ্যস্তর বা ট্রফিক লেভেল

8.3. খাদ্যশৃঙ্খল

8.3.1. খাদ্যশৃঙ্খলের প্রকারভেদ

8.3.2. খাদ্যশৃঙ্খলের গুরুত্ব

8.3.3. খাদ্যশৃঙ্খলের বৈশিষ্ট্য

8.3.4. খাদ্যজাল

8.4. শক্তি ও শক্তিপ্রবাহ সমূহ

8.4.1. বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ

8.4.2. শক্তির উৎস রূপে সূর্য

8.4.3. প্রকৃতিতে শক্তির রূপান্তর

8.4.4. Lindman-এর গতিশীল খাদ্যস্তরের ধারণা

8.4.5. শক্তিপ্রবাহের পর্যায়সমূহ

8.4.6. শক্তিপ্রবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন মডেল

8.5. বাস্তু পরিবেশগত বা ইকোলজিকাল পিরামিড

8.5.1. বাস্তুপরিবেশগত বা ইকোলজিকাল পিরামিডের শ্রেণিবিভাগ

8.6. সারাংশ

8.7. সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

8.8. উত্তরমালা

8.9. গ্রন্থপঞ্জি

8.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

জীব ভূগোলের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিভিন্ন জীবের খাদ্যের সম্পর্ক নির্দেশকারী খাদ্যস্তর। এছাড়া খাদ্যশৃঙ্খল কোনো একটি বিশেষ বাস্তুতন্ত্রে অবস্থানকারী জীবদের মধ্যে খাদ্য-খাদকের সম্পর্ককে নির্দেশ করে। সূর্য থেকে উদ্ভিদদেহে এবং উদ্ভিদদেহ থেকে প্রাণীদেহে শক্তির প্রবাহ বাস্তুতন্ত্রে অবস্থানকারী

জীবকূলের জীবনধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। তাছাড়া 'বাস্তুপরিবেশের পিরামিড' জীবদের সংখ্যা শক্তি ও ভর সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রদান করে। বর্তমান এককটিতে উপরিউক্ত বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচিত হবে।

উদ্দেশ্য—এই এককটি পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন—

- খাদ্যস্তর বলতে কী বোঝায়?
- খাদ্যশৃঙ্খল—তার শ্রেণি বিভাগ গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য।
- খাদ্যজালের ধারণা।
- শক্তি, শক্তি প্রবাহ, বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রধান উৎস, শক্তির রূপান্তর, শক্তিপ্রবাহের পর্যায় এবং শক্তি প্রবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন মডেল।
- বাস্তুপরিবেশগত বা ইকোলজিকাল পিরামিড।

8.2 খাদ্যস্তর বা ট্রফিক লেভেল

বাস্তুতন্ত্রে অসংখ্য জীবজন্তু ও গাছপালা পাশাপাশি অবস্থান করে, এদের খাদ্যাভ্যাস প্রায় একই ধরনের হয় এবং এরা প্রায় একই উৎস থেকে নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে। বাস্তুতন্ত্রে খাদক ও উৎপাদক—দুটি সম্প্রদায়ই বিভিন্নখাদ্য গোষ্ঠীতে বিভক্ত, যাদের প্রতিটি গোষ্ঠী খাদ্যস্তর বা 'ট্রফিক লেভেল' নামে পরিচিত। অর্থাৎ খাদ্যশৃঙ্খলের পুষ্টিস্তরগুলিকে খাদ্যস্তর বলে। যেসব জীব উদ্ভিদস্তর থেকে সমান সংখ্যক ধাপ উঁচুতে থাকা স্তর থেকে খাদ্য যোগাড় করে, সেইসব জীবগুলি একই খাদ্যস্তরে অবস্থান করে।

খাদ্যের অভ্যাস অনুসারে গাছপালা ও জীবজন্তুগুলিকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়, যার প্রথম স্তরে থাকে সবুজকণাবিশিষ্ট গাছ। এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে বলে এদের স্বভোজী বলে। সবুজ গাছপালা ও ঘাস খায় এমন প্রাণীগুলিকে (যেমন, ফড়িং, ইঁদুর, খরগোস, গোরু ইত্যাদি) একটি স্তরের মধ্যে রাখা যায়। একটি বাস্তুতন্ত্রে সাধারণত তিন থেকে ছয়টি স্তর থাকে। জীবগোষ্ঠীর এই সমস্ত স্তরগুলির মিলিত গঠন বা সামগ্রিক অবস্থা 'ট্রফিক গঠন' নামে পরিচিত।

বাস্তুতন্ত্রের প্রথম খাদ্যস্তরে থাকে উৎপাদক বা সবুজ ঘাস, দ্বিতীয় স্তরে থাকে প্রাথমিক খাদক বা তৃণভোজী প্রাণী, তৃতীয় স্তরে থাকে প্রাথমিক মাংসাশী প্রাণী এবং চতুর্থ বা সর্বোচ্চ স্তরে থাকে বড়ো আকারের মাংসাশী প্রাণী। পৃথিবীর উপরে পতিত সৌররশ্মির প্রায় 1-5 শতাংশ সবুজ গাছগুলি কাজে লাগায়। দ্বিতীয় স্তরের তৃণভোজী প্রাণীরা প্রথম স্তরের সঞ্চিত শক্তির প্রায় 5-20 শতাংশ কাজে লাগায়, পরবর্তী স্তরের মাংসাশী প্রাণীরা আবার আগেকার স্তরের মাত্র 5-20 শতাংশ শক্তিকে নিজের কাজে লাগায়।

ট্রফিক গঠনে শক্তি ও খাদ্য উপাদানগুলি স্বাভাবিক উপায়ে অজৈবমণ্ডল থেকে বিভিন্ন স্তর পরিক্রমা করে আবার অজৈবমণ্ডলে ফিরে আসে। প্রতিটি স্তর অতিক্রম করার সময় শক্তির কিছু কিছু অংশ নিঃশেষিত হয়। প্রতি স্তরে শ্বসন ও রেচন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শক্তি ও অন্যান্য অজৈব পদার্থের অপচয় হয়। ট্রফিক গঠনে স্তরগুলির সংখ্যা যত বেশি হয়, শক্তি ও অন্যান্য অজৈব পদার্থের অপচয় বেশি হয়।

স্থলভাগের ট্রফিক গঠনের স্তরবিন্যাসের উদাহরণ হল ঘাস—গোরু—বাঘ। আবার জলভাগে এই স্তরবিন্যাস হল ক্ষুদ্র উদ্ভিদ—ক্ষুদ্র প্রাণী—মাছ। জলভাগের একটি খাদ্যশৃঙ্খলের খাদ্যস্তরগুলি নীচে বিস্তারিতভাবে দেখানো হল—

খাদ্যস্তর	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম
জীব	ডায়াটস	প্রাণী প্লাংকটন	ছোটো মাছ	বড়ো মাছ	মানুষ
খাদ্যশৃঙ্খলে	উৎপাদক	প্রথম শ্রেণির খাদক	দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক	তৃতীয় শ্রেণির খাদক	চতুর্থ শ্রেণির খাদক

Trophic layer বা ট্রফিক স্তরগুলির সামগ্রিক অবস্থা ট্রফিক গঠন (Trophic structure) নামে পরিচিত। গ্রিক শব্দ 'ট্রফ' (Troph) বলতে খাদ্যের যোগানকে বোঝায়। উৎপাদক স্তর থেকে যত উপরের দিকে যাওয়া যায়, পুষ্টির পরিমাণ তত কমতে থাকে। পুষ্টি বা খাদ্যের যোগানের ক্রমপর্যায় অনুসারে ট্রফিক স্তরগুলিকে পরপর ছকে সাজানো থাকে। ট্রফিক গঠনে বিভিন্ন খাদ্যস্তরের মধ্যে সম্পর্ক নীচে উপস্থাপন করা হল—

প্রথম খাদ্যস্তর ঃ এটি হল খাদ্যশৃঙ্খলের ভিত্তি স্তর। প্রধানত স্বউৎপাদনকারী ও স্বভোজী গাছপালা এই স্তরে অবস্থান করে। একে উৎপাদক স্তরও বলে। সূর্য, বায়ু, মাটি, জল এবং বিয়োজকদের থেকে গাছপালা শক্তি গ্রহণ করে এবং নিজেদের খাদ্য তৈরি করে।

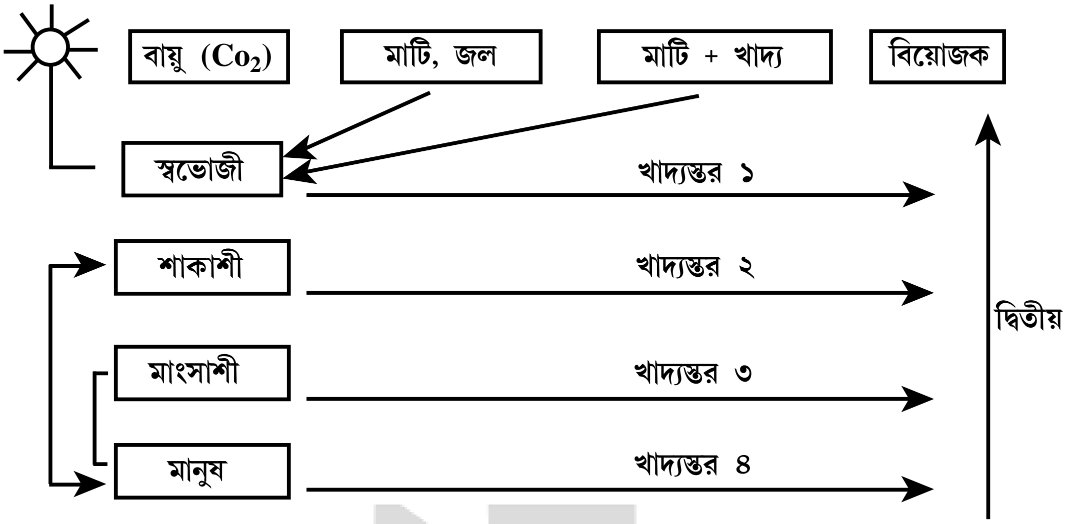

চিত্র 1 : ট্রফিক গঠনে বিভিন্ন খাদ্যস্তরের মধ্যে সম্পর্ক

দ্বিতীয় খাদ্যস্তর : যেসব জীব নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না, খাদ্যের জন্য প্রথম স্তরের গাছপালার উপর নির্ভরশীল, সেইসব জীবেরা দ্বিতীয় খাদ্যস্তরের অন্তর্ভুক্ত। এদের প্রথম শ্রেণির খাদক বলে। তৃণভোজী প্রাণী যেমন, গোরু, ভেড়া, হরিণ, ছাগল প্রভৃতি এই স্তরের অন্তর্গত।

তৃতীয় খাদ্যস্তর : এই খাদ্যস্তরের প্রাণীরা খাদ্যের জন্য দ্বিতীয় স্তরের তৃণভোজীদের উপর নির্ভরশীল। এদের মাংসাশী প্রাণী বলে। যেমন সিংহ, চিতাবাঘ, বাজপাখি, শিকারি মাছ প্রভৃতি।

চতুর্থ খাদ্যস্তর : যেসব প্রাণী নীচের তিনটি খাদ্যস্তর থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে, তাদের চতুর্থ খাদ্যস্তরের জীব বলে। মানুষ এই স্তরের সদস্য এবং এরা সর্বভুক প্রাণী।

8.3 খাদ্যশৃঙ্খল (Food Chain)

বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদক ও খাদকের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক সম্পর্ককে এবং এদের মধ্যে খাদ্যশক্তি প্রবাহের মধ্য দিয়ে যে শৃঙ্খল রচনা করা হয়, তাকে খাদ্যশৃঙ্খল বলে। যে কোনো বাস্তুতন্ত্রে সবুজ গাছ সৌরশক্তিকে নিজের দেহে শৃঙ্খলিত করার পরে তাকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। এই রাসায়নিক শক্তি কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট, প্রোটিন প্রভৃতি খাদ্যের মধ্যে বাঁধা পড়ে। জীবমণ্ডলের বিভিন্ন প্রাণীকে শক্তির প্রাপ্তি বা যোগানের বিষয়ে সবুজ গাছের উপর নির্ভর করতে হয় এবং একই কারণে কোনো জায়গায় সবুজ গাছের সৌরশক্তি আবদ্ধ করার ক্ষমতার উপরেই সর্বোচ্চ খাদ্যস্তরের শক্তি নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে

উৎপাদক বা সবুজ গাছ যে শক্তি ও খাদ্য সঞ্চয় করে বেঁচে থাকে তা নীচের স্তর থেকে প্রবাহিত হয়ে বিভিন্ন খাদ্যস্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সর্বোচ্চ খাদ্যস্তরে পৌঁছানোর ফলে যে শৃঙ্খলের মতো গঠনাকৃতির সৃষ্টি হয়, তাকে খাদ্যশৃঙ্খল বলে। বিজ্ঞানী Odum (1966) এর মতে, উৎপাদক থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়িকভাবে খাদ্য খাদক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রাণী গোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্যশক্তি প্রবাহের যে ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকেই খাদ্যশৃঙ্খল বলে।

উদাহরণ : সবুজ গাছে বা ঘাস $\rightarrow$ কীটপতঙ্গ $\rightarrow$ ব্যাং $\rightarrow$ সাপ $\rightarrow$ ময়ূর বা বাজপাখি।

প্রতিটি খাদ্যশৃঙ্খলে অনেকগুলি পুষ্টির স্তর থাকে। এদের খাদ্যস্তর (Traphic level) বলে। যে কোনো খাদ্যশৃঙ্খলের প্রথম খাদ্যস্তরটি উৎপাদক বা স্বভোজী জীবের দ্বারা গঠিত হয়। এই খাদ্যস্তরকে বলে উৎপাদক স্তর। পরবর্তী খাদ্যস্তরগুলি বিভিন্ন ধরনের খাদক (Consumer) দিয়ে গঠিত হয়। খাদক জীবগুলি স্বভোজী জীব অথবা স্বভোজী জীবের উপর নির্ভরশীল প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। তাই এদের পরভোজী জীব (heterotroph) বলে। জীবমণ্ডলে খাদকদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

(a) তৃণভোজী — যেমন, হরিণ, গোরু, খরগোস ইত্যাদি।

(b) মাংসাশী — যেমন, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি।

(c) সর্বভুক — যেমন, মানুষ।

খাদ্য-খাদকের সম্পর্কের ভিত্তিতে জীবমণ্ডলীয় খাদকগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণিগুলিতে ভাগ করা যায় যথা—

(a) প্রথম শ্রেণির খাদক : এই শ্রেণির তৃণভোজী প্রাণীরা উৎপাদক গাছের উপর নিজেদের খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে।

(b) দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক : এই শ্রেণির মাংসাশী প্রাণীরা (বাঘ, সিংহ ইত্যাদি) তৃণভোজীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

(c) তৃতীয় শ্রেণির খাদক : এই শ্রেণির প্রাণীরা (বাজপাখি, মানুষ ইত্যাদি) দ্বিতীয় শ্রেণির প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

জটিল বাস্তুতন্ত্রগুলিতে, বিশেষ করে আর্দ্র উষ্ণমণ্ডলে খাদ্যশৃঙ্খল নানা কারণে জটিল হয়, কারণ এখানে জীবদের পারস্পরিক নির্ভরতা অনেক বেশি জটিল। খাদ্যশৃঙ্খলের ধর্ম হল, এরা সর্বনিম্ন স্তরে জীবের সংখ্যা, জীবভার এবং শক্তির পরিমাণ বেশি হয়, শৃঙ্খলে উপরের স্তরগুলিতে পরিমাণগুলি কমতে থাকে, ফলে ট্রফিক গঠন অনেকটা পিরামিডের মতো দেখতে হয়। ট্রফিক গঠনে খাদ্যশৃঙ্খলের নীচের

স্তরে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সংখ্যা অনেক বেশি থাকে, কিন্তু আকার ছোটো হয়। যদিও প্রতিটি প্রাণী ও উদ্ভিদ পিছু জীবভর কম থাকে, কিন্তু প্রতি একক সময়ে জীবভর অনেক বেশি হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি একক আয়তনে জীবের ওজনকে জীবভর বা বায়োমাস বলে। যত উপরের স্তরে যাওয়া যায়, প্রতি একক আয়তনে জীবভরের পরিমাণ বাড়ে, কিন্তু প্রতি একক সময়ে উৎপাদন কম হয়। ফলে সংখ্যার ভিত্তিতে বা জীবভরের উপর নির্ভর করে ট্রফিক গঠন নিম্নলিখিত পিরামিডের মতো দেখতে হয়।

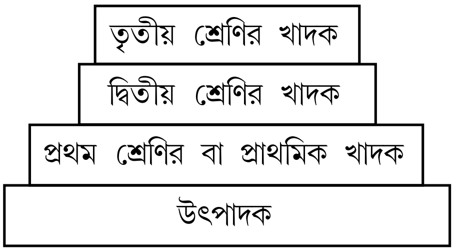

8.3.1 খাদ্যশৃঙ্খলের প্রকারভেদ

বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যশৃঙ্খলকে প্রধানত দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

1. চারণভিত্তিক বা গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খল

2. মৃতজীবী বা ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খল

যে সমস্ত খাদক প্রাণী উৎপাদক উদ্ভিদ ও উদ্ভিদের অংশকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদের চারণপশু বলে। এক্ষেত্রে খাদ্যশক্তি উদ্ভিদ থেকে তৃণভোজী প্রাণীতে, পরে মাংসাশী প্রাণীতে স্থানান্তরিত হয়। অর্থাৎ এই শ্রেণির খাদ্যশৃঙ্খল জীবন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

এই খাদ্যশৃঙ্খল দুই ধরনের হয়। যথা—

(a) শিকারি বা খাদক খাদ্যশৃঙ্খল : এতে শাকাশী প্রাণীদের খাদক স্তর থেকে খাদ্য খাদক সম্পর্ক বৃহত্তর মাংসাশী প্রাণীর স্তরে শেষ হয়। যথা :

ফড়িং $\rightarrow$ ব্যাং $\rightarrow$ সাপ $\rightarrow$ বাজপাখি

(b) পরজীবী খাদ্যশৃঙ্খল : যখন খাদ্যশৃঙ্খলে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বড়ো আকারের প্রাণী থেকে শুরু করে পরজীবী ক্ষুদ্র প্রাণীতে শেষ হয়, তাকে পরজীবী খাদ্যশৃঙ্খল বলে। যথা—কুকুর $\rightarrow$ কৃমি $\rightarrow$ বিয়োজক

বিশেষ কয়েকটি বাস্তুতন্ত্রের চারণভিত্তিক খাদ্য শৃঙ্খলের উদাহরণ নীচে দেওয়া হল ঃ—

যেমন—

(i) তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র—তৃণ $\rightarrow$ গঙ্গাফড়িং $\rightarrow$ ব্যাং $\rightarrow$ সাপ $\rightarrow$ বাজপাখি

(ii) বনভূমির বাস্তুতন্ত্র—সবুজ উদ্ভিদ → হরিণ → বাঘ

(iii) পুকুরের বাস্তুতন্ত্র—জলজ কীটপতঙ্গ → ছোটো মাছ → বড়ো মাছ

(iv) সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র—সামুদ্রিক অ্যালগি → ছোটো মাছ → বড়োমাছ → হাঙর

(v) কৃষি বাস্তুতন্ত্র—শস্য → পতঙ্গ → পতঙ্গভুক পাখি → শিকারি পাখি।

2. মৃতজীবী বা ডেট্রিটাশ খাদ্যশৃঙ্খল—

বাস্তুতন্ত্রে পদার্থ চক্রাকারে আবর্তিত হয়। মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহাবশেষ বা তার অংশ, প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ প্রভৃতি জৈবাবশেষ বা কর্কর বিয়োজক ও কর্কর ভক্ষক প্রাণীর মাধ্যমে বিয়োজিত হয়। এই বিয়োজনের মাধ্যমে জৈবাবশেষের বা কর্করের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত শক্তি বা পুষ্টি পরিবেশে ফিরে আসে এবং আবার সেগুলি গাছের দ্বারা গৃহীত হয়। জৈবাবশেষ বা কর্কর বিয়োজনে প্রধানত দুই ধরনের অনুজীব অংশ নেয়। যথা—

(i) **বিয়োজক** (decomposers)—সদ্য বর্জ্য বা পরিত্যক্ত জৈব দেহাবশেষের উপর প্রাথমিকভাবে ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, শ্যাওলা প্রভৃতি মৃতজীবী জীব জন্মায়। এইসব মৃতজীবী প্রাণীর দেহ নিঃসৃত উৎসেচকের প্রভাবে জৈব অবশেষের জটিল জৈব যৌগগুলির সরলীকৃত হয় এবং সেইসাথে শক্তি নির্গত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ বা বিয়োজন বা পচন বলে। বিয়োজনের ফলে উৎপন্ন শক্তি ও রাসায়নিক শক্তি পদার্থের কিছু অংশ সেই সমস্ত বিয়োজকের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে কাজে লাগে এবং অবশিষ্ট অংশ পরিবেশে ফিরে যায়। জীবের দেহাবশেষ এবং জীবের বর্জ্য পদার্থ থেকে শক্তি ও পুষ্টি পদার্থ মৃতজীবী বিয়োজকের মধ্যে প্রবাহিত হবার মাধ্যমে যে খাদ্যশৃঙ্খল রচিত হয় তাকে ‘বিয়োজক খাদ্যশৃঙ্খল’ বলে।

(ii) **কর্কর ভক্ষক** (Detrivores)—বিয়োজক অনুজীবগুলি জীবের দেহবশেষ বা বর্জ্য পদার্থগুলিকে বিশ্লেষণ ও পচনের মাধ্যমে এক ধরনের স্বল্প বিয়োজিত জৈব পদার্থে পরিণত করে। একে কর্কর বা জৈব অবশেষ বলে। যেসব অনুজীব এই কর্করগুলিকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাদের কর্কর ভক্ষক বলে। কর্কর ভক্ষক অণুজীবগুলি আবার উচ্চতর স্তরের খাদকদের দ্বারা ভক্ষিত হয়। এভাবে নিম্নলিখিত খাদ্যশৃঙ্খল গঠিত হয়। যথা,

জৈবাবশেষ বা কর্কর → কর্করভক্ষক → মাংসাশী প্রাণী।

একে কর্কর ভিত্তিক খাদ্যশৃঙ্খল বলে। বিয়োজক বা কর্কর খাদ্যশৃঙ্খলে প্রাথমিক খাদক হল বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ ও বিয়োজকসমূহ। তবে কীটপতঙ্গগুলি প্রাথমিক উৎপাদনের 10 শতাংশের কম গ্রহণ করে, বাকি 90 শতাংশ প্রাথমিক উৎপাদনই বিয়োজক দ্বারা বিশ্লেষিত হয়। সব বাস্তুতন্ত্রেই এই

খাদ্যশৃঙ্খল উপস্থিত থাকে। তবে কোনো কোনো বাস্তুতন্ত্রে এই খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে প্রবাহিত শক্তি ও পদার্থের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি। যথা—

উদ্ভিদের দেহাবশেষ → কেঁচো → শালিকপাখি → বাজপাখি।

মৃতপ্রাণী → মাছি → ব্যাং → সাপ

8.3.2 খাদ্যশৃঙ্খলের গুরুত্ব

সমস্ত জীবমণ্ডলে জীবদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে খাদ্যশৃঙ্খলের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে স্বভোজী গাছ থেকে খাদ্য বা শক্তি অন্য জীবদেহে স্থানান্তরিত হয়। অর্থাৎ খাদ্যখাদক সম্পর্কের ভিত্তিতে গাছপালা ছাড়া অন্যান্য প্রাণীগুলি এই খাদ্যশৃঙ্খল থেকেই জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও শক্তি সংগ্রহ করে। তাই খাদ্যশৃঙ্খল নষ্ট হলে বাস্তুতন্ত্রটির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। খাদ্যশৃঙ্ঘল উৎপাদক থেকে ক্রমে পরবর্তী পর্যায়ে খাদকের সংখ্যা কমে যায়, কিন্তু প্রয়োজনীয় খাদ্যের আয়তন বেড়ে যায়। তাই খাদ্যশৃঙ্খল যত সংক্ষিপ্ত হয়, বাস্তুতন্ত্র ও সুগঠিত হয়। খাদ্যশৃঙ্খলের উপরে সেই অঞ্চলের স্বভোজী ও পরভোজীদের সংখ্যা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অনেকখানি নির্ভর করে।

8.3.3 খাদ্যশৃঙ্খলের বৈশিষ্ট্য

খাদ্যশৃঙ্খলের অন্যতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল—(i) সবুজ গাছ সমস্ত শৃঙ্খলের প্রাথমিক ভিত্তি (ii) এর উপরের দিক থেকে নীচের দিকে প্রাণীদের সংখ্যা বাড়ে (iii) এর তলদেশে থেকে উপরের দিকে খাদক বা প্রাণীদের আকৃতি বাড়ে (iv) সাধারণত খাদ্যশৃঙ্খলে খাদ্যস্তরের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচ এর মধ্যে থাকে। তবে দুই একটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়। (v) উৎপাদক বা স্বাভোজী সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ করে। এই শক্তি খাদ্যের মধ্যে স্থৈতিক শক্তি হিসেবে অবস্থান করে। (vi) খাদ্যশৃঙ্খলের প্রকৃতি খুবই জটিল থাকে। (vii) জীবের সংখ্যা অনুসারে পরপর সাজালে খাদ্যশৃঙ্খল পিরামিড এর রূপ নেয়, যা ‘ইকোলজিকাল পিরামিড’ নামে পরিচিত।

8.3.4 খাদ্যজাল (Food Web)

কোনো একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে অনেকগুলি খাদ্যশৃঙ্খল থাকে। বিশেষ একটি খাদ্যশৃঙ্খলের জৈব উপাদানগুলিকে আর একটি খাদ্যশৃঙ্খলে অবস্থিত খাদক তার খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। এভাবে কয়েকটি খাদ্যশৃঙ্খল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে নিম্নলিখিতভাবে যে জালের মতো আকৃতির সৃষ্টি করে,

তাকে খাদ্যজাল বলে। সুতরাং একটি খাদ্যশৃঙ্খলকে খাদ্য জালকের অংশ হিসাবে গণ্য করা যায় এবং বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলের ক্ষেত্রে একই প্রাণীর খাদ্যস্তর ভিন্ন ধরনের হয়। যেমন একটি উদাহরণে নেকড়ে বাঘ, হরিণ, শেয়াল, কাঠবিড়ালি প্রভৃতি সব প্রাণীকেই খায়। সুতরাং ফল → হরিণ / কাঠবেড়ালি → নেকড়ে এই খাদ্যশৃঙ্খলে নেকড়ে দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক হলে উদ্ভিদ → খরগোস → শেয়াল → নেকড়ে খাদৃশৃঙ্খলে এরা তৃতীয় শ্রেণির খাদক। একইভাবে ফল → ভল্লুক খাদ্যশৃঙ্খলে ভল্লুক হল প্রথম শ্রেণির খাদক। আবার ফল → ইঁদুর → বুনো বেড়াল → পাখি → ভল্লুক খাদ্যশৃঙ্খলে ভল্লুক হল চতুর্থ শ্রেণির খাদক।

জলভাগের তুলনায় স্থলভাগের বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য জালকগুলি অপেক্ষাকৃত সরল প্রকৃতির। আবার ক্রান্তীয় অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রে নাতিশীতোষ্ণ বা মেরু অঞ্চলের তুলনায় খাদ্যজাল জটিলতর হয়। একটি খাদ্যজাল সংক্ষেপে নীচে দেখানো হল—

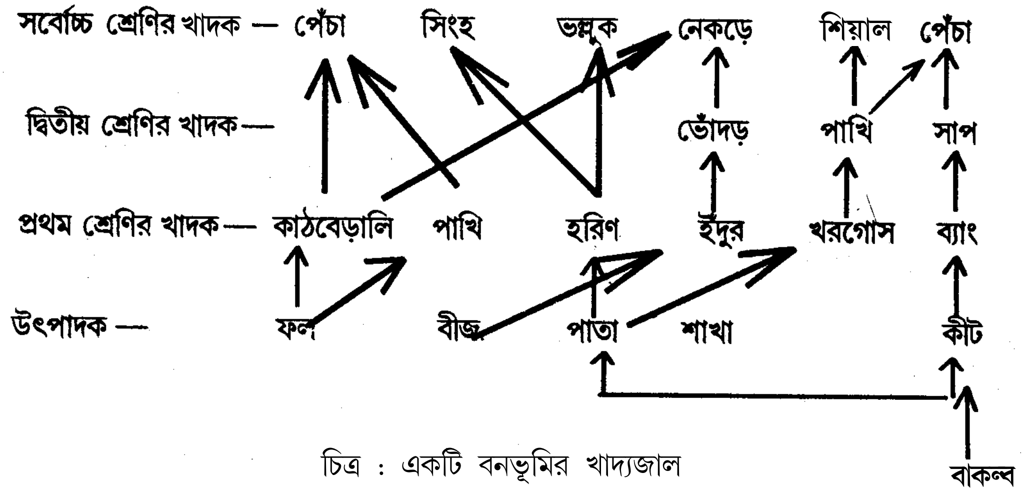

চিত্র : একটি বনভূমির খাদ্যজাল

8.4 শক্তি (Energy) ও শক্তিপ্রবাহ (Energy Flow)

পরিবেশে নানা ধরনের শক্তি আছে। এদের মধ্যে প্রধান দুই ধরনের শক্তি হল (a) স্থিতিশক্তি ও (b) গতিশক্তি।

(a) স্থিতিশক্তি : স্বাভাবিক অবস্থা থেকে কোনো বস্তুকে অন্য কোনো অবস্থায় রূপান্তরিত করলে তার মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত হয়, তাকে বলে স্থিতিশক্তি। যেমন, কাঠ থেকে কয়লায় পরিণত হলেও কয়লাতে শক্তি পরিবাহিত হয় না।

(b) গতিশক্তি : কোনো গতিশীল বস্তু তার গতি বা প্রবাহের জন্য যে শক্তি পায়, তাকে গতিশক্তি বলে।

যেমন, আলোকশক্তি, তাপ, শব্দ ইত্যাদি।

বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রধান উৎসগুলি কী কী?—

কোনো একটি বাস্তুতন্ত্রে শক্তির মূল উৎস হল সূর্য। গাছপালা, জীবজন্তু ও মানুষের প্রয়োজন মতো শক্তির যোগান দেবার একমাত্র উৎস হল সূর্য। সূর্যালোককে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে সবুজ গাছপালা প্রথমে নিজেদের প্রয়োজন মেটায়। এই রাসায়নিক শক্তি অর্জিত শক্তিরূপে প্রাথমিক খাদকের (তৃণভোজী) দেহে চালিত হয়। দেহে তাপশক্তি বা গতিশক্তি তৈরির জন্য তৃণভোজীদের দেহ থেকে মাংসাশীরা এই শক্তি পায় এবং পরে আবার এই শক্তি সর্বভুক প্রাণীদের দেহে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি জীবদেহে যে রাসায়নিক শক্তি পাওয়া যায়, তাকে রূপান্তরিত সৌরশক্তি বলে।

শক্তি প্রবাহ (Energy flow) বলতে কী বোঝো?

শক্তি হল জীবনের অন্যতম উৎস। আর সূর্য হল সব শক্তির মূল উৎস। সবুজ গাছপালা ও কিছু সবুজ ব্যাকটিরিয়া সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। বাস্তুতন্ত্রে সৌরশক্তি বিভিন্ন খাদ্যস্তরের মাধ্যমে এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত ও প্রবাহিত হয়। একে শক্তিপ্রবাহ বলে। সৌরশক্তি গাছপালার মধ্যে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবার পর সেই গাছপালা যখন তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্যে পরিণত হয়, তখন খাদ্যের মাধ্যমে পুষ্টিস্তর অনুসারে শক্তি প্রবাহিত হয় বা ছড়িয়ে পড়ে।

যেমন,

Á

প্রথম ধাপ	উদ্ভিদ	—শক্তিপ্রবাহ→	পোকা
দ্বিতীয় ধাপ	পোকা	—শক্তিপ্রবাহ→	মাছ
তৃতীয় ধাপ	মাছ	—শক্তিপ্রবাহ→	মানুষ

à

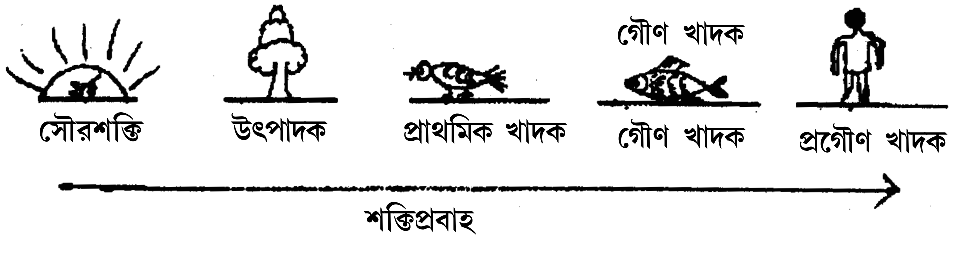

চিত্র : ক ও খ শক্তিপ্রবাহ

8.4.1 বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ

কাজ করার ক্ষমতাই হল শক্তি। যে কোনো জৈবিক প্রক্রিয়ায় শক্তির ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজন। বাস্তুতন্ত্রে শক্তির মূল উৎস হল সূর্য। নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়ে বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহিত হয়। যথা—

1. বাস্তুতন্ত্রে সবুজ গাছ সৌরশক্তিকে সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে নিজেদের দেহে রাসায়নিক শক্তিরূপে সঞ্চয় করে এবং পরে সেই শক্তি যান্ত্রিক ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে অন্যান্য খাদ্যস্তরে নিম্নলিখিত উপায়ে সঞ্চালিত হয়।

2. বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ সবসময় একমুখী। উৎপাদক স্তর থেকে শক্তি সবসময় প্রগৌণ খাদকের স্তরে অগ্রসর হয়, কিন্তু প্রগৌণ স্তর থেকে উৎপাদক স্তরের দিকে প্রবাহ দেখা যায় না।

3. অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের মতো বাস্তুতন্ত্রে শক্তির চক্রাকারে আবর্তন দেখা যায় না।

4. বাস্তুতন্ত্রে প্রাথমিক স্তর থেকে প্রগৌণ স্তরে শক্তির যোগান ক্রমশ কমতে থাকে।

5. জীবনধারণের জন্য প্রতিটি জীবের স্থৈতিক শক্তি (Potential energy) প্রয়োজন, যা জীব খাদ্য থেকে পায়। খাদ্যের রাসায়নিক শক্তি পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে স্থৈতিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং পরে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, যা জৈবনিক কাজ সম্পাদনে ব্যবহৃত হয়।

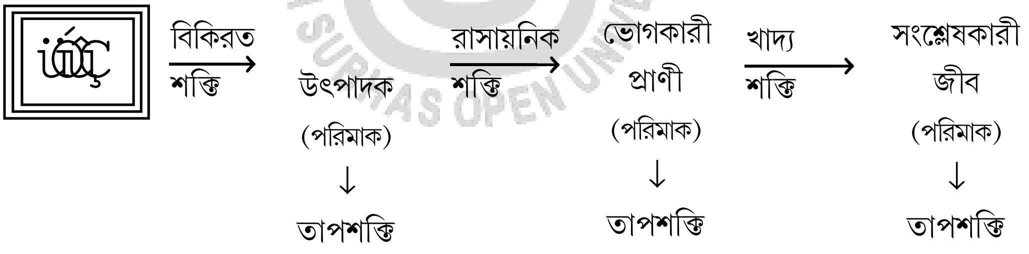

বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ তাপগতিবিদ্যার সূত্র (law of thrmodynamics) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রথম সূত্র : শক্তির রূপান্তর সম্ভব, কিন্তু সৃষ্টি বা ধ্বংস সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় সূত্র—বাস্তুতন্ত্রে শক্তি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরে তাপশক্তি নষ্ট হয়। তাই এই শক্তি একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত প্রবাহিত হবার পর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।

উপরিউক্ত প্রবাহচিত্র থেকে দেখা যায় যে, প্রতিটি রূপান্তরেই কিছু পরিমাণ তাপশক্তি নষ্ট হয়। অর্থাৎ প্রতিটি রূপান্তর তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র মেনে চলে। আবার কোনো একটি বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে আপতিত সৌরশক্তির পরিমাণ ও পরিত্যক্ত তাপশক্তির পরিমাণ সমান হয় অর্থাৎ তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র মেনে চলে।

8.4.2 শক্তির উৎস সূর্য

এক ধরনের আণবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সূর্যের হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়ামে পরিণত হয়। ফলে প্রচুর পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হয়। এই শক্তি তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ হিসেবে সব সময় সূর্য থেকে নির্গত হয়। এই নির্গত তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং কম্পাঙ্কযুক্ত তরঙ্গ উপস্থিত থাকে।

সূর্য থেকে নির্গত শক্তির শতকরা প্রায় 90 ভাগ হল অতিবেগুনি ও অবলোহিত (ultra violet Infrared) তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের। এদের মধ্যে দৃশ্যমান (visible) তরঙ্গের পরিমাণ শতকরা প্রায় 45 ভাগ অবং অবলোহিত তরঙ্গের পরিমাণ শতকরা প্রায় 45 ভাগ। গাছপালা সাধারণত নীল ও লাল (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 400-500 ও 600-700 ন্যানোমিটার) রশ্মি বেশি শোষণ করে। ভূ-পৃষ্ঠে যে পরিমাণ সৌররশ্মি পতিত হয়, তার 35% আবার মহাশূন্যে ফিরে যায়। বাকি 65%-এর মধ্যে ওজোন স্তর, জলীয় বাষ্প ও নানাবিধ গ্যাসের মাধ্যমে শোষিত হয় প্রায় 10%, অবশিষ্ট 55% ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়। পতিত সৌরশক্তির খুব সামান্য অংশের উপর বস্তু পরিবেশ নির্ভর করে আছে।

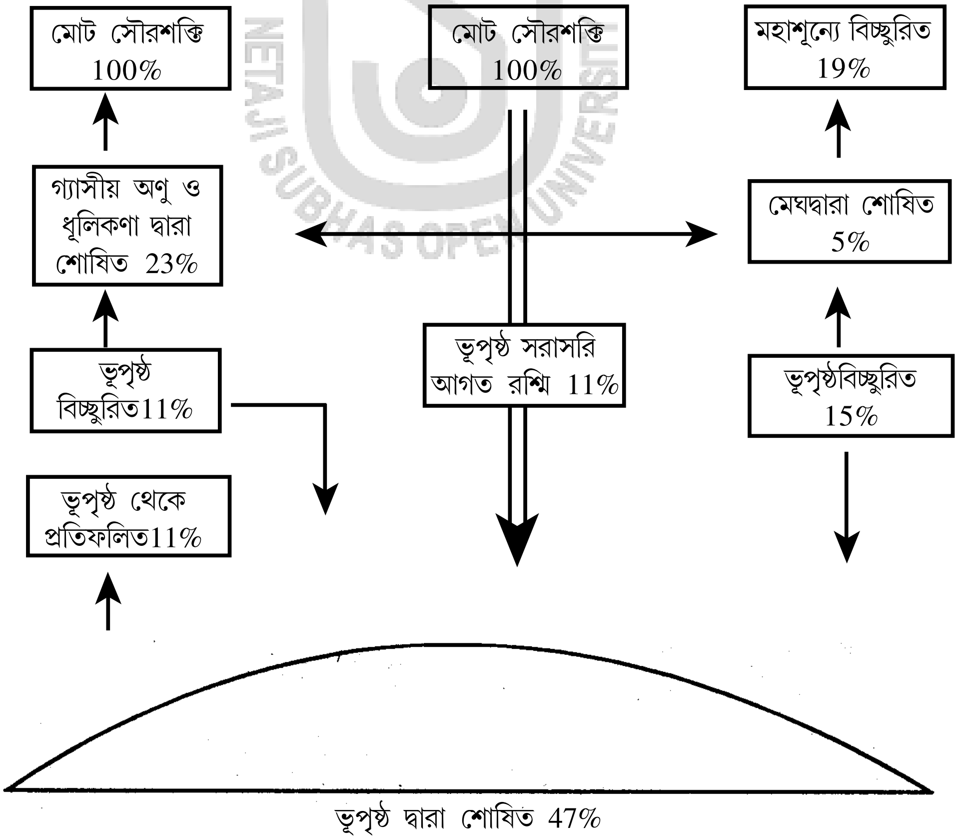

চিত্র : সৌররশ্মির তাপীয় ফল

8.4.3 প্রকৃতিতে শক্তির রূপান্তর

সৌরশক্তি প্রথমে উ ৎপাদকদের মধ্যে গৃহীত হয় এবং উৎপাদক বা স্বভোজীদের সংখ্যা ও অবস্থানের উপর শোষিত সৌরশক্তির পরিমাণ নির্ভর করে। অক্ষাংশভেদে প্রাপ্ত সৌরশক্তির পরিমাণের তারতম্য হয়। যেমন—

অক্ষাংশ		প্রাপ্ত সৌরশক্তি $(K\ cal/m^2)^{-4}$
0–20°	—	173
20–40°	—	163
40–60°	—	114
60–80°	—	73

উৎপাদক বা স্বভোজীদের মাধ্যমে গৃহীত সৌরশক্তির 90%-95% শক্তি বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পরিত্যক্ত হয়। অবশিষ্ট 5-10% শক্তি সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক খাদ্য তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। পরে উৎপাদিত খাদ্যে থাকা রাসায়নিক শক্তি নিম্নলিখিত উপায়ে প্রবাহিত হয়—

1. আলোকভিত্তিক উৎপাদক বা স্বভোজীদের মাধ্যমে গৃহীত সৌরশক্তি	=	NPP (রাসায়নিক শক্তি) + শ্বসনে ব্যবহৃত শক্তি
2. তৃণভোজীদের (Herbivore) মাধ্যমে গৃহীত (NPP)	=	তৃণভোজী গৃহীত রাসায়নিক খাদ্যশক্তি + তৃণভোজী বর্জিত পদার্থে নিহিত রাসায়নিক শক্তি স্বপুষ্টি + বর্জ্য পদার্থ
3. তৃণভোজীদের মাধ্যমে্ আত্তীকৃত রাসায়নিক গৌণ খাদ্যশক্তি	=	তৃণভোজী উৎপাদিত উৎপাদন (বৃদ্ধি ও জননে ব্যবহৃত শক্তি) + তৃণভোজীদের পরিপাকে ব্যবহৃত শক্তি
4. তৃণভোজীদের মাধ্যমে উৎপাদিত গৌণ খাদ্যশক্তি		মাংসাশী দ্বারা আত্তীকৃত

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

যা মাংসাশী প্রাণীরা খায় তৃণভোজী প্রাণীর পরিপাকে = রাসায়নিক খাদ্যশক্তি + ব্যবহৃত শক্তি

5. মাংসাশী প্রাণী দ্বারা আত্তীকৃত রাসায়নিক খাদ্যশক্তি ← = মাংসাশী দ্বারা উৎপাদিত (বৃদ্ধি ও জনন) রাসায়নিক খাদ্যশক্তি + মাংসাশী প্রাণীর পরিপাকে ব্যবহৃত শক্তি।

8.4.4 Lindman এর গতিশীল খাদ্যস্তরের ধারণা

বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যশক্তির প্রবাহ সংক্রান্ত Lindman-এর (1942) গতিশীল খাদ্যস্তরের ধারণাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য (চিত্র)। এই ধারণা অনুসারে কোনো একটি খাদ্যস্তরে (η) নিহিত মোট শক্তি Λn [ল্যাম্বডা, n = যে কোনো সরল সংখ্যা, যেমন 1, 2, 2 প্রভৃতি। অর্থাৎ যদি উৎপাদক $\Lambda 1$ স্তরের (Producer level) মোট শক্তিকে নির্দেশ করে, তাহলে $\Lambda 2$ ও $\Lambda 3$ যথাক্রমে তৃণভোজী ও মাংসাশী খাদ্যস্তরের শক্তিকে নির্দেশ করবে। প্রতিটি খাদ্যস্তরেই ক্রমাগত শক্তির প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ হবে। কোনো একটি খাদ্যস্তরে (η) একক সময়ে প্রবেশ করা শক্তির পরিমাণকে $\eta\eta$ দিয়ে সূচিত করা হয়। জৈবনিক কাজের প্রয়োজনে এই শক্তির কিছু পরিমাণ তাপশক্তি হিসাবে বর্জিত হয় এবং বাকি শক্তি পরবর্তী খাদ্যস্তরে প্রবাহিত হয়। একক সময়ে বর্জিত তাপশক্তি এবং পরবর্তী স্তরে প্রবাহিত শক্তির মোট পরিমাণকে $\eta\eta$ দিয়ে সূচিত করা হয়। সুতরাং কোনো খাদ্যস্তরে (Λn) শক্তির পরিবর্তনের হারকে নিম্নলিখিত সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

$$\frac{\Delta n}{\Delta t} = hn + h'\,n$$

অর্থাৎ কোনো একটি খাদ্যস্তরে নিহিত শক্তির পরিমাণের পরিবর্তন = উক্ত খাদ্যস্তরে প্রবিষ্ট শক্তি + উক্ত খাদ্যস্তর থেকে নিষ্ক্রান্ত শক্তি (যেহেতু সবসময় ঋণাত্মক, সেজন্য + চিহ্ন ব্যবহার করা হয়)।

উপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে প্রতিটি খাদ্যস্তর সমসময় শক্তি গ্রহণ ও বর্জন করে, অর্থাৎ একটি গতিশীল অবস্থায় থাকে।

এই ধারণাটিকে গতিশীল খাদ্যস্তরের ধারণা বলে।

8.4.5 শক্তিপ্রবাহের পর্যায়সমূহ

বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ বা স্থানান্তর তিনটি পর্যায়ে ঘটে। যথা,

1. শক্তি অর্জন বা গ্রহণ-এর পর্যায়

2. শক্তি প্রবাহ বা স্থানান্তর-এর পর্যায়

3. শক্তির ব্যবহার-এর পর্যায়।

1. শক্তি গ্রহণ বা অর্জন এর পর্যায়—আগেই বলা হয়েছে যে বাস্তুতন্ত্রে সমস্ত শক্তির প্রধান উৎস হল সূর্য। সূর্য থেকে প্রতিদিন পৃথিবীতে 12·3 × 10^2 কিলো ক্যালরি শক্তি এসে পৌঁছায়। R, Gieger-এর মতে, মোট সৌরশক্তির মাত্র 2% সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে উৎপাদকের দেহে শর্করা হিসেবে আবদ্ধ হয়। একে উৎপাদকের মোট উপলব্ধ শক্তি (Total assimitaed energy — A) বলে। সালোকসংশ্লেষ ও বিপাকীয় কাজের জন্য কিছু শক্তি শ্বসনে ব্যয়িত (R) হয় এবং অবশিষ্ট প্রাথমিক শক্তি (PN) দেহে বিভিন্ন উপাদানরূপে সঞ্চিত থাকে। একে অবশিষ্ট প্রাথমিক শক্তি (Net Primary Energy) বলে।

অবশিষ্ট প্রাথমিক শক্তি (PN) = মোট উপলব্ধ শক্তি (A) — শ্বসনে ব্যয়িত শক্তি (R)।

সালোকসংশ্লেষের সময় গাছের দেহে যে শক্তি আবদ্ধ হয় বা মোট প্রাথমিক উৎপাদন থেকে গাছের নিজের দরকারে কিছু শক্তি ব্যয় হবার পরেও কিছু শক্তি অবশিষ্ট ও সঞ্চিত থাকে, তাকে নিট প্রাথমিক উৎপাদন বলে। বিজ্ঞানীদের মতে, প্রাথমিক উৎপাদনের প্রায় 50% - 58% হল নিট প্রাথমিক উৎপাদন। সুতরাং নিট প্রাথমিক উৎপাদন সবসময় মোট প্রাথমিক উৎপাদনের চেয়ে কম হয়। খাদ্যশৃঙ্খলে উৎপাদক স্তর থেকে খাদক স্তরে নিট প্রাথমিক উৎপাদনের জন্য উদ্বৃত্ত শক্তির স্থানান্তর হয়।

2. শক্তির প্রবাহ বা স্থানান্তর এর পর্যায় : খাদ্যশৃঙ্খলে অবস্থিত জীবদেহে সঞ্চিত মোট শক্তির মাত্র 10 শতাংশ পরবর্তী খাদকের দেহে পৌঁছায় (বিজ্ঞানী Lindman এর 10% সূত্র)। বাকি শক্তি অপচয় হয় (Nu)। সুতরাং অবশিষ্ট প্রাথমিক শক্তি (100%) বা PN = অপচয় হওয়া শক্তি (90%) বা Nu = আসল অর্জিত শক্তি (10%) বা 1।

3. শক্তির ব্যবহার এর পর্যায়—যে 10% শক্তি কেবলমাত্র পরবর্তী খাদ্যস্তরের খাদক গ্রহণ করে, তার কিছু অংশ আবার খাদকের দেহের কাজে লাগে না (NA)। বাকী উপলব্ধ শক্তির (A) কিছু অংশ আবার শ্বসন শক্তিরূপে (R) ব্যয়িত হয়। কিছু পরিমাণ শক্তি সংশ্লেষধর্মী কাজে (P) ব্যবহৃত হয়। সংশ্লেষধর্মী কাজ (P) তিন রকমের হয়। যথা, বৃদ্ধি জনিত সংশ্লেষ (G) + রেচন কাজ (E) + দেহে বিপাকীয় বস্তু হিসাবে সঞ্চয় (S) আবার আসল অর্জিত শক্তির (1) মিলিত হয়ে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগে।

প্রাথমিক খাদকেরা খাদ্যের মাধ্যমে উৎপাদকের কাছ থেকে যে শক্তি পায়, তাকে আসল অর্জিত শক্তি বলে। খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন ধাপে আসল শক্তির পরিমাণ কমে যায় এবং পরবর্তী স্তরে অর্জিত

শক্তির পরিমাণ কমে যায়। খাদকদের মধ্যে এই অর্জিত শক্তিকে 'আসল অর্জিত শক্তি' বলে। আসল অর্জিত শক্তি থেকে যে পরিমাণ শক্তি প্রাণীদেহে তাপ উৎপাদন এবং অন্যান্য শারীরিক প্রয়োজনে খরচ হয়ে যায়, তাকে 'শ্বসন শক্তি' বলে।

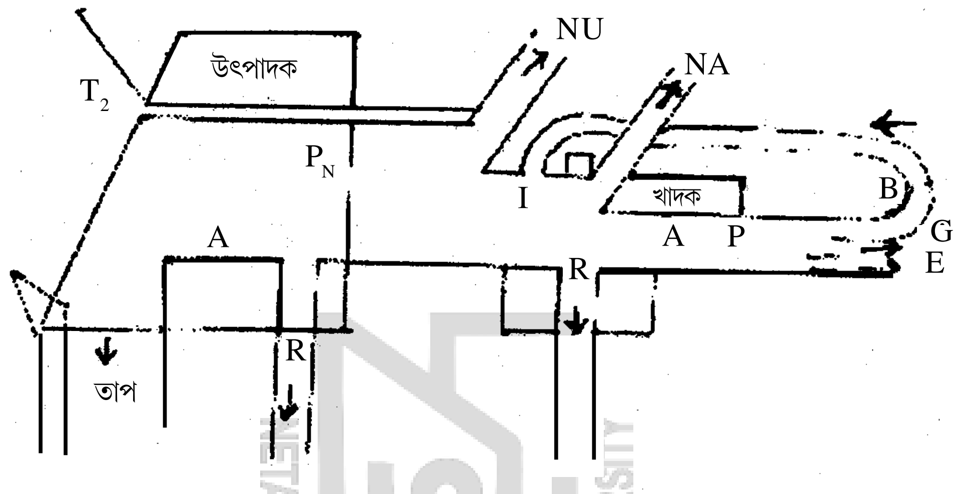

চিত্র

বাস্তুতন্ত্রের শক্তিপ্রবাহের উপরের চিত্রে—

TL = সমগ্র সৌরশক্তি

A = সমগ্র উপলব্ধ শক্তি

PN = অবশিষ্ট প্রাথমিক শক্তি

P = সংশ্লেষের কাজে ব্যবহৃত শক্তি

S = সঞ্চিত বস্তুতে নিহিত শক্তি

I = আসল অর্জিত শক্তি

Nu = অপচিত শক্তি

NA = খাদকের দেহে অপচিত শক্তি

G = বৃদ্ধি জনিত সংশ্লেষ

E = রেচন বস্তুতে নিহিত শক্তি

R = শ্বসন শক্তি

চিত্র : বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ

8.4.6 শক্তি প্রবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন মডেল

বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ কী ধরনের হয়, সে সম্পর্কে বাস্তুতন্ত্রবিদেরা বিভিন্ন মডেল উপস্থাপনা করেছেন। নীচে এই ধরনের তিনটি মডেল সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

(a) এক খাত বিশিষ্ট শক্তি প্রবাহ মডেল (Single Channel Energy Flow model) —

এই ধরনের শক্তিপ্রবাহ মডেলের বৈশিষ্ট্য হল, বিভিন্ন ট্রফিক স্তরের মধ্যে দিয়ে একটি মাত্র খাদ্যশৃঙ্খল বরাবর একমুখী শক্তিপ্রবাহ এবং প্রতি হস্তান্তরে কিছু পরিমাণ শক্তির অপচয়।

মোট আগত সৌরশক্তির (118872 গ্রাম ক্যালরি/ সেমি^{2}/ বছর) 118761 গ্রাম ক্যালরি/ সেমি^{2}/ বছর অব্যবহৃত থাকে। সুতরাং উৎপাদিত শক্তির 21% (23 গ্রাম ক্যালরি/ সেমি 2/ বছর) জীবের পরিপাক ও শ্বসনে ব্যবহৃত হয় যা তাদের বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়। মোট উৎপাদনের 17% (15 গ্রাম ক্যালরি/ সেমি^{2}/ বছর) তৃণভোজী দ্বারা ভক্ষিত হয়। মোট উৎপাদনের 3.4% (3 গ্রাম ক্যালরি/ সেমি^{2}/ বছর) পচন স্তরে যায় এবং 79.5% (70 গ্রাম ক্যালরি/ সেমি^{2}/ বছর) অব্যবহৃত থাকে।

উপরের মডেল থেকে দুটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। যথা—(1) শক্তি প্রবাহ সবসময় একমুখী। তাই শক্তির উৎস অর্থাৎ সৌরশক্তির যোগান বন্ধ করা হলে সমস্ত বাস্তুতন্ত্রটি ধ্বংস হবে। (2) একটি খাদ্যস্তর থেকে অন্য একটি খাদ্যস্তরে শক্তি প্রবাহিত হবার সময় অনেক পরিমাণ শক্তি নষ্ট হয়।

(b) "Y" আকৃতির শক্তিপ্রবাহ মডেল—

এই মডেলটি দ্বি-খাতবিশিষ্ট শক্তিপ্রবাহ মডেল নামেও পরিচিত। এই মডেলে একটি বাস্তুতন্ত্রের তৃণভোজী এবং কর্কর উভয় খাদ্যশৃঙ্খলকেই দেখানো হয়। এক খাতবিশিষ্ট মডেলের তুলনায় এটি বেশি যুক্তিগ্রাহ্য কারণ

(1) এই মডেল বাস্তুতন্ত্রের স্তরবিন্যাস গঠনের সঙ্গতিপূর্ণ ও (2) এই মডেল স্থান ও কাল অনুসারে জীবিত উদ্ভিদের সরাসরি ভক্ষণ ও তাদের মৃত জৈব বস্তুর ব্যবহার একসাথে অথচ পৃথকভাবে দেখায়।

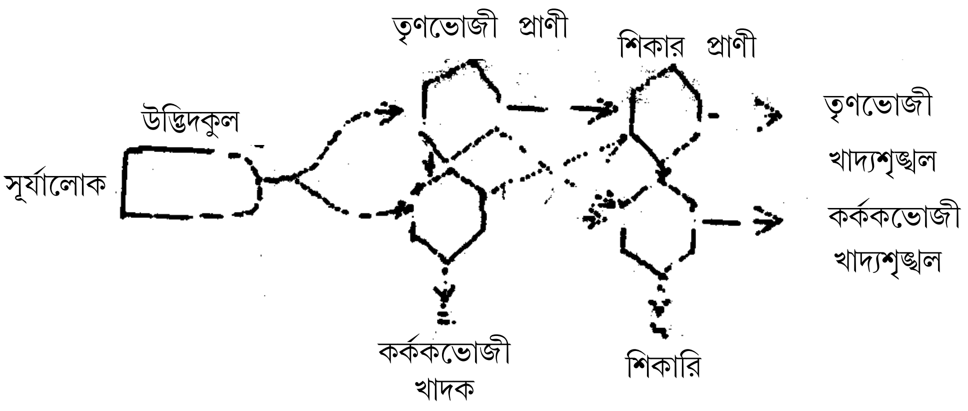

চিত্র ঃ 'Y' আকৃতির শক্তিপ্রবাহ নডেন

প্রকৃত মুখ্য উৎপাদনের কত শতাংশ দুই খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবাহিত হবে তা বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে ভিন্ন হয় এবং ঋতু ও বছরের সাথে পরিবর্তিত হয়। অগভীর জল, বেশি তৃণভোজীবিশিষ্ট চারণভূমি এবং প্লাংক্টন প্রধান জলজ বাস্তুতন্ত্রে 50% - 90% প্রকৃত মুখ্য উৎপাদন তৃণভোজী খাদ্যশৃঙ্খলের পথে বাহিত হয়। কিন্তু জলাভূমি ও অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রে বা 90% তারও বেশি উদ্ভিদ উৎপাদন কর্কর খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। কিন্তু তৃণভূমি এবং কর্কর খাদ্যশৃঙ্খল পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবার সুবাদে সব বাস্তুতন্ত্রেই শক্তিপ্রবাহ এক পথ থেকে অন্যপথে দ্রতু পরিচালিত হতে পারে। যেমন, তৃণভোজীরা তাদের গৃহীত খাদ্যের সবখানি পাচিত করতে পারে না এবং তাদের অপাচিত পদার্থ সহজেই কর্করভুক পথে চালিত হতে পারে।

(c) সার্বজনীন (universal) শক্তিপ্রবাহ মডেল—

এই ধরনের মডেল যে কোনো বাস্তুতন্ত্রের যে কোনো ট্রফিক স্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিজ্ঞানী ওডাম (1968) বাস্তুতন্ত্রকে সরল শক্তিপ্রবাহের চিত্র হিসেবে তুলে ধরেন। কোনো একটি ট্রফিক স্তরের ক্ষেত্রে এই ধরনের চিত্র স্তরটির যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জীবভর বা অন্য কোনো শক্তি সমার্থক নির্দেশকারী একটি বাক্স এবং তার সাথে যুক্ত শক্তিপ্রবাহ নির্দেশকারী। কয়েকটি পথের সমন্বয়ে অঙ্কন করা হয়। একটি ট্রফিক স্তরের মধ্যে শক্তিপ্রবাহ এই চিত্রে দেখানো হয়। এই চিত্রে বাক্সটির আকার ট্রফিক স্তরের সম্পূর্ণ জীবভারের সমানুপাতিক। ট্রফিক স্তরে শক্তির প্রবেশ খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে হয়। শক্তির কিছু অংশ অব্যবহৃত অবস্থায় জীবদেহ থেকে বহিষ্কৃত হয় এবং বাকি অংশ আত্তীকৃত হয়। আবার ওই আত্তীকৃত শক্তির একটা অংশ শ্বসনে ব্যয়িত হয় অথবা Fat বা স্নেহজাতীয় পদার্থরূপে জীবদেহে সঞ্চিত হয়। শক্তির অবশিষ্ট অংশটিই হল জীবভর এবং এই অংশটিই পরবর্তী ট্রফিক স্তরে প্রাপ্ত হয়। এই মডেল যেমন সম্পূর্ণ ট্রফিক স্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি সেই ট্রফিক স্তরের যে কোনো একটি সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

8.5 বাস্তু পরিবেশগত পিরামড বা ইকোলজিকাল পিরামিড

একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যখাদক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে পুষ্টি বা খাদ্যের যোগানকে স্তর অনুসারে ক্রমান্বয়ে পর পর সাজালে যে পিরামিডের মতো আকৃতির চিত্র তৈরি হয় তাকে ইকোলজিকাল পিরামিড বলে। অর্থাৎ কোনো বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যস্তরীয় গঠনকে বাস্তু পরিবেশগত পিরামিড বলে। জি. এলটন (G. Elton, 1939) প্রথম এই পিরামিডের বর্ণনা দেন।

এই পিরামিডের সবচেয়ে নীচের স্তরে আছে উৎপাদক বা সবুজ গাছ। এই স্তরে জীবের সংখ্যা ও পরিমাণ এবং জীবভর বেশি এবং এখানে শক্তি বা খাদ্যের যোগানও বেশি। ক্রমশ উপরের স্তরগুলিতে একদিকে যেমন শক্তি বা খাদ্যের যোগান কমতে থাকে, তেমনি জীব বা খাদকের সংখ্যা ও জীবভর কমে যায়। ফলে ট্রফিক গঠন পিরামিডের রূপ নেয়। এভাবে বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য বজায় থাকে।

8.5.1 বাস্তু পরিবেশগত বা ইকোলজিকাল পিরামিডের শ্রেণিবিভাগ

ইকোলজিকাল বা বাস্তু পরিবেশগত পিরামিড তিন ধরনের হয়। যথা—

(i) জীবসংখ্যার পিরামিড (ii) শক্তির পিরামিড (iii) জীবভর (Biomass) এর পিরামিড

একটি বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যস্তর বা পুষ্টিস্তর অনুসারে বিভিন্ন জীবের সংখ্যাকে ক্রমপর্যায়ে সাজালে যে পিরামিডের মতো আকৃতির সৃষ্টি হয়, তাকে জীব সংখ্যার পিরামিড বলে।

এই পিরামিডে দেখা যায় যে সবচেয়ে নীচের খাদ্যস্তরে জীবের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি থাকে এবং পরের উচ্চতর স্তরগুলিতে এই সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। যেমন, সবুজ গাছপালা বা উৎপাদকের তুলনায় পরের স্তরের পোকামাকড়ের সংখ্যার চেয়ে পরের স্তরের মাছ, ব্যাং প্রভৃতির (গৌণ খাদক) সংখ্যা কম হয়। আবার প্রগৌণ খাদকের সংখ্যা আরও কম হয়। এভাবে সংখ্যার ভিত্তিতে শীর্ষদেশ বা মাথার দিকে পিরামিড বা শঙ্কু আকৃতির সৃষ্টি হয়।

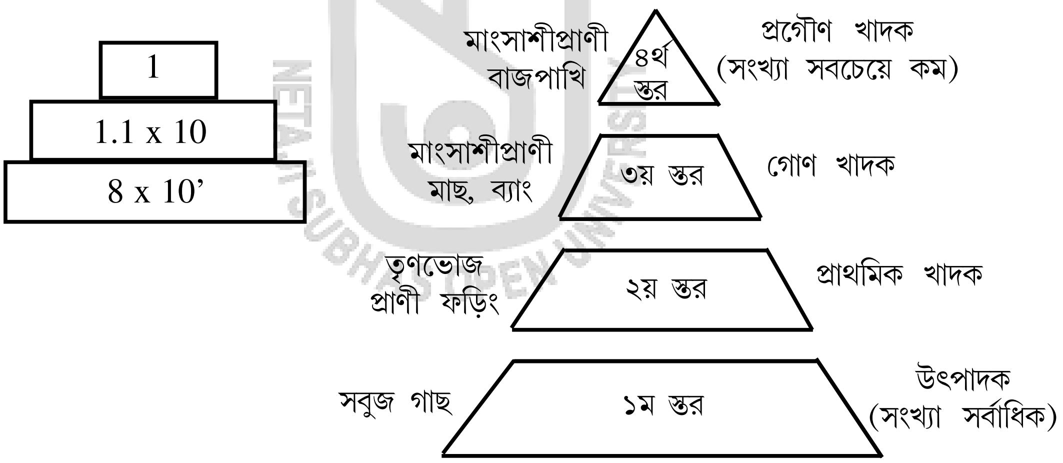

চিত্র : জীব সংখ্যার পিরামিড

(ii) শক্তির পিরামিড : কোনো বাস্তুতন্ত্রে পুষ্টিস্তর বা খাদ্যস্তর অনুসারে বিভিন্ন জীবের মধ্যে অর্জিত শক্তির পরিমাণকে ক্রমপর্যায়ে সাজালে যে পিরামিডের মতো আকৃতির সৃষ্টি হয় তাকে বলে শক্তির পিরামিড।

এই পিরামিডে দেখা যায় যে, সবচেয়ে নীচের খাদ্যস্তরে সূর্য থেকে অর্জিত শক্তির পরিমাণ সর্বাধিক হয়। পরের উচ্চতর স্তরগুলিতে ক্রমশ নীচের স্তর থেকে পাওয়া শক্তির পরিমাণ কমতে থাকে। Lindman

(1947)-এর সূত্র অনুসারে প্রতি খাদ্যস্তরে 10 শতাংশ শক্তি দেহগঠনের কাজে ব্যবহৃত হয়। শক্তির পিরামিডে উৎপাদক স্তরে যে পরিমাণ শক্তি আছে তার সম্পূর্ণ অংশ প্রাথমিক খাদক স্তরে পৌঁছাতে পারে না। আবার একইভাবে প্রাথমিক খাদক স্তরে সঞ্চিত শক্তির সম্পূর্ণ অংশ গৌণ খাদক স্তরে পৌঁছায় না। এভাবেই শক্তির পিরামিড গড়ে ওঠে।

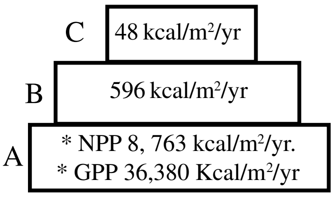

* NNet Primary Productivity বা নিট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা

* Gross Primary Productivity বা সামগ্রিক প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা

A = উৎপাদক স্তর
B = তৃণভোজী স্তর
C = মাংসাশী স্তর

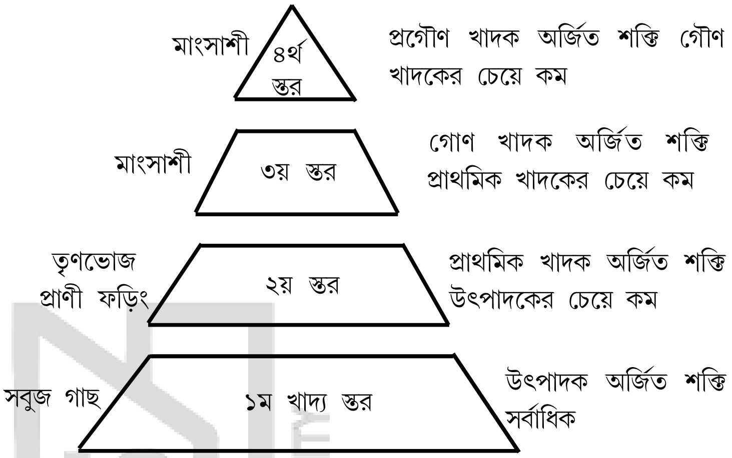

চিত্র : জীব সংখ্যার পিরামিড

(iii) জীব ভর (Diomass) এর পিরামিড—কোনো বাস্তুতন্ত্রে প্রতিটি পুষ্টিস্তর বা খাদ্যস্তর অনুসারে জীব সমষ্টির মোট শুষ্ক ওজন বা জীবভরের পরিমাণ ক্রমপর্যায়ে সাজালে যে পিরামিডের মতো আকৃতির সৃষ্টি হয়, তাকে জীবভর-এর পিরামিড বলে।

এই পিরামিডে দেখা যায় যে, সর্বনিম্ন পুষ্টিস্তর বা খাদ্যস্তরে জীবসমষ্টির মোট ভরের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হয়। ফলে উৎপাদক স্তর থেকে প্রাথমিক খাদক স্তরে, প্রাথমিক খাদক স্তর থেকে গৌণ খাদক স্তরে এবং গৌণ খাদক স্তর থেকে প্রগৌণ খাদক স্তরে জীব সমষ্টির ওজন বা জীবভর এর পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে।

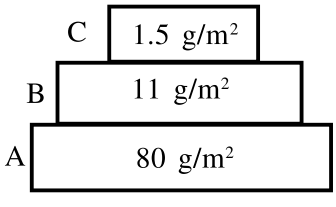

A = উৎপাদক স্তর
B = প্রাথমিক খাদক বা তৃণভোজী স্তর
C = গৌণ খাদক বা মাংসাশী স্তর

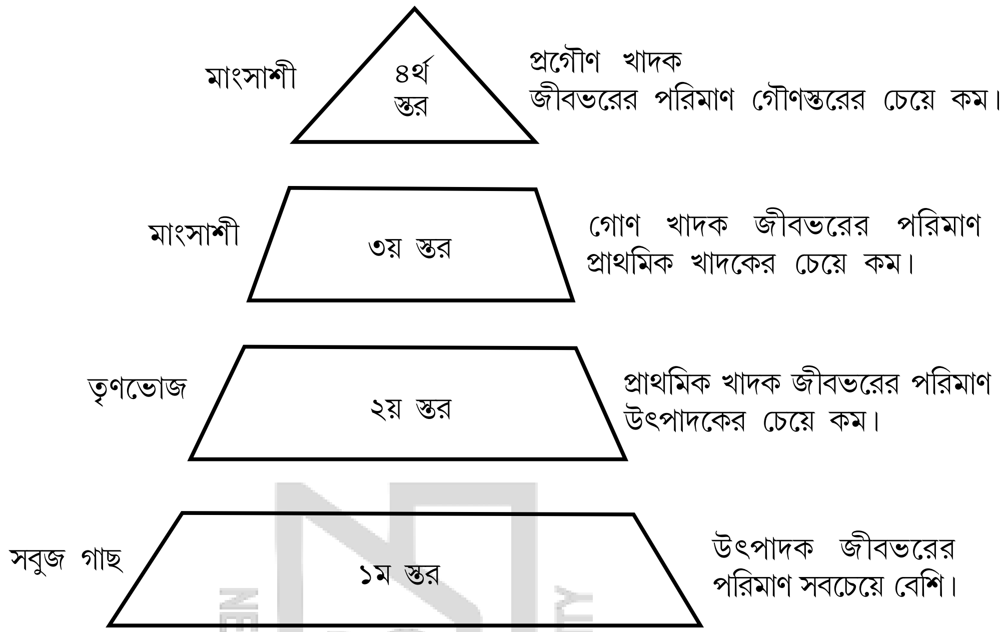

চিত্র : জীবভর (Biomass) এর পিরামিড

8.6 সারাংশ

এই এককে জীবদের খাদ্যস্তর সম্পর্কে জেনেছি। এরপর আমরা জেনেছি উৎপাদক ও খাদকের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক সম্পর্ক, যাকে 'খাদ্যশৃঙ্খল' বলা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খাদ্যশৃঙ্খল দেখা যায়। তাছাড়া খাদ্যশৃঙ্খল যে জীবজগতের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা জানতে পেরেছি, এমনকি খাদ্যশৃঙ্খলের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও আমরা জেনে নিয়েছি। এই খাদ্যশৃঙ্খলগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে যে খাদ্যজাল গঠন করে, তা জীবদের খাদ্যখাদক সম্পর্ককে আরও পরিস্ফুট করে। এরপর আমরা শক্তি, শক্তির উৎস এবং শক্তিপ্রবাহ সম্পর্কে নিজেদের ধারণা তৈরি করেছি। বাস্তুতন্ত্রে শক্তি কীভাবে প্রবাহিত হয় এবং জীবনচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা আমাদের কাছে অনেকখানি স্পষ্ট করেছে এই শক্তি প্রবাহ সম্পর্কিত আলোচনা। আমরা আরও জেনেছি প্রকৃতিতে শক্তির কীরূপ রূপান্তর হয়। শক্তি প্রবাহের পর্যায়গুলিকেও এই এককে সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং শক্তি প্রবাহের কিছু মডেল সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে বাস্তু পরিবেশগত পিরামিড বা ইকোলজিকাল পিরামিডের শ্রেণিগুলি জীবদের সংখ্যা, শক্তি ও ভর সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেকখানি স্বচ্ছ করেছে।

8.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. খাদ্যস্তর কাকে বলে?
2. খাদ্যশৃঙ্খল কীভাবে গঠিত হয় এবং কত প্রকারের হয়?
3. খাদ্যশৃঙ্খল জীবজগতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কেন?
4. সংক্ষেপে খাদ্যশৃঙ্খলের বৈশিষ্ট্য কয়েকটি উল্লেখ করুন।
5. খাদ্যজাল কী?
6. শক্তি কয় প্রকার ও কী কী?
7. বাস্তুতন্ত্রে শক্তির উৎস সম্পর্কে ধারণা দিন।
8. শক্তিপ্রবাহ বলতে কী বোঝায়?
9. তাপগতিবিদ্যার দুটি সূত্র কী কী?
10. Lindman এর ধারণাটির নাম কী?
11. শক্তি অর্জন এর পর্যায় বলতে কী বোঝায়?
12. একখাত বিশিষ্ট শক্তিপ্রবাহ মডেল এর দুটি ধারণা উল্লেখ করুন।
13. ইকোলজিকাল বা বাস্তু পরিবেশগত পিরামিড কাকে বলে?
14. জীবসংখ্যার পিরামিড বলতে কী বোঝায়?
15. জীবভর পিরামিডে ভরের পরিমাণ সর্বোচ্চ স্তরে কীরূপ হয়?

8.8 উত্তরমালা

1 নং প্রশ্নের উত্তর 8.2 এককে। 2 নং প্রশ্নের উত্তর 8.3.1 এককে, ও 3 নং প্রশ্নের উত্তর 8.3.2 এককে, 4 নং প্রশ্নের উত্তর 8.3.3 একক এবং 5 নং প্রশ্নের উত্তর 8.3.4 এককের পাঠ্যাংশে দেখুন।

6 নং প্রশ্নের 7, 8 ও 9 নং প্রশ্নের উত্তর 8.4 এককে, 10 নং প্রশ্নের উত্তর 8.4.4 এককে, 11 নং প্রশ্নের উত্তর 8.4.5 এককে, 12 নং প্রশ্নের উত্তর 8.4.6 এককে এবং 13, 14, 15 নং প্রশ্নগুলির উত্তর 8.5 একক থেকে খুঁজে নিন।

8.9 গ্রন্থপঞ্জি

ওডাম, ই.পি. 1996 : ফানডামেন্টাল অফ ইকোলজি, নটরাজ পাবলিকেশনস, দেরাদুন

শর্মা, পি ডি 1984 : এলিমেন্টস অফ ইকোলজি, রাস্তোগি পাবলিকেশন, মিরাট।

সিং, সবীন্দ্র 1991 : এনভায়রনমেন্টাল, জিওগ্রাফি, প্রায়াগ পুস্তক ভবন, এলাহাবাদ।

পাল, অজয় 2000 : পরিবেশবিদ্যা, বুকস্ অ্যান্ড অ্যালায়েড, প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

লাহিড়ী দত্ত, কুন্তলা
ও
দে ও বাসুদেব 2000 : পরিবেশ সমীক্ষণ, দি ওয়ালর্ড প্রেস প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক 9 ❑ উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানসমূহ

গঠন

9.1. প্রস্তাবনা

9.2. উদ্দেশ্য

9.3. উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানসমূহ

9.4. জলবায়ু সংক্রান্ত উপাদানসমূহ

- **9.4.1.** বৃষ্টিপাত ও তুষার পাত
- **9.4.2.** বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতা
- **9.4.3.** বায়ুর উষ্মতা
- **9.4.4.** সূর্যালোক
- **9.4.5.** বায়ুপ্রবাহ
- **9.4.6.** আগুন

9.5. ভূ প্রাকৃতিক উপাদান

9.6. মৃত্তিকাসংক্রান্ত উপাদান

9.7. জীবজ উপাদানসমূহ

9.8. সারাংশ

9.9. সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

9.10. উত্তরমালা

9.11. গ্রন্থপঞ্জি

9.1 প্রস্তাবনা

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের দিক থেকে এবং সামগ্রিকভাবে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বা সমতা বজায় রাখার জন্যে উদ্ভিদ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানুষসহ বিভিন্ন জীবজন্তুর জীবনধারণ ও বৃদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশের উপর। বীজের অঙ্কুরোদগম, চারাগাছের রোপন ও বৃদ্ধি, গাছের খাদ্য তৈরি প্রভৃতি বিষয়গুলি বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান বা নিয়ন্ত্রকের দ্বারা প্রভাবিত

হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশ নিয়ন্ত্রণকারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপাদানগুলি সম্পর্কে এবং তাদের কার্যাবলি সম্পর্কে বর্তমান এককটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

9.2 উদ্দেশ্য

এই অংশটি পড়ার পর আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন—

- জলবায়ুসংক্রান্ত উপাদানগুলি কীভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে,
- ভূপ্রাকৃতিক উপাদানগুলি কীভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশকে প্রভাবিত করে,
- উদ্ভিদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও সংখ্যাকে মৃত্তিকা কীভাবে প্রভাবিত করে,
- বিভিন্ন জৈব উপাদানগুলি কীভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

9.3 উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানসমূহ

উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধি পরিবেশের নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন উপাদানগুলির উপর বা পরিবেশের প্রভাবকের উপর নির্ভর করে। এই উপাদানগুলির কয়েকটি বহির্প্রভাবক বা External Factors এবং কয়েকটি অন্তর্প্রভাবক Internal factors (হরমোন, উৎসেচক, পুষ্টি ইত্যাদি)। বহির্প্রভাবকগুলির মধ্যে বায়ু, জল, মাটি প্রভৃতি অন্যতম। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে পরিবেশের কোনো একটি বিশেষ উপাদানের প্রভাব দেখা যায় না, বরং অনেকগুলি উপাদান একসাথে উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে সূর্যালোক, উষ্ণতা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

যেসব উপাদানগুলি বা পরিবেশগত অবস্থাগুলি উদ্ভিদের আকৃতি ও কার্যাবলিকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে এবং তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলিকে উদ্ভিদের পরিবেশগত উপাদান বলে। কোনো একটি উদ্ভিদের বসবাসের অনুকূল পরিবেশকে তার স্বাভাবিক আবাস (habitat) বলে। যদিও উদ্ভিদের বিকাশ ও বৃদ্ধিকারী এই পরিবেশগত অবস্থাগুলিকে আলাদাভাবে পাঠ করা প্রয়োজন, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তারা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না, এবং এই উপাদানগুলি উদ্ভিদকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে পরস্পর ক্রিয়া করে। এই উপাদানগুলির মধ্যে কিছু জীবজ (biotic) ও কিছু অজীবজ (abiotic)। সমস্ত জীবজ ও অজীবজ উপাদানগুলি কোনো একটি উদ্ভিদের পরিবেশ গঠন করে এবং তার বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অনেকসময় উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রভাবকারী উপাদানগুলিকে (i) প্রত্যক্ষ উপাদান ও (ii) পরোক্ষ উপাদান—এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। আলো, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, মাটির বায়ু, মাটির জল, মাটির মধ্যে থাকা গাছের পুষ্টি মৌল প্রভৃতি হল প্রত্যক্ষ উপাদান। আবার মাটির গঠন, মাটির জীবাণু, উচ্চতা, বায়ু, ভূমির ঢাল প্রভৃতি হল অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপাদান।

Oosting (1948) এর মতে, কোনো একটি পরিবেশ হল বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টি, যার মধ্যেরয়েছে (a) বস্তু বা পদার্থসমূহ (মাটি, জল ইত্যাদি) (b) অবস্থাসমূহ (উষ্মতা, সূর্যালোক, প্রভৃতি), শক্তিসমূহ (বায়ু, মহাকর্ষ ইত্যাদি) (d) জীবসমূহ (উদ্ভিদ, জীবজন্তু প্রভৃতি), (e) সময় প্রভৃতি।

মিশ্র ও পুরী (1959) উদ্ভিদের পরিবেশকে (i) উদ্ভিদমূল বা শিকড়ের পরিবেশ (ভূতত্ত্ব ও মাটি), (ii) উদ্ভিদের শাখা ও কাণ্ডের পরিবেশ [জলবায়ুগত (যেমন উষ্মতা, সূর্যালোক, জল, বায়ু প্রভৃতি) ও জীবজ পরিবেশ]—এই দুই ধরনের পরিবেশের ভিত্তিতে আলোচনা করেছেন।

অধিকাংশ পরিবেশবিদ্ চার শ্রেণির পরিবেশগত উপাদানের কথা বলেছেন। যথা—

(a) জলবায়ুসংক্রান্ত উপাদানসমূহ—এই উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে (i) সূর্যালোক (ii) বায়ুর উষ্মতা (iii) বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত (iv) বায়ুর আর্দ্রতা (v) বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাস ও বায়ুপ্রবাহ।

(b) ভূপ্রকৃতির উপাদানসমূহ—এই অংশটির মধ্যে রয়েছে (i) উচ্চতা (ii) পর্বত ও উপত্যকার অবস্থান (iii) ভূমিঢালের মাত্রা।

(c) মৃত্তিকাসংক্রান্ত উপাদানসমূহ—মাটির উৎপত্তি, মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি এর অন্তর্গত।

(d) জীবজ উপাদানসমূহ—বিভিন্ন উদ্ভিদ, জীবজন্তু, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণু প্রভৃতি প্রাণীগুলির কার্যাবলি ও পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এর অন্তর্গত।

9.4 জলবায়ু সংক্রান্ত উপাদানসমূহ

সাধারণত সুবিস্তৃত একটি অঞ্চলের জলবায়ু একই ধরনের হলেও অনেক সময় এমনকি খুব ছোটো একটি অঞ্চলেও ভূপ্রাকৃতিক বা অন্য কোনো কারণে জলবায়ুগত পার্থক্য দেখা দিতে পারে। এই স্থানীয় পার্থক্য বা Microclimate খুব ছোটো অঞ্চল জুড়ে দেখা যায় এবং অনুভূমিক ও উল্লম্ব দুভাবেই এই পার্থক্য ঘটতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ পার্বত্য উচ্চতায়, খাড়া ঢালে, ঘন ঝোপে ও উন্মোচিত অংশে স্থানীয় জলবায়ুতে পার্থক্য দেখা যায়।

নিম্নলিখিত বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানগুলি গাছের জন্ম ও বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যথা—

9.4.1 বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত

বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত, যে ভাবেই অধঃক্ষেপণ ঘটুক না কেন, তা গাছের জন্ম (বীজের অঙ্কুরোদগম), পুষ্পায়ন (flowering) ও বিকাশে (growth) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত

একটি গাছের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কত পরিমাণ জলের যোগান পাওয়া যায়, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গাছের প্রকৃতি ও উদ্ভিদগোষ্ঠীর বন্টনের ক্ষেত্রে জল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বৃষ্টিপাত বায়ুমণ্ডলের ও মাটির আর্দ্রতা বাড়ায় এবং গাছের জীবনচক্রকে প্রভাবিত করে। কারণ গাছ দুটি উপায়ে জল গ্রহণ করে। যথা—(a) শিকড়ের সাহায্যে ও (b) পাতা দিয়ে সরাসরি শোষণের মাধ্যমে।

উদ্ভিদসহ অন্যান্য জীবের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় উদকচক্রের ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত ও বাষ্পীভবন—বাষ্পমোচন দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অধঃক্ষেপণের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে জল বায়ুমণ্ডল থেকে মাটিতে এসে মেশে। এগুলির মধ্যে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি, স্লিট প্রভৃতি অন্যতম। মোট বার্ষিক অধঃক্ষেপণের প্রায় 45% জল নদীতে মেশে, 20% জল চুঁয়ে ভৌমজলস্তরে যায় এবং বাকি 35% বাষ্পীভূত হয়। বছরের বিভিন্ন ঋতুতে বৃষ্টিপাতের বন্টনের পার্থক্য উদ্ভিদের আঞ্চলিক বন্টনকে প্রভাবিত করে। উঁচু পর্বতে বৃষ্টিপাতের বন্টনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক শ্রেণিবিভাগ করা হয়। যথা—(i) অতি কম বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চল (ii) বেশি বৃষ্টিপাত যুক্ত মধ্যভাগ এবং (iii) শুষ্ক উচ্চভাগ (তুষার বৃত)।

বৃষ্টিপাতের ভিত্তিতে কোনো অঞ্চলের উদ্ভিদের শ্রেণিগত পার্থক্য হয়। যেমন সারাবছর ব্যাপী বেশি বৃষ্টিপাতযুক্ত ক্রান্তীয় অঞ্চলে চিরহরিৎ গাছ দেখা যায়। আবার যেসব অঞ্চলে শীতকালে ভারী বর্ষা ও গ্রীষ্মকালে কম বর্ষা হয়, সেখানে Sclerophyllous প্রজাতির গাছ জন্মে। আবার যেসব অঞ্চলে গ্রীষ্মে বেশি বৃষ্টি হয় এবং শীতকালে কম হয়, সেসব অঞ্চলে তৃণভূমির সৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাত খুব কম হলে অথবা না হলে সেখানে জেরোফাইট জাতীয় গাছের সন্ধান মেলে।

কোনো জায়গায় উদ্ভিদের বন্টনের ক্ষেত্রে ‘Number of rainy days’ বা ‘বছরপ্রতি বৃষ্টিসম্পন্ন দিন’ বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বছরে কম দিন জুড়ে আকস্মিক ও অত্যধিক বৃষ্টিপাত গাছের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে লাগে না এবং অত্যধিক পৃষ্ঠ জলধারার (Surface remoff) সৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাত মাঝারি রকমের হলে এবং বছরের বেশি সংখ্যক দিন জুড়ে হলে, তাও গাছের কোনো প্রয়োজনে লাগে না কারণ মাটিতে জল প্রবেশের আগেই তা বাষ্পীভূত হয়। খুব কম বৃষ্টিপাত গাছের বিকাশ ভালোভাবে হতে দেয় না এবং ফলে গাছগুলি বেঁটে ও ঝোপবিশিষ্ট হয়।

জল হল এমন মাধ্যম, যা দিয়ে বিভিন্ন খাদ্যমৌলগুলি দ্রবীভূত অবস্থায় গাছের দেহে প্রবেশ করে এবং কোষগুলির মধ্য দিয়ে চলাফেরা করে। জল আবার গাছের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম কাঁচামাল। গাছের দেহের রসস্ফীতির বিষয়ে জলের ভূমিকা আছে, যা ছাড়া উদ্ভিদকোষগুলি ভালোভাবে কাজ করতে পারে না। তাছাড়া, প্রোটোপ্লাজমের উপস্থিতির জন্যেও জলের একান্ত প্রয়োজন। জলের পরিমাণ 10 শতাংশ কমে গেলে খুব কম দেহকোষ-ই বেঁচে থাকতে পারে। সাধারণত গাছের বৃদ্ধি তখনই হতে পারে, যখন বাষ্পমোচনের চেয়ে রস গ্রহণের পরিমাণ বেশি হয়। কেবলমাত্র জলের পরিমাণের উপর নয়, গাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে বার্ষিক জলের বণ্টনের প্রকৃতি, বাষ্পীভবনের মাত্রা, গাছের জীবনের বিভিন্ন সময়ে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ প্রভৃতির উপর। খুব কম বৃষ্টিপাতের সাথে যদি অত্যধিক

তাপমাত্রা থাকে, তাহলে খরার সৃষ্টি হয় এবং তা গাছকে দুর্বল এমনকি মেরেও ফেলে। পাহাড়ের ঢাল দিয়ে বৃষ্টির জল বয়ে যায় এবং ঢালু জমিতে জল সংরক্ষণের জন্য চাষিরা ধাপ-চাষ করে।

অত্যধিক বৃষ্টিপাত গাছের পুষ্পায়নকে বাধা দেয় এবং ফুলফলের বৃদ্ধিকে বাধা দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে গাছকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ও ধ্বংস করে। অত্যধিক আর্দ্রতা Hail বা শিলাবৃষ্টি গাছের ব্যাপক ক্ষতি করে। তাছাড়া তুষারপাতও গাছের ডালপালা ও ফলফুলের সমূহ ক্ষতি করে। অতিমাত্রায় বৃষ্টিপাত অঙ্কুরোদগমের জন্য উপযুক্ত বীজগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং মাটির উপরের স্তরকে ক্ষয় করার মাধ্যমে ছোট ছোটো চারাগাছগুলির বৃদ্ধিতে প্রতিকূল ভূমিকা নেয়। Shimper এর third law এর নিয়ম অনুসারে ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ম অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও ঋতুভিত্তিক বণ্টন এবং বায়ুর আর্দ্রতার উপর উদ্ভিদের শ্রেণিগুলি নির্ভরশীল।

উদ্ভিদদেহে জলের ভূমিকা :

উদ্ভিদদেহের ক্ষেত্রে জলের ভূমিকা অপরিসীম এবং গুরুত্ব এই উপাদানটি সূর্যালোক ও তাপত্রাকেও ছাড়িয়ে যায়। গাছের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে জলের ভূমিকাগুলি নীচে উল্লেখ করা হল। যথা—

(i) শোষণকারী হিসেবে সব প্রোটোপ্লাজমে এবং সব কোষ-দেওয়ালে জল অবস্থান করে।

(ii) কোষের রস হিসাবে জল দেহাবয়বের ক্ষুদ্র গর্তে (Vaccuoles) অবস্থান করে এবং রসস্ফীতি (turgidity) ও স্বাভাবিক বিকাশে ভূমিকা নেয়।

(iii) পুষ্টি উপাদান হিসাবে জল প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগে।

(iv) মাটি থেকে সমস্ত পুষ্টিমৌলের শোষণ, সমস্ত অভিস্রবণের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন বস্তুর স্থানান্তরের ক্ষেত্রে জলের বিশেষ ভূমিকা আছে।

(v) উদ্ভিদদেহে বায়ুমণ্ডলের CO_2 গ্রহণে (assimilation) জলের ভূমিকা আছে।

(vi) কোনো উদ্ভিদে জলের পরিমাণ নির্দিষ্ট সীমার নীচে নামলে শ্বাসকার্য বন্ধ হয়ে যায়।

(vii) পত্ররন্ধ্রের স্টোমাটার উন্মোচিত হওয়া ও বন্ধ হওয়া এবং এর ফলে যে প্রস্বেদন হয়, তা আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে।

(viii) যে কোনো রকমের গতি, তা স্ফীতির ফলেই হোক বা উত্তেজনার ফলেই হোক, জলের মাধ্যমেই সমাধা হয়।

(ix) উদ্ভিদের জলের পরিমাণ জন্ম ও মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করে, যখন তাপমাত্রা চরমতার (extremity) বাইরে থাকে।

উপরিউক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, অন্য কোনো উপাদান গাছের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠনকে এত বেশি মাত্রায় প্রভাবিত করে না, যতখানি বায়ুস্থিত ও মৃত্তিকাস্থিত জল করে।

9.4.2 বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতা

এটি হল প্রকৃতিতে জলের অন্য একটি রূপ। অদৃশ্য জলীয় বাষ্পরূপে বায়ুমণ্ডলীয় জলকে আর্দ্রতা বলে। সাধারণত আর্দ্রতাকে 'আপেক্ষিক আর্দ্রতা' রূপে প্রকাশ করা হয়। বায়ুর আর্দ্রতা গাছের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে, কারণ আর্দ্রতা গাছের সাথে জলের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। অন্যান্য সব উপাদানগুলি ঠিক থাকলেও আপেক্ষিক আর্দ্রতার বৃদ্ধি বাষ্পীভবন ও বাষ্পমোচনের মাত্রাকে কমিয়ে দেয়। পরিপৃক্ত বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয় যার কিছু অংশ তুষার ও বৃষ্টিরূপে অধঃপতিত হয়। এই ধরনের বায়ুমণ্ডলে বায়ু আর অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প গ্রহণ করতে পারে না এবং বাষ্পীভবন-বাষ্পমোচনের মাত্রাখুব কম হয়। আবার শুষ্ক জলবায়ুতে এই মাত্রা দ্রুত হয় কারণ বায়ু সম্পূর্ণ পরিপৃক্ত না হবার ফলে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে। এভাবে বাষ্পমোচনের মাত্রাকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতা উদ্ভিদের বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

উদ্ভিদদেহ থেকে বাষ্পমোচন অথবা জলভাগ থেকে বাষ্পীভবন প্রত্যক্ষভাবে বায়ুমণ্ডলের আপেক্ষিক আর্দ্রতার উপর নির্ভরশীল। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে জলীয় বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণ এবং বায়ুমণ্ডলকে পরিপৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্পের পরিমাণের অনুপাত বাষ্পমোচনের মাত্রাকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোনো স্থানের উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাসকে প্রভাবিত করে। অনেক cryptogamic উদ্ভিদ এমন স্বাভাবিক আবাসে (habitat) জন্ম নেয়, যেখানে আপেক্ষিক আর্দ্রতা স্বাভাবিকভাবে খুব বেশি। এদের হাইগ্রোফাইট বলে। কিছু ফ্যাঞ্জি ও লাইকেন বেশি আর্দ্রতায় পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে। এই অবস্থায় এপিফাইটও জন্ম নেয়। যেসব স্থানে স্পষ্ট বর্ষাকাল ও শুষ্ক গ্রীষ্মকাল থাকে, সেসব স্থানে আপেক্ষিক আর্দ্রতার হ্রাসবৃদ্ধির ফলে উদ্ভিদগুলির বিকাশের মাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। পরিপৃক্তকরণের ঘাটতি (saturation deficiency), তাপমাত্রার হার এবং বায়ুর গতি ও প্রকৃতি প্রভৃতি উপাদানগুলির বাষ্পীভবন ও বাষ্পমোচনের মাত্রাকে কিছুটা পরিবর্তিত করে। শুষ্ক বায়ু আর্দ্র বায়ুকে তাড়িয়ে বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাণ কমায় এবং শুষ্কবায়ুর সাথে আর্দ্র বায়ুকে মিশ্রিত করে আর্দ্রতাকে হ্রাস করে এবং বাষ্পমোচনের পরিমাণকে বাড়ায়। ফলে আবার বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতা বাড়ে। কিছু গাছ যেমন অর্কিড, লাইকেন, মস প্রভৃতি সরাসরি বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতাকে ব্যবহার করে। ফাঞ্জি ও অন্যান্য জীবাণুর জীবনচক্রের (life cycle) বিভিন্ন পর্যায়গুলির ক্ষেত্রে আর্দ্রতা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

9.4.3 বায়ুর উষ্ণতা

বায়ুর উষ্ণতা ও মাটির উষ্ণতা উদ্ভিদের বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। উদ্ভিদদেহের উপরে তাপমাত্রার প্রধান প্রভাবটি হল বাষ্পমোচন (Transpiration)। উদ্ভিদের উপর উষ্ণতার প্রভাব বলতে কেবলমাত্র স্থলভাগের উদ্ভিদকেই বোঝায় না, জলভাগের উদ্ভিদকেও বোঝায়।

তাপমাত্রা উদ্ভিদকে বিভিন্ন উপায়ে প্রভাবিত করে। যথা—(i) অবস্থান ও অক্ষাংশগত পার্থক্য— আমরা যখন মেরুদেশীয় উদ্ভিদের সাথে ক্রান্তীয় উদ্ভিদের তুলনা করি, তাপমাত্রার প্রভাবে উদ্ভিদের শারীরিক বা অঙ্গাসংস্থানিক পার্থক্য দেখতে পাই। নিরক্ষরেখা থেকে মেরু পর্যন্ত বিভিন্ন অক্ষাংশে যথাক্রমে নিরক্ষীয় চিরহরিৎ ক্রান্তীয় পর্ণমোচী, সরলবর্গীয় এবং আল্পীয় উদ্ভিদ দেখা যায়। (চিত্র 1) প্রধানত উচ্চতার পার্থক্যের ফলেই উদ্ভিদের এই বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য দেখা যায়।

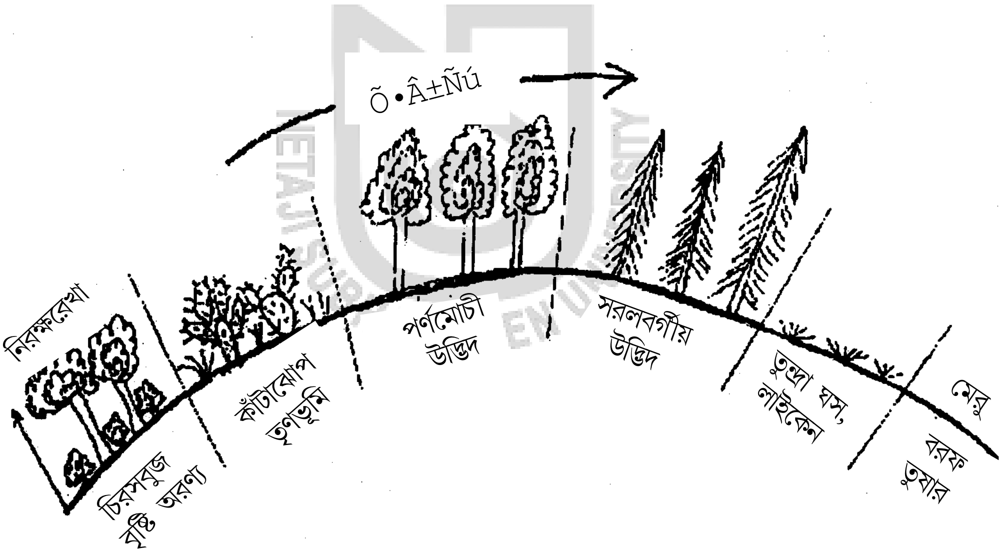

চিত্র : 1 তাপমাত্রা ও উদ্ভিদের অক্ষাংশগত পার্থক্য

উষ্ম ক্রান্তীয় অঞ্চলে সারাবছর ধরে প্রচুর উদ্ভিদ জন্মায়। অন্যদিকে শীতল সুমেরু অঞ্চলে এবং পর্বতের উপরে উদ্ভিদ জন্মানোর সময়কাল (Vegetative season) কম হয় বলে সেখানকার উদ্ভিদের পাতা ছোটো হয় এবং উদ্ভিদের বৈচিত্র্য হয় কম।

(ii) উচ্চতাগত পার্থক্য—পর্বতের ঢালে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উষ্ণতা হ্রাস পায় এবং তাপমাত্রা সহ্যের ক্ষমতার ভিত্তিতে উদ্ভিদ প্রজাতির পার্থক্য হয়। বিভিন্ন স্থানে জন্মানো উদ্ভিদগোষ্ঠী বিভিন্ন তাপমাত্রা দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুমেরু অঞ্চলের কাছে প্রায়—80° ফা: তাপমাত্রায় সরলবর্গীয় উদ্ভিদ জন্মায়, আবার মরু উদ্ভিদগুলি এমনকি 140° ফা: তাপমাত্রায়ও বেঁচে থাকতে পারে। যেসব অঞ্চলে তাপের

প্রসার খুব বেশি সেসব অঞ্চলে শুষ্ক উদ্ভিদ জন্মায়। প্রতিটি উদ্ভিদগোষ্ঠীর সঠিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য মাঝারি ধরনের কার্যকরী বা সবচেয়ে অনুকূল তাপমাত্রা প্রয়োজন আছে। উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে যথাক্রমে বড়ো পাতার চিরহরিৎ অরণ্য, পর্ণমোচী অরণ্য ও তৃণভূমি, সরলবর্গীয় অরণ্য, ঝোপ, মস ও লাইকেন প্রভৃতি দেখা যায়।

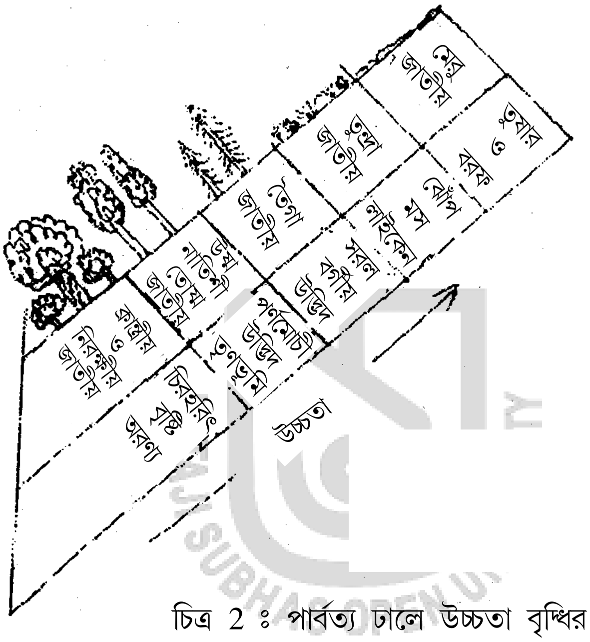

চিত্র 2 ঃ পার্বত্য ঢালে উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উদ্ভিদের পার্থক্য

(iii) তাপমাত্রা অঞ্চল—0° থেকে 50° তাপমাত্রার মধ্যে বিভিন্ন উদ্ভিদের তাপমাত্রা গ্রহণ ক্ষমতার পার্থক্য হয়, কারণ সাধারণত 50° সে. এর বেশি উচ্চতায় উদ্ভিদ বেঁচে থাকতে পারে না, তাই ‘তাপমাত্রার নির্দিষ্ট সীমা’ ও কার্যকরী তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন প্রজাতির গাছে কার্য বা function ভিন্ন ধরনের বলে তাপমাত্রার সীমার প্রভেদ হয়।

পৃথিবীতে প্রকৃতপক্ষে এমন কোনো অঞ্চল নেই যা অতি শীতল বা অতি উষ্ম হলেও সেখানে কিছু উদ্ভিদ জন্মায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন তাপমাত্রা-প্রধান অঞ্চলে তৃণভূমি, বনভূমি, মরুভূমি প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, যদিও বনভূমিগুলির প্রজাতিগত তারতম্যের পিছনে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের উপাদান দেখা যায়।

(iv) উষ্মতার ভিত্তিতে উদ্ভিদের আঞ্চলিক পার্থক্য—স্বাভাবিক উদ্ভিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাপমাত্রার বার্ষিক প্রসার উদ্ভিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো স্থানের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা নিরক্ষরেখা থেকে সেই স্থানের দূরত্বের উপর এবং পার্বত্য ঢালে উচ্চতার উপর অনেকটা নির্ভর করে। নিরক্ষরেখা থেকে মেরুর দিকে গড় তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে, কিন্তু উষ্মতার প্রসার বাড়তে থাকে। আবার উপকূল থেকে মহাদেশীয়

স্থলভাগে মধ্যভাগ পর্যন্ত উষ্মতার প্রসার দ্রুত বাড়ে। অনেক বিজ্ঞানীদের মতে, ভৌগোলিক অক্ষাংশ পৃথিবীতে উদ্ভিদের বণ্টনকে সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁদের মতে, পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদগুলিকে উষ্মতার পার্থক্য অনুসারে চারটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(a) মেগাথার্ম উদ্ভিদ—যেসব উদ্ভিদের কার্যকর বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য মোটামুটি অবিরাম ও বেশি তাপমাত্রা দরকার হয়, তাকে মেগাথার্ম উদ্ভিদ বলে। সাধারণত নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় অঞ্চলে এদের দেখা যায়। এই গাছগুলির ক্ষেত্রে সারা বছর ধরে তাপমাত্রা বেশি থাকে এবং ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যের সৃষ্টি হয়।

(b) মেসোথার্ম উদ্ভিদ—যেসব উদ্ভিদ সূর্যালোকসম্পন্ন শীতকালীন মাসগুলিতে অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে তাদের মেসোথার্ম উদ্ভিদ বলে। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের অনেক গাছ এই শ্রেণির। এই অঞ্চলে গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুতে যথাক্রমে বেশি ও কম তাপমাত্রা বজায় থাকে। ক্রান্তীয় পর্ণমোচী গাছগুলি এই শ্রেণিভুক্ত।

(c) মাইক্রোথার্ম উদ্ভিদ—শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে যেসব উদ্ভিদ তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য খুব কম তাপমাত্রা গ্রহণ করে, সেগুলি এই শ্রেণির। এক্ষেত্রে গাছগুলি বছরের কোনো সময়েই বেশি তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে না। অর্থাৎ এই উদ্ভিদপ্রধান অঞ্চলের তাপমাত্রা সারা বছর কম থাকে। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের 12,000 ফুট উচ্চতা পর্যন্ত প্রায় সব গাছগুলি এই শ্রেণিভুক্ত। মিশ্র ও সরলবর্গীয় গাছগুলি এই শ্রেণির হয়।

(d) হেকিস্টোথার্ম উদ্ভিদ—এই শ্রেণির উদ্ভিদগুলি শীতল মেরুদেশীয় ও আল্পীয় জলবায়ুতে জন্মায়। পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলগুলিতে 12000 ফুটের বেশি উচ্চতায় এবং ক্রান্তীয় অঞ্চলে 16000 ফুটের বেশি উচ্চতায় এই উদ্ভিদ দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠের সমস্ত গাছগুলির মধ্যে হেকিস্টোথার্মের তাপের প্রয়োজন সবচেয়ে কম এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে যেখানে গ্রীষ্ম ঋতুর দৈর্ঘ্য খুব কম, সেখানে এই গাছ দেখা যায়। কোনো স্থায়ী আঘাত বা ক্ষতি ছাড়াই অত্যধিক ঠাণ্ডা সহ্য করে এরা বেঁচে থাকে। সারা বছর তাপমাত্রা বেশ কম হয় বলে আল্পীয় উদ্ভিদ জন্ম নেয়।

উপরিউক্ত উদ্ভিদগুলি ছাড়া শুষ্ক মরু অঞ্চলগুলিতে এক ধরনের ঝোপবিশিষ্ট কাঁটাজাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়, যারা শুষ্কতা প্রতিরোধ করে বেঁচে থাকতে পারে। এদের জেরোফাইট বলে। বাবলা, খেজুর, ফনিমনশা প্রভৃতি এই শ্রেণির উদ্ভিদ।

(v) উদ্ভিদের বিপাকক্রিয়ার উপর প্রভাব—গাছের সমস্ত বিপাক ক্রিয়া উষ্মতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেহেতু উষ্মতা এনজাইম বা উৎসেচকের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, উদ্ভিদদেহের সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া উষ্মতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাষ্পমোচন, সালোকসংশ্লেষ, শ্বসন প্রভৃতির মাত্রা এবং গাছের অন্যান্য বিপাকক্রিয়াগুলি তাপমাত্রা দ্বারা প্রভাবিত হয়। বীজের অঙ্কুরোদগমকেও তাপমাত্রা অনেকখানি প্রভাবিত করে।

(vi) প্রজননের উপর প্রভাব—Thermoperiodism এর মাধ্যমে তাপমাত্রা উদ্ভিদের পুষ্পায়নকে প্রভাবিত করে। থার্মোপিরিয়ডিসম বলতে তাপমাত্রার দৈনিক ওঠানামায় গাছের সাড়াকে বোঝায়। উদ্ভিদের Phenology-এর (জলবায়ু প্রভাবিত গাছের পুষ্পায়ন বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পর্যায়ক্রমিক পার্থক্য) ক্ষেত্রে উষ্মতা একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করে। বসন্ত বা গ্রীষ্মের প্রথমদিকে গাছের কিছু শরীরসংক্রান্ত বিষয় এমনভাবে উষ্মতার দ্বারা প্রভাবিত হয় যে, তাদের প্রয়োজনীয়তাকে আংশিক প্রক্রিয়ায় বর্তমানে খুব সঠিকভাবে বলে দেওয়া যেতে পারে।

(vii) বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে প্রভাব—খুব কম বা খুব বেশি উভয় তাপমাত্রাই গাছের বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল নয়। অতি কম তাপমাত্রায় গাছের শৈত্যজনিত ক্ষতি বা আঘাত (Cold injury) তিনটি উপায়ে হয়। যথা (a) ডেসিকেশান বা শুষ্ককরণ (b) Chiling injury বা অতি শীতলীকরণজনিত আঘাত (c) Freezing injury বা হিমায়িতকরণজনিত আঘাত বা ক্ষতি। ডেসিকেশানের ক্ষেত্রে দ্রুত বাষ্পমোচন ও শীতকালে জলের ধীর শোষণের ফলে উদ্ভিদের কোষ ও কলাগুলি জলশূন্য হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উষ্ম জলবায়ুতে কিছু সময়ের জন্য গাছগুলি যখন কম তাপমাত্রার সংস্পর্শে আসে, তখন 'চিলিং ইনজুরি' হয় এবং অনেক সময় গাছ মারা যায়। নাতিশীতোষ্ম জলবায়ুর কিছু গাছ যখন খুব কম তাপমাত্রায় সংস্পর্শে আসে তখন গাছের দেহ কোষের ভিতরে জল জমে গিয়ে বরফের কেলাসে পরিণত হয় এবং কোষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একে freezing injury বলে।

তুহিন/শৈত্য প্রতিরোধক—কিছু গাছ খুব কম তাপমাত্রা বা শৈত্যকে সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে এবং এই ধরনের ক্ষমতা সম্পন্ন গাছকে শৈত্য প্রতিরোধক বা Cold resistant বলে। অত্যধিক তুহিন-সমৃদ্ধ অঞ্চলে জল দেহকোষের মধ্যে জমে যায়। কোষের মধ্যে বরফ তৈরির ফলে একসময় কোষের মৃত্যু হয় বেশি ঠান্ডায়। গাছের প্রোটোপ্লাজম জলশূন্য হয় এবং যান্ত্রিকভাবে প্রোটোপ্লাজমকে ভেঙে বরফ কোষগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। শীতলীকরণ (Chilling) প্রত্যক্ষভাবে গাছের কোষকে না ধ্বংস করলেও মূল থেকে গাছের দেহে রসের পরিবহন বা প্রবাহকে কমিয়ে দেয় এবং তাই বাষ্পমোচনের ফলে গাছের যে ক্ষতি হয়, তা পূরিত হয় না। কিন্তু তুহিন বা বরফ প্রত্যক্ষভাবে গাছের শিকড়, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতিকে আঘাত করে ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কৃষিশস্যের মধ্যে গম গাছের বৃদ্ধির জন্য বছরে প্রায় 90টি তুহিনমুক্ত দিন এবং 60° ফা: গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা দরকার, আর তুলাগাছের বৃদ্ধির জন্য বছরে প্রায় 20° টি তুহিনমুক্ত দিন ও 70° ফা: গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা দরকার।

Heat injury বা তাপীয় আঘাত/ক্ষতি—অত্যধিক তাপমাত্রা গাছের সহজ বৃদ্ধিতে বাধা দেয় এবং একসময় গাছ মারা যায়। বিভিন্ন দৈহিক প্রক্রিয়া যেমন শ্বসন, বাষ্পমোচন, প্রোটিন-বিপাকক্রিয়া প্রভৃতির উপর তাপবৃদ্ধি জনিত প্রতিকূল প্রভাব পড়ে এবং আঘাত বা ক্ষতির (injury) সৃষ্টি হয়। উচ্চতাপমাত্রা গাছকে শুকিয়ে ফেলে এবং প্রোটোপ্লাজমের ক্ষতি করে এবং ফলে দীর্ঘদিন এই অবস্থা চলতে থাকলে গাছ মারা যায়।

বাষ্পমোচন ও শ্বসনের উপর তাপমাত্রার প্রভাব—গাছের পাতা থেকে তাপমাত্রার প্রভাবে বাষ্পীভবনকে বাষ্পমোচন বলে। তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে বাষ্পমোচন সরাসরি বেড়ে যায়। ত্বক সংক্রান্ত ও পত্ররন্ধ্র সংক্রান্ত বাষ্পমোচনের অনুপাতকেও তাপমাত্রা প্রভাবিত করে। কোনো একটি বিশেষ প্রজাতির উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বাষ্পমোচন ও শ্বসন প্রক্রিয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কার্যকরী তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। সাধারণত শ্বসনের জন্য কার্যকরী তাপমাত্রা সালোকসংশ্লেষের কার্যকরী তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হয়। (চিত্র 3)

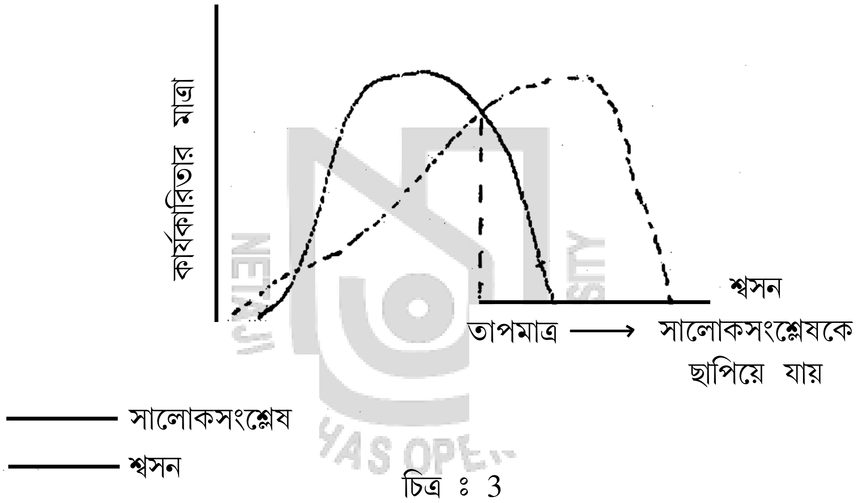

চিত্র ঃ 3

উদ্ভিদের উপর তাপমাত্রার প্রভাব—বায়ুর তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি উদ্ভিদের বিভিন্ন জীবজ ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পর্কিত। অধিকাংশ শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়াকলাপ 0° থেকে 40° সে.-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে গাছের বৃদ্ধি ওই উষ্মতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রতি 10° সে. উষ্মতা বৃদ্ধিতে গাছের বৃদ্ধির হার হয় দ্বিগুণ (ভ্যান্ট হফ্-এর সূত্র)। তবে 35° সে: পর্যন্ত এই বৃদ্ধি চলে। গ্রীষ্মমণ্ডলের গাছের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির অনুকূল উষ্মতা 30° সে. থেকে 32° সে:-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

গাছের উপর তাপমাত্রার প্রভাবের বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল—(a) বিভিন্ন প্রজাতির গাছে ঊর্ধ্বতম ও নিম্নতম চরম তাপমাত্রার (Critical temperature) পার্থক্য হয়। (b) গাছের দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলির সর্বাধিক তাপমাত্রা সহ্য করার ভিন্ন ক্ষমতা আছে। গাছের প্রজাতি কোনো স্থানের তাপমাত্রায় সতেজ হয়ে উঠতে পারে এবং মুকুল বা ফুল তৈরি হতে পারে, কিন্তু এর বীজ নাও পাকতে পারে। আবার বীজ পাকলেও তারা হয়তো তুহিনকে প্রতিরোধ করতে পারে না এবং চারাগাছগুলি শৈত্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়। (c) বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও বাষ্পমোচনের ক্ষেত্রেও তাপমাত্রার পরোক্ষ প্রভাব

আছে (d) উদ্ভিদের যে সাধারণ তাপমাত্রা থাকে, তার থেকে পরিবর্তন হলে গাছের পক্ষে তা ক্ষতিকর হয়। (e) বিভিন্ন গাছের একই কাজের জন্য অপরিহার্য তাপমাত্রার (Cardinal temperature) পার্থক্য হয়। (f) আবার একই গাছের বিভিন্ন কাজগুলির জন্য বিভিন্ন উষ্মতার প্রয়োজন হয়। (g) একই গাছের বিভিন্ন অঙ্গাগুলির একই কাজের জন্য আলাদা অত্যাবশ্যক/অপরিহার্য তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। (h) গাছের বয়সের পার্থক্যের সাথে ও অপরিহার্য বা অত্যাবশ্যক তাপমাত্রা পরিবর্তিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে অত্যাবশ্যক/অপরিহার্য তাপমাত্রা কোনো একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নয়, এটি তাপমাত্রার একটি প্রসার বা ব্যাপ্তিকে প্রকাশ করে।

(i) গাছের রোগগুলি ও কীটপতঙ্গের কার্যকারিতাও উষ্মতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। (ii) তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধির সাথে প্রত্যক্ষভাবে পুষ্টিমৌলগুলির মাত্রার এবং কার্যকারিতার হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

9.4.4 সূর্যালোক

উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যেমন, সালোকসংশ্লেষ, বাষ্পমোচন, বিপাকক্রিয়া, বীজের অঙ্কুরোদগম, পুষ্পায়ন প্রভৃতি সূর্যালোকের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং উদ্ভিদের প্রজাতিগত গঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতিটি উদ্ভিদ প্রজাতির বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সূর্যালোকের প্রয়োজন। শ্বসনের সময় উদ্ভিদদেহ সারাদিন শর্করা ক্ষয় করে, যা সালোকসংশ্লেষের দ্বারা পূরণ হয়। সর্বনিম্ন পরিমাণ সূর্যালোক, যা সালোকসংশ্লেষ জনিত লাভ ও শ্বসনজনিত ক্ষতির মধ্যে সমতা আনে, তাকে 'কমপেনসেশান পয়েন্ট' বলে।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে জলবায়ুর সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে সূর্যালোক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রধানত গাছের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে এর যথেষ্ট ভূমিকা আছে। ক্লোরোফিল ও হরমোন সংশ্লেষে, প্রস্বেদন প্রভৃতি কাজে আলো সক্রিয় অংশ নেয়। আলো তিনটি উপায়ে উদ্ভিদকে প্রভাবিত করে যথা—(a) আলোর তীব্রতার মাধ্যমে (b) আলোর মান ও প্রকৃতির মাধ্যমে (Wave length) ও (c) আলো পতিত হবার সময় বা স্থায়িত্বের (photoperiod) উপরে। আলোর তীব্রতা উষ্মতা ও আর্দ্রতাকে প্রভাবিত করে। আবার উষ্মতা ও আর্দ্রতা পরোক্ষভাবে আলোর তীব্রতাকে প্রভাবিত করে। আবার উষ্মতা বাড়লে উদ্ভিদদেহে আলোর তীব্রতা বাড়ে, কিন্তু আর্দ্রতা বাড়লে আলোর তীব্রতা কমে যায়। সূর্যরশ্মির পতনকোণের উপরও আলোর তীব্রতা নির্ভরশীল। তাই শীতের চেয়ে গ্রীষ্মে, নাতিশীতোষ্ম অঞ্চলের চেয়ে ক্রান্তীয় অঞ্চলে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের চেয়ে মধ্যাহ্নে আলোর তীব্রতা বাড়ে। (চিত্র 4)। আলোর তীব্রতা গাছের ফলফুল, বীজ প্রভৃতির উৎপত্তিকে প্রভাবিত করে। আলোর প্রকৃতি অর্থাৎ লাল, নীল ও অতিবেগুনি রশ্মি দিয়ে গাছের বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রভাবিত হয়। লাল রশ্মি সাধারণত উদ্ভিদকলার (Plant tissue) বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং সেই কারণে কোষগুলি প্রসারিত হয়। নীলরশ্মি কোষের বৃদ্ধি ও প্রসারকে ব্যাহত করে। আবার অতিবেগুনি

রশ্মি উদ্ভিদকোষের বৃদ্ধি ও গাছের শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। আলোর স্থায়িত্ব (Photoperiod) প্রধানত অক্ষাংশের উপর নির্ভরশীল। নিরক্ষীয় অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্মে আলোর স্থায়িত্ব 12 ঘন্টা, কিন্তু দুই মেরুতে গ্রীষ্মকালে আলোর স্থায়িত্বকাল 12 ঘন্টার বেশি হয় এবং শীতকালে 12 ঘন্টার কম হয়। ফুলের প্রস্ফুটনকাল ও উদ্ভিদের বন্টন আলোর স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে।

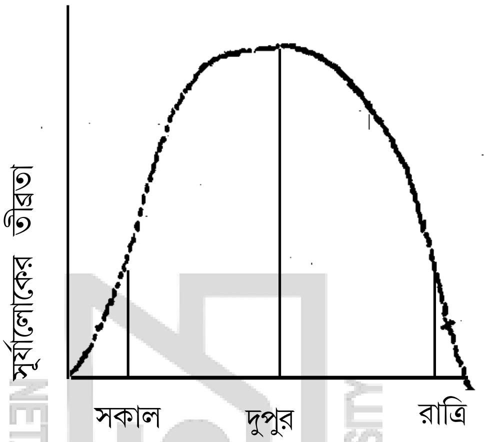

চিত্র ঃ 4

সূর্যালোক গাছকে প্রভাবিত করে —

(i) ক্লোরোফিলের উপর রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে,

(ii) তাপমাত্রা বৃদ্ধির দ্বারা বাষ্পমোচন বৃদ্ধির মাধ্যমে,

(iii) উদ্ভিদের বন্টনকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে,

(iv) গাছের পাতা তৈরির মাধ্যমে,

(v) গাছের অঙ্গজ আকৃতিকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে,

(vi) গাছের সামগ্রিক শারীর বৃত্তিয় বিকাশের মাধ্যমে।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সূর্যালোক উদ্ভিদজীবনকে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রভাবিত করে। যথা —

(a) ক্লোরোফিল উৎপাদন — কিছু গাছ যেমন সরলবর্গীয় চারাগাছ, ছোটো ফার্ন, কিছু মস ও অ্যালগি যেগুলি আলোর সরবরাহ ছাড়াও সবুজ রংয়ের হতে পারে, সেগুলি ছাড়া পৃথিবীর অধিকাংশ গাছের ক্লোরোফিল উৎপাদনে সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়। ফলে অধিকাংশ প্রাণী, যারা খাদ্যের জন্য সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল, সেগুলি সূর্যালোকের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

(b) সূর্যালোক ও সালোকসংশ্লেষ — এই প্রক্রিয়ার দ্বারা সবুজ উদ্ভিদ, জল ও বায়ুমণ্ডলের কার্বন

ডাই অক্সাইড গ্যাসের উপস্থিতিতে তাদের খাদ্য (শর্করা) উৎপন্ন করে। উদ্ভিদ এই কাজ করে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলাস কোষের মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদদেহে প্রাপ্ত সূর্যের radient energy ক্লোরোফিলের মাধ্যমে chemical energy- তে পরিণত হয়। সবসময় পতিত সূর্যালোকের চেয়ে মাঝে মাঝে পতিত সূর্যালোকের ক্ষেত্রে সালোকসংশ্লেষের পরিমাণ বা মাত্রা বেশি হয়। সালোকসংশ্লেষের সমীকরণটি হল —

$$6C0_2 + 12H_20 \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} C_6H_{12}0_6 + 60_2 + 6H_20$$

কার্বনযুক্ত শর্করা

এভাবে উৎপন্ন শর্করাজাতীয় দ্রব্য সৌরশক্তি ও জীবদেহের মধ্যে একমাত্র সংযোগকারী রূপে পরিচিত। সূর্যালোকের তীব্রতা, সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়ার মাত্রাকে প্রভাবিত করে । এই বিক্রিয়া উজ্জ্বল সূর্যালোকের তীব্রতা, কার্বন ডাই-অক্সাইডের কেন্দ্রীভবন এবং জলের যোগান। আর অন্তর্প্রভাবকগুলি হল Pigment এর সঞ্চয়, সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া, গাছের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া (যেমন শ্বসন ও পচন) প্রভৃতি।

(c) উত্তপ্তকরণ প্রক্রিয়া — উদ্ভিদদেহের যেসব অংশ সূর্যালোকের পথে উন্মোচিত হয়, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সেগুলি উত্তপ্ত ও উত্তেজিত হয় এবং তা প্রস্বেদনের মাত্রাকে বাড়ায়। গাছের পাতা, ফুল প্রভৃতির বিকাশকে এবং বর্ণময়তাকে সূর্যালোক প্রভাবিত করে। সূর্যালোক এমনকি গাছের পাতার আকৃতিও পালটে দেয়।

(d) প্রস্বেদন/বাষ্পমোচনের মাত্রার উপর প্রভাব — তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে সূর্যালোক পরোক্ষভাবে বাষ্পমোচনের মাত্রাকে প্রভাবিত করে। বাষ্পমোচনের মাত্রা একই সাথে জলের শোষণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে সূর্যালোকের অত্যধিক তীব্রতা শুষ্ক স্বাভাবিক আবাসের (dry habitat) সাথে এবং অধিক প্রস্বেদন মাত্রা সাথে সম্পর্কিত।

(e) পত্ররন্ধ্র সম্পর্কিত চলন — পত্ররন্ধ্রের উন্মুক্ত হওয়া অথবা বন্ধ হওয়া সূর্যালোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে এটি প্রস্বেদন ও বিশোষণের (absorption) সাথে সম্পর্কিত।

(f) উদ্ভিদসমূহের বন্টন — পৃথিবীর অন্যান্য অংশের চেয়ে মেরু অঞ্চলদুটিতে সূর্যালোকর মাত্রা ভিন্ন প্রকৃতির। ফলে ভূপৃষ্ঠের দ্বারা মোট বিকিরিত তাপ অক্ষাংশ অনুসারে (নিরক্ষরেখা থেকে দুরত্ব অনুযায়ী) পরিবর্তিত হয়। মেরু ও অন্যান্য স্থানগুলিতে উদ্ভিদের বন্টনগত পার্থক্যের অন্যতম কারণ হল এই সূর্যালোকের তারতম্য।

(g) Photoperiodism বা আলোক-স্থায়িত্ব — প্রতিদিন উদ্ভিদদেহে সূর্যালোক পতিত হবার সময়ের দৈর্ঘ্য (photoperiod) উদ্ভিদের দৈহিক বিকাশ ও পুষ্পায়নকে প্রভাবিত করে। সূর্যালোকের

স্থায়িত্বের ভিত্তিতে উদ্ভিদকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় — (i) ক্ষুদ্র দিবস উদ্ভিদ — যখন Photoperiod চরম সর্বাধিক মাত্রার চেয়ে কম (12-14 ঘন্টা) হয়, তখন সাধারণত এই ধরনের উদ্ভিদ জন্ম নেয়। (উদাহরণ—সালভিয়া স্পেলনডেনস, দাতুরা স্ট্রামোনিয়াম ইত্যাদি)

(ii) দীর্ঘ-দিবস উদ্ভিদ— এক্ষেত্রে photoperiod নির্দিষ্ট চরম সর্বনিম্ন মাত্রার চেয়ে বেশি হয়। উদাহরণ— ব্রাসিকা রাপা। সবগাছের মধ্যে অধিকাংশই হল ক্ষুদ্র দিবস উদ্ভিদ (shortday plant) যেগুলি পুষ্পায়নের জন্য একটি দীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারাচ্ছন্নতা প্রয়োজন হয়। কিছু গাছ আবার উপরিউক্ত কোনো অবস্থার দ্বারাই প্রভাবিত হয় না। এদের দিবস-নিরপেক্ষ উদ্ভিদ (day neutra Plant) বলে। ফলে সূর্যালোক photoperiod এর মাধ্যমে উদ্ভিদের স্থানীয় বন্টন, কান্ডের বর্ধিতকরণ, পুষ্পায়ন ফলের বিকাশ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।

(h) বংশগতি (succesion) – সূর্যালোক উদ্ভিদের বংশগতি বা উত্তরাধিকারকে প্রভাবিত করে।

(i) *Sun-loving Plant ও Shade-loving plant* – আলোর আপেক্ষিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে উদ্ভিদকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। (চিত্র 5) যথা— (i) Sun loving plant বা হেলিওফাইট — পূর্ণ সূর্যালোকে এই গাছগুলি ভালোভাবে জন্মায়। এই গাছগুলি ছোটো, ঘন ও ধারালো পাতাযুক্ত এবং পাতাগুলি প্রায়ই দন্তাকার, ভাঁজযুক্ত হয়।

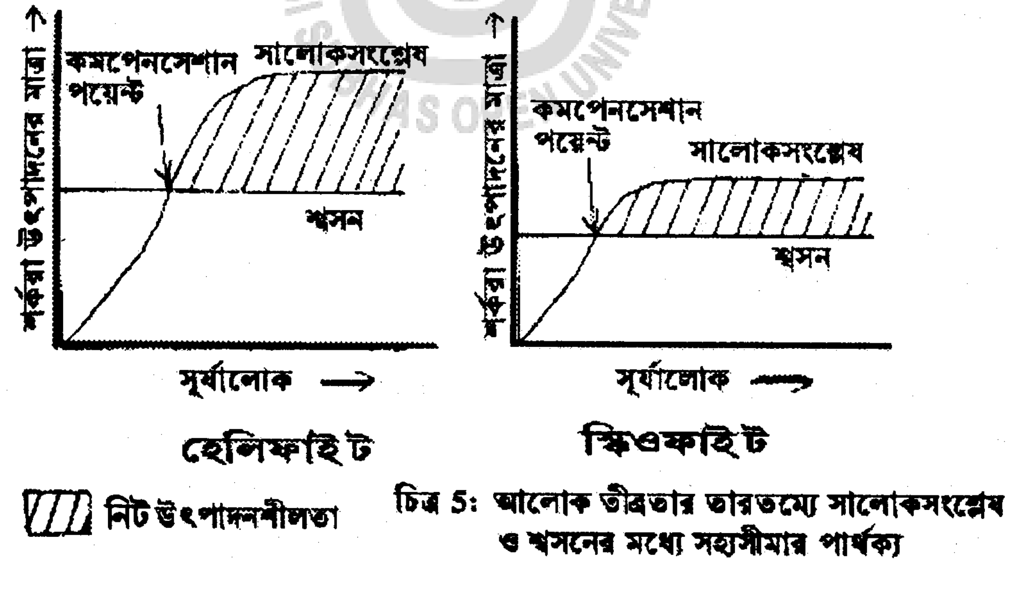

চিত্র 5: আলোক তীব্রতার তারতম্যে সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের মধ্যে সহ্যসীমার পার্থক্য

(ii) Shade-loving plant বা স্কিওফাইট—এই গাছগুলি অপেক্ষাকৃত কম আলোক তীব্রতায় জন্মায়। স্কিওফাইটগুলি বড়ো ও চওড়া পাতাবিশিষ্ট হয় এবং সেগুলি পাতলা, চ্যাপটা প্রায় লোমবিহীন ও মসৃণ হয়। এর কাণ্ডগুলি লম্বা হয় এবং পত্ররন্ধ্রগুলি বেশি অনুভতিপ্রবণ বলে কম পরিমাণ আলোক

ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। কিছু হেলিওফাইট আছে যারা সূর্যালোকে সবচেয়ে ভালোভাবে উৎপন্ন হয়, কিন্তু ছায়াময় অঞ্চলে ও মোটামুটি জন্মায়। এদের ফ্যাকালটেটিভ স্কিওফাইট বলে। আবার কিছু উদ্ভিদ কম সূর্যালোক তীব্রতায় সবচেয়ে ভালোভাবে বেঁচে থাকে, কিন্তু মোটামুটি ভালো জন্মায় পূর্ণ সূর্যালোকে। এদের ফ্যাকালটেটিভ হেলিওফাইট বলে।

9.4.5 বায়ুপ্রবাহ

বায়ু উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশকে প্রধানত পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক সময় তীব্র উষ্ম বায়ুপ্রবাহে বাষ্পীভবন ও বাষ্পমোচন বৃদ্ধি পায়। বায়ু উদ্ভিদদেহের পরাগরেণু বহন করে এবং অন্যত্র পরাগমিলনে সাহায্য করে। মাঝারি গতিসম্পন্ন বায়ু সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে গাছের $C0_2$ গ্রহণকে প্রভাবিত করে।

বায়ু অনেক ক্ষেত্রেই উদ্ভিদদেহে প্রতিকূল প্রভাবের সৃষ্টি করে। যেমন, শীতপ্রধান দেশে শীতল বায়ু গাছের দেহে Chilling injury এর সৃষ্টি করে। আবার তীব্র গতিসম্পন্ন বায়ু (ঘূর্ণবাত) গাছের কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফলকে ভেঙে দেয় এবং ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। যেমন, পশ্চিম আফ্রিকা ও পূর্ব ব্রাজিলে কোকো আধার বা খোসাগুলিকে দূরে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তীব্র বায়ু মৃত্তিকাক্ষয়ের মাধ্যমেও উদ্ভিদকে প্রভাবিত করে। বায়ুবাহিত বালুকণা বা শিলাখণ্ড অনেক গাছকে ঘর্ষণের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং গাছের বিকাশকে এবং ফুল-ফল উৎপাদনকে বাধা দেয়। মরু অঞ্চলে অনেক সময় বায়ুবাহিত বালুকণা উদ্ভিদকে আবৃত করে। এভাবে কেবলমাত্র গাছের বৃদ্ধি বাধা পায় না, গাছের মৃত্যুও ত্বরান্বিত হয়। আবার সমুদ্রবায়ু বা হালকা বায়ু নারকেল ও কফি গাছের বিকাশের পক্ষে বেশ অনুকূল।

বায়ুর গতিবেগ গাছের বাহ্যিক গঠন ও বিকাশকে প্রভাবিত করে। গাছের অন্যান্য নিয়ন্ত্রকগুলিকেও বায়ু প্রভাবিত করে। কোনো অঞ্চলের আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বায়ুর গতিবেগ ও সময়কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদ্ভিদদেহে ও উদ্ভিদের জীবনে বায়ুর প্রত্যক্ষ যান্ত্রিক এবং পরোক্ষ প্রভাব শারীরবৃত্তীয়। এগুলি নীচে উল্লেখ করা হল। যথা—

(i) প্রত্যক্ষ বা যান্ত্রিক প্রভাব—(a) বায়ুর প্রবল গতিবেগে উদ্ভিদ শিকড়সহ উৎপাটিত হতে পারে এবং শাখা-প্রশাখা, ফল-ফুল ভেঙে যেতে পারে (b) প্রবল বায়ুর প্রবাহ এক দিক থেকে (one sided) হলে, গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ বিঘ্নিত হয়। ফলে অনেক সময় গাছ একদিকে হেলে বা বেঁকে যায় এবং ডালপালাগুলি অনিয়মিতভাবে বিভিন্নদিকে প্রসারিত হয়। (c) বায়ুর গতিবেগ প্রবল হলে কৃষিজ উদ্ভিদ ও অন্যান্য উদ্ভিদ আনমিত (lodging) হয়ে জমিতে পড়ে যায়।

(ii) পরোক্ষ বা শারীরবৃত্তীয় প্রভাব— (a) বায়ুর গতিবেগের ফলে কোনো অঞ্চলের বাষ্প দ্রুত তাড়িত হয়। ফলে ওইসব অঞ্চলের বায়ু শুষ্ক হয়ে ওঠে এবং গাছের প্রস্বেদনের মাত্রা বাড়ে। (b) বায়ুর

তীব্র গতিবেগের ফলে উদ্ভিদদেহের অংশগুলি বেঁকে যায় বা কুঞ্চিত হয়। (c) বায়ুর গতিবেগ গাছের দেহকোষের রসস্ফীতিজনিত চাপ কমার অন্যতম প্রধান কারণ এবং এর ফলে অনেক সময় কোষের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং গাছের আকৃতি খর্ব হয়ে পড়ে।

9.4.6 আগুন (Fire)

বজ্রপাত ও অগ্ন্যুৎপাতের মাধ্যমে খুব কম অঞ্চল জুড়ে আগুন তৈরি হলেও বনাঞ্চলে অধিকাংশ আগুনের উৎস হল জীব। এদের মধ্যে মানুষের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। আবার বনাঞ্চলে উদ্ভিদদেহগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে আগুনের উৎপত্তি হয়।

উদ্ভিদের প্রভাবকরূপে আগুনকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(i) ভূমিবাগের আগুন (Ground fire) — যেসব স্থানে জৈব পদার্থগুলি প্রচুর পরিমাণে ঢিবির মতো জমে থাকে, সেসব স্থানে ওই পদার্থগুলি আগুন লেগে দীর্ঘকাল ধরে জ্বলতে থাকে। এই আগুন শিখাহীন হয় এবং জ্বলন্ত বস্তুগুলির মধ্যে থাকা বিভিন্ন গাছগুলিকে (কঠিন বৃক্ষজাতীয় গাছ ছাড়া) মেরে ফেলে।

(ii) পৃষ্ঠদেশের আগুন (Surface fire) —এই আগুন ভূপৃষ্ঠের উপর তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে এবং এদের শিখাগুলি জীবিত তৃণজাতীয় উদ্ভিদ ও ঝোপঝাড়কে পুড়িয়ে দেয়। (iii) মস্তকদেশের বা চাঁদোয়ার উপরকার আগুন (Crown fire) —বনের গাছগুলির চাঁদোয়ার উচ্চতম অংশটি এই ধ্বংসকারী আগুনে পুড়ে যায় এবং উদ্ভিদ ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়। এই ধরনের আগুনের তাপমাত্রা বেড়ে হয় প্রায় 1300 ফা:। আগুনের প্রভাব—মৃত্যু ছাড়া ও গাছের দেহে আগুনের অন্যান্য প্রভাব দেখা যায়—(a) আগুন কাণ্ডের মধ্যে যে ক্ষতের সৃষ্টি করে, সেখানে কীটপতঙ্গ, পরজীবী ফাংগি প্রভৃতির অনুপ্রবেশ হয়।

(b) আলো, বৃষ্টি, পুষ্টিমৌলের চক্র, মাটির উর্বরতা, গাছের পাতার সংখ্যা, মাটিতে হিউমাসের পরিমাণ মাটির জীবাণু, মাটির PH প্রভৃতি বিষয়গুলি আগুনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পরোক্ষভাবে গাছের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। (c) আগুনের মাধ্যমে অনেক প্রজাতির গাছ ধ্বংস হয়। যেসব গাছ আগুন সহ্য করে বেঁচে থাকে (fire tolerant), সেগুলি সংখ্যায় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কারণ গাছগুলির মধ্যে বেড়ে ওঠার প্রতিযোগিতা কমে যায় এবং অন্যান্য অবস্থাগুলিরও পরিববর্তন হয়। (d) কিছু গাছ (যেমন, Aritida stricta) এর ফলে উদ্দীপিত হয়ে প্রচুর পরিমাণ বীজ তৈরি করে। কিছু ঘাস ও লেগুমজাতীয় গাছের ক্ষেত্রে বীজগুলি আগুনের সংস্পর্শে এলে তবেই তাদের অঙ্কুরোদ্গম হয়। এই বীজগুলির তাপ সহ্যকারী ক্ষমতা বেশি। (e) আগুনে পুড়ে যাওয়া বনাঞ্চলের মাটিকে কিছু ফাংগিও (প্রধানত কিছু Ascomycetes) জন্ম নেয়।

9.5 ভূপ্রাকৃতিক উপাদান (Topographical factor)

কোনো অঞ্চলে ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান যথা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সেই স্থানের উচ্চতা, খাড়াই বা ঢাল, পর্বতশ্রেণির অবস্থান ইত্যাদি সেই স্থানটির উদ্ভিদের অবস্থান, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতপক্ষে জলবায়ুর বেশির ভাগ উপাদান ভূপ্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভূপৃষ্ঠদেশ সর্বত্র এক রকমের নয় বা সমতলবিশিষ্ট নয়, বরং বিভিন্ন অংশে ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আছে এবং ভূপৃষ্ঠদেশ অসমতল হয়। এই ভূপ্রাকৃতিক উপাদানগুলি বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে জলবায়ুগত পরিবর্তন ঘটিয়ে উদ্ভিদকে প্রভাবিত করে। ভূপ্রকৃতি এমনকি mircroclimate কে ও প্রভাবিত করে এবং মাটির অবস্থাকে পরিবর্তিত করে। ফলে গাছের বৃদ্ধি ও বিকাশে ভূপ্রাকৃতিক প্রভাব হল পরোক্ষ (জলবায়ুর মাধ্যমে)। পর্বতের উচ্চতা, পর্বতশ্রেণির অবস্থান ও বিস্তার, ভূমিঢাল প্রভৃতি ভূপ্রাকৃতিক বিষয়গুলি নীচে আলোচনা করা হল।

(i) পর্বতের উচ্চতা— কোনো স্থানের নির্দিষ্ট উচ্চতার উপর বায়ুচাপের পরিমাণ নির্ভর করে। উচ্চতা বাড়ার সাথে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কমে যায়। উচ্চতার বৃদ্ধি বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতাকে প্রভাবিত করে। উচ্চতা বাড়ার ফলে বায়ুর উষ্ণতা কমে, যা সরাসরি গাছের প্রস্বেদনের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং উচ্চতার তারতম্যের ফলে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের পার্থক্য হয় এবং তা উদ্ভিদের গঠন, বিকাশ ও বন্টনকে প্রভাবিত করে।

ভূপৃষ্ঠে অসমতলতার ফলে পাহাড়, পর্বত, টিলা, মালভূমি, উপত্যকা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদের উপর উচ্চতার পার্থক্যের প্রভাব সবচেয়ে ভালো দেখা যায় পর্বতের উপরে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুর উষ্ণতা, বায়ুচাপ, বায়ুর গতিবেগ, আর্দ্রতা, সৌর বিকিরণের তীব্রতা প্রভৃতি বিষয়গুলির পার্থক্য ঘটতে দেখা যায়। এই পার্থক্য বিভিন্ন উচ্চতায় উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের তারতম্য ঘটায়। পূর্ব ও পশ্চিম হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় উদ্ভিদগুলির বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য দেখা যায়।

(ii) পর্বতশ্রেণির অবস্থান ও বিস্তার—পর্বতের অবস্থান ও বিস্তার উদ্ভিদ ও অরণ্য সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কারণ বায়ুর গতিপথ ও গতিবেগ, বৃষ্টিপাতের হার ও সময়কাল প্রভৃতি বিষয়গুলি পর্বতের অবস্থানের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। বায়ু পর্বতে বাধা পেয়ে বিভিন্নদিকে ছিটকে যায় এবং পর্বতের যে কোনো একটি দিকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুকে আটকে রাখে। ফলে পর্বতের একটি দিকে জলীয় বাষ্প মেঘরূপে সঞ্চিত হয় এবং বৃষ্টিরূপে পতিত হয় (চিত্র 6)। এই কারণে পর্বতের একটি বিশেষ দিকে এবং বিশেষ এক উচ্চতায় ঘন গাছপালা বা অরণ্য দেখা যায়, আর অন্য দিকটিতে (বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে) এবং অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতায় গাছপালার সংখ্যা খুবই কম থাকে এবং শুষ্কতার ঝোঁক দেখা যায়। বহিঃহিমালয় বা শিবালিক হিমালয়ে প্রধানত এর ফলেই মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় এবং উচ্চ হিমালয়ের তুলনায় এই অংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি হয় এবং গাছপালার সংখ্যা বেশি হয়।

আর মধ্য ও অভ্যন্তরস্থ হিমালয়ে আর্দ্রতার অভাব ও শুষ্কতা দেখা যায় এবং গাছপালা কম হয়। বায়ুর জলীয় বাষ্পঘনীভূত হয় এবং মধ্য হিমালয়ে পৌঁছানোর আগেই বহিঃহিমালয়ে সঞ্চিত হয়।

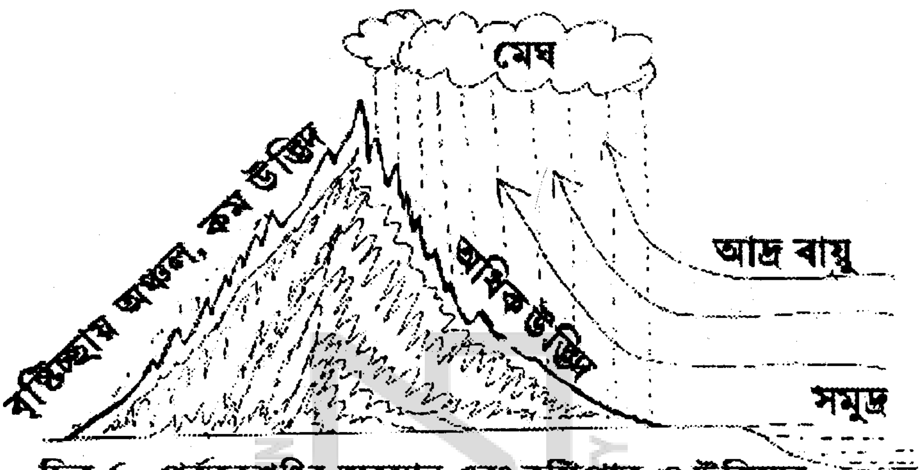

চিত্র 6 : পর্বতশ্রেণির অবস্থান এবং বৃষ্টিপাত ও উদ্ভিদের উপর তার প্রভাব।

এছাড়া পর্বতের উপরে স্থানীয় বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং পার্বত্য বায়ুর সৃষ্টি হয় যার প্রভাব পড়ে স্বাভাবিক উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি ও বন্টনের উপর।

(iii) ভূমিঢাল—কোনো স্থানের খাড়াই বা ঢালের উপর সেই অঞ্চলের জলবায়ু ও আবহাওয়া অনেকখানি নির্ভরশীল। কারণ সূর্যরশ্মি যে কোণে ভূভাগে পতিত হয় তা ভূমিঢালের দ্বারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া মাটিতে জল সঞ্চয়ের পরিমাণ ও জলধারণ ক্ষমতা কোনো অঞ্চলের ভূমিঢালের সাথে যুক্ত।

ভূমিঢাল পর্বত বা উচ্চভূমির প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি উচ্চভূমির ঢালের মাত্রা দিনের বেলায় পতিত সৌর বিকিরণের পরিমাণকে এবং মাটির বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে। উত্তর গোলার্ধে উচ্চভূমির দক্ষিণঢাল সূর্যালোকের দিকে বেশি উন্মোচিত এবং অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর হয়, অন্যদিকে উচ্চভূমিটির উত্তর ঢালটি শীতলতর হয়। (চিত্র 7) এর কারণ হল, উত্তর গোলার্ধে উচ্চভূমির খাড়া দক্ষিণ ঢালগুলিতে মধ্যদিবসীয় সূর্যের রশ্মি প্রায় সমকোণে পতিত হয়; অন্যদিকে উত্তর ঢালগুলিতে তির্যকরশ্মি পতিত হয় এবং কখনো কখনো কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালের সামান্য সময় ছাড়া পতিত হয় না বললেই চলে। সৌরবিকিরণের এই পার্থক্য এবং তাপমাত্রার মান পর্বতের উভয় দিকে উদ্ভিদের বন্টনগত ও বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বা তারতম্যের সৃষ্টি করে। উত্তর ঢালগুলি সাধারণত সূর্যরশ্মির পিছনের দিকে থাকে এবং সেখানে বিশুদ্ধ অরণ্যের

সৃষ্টি হয় এবং ভূমিভাগের উপরে hygrophilous উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। আর সূর্যরশ্মির দ্বারা প্রভাবিত উচ্চভূমির দক্ষিণ ঢালে 'জেরোফাইট' প্রজাতির উদ্ভিদ জন্মে। পর্বতের দুটি ঢালে স্থানীয় জলবায়ুগত পার্থক্য এর জন্য দায়ী।

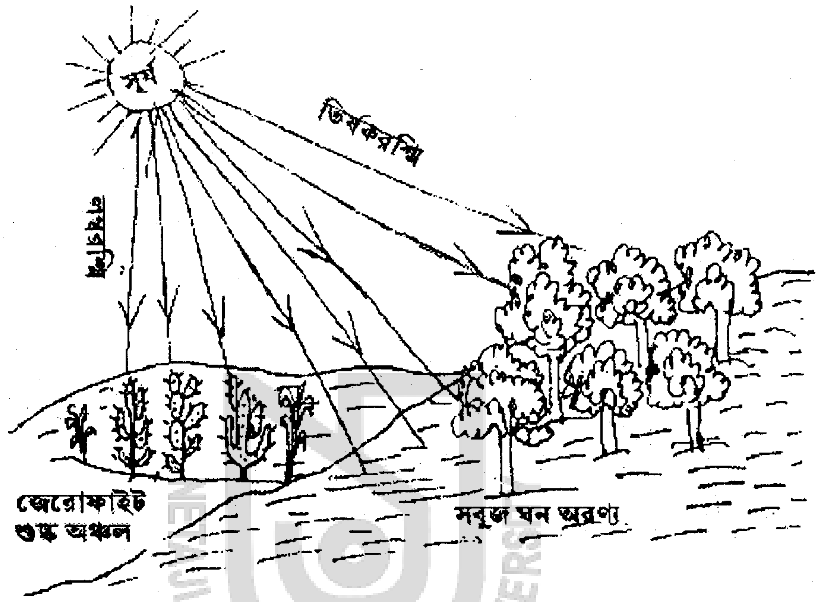

চিত্র 8 : তাপমাত্রা ও উদ্ভিদের ওপর সূর্যরশ্মির পতনকোণের প্রভাব

ভূমিঢালের পার্থক্য জলের গতি ও মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রভাবিত করে। অত্যধিক ঢালে জল তীব্রগতিতে নীচে নেমে যায় এবং মাটির জন্য জল কিছুমাত্র থাকে না বললেই চলে। আবার পর্বতের যেদিকের ঢাল অপেক্ষাকৃত কম, সেখানে জলের গতি কম হয় এবং মাটির জন্যে কিছু জল ব্যবহৃত হয়। ফলে একই বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে পর্বতের দুটি দিক ভূমিঢালের পার্থক্যের ফলে ভিন্ন ধরনের স্বাভাবিক উদ্ভিদের জন্ম দেয়। যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হলেও অতিরিক্ত ঢালু জমিতে গাছগুলি জন্মগ্রহণ করতে ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

আবার অত্যধিক ঢালু জমিতে দ্রুতগতিসম্পন্ন জলের আঘাতে মাটির ক্ষয় ও নগ্নীভবন বেশি হয় এবং ওইসব অঞ্চল থেকে গাছগুলি অদৃশ্য বা নিশ্চিহ্ন হয়। ক্ষয়প্রাপ্ত পাহাড়, খাড়া ঢাল এবং শিলার প্রকৃতি এক বিশেষ ধরনের habitat বা স্বাভাবিক আবাসের জন্ম দেয়, যেখানে বিশেষ কয়েক শ্রেণির উদ্ভিদ অভিযোজন করতে পারে। শিলাপৃষ্ঠ থেকে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির দ্বারা ক্ষতিপ্রাপ্ত নুড়ি, বালি ও কাদা নদীপ্রবাহের মাধ্যমে নীচের দিকে বাহিত হয় এবং নদীমোহনায় পলির আকারে জমা হয় এবং নতুন স্বাভাবিক আবাস (habital, যেমন—লবণাক্ত জলাভূমি) গড়ে তোলে। এই লবণাক্ত জলাভূমিতে লবণ সহ্যকারী ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছের অরণ্য গড়ে ওঠে।

(iv) ভূমিঢালের প্রকটভবন (Exposure of Slope)—কোন ঢাল সূর্য ও বায়ুর দিকে প্রকটিত হলে তা সেই স্থানে উৎপন্ন উদ্ভিদকে প্রভাবিত করে। (চিত্র ৪) সূর্যের ও বায়ুপ্রবাহের পথে প্রকটিত ঢালে যেসব গাছ জন্মে তার বিপরীত দিকের ঢালে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের উদ্ভিদ জন্মায়। এই কারণে Green house বা কাচঘরগুলি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সূর্যালোক পতনের দিকে বা দক্ষিণঢালে (উত্তরগোলার্ধে) অবস্থিত যেগুলি সৌররশ্মি থেকে অনেক তাপ গ্রহণ করে।

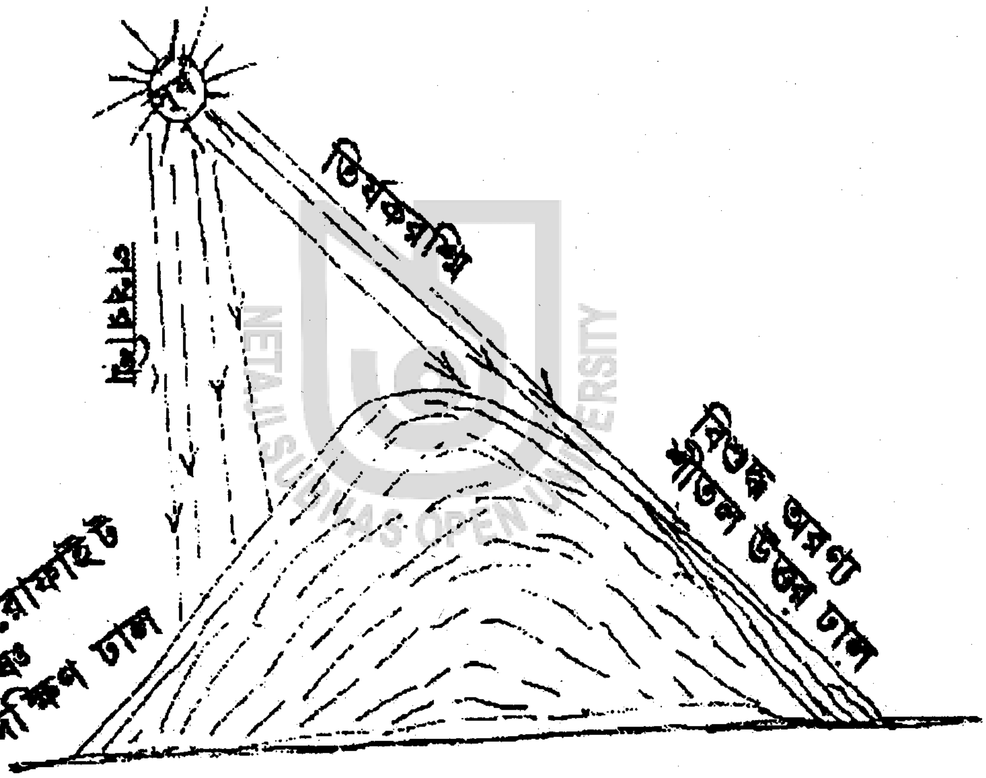

চিত্র 7 : উত্তর গোলার্ধে পর্বতের দক্ষিণ ঢাল উত্তর ঢালের চেয়ে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ।

9.6 মৃত্তিকা সংক্রান্ত উপাদান (Edaphic factor)

মাটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত উপাদান। উদ্ভিদ তার পুষ্টিমৌলের যোগান, জলের যোগান ও সার্বিক বিকাশের জন্য মাটির উপর অনেকটা নির্ভরশীল। এমনকি ভাসমান জলজ উদ্ভিদগুলি জলীয় মাধ্যমে দ্রবীভূত যেসব পুষ্টিমৌলগুলি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে, তাদের প্রধান আধার হল মাটি বা কর্দম, যা জলীয় মাধ্যমে খাদ্যের যোগান দেয়। Marsden-Jones ও Turrill -এর (1944) মতে, বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম, গাছের আকৃতি ও দৈর্ঘ্য, উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশের বলিষ্ঠতা, শিকড়ের গভীরতা, তুহিন ও খরা সহ্যকারী ক্ষমতা, পরজীবী গাছের অবস্থান, গাছ -প্রতি ফুল ও ফলের সংখ্যা, পুষ্পায়নের সময়কাল প্রভৃতিকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে মাটি উদ্ভিদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিজ্ঞানী Warming(1904) মাটির বৈশিষ্ট্যগুলির গুরুত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভিদের পাঁচটি বাস্তুতান্ত্রিক শ্রেণির কথা উল্লেখ করেন। যথা—(a) অক্সলোফাইট—অম্ল মাটিতে জন্মানো উদ্ভিদ (b) হ্যালোফাইট—লবণাক্ত মাটিতে জন্মানো উদ্ভিদ, (c) স্যামোফাইট—বালির মধ্যে জন্ম নেওয়া উদ্ভিদ (d) লিথোফাইট—যেসব উদ্ভিদ শিলার উপরে জন্মায় (e) চাসমোফাইট—যেসব উদ্ভিদ শিলার ফাটলের মধ্যে জন্মায়।

মাটির মধ্যেকার বিভিন্ন খনিজ ও মাটির উপরকার জৈব উপাদানগুলির মিশ্রণ ও তারতম্যের উপর মাটির প্রকৃতি নির্ভর করে। মাটির জলধারণ ক্ষমতা, মাটির বায়ু, তাপমাত্রা, গভীরতা, বোদ বা হিউমাসের পরিমাণ, মাটির পি.এইচ (PH) প্রভৃতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি কোনো অঞ্চলের উদ্ভিদের গঠন, বৃদ্ধি ও বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। নীচে এদের ব্যাখ্যা দেওয়া হল —

(i) মাটির জল—মাটি ছিদ্রগুলি সবসময় জল বায়ুর দ্বারা পূর্ণ থাকে। গাছের খাদ্য তৈরিতে, বীজের অঙ্কুরোদগমে, শিকড়ের বৃদ্ধিতে, পুষ্টিমৌলগুলিকে দ্রবীভূত করে গাছের গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে, শিকড়ের খাদ্যশোষণে ও খাদ্যপরিবহনে উদ্ভিদকোষকে রসস্ফীত রাখতে ও কোষের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে, দ্রাবক হিসাবে কাজ করার ক্ষেত্রে মাটির জল গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

(ii) মাটির জলধারণ ক্ষমতা—মাটির জল ধারণ ক্ষমতা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। বেলে মাটির জলধারণ ক্ষমতা খুব কম, আবার কাদামাটিতে জল উপরে জমে থাকে। ফলে দোআঁশ ও পলি মাটির জলধারণ ক্ষমতা খুব বেশি এবং এই মাটিগুলি গাছের বৃদ্ধি ও বিকাশের পক্ষে উপযুক্ত।

(iii) মাটির তাপমাত্রা—অঙ্কুরোদগম, শিকড়ের বৃদ্ধি, মাটির জীবাণুদের কার্যকারিতা প্রভৃতি মাটির তাপমাত্রার উপর অনেকটা নির্ভর করে। হিউমাস ও জল উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রবাবিত করে। এই হিউমাসে সৃষ্টি হয় জৈব পদার্থের বিয়োজনের ফলে এবং জলের পরিমাণের তারতম্য হয় বাষ্পীভবনের তারতম্যের ফলে। হিউমিকেশান ও বাষ্পীভবন—উভয় প্রক্রিয়াই মাটির তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। মাটিতে মাঝারি উষ্ণতা গাছের বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়। মাটিতে তাপের উৎস দুটি। যথা (a) সূর্য থেকে প্রাপ্ত তাপ ও (b) মাটির রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহ। উদ্ভিদের জীবনচক্র বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। যথা

(i) সূর্যরশ্মির প্রাপ্যতা (ii) সূর্যরশ্মির পতনকোণ (iii) সৌর বিকিরণের সময়সীমা (iv) মাটির আপেক্ষিক তাপ (v) ভূগর্ভের তাপ (vi) বায়ু দ্বারা মাটির উত্তপ্ত ও শীতল হওয়া (vii) উদ্ভিদের অবস্থান (viii) মাটির জল ও ছিদ্রতা ইত্যাদি।

(iv) মাটির বায়ু— উদ্ভিদের গঠন ও বৈশিষ্ট্যের সাথে মাটির বায়ুর একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গাছের যে অঙ্গগুলি মাটির নীচে থাকে, সেগুলির শ্বসনের জন্য মাটির বায়ুর প্রয়োজন হয়। বীজের অঙ্কুরোদগমে মাটির বায়ুর মধ্যে থাকা অক্সিজেনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অতি সিক্ত মাটিতে অক্সিজেনের অভাব হয়, ফলে জলা অঞ্চলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। মাটির বায়ুর মধ্যে থাকা নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি গাছের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়। হিউমাস তৈরির সময় মাটির জীবাণুদের কার্যকারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে বায়ু এবং ফলে মাটির বায়ু পরোক্ষভাবে উদ্ভিদকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(v) মাটির কাঠিন্য— মাটির কাঠিন্য গাছের শিকড়ের অনপ্রবেশের ক্ষমতা কমায়। এঁটেল মাটি শুকিয়ে কঠিন হলে শিকড়ের প্রবেশ ক্ষমতা কম হয়। আবার মাটি নরম বা ভঙ্গুর হলেও গাছের জন্ম ও বৃদ্ধির সহায়ক হয় না।

(vi) মাটির গ্রথন—মাটির মধ্যে বালি, পলি ও কাদা কণাগুলির আপেক্ষিক অনুপাতকে মাটির গ্রথন বলে। কণাগুলির আকৃতি ও অণুপাতের ভিত্তিতে মাটি সূক্ষ্ম বা স্থূল গঠনের হয়। মাটির গ্রথনের উপর গাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে। স্থূল গ্রথনের মাটি জল ও উদ্ভিদখাদ্য ধরে রাখতে পারে না, তাই জল ও সার প্রয়োগের দরকার হয়। সূক্ষ্ম গ্রথনের মাটিতে (এঁটেল) Waterlogging হতে পারে এবং অনেক গাছ মারা যেতে পারে। মাঝারি গ্রথনের মাটি উদ্ভিদমূলের বৃদ্ধির জন্যে অনুকূল। কাদা ও পলি মাটিতে নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় গাছের খাদ্য নষ্ট হয়ে যায় না।

কাঁকর মাটিতে জলের পরিমাণ কম থাকায় এই মাটিতে জঞ্জাল উদ্ভিদ জন্মে এবং বেলেমাটিতে দীর্ঘ শিকড়যুক্ত কাঁটাজাতীয় জেরোফাইট জন্মে। দোআঁশ ও পলিমাটি গাছের বৃদ্ধির পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল।

(vii) মাটির গঠন— মাটির স্তুপে কণাগুলির বিন্যাস বা সজ্জিতকরণকে মাটির গঠন বলে। এই গঠন সরল ও যৌগিক হতে পারে। সরল গঠনের মাটি চাষবাস ও গাছের বৃদ্ধির অনুকূল হয়। মাটির গঠন বর্তুলাকার সচ্ছিদ্র মৃত্তিকাপিণ্ড (Gramular) ও অতি ও অতি সচ্ছিদ্র মৃত্তিকাপিণ্ড (crumby) হলে বেশির ভাগ উদ্ভিদ জন্মাবার ও বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়।

(viii) মাটির হিউমাস ও জৈব পদার্থ—গাছ ও প্রাণীর দেহ বশেষ পচনের ফলে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ে। প্রাণীদের দেহাবশেষ ও বর্জ্য পদার্থ থেকে উৎপন্ন মাটিকে হিউমাস বলে। মাটির ছিদ্রের সংখ্যা, বায়ু, কাঠিন্য, জলধারণ ক্ষমতা, গ্রথন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে হিউমাস ও জৈব পদার্থ বীজের অঙ্কুরোদগম, উদ্ভিদমূলের প্রবেশ ও বৃদ্ধি এবং সার্বিকভাবে গাছের বৃদ্ধি ও বিকাশকে প্রভাবিত করে। হিউমাস দুই শ্রেণির হয়। যথা— (a) Mor হিউমাস— এতে অম্লতা

বেশি হয়, পডজল মাটির সৃষ্টি হয় এবং সরলবর্গীয় গাছ ভালো জন্মে। (b) Mull হিউমাস—বিশ্লেষিত জৈব পদার্থের এই শ্রেণিতে বাদামি অরণ্য মাটির সৃষ্টি হয় এবং পর্ণমোচী গাছ ভালো জন্মায়।

(ix) মাটির মধ্যে থাকা উদ্ভিদের পুষ্টিমৌল—মাটির মধ্যেকার বিভিন্ন দ্রবণীয় লবণগুলি উদ্ভিদের পুষ্টিমৌলের কাজ করে। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য মাটির খনিজগুলি (Ca, Mg, K, P, Na, Fe, Cu প্রভৃতি) অতি প্রয়োজনীয় এবং একই খনিজ বা খাদ্য উপাদান বিভিন্ন উদ্ভিদের দ্বারা আয়নরূপে শোষিত হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতিতে এই শোষণের পরিমাণের তারতম্য হয়। কিছু উদ্ভিদ (Ca) চুন সমৃদ্ধ মাটিতে ভালো জন্মে, এদের ক্যালসিফাইট বলে; আবার কিছু উদ্ভিদ চুনসমৃদ্ধ মাটি সহ্য করতে পারে না, এদের অক্সিলোফাইট বা ক্যালিসিফিউস উদ্ভিদ বলে।

উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় N. P. ও K এর মতো প্রধান খাদ্য উপাদানগুলি। গাছের দরকারি ষোলোটি খাদ্য উপাদানের মধ্যে সাতটি গাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য কম পরিমাণে দরকার হয়। এদের অনুখাদ্য বলে। পুষ্টিমৌলগুলি গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি ঘটায়, পাতার বর্ণকে নিয়ন্ত্রণ করে, কাণ্ড ও শাখা প্রশাখার কাঠিন্যকে প্রভাবিত করে, গাছের ফুল-ফলের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে, গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, ফসল পাকতে সাহায্য করে। এছাড়া উদ্ভিদের প্রজননে, সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনে, জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং গাছের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য হরমোন তৈরি করে।

চুনমাটি, লবণাক্ত মাটি ও অম্লমাটি—$CaCo_3$ সমৃদ্ধ মাটিতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পোষকের অভাব হতে দেখা যায়। সাধারণত কয়েকটি বীরুৎ ও গুল্ম এই মাটিতে জন্মে। লবণাক্ত মাটিতে সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগানেসিয়াম ও সোডিয়াম সালফেট প্রভৃতি দ্রবীভূত থাকার ফলে উদ্ভিদ প্রয়োজন মতো মাটিতে (PH: 7.0 এর কম) চুনের অভাব দেখা যায় এবং রোডেড্রেডন, পাইন প্রভৃতি গাছগুলি এই মাটিতে যথেষ্ট সংখ্যায় জন্মায়। ক্ষারীয় মাটিতে সোডিয়াম, পটাসিয়াম ক্যালসিয়াম প্রভৃতি বেশি থাকে এবং লবণাম্বু গাছগুলি এই মাটিতে ভালো জন্মে।

9.7 জীবজ উপাদানসমূহ (Biotic factor)

সাধারণত অধিকাংশ উদ্ভিদ স্বভোজী শ্রেণির হয় এবং এগুলি স্বাধীনভাবে জীবনধারণে সক্ষম হয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বিভিন্ন জীব কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে জন্মানো উদ্ভিদকুলের সাথে নানাভাবে সম্পর্কিত। বিভিন্ন উদ্ভিদ, জীবজন্তু, ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়া জাতীয় জীবাণু প্রভৃতি অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতি, বিভিন্ন জীবজন্তু ও মাটির জীবাণুগুলির আন্তঃক্রিয়া সেই অঞ্চলের অরণ্যের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল যদি গৃহপালিত পশুর চারণভূমি হয়, তাহলে সেইসব পশুর মাধ্যমেই সেই অঞ্চলের গাছের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। পশুচারণের ফলে অনেক গাছ পদদলিত হয়ে ধ্বংস হয় এবং বেশির ভাগ বীরুৎ ও গুল্ম জাতীয় গাছকে ওইসব পশুগুলি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। মাটির গঠন ও প্রকৃতি পশুচারণের দ্বারা বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। ভারতের বিভিন্ন বনজঙ্গল পশুচারণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাধারণত প্রাণীগুলি বনাঞ্চলের চারাগাছকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাদের পায়ের চাপে মাটি কঠিন হয়ে যায়। ফলে বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম ও গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। হাতি, বাইসন প্রভৃতি বৃহদাকার পশুগুলি বড়ো বড়ো গাছের ক্ষতি করে, এমন কি অনেক সময় সেগুলিকে উৎপাটনও করে। গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি চারণের ফলে কোনো স্থানে উদ্ভিদের প্রকৃতির পরিবর্তন হয় এবং অধিকাংশ সময়ে রামশ ও কাঁটাময় গাছগুলি জীবিত থাকে এবং অন্যান্য গাছগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। অনেকসময় মানুষ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কোনো অঞ্চলের গাছগুলিকে ধ্বংস করে। তবে মানুষ আবার অনেক ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয় গাছ রোপন করে বনভূমির পরিবর্তন ঘটায়।

পরজীবী গাছ, ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি কোনো অঞ্চলের উদ্ভিদকুলকে আক্রমণ করে এবং তাদের দেহে গুরুতর রোগের সৃষ্টি করে। ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল গাছগুলি সংখ্যায় কমে যায় এবং যে সব গাছ রোগ-প্রতিরোধে সক্ষম হয়, সেগুলিই কেবলমাত্র প্রসার লাভ করে। মাটির মধ্যেকার জীবাণু, কয়েক ধরনের পতঙ্গ, কেঁচো প্রভৃতি বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে মাটির রাসায়নিক ও ভৌত বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তন ঘটায় এবং অঞ্চলটিকে উর্বর বা অনুর্বর করে তোলে। এর ফলে গাছের গঠন ও বন্টনের পরিবর্তন হয়।

অনেক সময় বিভিন্ন প্রজাতির গাছ (যেমন লাইকেল অথবা সেগুমিনাস প্রজাতির গাছ) ও ব্যাকটিরিয়া (যেমন রাইজোবিয়াম) পরস্পরের সান্নিধ্যে ও সাহায্যে বেঁচে থাকে। এই অবস্থাটিকে সাজুয্য বলে। এক্ষেত্রে একটি জীব অন্যটির উপর নির্ভরশীল হয়। সাজুয্যকারী গাছগুলির ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় একটি গাছের অনুপস্থিতিতে অন্যটি বিনষ্ট হয়। পারস্পরিক সম্পর্কের (Mutualism) উদাহরণ হল পরাগমিলন, বীজ ও ফলের বিচ্ছিন্নকরণ, পশুচারণ প্রভৃতি, যার মধ্যে উভয় প্রজাতি সুবিধা ভোগ করে এবং প্রতিটির বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে কমবেশি সম্পর্ক থাকে। উদ্ভিদ ও ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে ও এই পারস্পরিক সম্পর্ক দেখা যায়। বিভিন্ন প্রজাতিদের মধ্যে এই সম্পর্ক উভয়ের জন্যে উপকারী হতে পারে, ক্ষতিকর হতে পারে অথবা একের কাছে উপকারী ক্ষতিকর হতে পারে এবং অন্যের কাছে নিরপেক্ষ (Neutral) হতে পারে।

জীবদের মধ্যে উপরিউক্ত পারস্পরিক সম্পর্ককে অধিকাংশ বাস্তুবিদ্যাবিজ্ঞাণী 'মিথোজীবিত্ব' বা সাজুয্য (Symbiosis) শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার আক্ষরিক অর্থ হল একসাথে বসবাস করা। বিজ্ঞানী Odum (1971) 'symbiosis' শব্দটিকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করতে গিয়ে বিভিন্ন জীবের মধ্যে সব ধরনের সাজুয্যকারী সম্পর্ককে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেন। যথা (a) ধনাত্মক ও (b) ঋণাত্মক মিথস্ক্রিয়া। এই দুইয়ের ক্ষেত্রে দুটি জীব পরস্পরকে সাহায্য করে এবং সুবিধা ভোগ করে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত

হয়। কিন্তু বিজ্ঞানী Clarke (1954) সাজুয্য শব্দটি এমন পারস্পরিক ক্রিয়ার বিষয়ে ব্যবহার করেছেন, যা পরস্পর সুবিধাদায়ক এবং সেখানে এক বা উভয় প্রজাতি সুবিধা ভোগ করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

বিভিন্ন ক্রিয়ার ফলে মানুষ সজীব উপাদান হিসেবে উদ্ভিদকে প্রভাবিত করে। উদ্ভিদের উপরে মানুষের ক্রিয়াকলাপের প্রভাব সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে পারি। যথা— (i) গৃহপালিত ও বন্য জীব— বিভিন্ন গৃহপালিত জীব অরণ্যের গাছগুলিকে ধ্বংস করে। বীজ ও চারাগাছগুলি বিভিন্ন প্রাণীদের দ্বারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিভিন্ন তৃণভুমি জৈব প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, পশুচারণ যার একটি প্রধান অঙ্গ। এমনকি অনেক স্থানে জৈব প্রভাবের দ্বারা শুষ্ক মরু অঞ্চলের সৃষ্টি হয়।

(ii) অতিরিক্ত বৃক্ষচ্ছেদন—মানুষের অত্যধিক বৃক্ষচ্ছেদন করার মাধ্যমে উদ্ভিদের বিকাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(iii) দহন—কৃষিজমি ও জনপদ তৈরির জন্য অরণ্য দহন করা হয় এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

(iv) দেশীয় ও বিদেশি প্রজাতির উদ্ভিদ রোপন—মানুষের প্রয়োজন মতো বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য প্রজাতির গাছ লাগানো হয় এবং বনভূমির বিকাশ ঘটানো হয়।

(v) মানুষ ও দূষণ—মানবসভ্যতার বিভিন্ন ধরনের উন্নতি যেমন মানুষের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সহায়ক ও লাভজনক হয়, তেমনি এই উন্নতির ফলে যে দূষণ হয় তা বিভিন্ন উপায়ে (জল,মাটি ও বায়ু দূষণের দ্বারা) উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশকে বাধা দেয়, এমনকি মেরেও ফেলে।

9.8 সারাংশ

বর্তমান এককটির প্রথমেই উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশ নিয়ন্ত্রণকারী পরিবেশের বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে প্রথমে জলবায়ুগত উপাদানগুলি যেমন, বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত. আর্দ্রতা, উষ্ণতা, সূর্যালোক, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির প্রভাব আমরা আলোচনা করেছি। একইসাথে আগুন উদ্ভিদদেহে কী ভূমিকা পালন করে, তাও বলা হয়েছে। এর পরে আপনারা উদ্ভিদদেহের ক্ষেত্রে ভূপ্রাকৃতিক বিভিন্ন বিষয়গুলির প্রভাব সম্পর্কে জেনেছেন। উদ্ভিদের বিকাশ সৃষ্টিকারী উপাদানগুলির ক্ষেত্রে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মৃত্তিকা। এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি এবং উদ্ভিদজীবনে তাদের প্রভাব সম্পর্কে ও আপনাদের কাছে আলোচনা করা হয়েছে। উদ্ভিদদেহের বিকাশ ও বিনাশে ক্ষেত্রে বিভিন্ন জীবজ উপাদান, যেমন পশুপাখি, জীবাণু ও মানুষের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়েও আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এককটির বিস্তারিত আলোচনা থেকে আপনারা জেনেছেন যে, উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভমিকা পালন করে।

9.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. উদ্ভিদবৃদ্ধির বহিঃপ্রভাবগুলি কী কী?
2. উদ্ভিদের বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণকারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপাদানগুলি কী কী?
3. উদ্ভিদ কী কী উপায়ে জল গ্রহণ করে?
4. উদ্ভিদদেহে জলের ভূমিকা কী কী?
5. উষ্মতার পার্থক্য অনুসারে উদ্ভিদের শ্রেণিবিভাগ করুন।
6. 'ফ্রিজিং ইনজুরি' ও 'চিলিং ইনজুরি' বলতে কী বোঝায়?
7. শৈত্য প্রতিরোধক বা Cold resistant কাকে বলে?
8. 'আলোক স্থায়িত্ব' বা Photoperiodism কী? দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র দিবস উদ্ভিদ' বলতে কী বোঝায়?
9. আলো কী কী উপায়ে উদ্ভিদকে প্রভাবিত করে?
10. Heat injury বলতে কী বোঝায়?
11. 'হেলিওফাইট' ও 'স্কিওফাইট' বলতে কী বোঝায়?
12. Warming কৃত উদ্ভিদের পাঁচটি বাস্তুতান্ত্রিক শ্রেণি উল্লেখ করুন।
13. 'Mull' ও 'Mor' হিউমাস কী?

9.10 উত্তরমালা

1. 9.3 অংশের প্রথম অনুচ্ছেদ দেখুন।
2. 9.3 অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখুন।
3. 9.4.1 অংশের প্রথম অনুচ্ছেদ দেখুন।
4. 9.4.2 অংশের শেষ অংশটি দেখুন।
5. 9.4.3 অংশের অংশ থেকে খুঁজে নিন।
6. 9.4.3 এর (Vii) অংশ দেখুন।
7. 9.4.3 অংশের 'তুহিন/শৈত্য প্রতিরোধক' অনুচ্ছেদ দেখুন।
8. 9.4.4 এর photoperiodism অংশ দেখুন।

9. 9.4.4 অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখুন।

10. 9.4.3 অংশ দেখুন।

11. 9.4.3 এর sun loving ও Shade loving অংশ দেখুন।

12. 9.6 অংশের প্রথম অনুচ্ছেদ দেখুন।

13. 9.6 এর (vii) নং বৈশিষ্ট্য।

9.11 গ্রন্থপঞ্জি

Arora, M. P. 1997 ঃ ECOLOGY; Himalaya Pub, House, Mumbai, Delhi.

Odum, E. P. 1996 ঃ Fundamantals of Ecology; Natraj Publishers, Dehra Dun.

Sharma, P.D. 1984 ঃ Elements of Ecology, Rastogi Publishers, Meerut.

Simmons, I. G. 1981ঃ The Ecology of Natural Resources ELBS Pub. 2nd edition.

Warming, E. 1905 ঃ Oecology of Plants; OUP, Oxford.

মিত্র, দেবব্রত, গুহ,

জীবেশ প্রভৃতি ১৯৮৬ ঃ উদ্ভিদ বিজ্ঞান (২য় খণ্ড) মৌলিক লাইব্রেরি, কলিকাতা।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক 10 ❑ জৈব ভূরাসায়নিক চক্রসমূহ—জীব সংরক্ষণ (Biogeochemical Cycles—Bio-conservation)

গঠন

10.1 প্রস্তাবনা

10.2 উদ্দেশ্য

10.3 জৈব ভূরাসায়নিক চক্রের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

10.4 জৈব ভূরাসায়নিক চক্রের গুরুত্ব

10.5 জৈব ভূরাসায়নিক চক্রের শ্রেণিবিভাগ

10.5.1. জলচক্র বা উদকচক্র

10.5.2 গ্যাসীয় পুষ্টিচক্র

10.5.2.1. কার্বন চক্র

10.5.2.2. নাইট্রোজেন চক্র

10.5.2.3. অক্সিজেন চক্র

10.5.3 পলল প্রকৃতির পুষ্টিচক্র

10.5.3.1. ফসফরাস চক্র

10.5.3.2. সালফার চক্র

10.6 জীব-সংরক্ষণ

10.7 বিভিন্ন শ্রেণির জীব-সংরক্ষণ

(i) বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ—[বনের উদ্ভিদ সংরক্ষণ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ]

(ii) মৎস্য ও সামুদ্রিক উদ্ভিদ সংরক্ষণ—[মৎস্য ও সামুদ্রিক প্রাণী সংরক্ষণ উদ্ভিদ সংরক্ষণ]

10.8 সারাংশ

10.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

10.10 উত্তরমালা

10.11 গ্রন্থপঞ্জি

10.1 প্রস্তাবনা

যে চক্রাকার পথে রাসায়নিক মৌলগুলি পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে আবর্তিত হয় তাকে জৈব-ভূরাসায়নিক চক্র বলে। ফলে জীবদেহ ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক এই চক্রগুলির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে মানুষের বিভিন্ন অবিবেচনাপ্রসূত কাজকর্মের জন্য বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন চক্রগুলিতে সমতা বা ভারসাম্য নষ্ট হয়ে চলেছে এবং জীব ও পরিবেশের সম্পর্ক নিদারুণভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এমনকি বিভিন্ন কারণে জলচক্র বা উদকচক্রও বিঘ্নিত হচ্ছে। এই অংশটিতে কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফসফরাস, সালফার প্রভৃতি চক্র এবং উদকচক্র সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া মানুষের বিভিন্ন অবিবেচনাপ্রসুত ক্রিয়াকলাপের ফলে পৃথিবীর জীব ভাণ্ডারও বিলুপ্ত হয়ে চলেছে। এই সম্পদ ভাণ্ডারকে রক্ষা করার জন্য জীব-সংরক্ষণের প্রয়োজন। এই অংশে অরণ্যের উদ্ভিদ সংরক্ষণ, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, সামুদ্রিক মৎস্য, প্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে।

10.2 উদ্দেশ্য

জৈব-ভূরাসায়নিক চক্র ও জীব সংরক্ষণের উপর লেখা এই এককটি পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন—

- জৈব ভূরাসায়নিক চক্রের ধারণা, প্রকৃতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে
- উদকচক্র সম্পর্কে
- বিভিন্ন গ্যাসীয় প্রকৃতির পুষ্টিচক্রগুলি সম্পর্কে
- পলল প্রকৃতির পুষ্টিচক্রগুলি সম্পর্কে
- বনের উদ্ভিদ ও বন্য প্রাণীদের সংরক্ষণের বিষয়ে এবং
- সামুদ্রিক মৎস্য, প্রাণী ও সামুদ্রিক উদ্ভিদের সংরক্ষণের বিষয়ে।

10.3 জৈব ভূরাসায়নিক চক্রের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

যেসব রাসায়নিক মৌল উপাদানগুলি (Chemical elements) দিয়ে জীবদেহ গঠিত সেসব মৌলগুলিকে জীব তার নিজের পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে সংগ্রহ করে। প্রোটোপ্লাজমের প্রধান উপাদানগুলি সহ রাসায়নিক মৌলগুলি জীবমণ্ডলে পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে আবর্তিত হয়। সুদীর্ঘ সময় জুড়ে দৈহিক বিকাশের সময় জীব মৌলগুলিকে সংগ্রহ করে এবং মৃত্যুর পর রেচন প্রক্রিয়া ও বর্জ্য পদার্থগুলি ত্যাগের মাধ্যমে জীব সেই মৌলিক উপাদানগুলিকে আবার

পরিবেশে বা প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দেয়। এভাবে যে চক্রাকার পথে জীবদেহ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক, মৌলগুলি আবর্তিত হয়, তা জৈব 'ভূরাসায়নিক চক্র' নামে পরিচিত। জীবের জীবনধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় এই অজৈব যৌগ ও অন্যান্য উপাদানগুলির গতিকে পুষ্টিচক্র (Nutrient Cycle) বলে। এই চক্রগুলি জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অজৈব যৌগগুলির পুনর্ব্যবহার এবং প্রাপ্যতাকে নিশ্চিত করে। পৃথিবীতে প্রধানত তিন ধরনের চক্র দেখা যায়। যথা—(i) জলচক্র বা উদকচক্র (ii) গ্যাসীয় পুষ্টিচক্র ও (iii) পলল প্রকৃতির পুষ্টিচক্র।

কয়েকটি শ্রেণিবন্ধ বা অনুক্রমিক সঞ্চয়ের আধার এবং এই আধারগুলির মধ্যবর্তী পথ হিসাবে ভূরাসায়নিক চক্রকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে (ডি. বি. বটকিন ও ই.এ. কেলার, 1982)। গ্যাসীয় প্রকৃতির জৈব ভূরাসায়নিক চক্রের আধারটি বায়ুমণ্ডল ও বারিমণ্ডলে অবস্থান করে এবং পলল প্রকৃতির জৈব-ভূরাসায়নিক চক্রের আধারটি ভূত্বকে অবস্থিত। Furely ও Newey 1983 এর ধারণা অনুসারে ভূরাসায়নিক চক্র বলতে বড়ো আকারের চক্রগুলিকে বোঝায়, যাদের মধ্যে অজৈব পদার্থগুলি থাকে, যেগুলি বিভিন্ন জৈব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় এবং পরে আবার অজৈব অবস্থায় ফিরে আসে। বায়ুমণ্ডল ও পললের সঞ্চয় বা আধার থেকে পাওয়া বিভিন্ন উপাদন বা মৌলগুলি মাটির মধ্যে সঞ্চিত হয়। সঞ্চিত রাসায়নিক বা অজৈব মৌলগুলি আবহবিকার, ক্ষয় ও বহনকারী প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে মাটির নীচে, জলাশয়ে বা সমুদ্রে এসে মিলিত হয়। বায়বীয় পর্যায়ের (Phase) অজৈব উপাদনগুলি বৃষ্টির জলের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল থেকে নেমে এসে মাটিতে মেশে। মাটির ছিদ্রের মধ্যে যে অজৈব মৌল ও খাদ্যমৌলগুলি সঞ্চিত হয়, সেগুলি আবার গাছের শিকড়ের অভিস্রবণের মাধ্যমে দ্রবণীয় অবস্থায় গাছের দেহে প্রবেশ করে। এর পর গাছ এই অজৈব উপাদানগুলিকে এমন কিছু উপাদানে পরিণত করে যে সেগুলি ভূরাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে (প্রধানত সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে) গাছের দেহকোষ ও পেশিগুলিকে উন্নত ও সবল করে এবং সামগ্রিকভাবে গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অর্থাৎ জীব-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্য দিয়ে শক্তি প্রবাহের (Energy flow) দ্বারা খাদ্যমৌলগুলির চলন যে চক্রের মতো গোলাকার পথে ঘটে থাকে, তাকে ভূরাসায়নিক চক্র বলে। সাধারণত প্রকৃতিতে থাকা 90টি উপাদানের মধ্যে প্রায় 30/40 টি সজীব উপাদানের প্রয়োজনে লাগে। এদের মধ্যে কিছু উপাদান (যেমন, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন) বেশি পরিমাণে প্রয়োজন হয়, অন্যগুলি কম পরিমাণে, এমনকি অতি সামান্য পরিমাণেও প্রয়োজন হয়। যে পরিমাণেই প্রয়োজন হোক না কেন, উপাদানগুলি জৈব ভূরাসায়নিক চক্রগুলিকে প্রভাবিত করে।

সাধারণত পাললিক পর্যায় (sedimentary phase) থেকে উদ্ভুত অজৈব উপাদনগুলি মাটি থেকে গাছের শিকড়ের মাধ্যমে পুষ্টিমৌলের দ্রবণরূপে গৃহীত হয়, যা ভূরাসায়নিক চক্রের একটি অন্যতম বিষয়। কিছু পুষ্টিমৌল মাটির সঞ্চয় থেকে ধৌত হয়ে যায় এবং আবার পাললিক পর্যায়ে ফিরে আসে। আবার

কিছু পুষ্টিমৌল এবং অন্যান্য কিছু রাসায়নিক দ্রব্য নদনদীর মাধ্যমে ধৌত হয় এবং পরিশেষে সমুদ্রে গিয়ে মেশে (চিত্র 1)

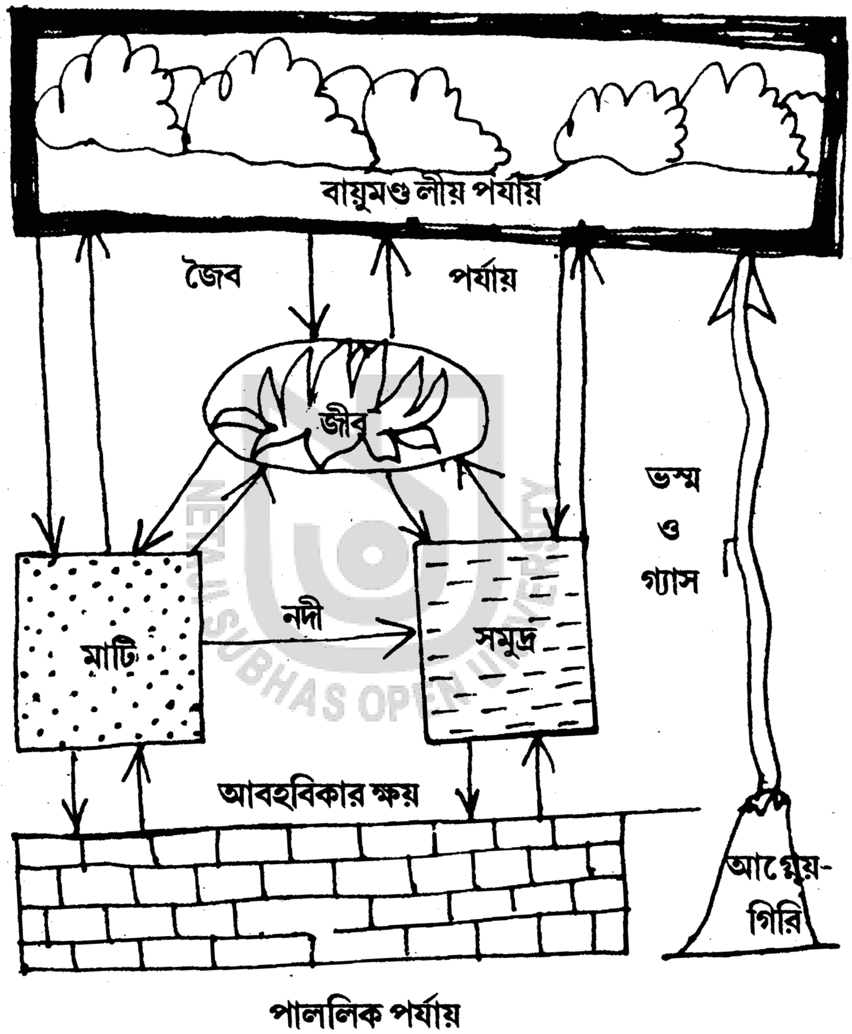

চিত্র 1 ঃ সাধারণ ও সরল জৈব ভূরাসায়নিক চক্র
(ব টবি ও কেলার ওর মতানুসারে1982)

গাছ যে অজৈব উপাদানগুলিকে বা পুষ্টিমৌলগুলিকে গ্রহণ করে সেগুলি শক্তিপ্রবাহের (Energy Flow) মাধ্যমে খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন ট্রফিকস্তরে (Tropical level) পরিবাহিত হয় (চিত্র 2)

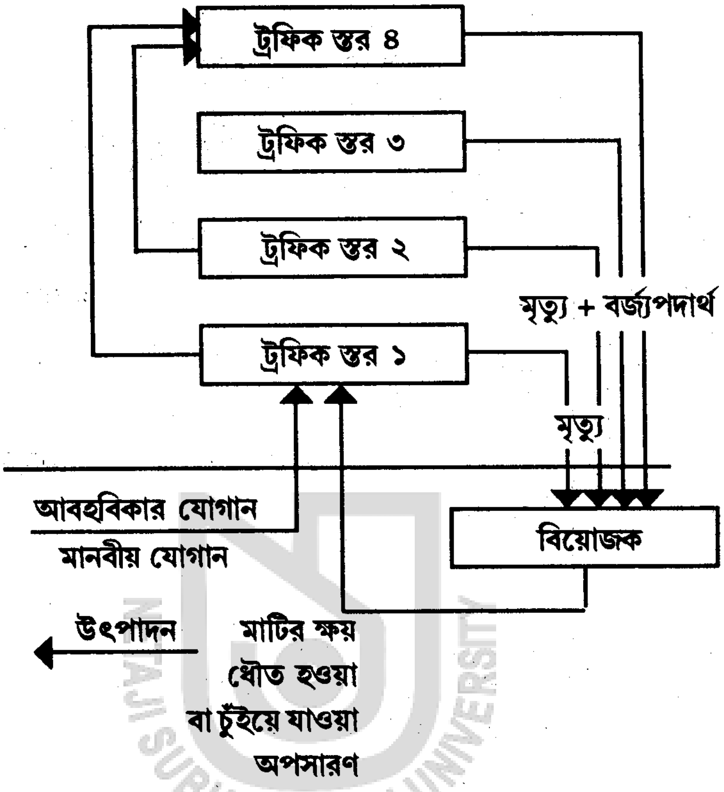

চিত্র 2 ঃ পুষ্টিচক্রের সাধারণ নমুনা
(সি. সি. পার্ক, 1980)

যখন পুষ্টিমৌলগুলি গাছের পেশি গঠনে ও দেহকোষ গঠনে ব্যবহৃত হয়, এবং যখন এগুলি বিভিন্ন ট্রফিক স্তরের অন্তর্গত বিভিন্ন জীবদেহের মধ্যে আবর্তিত হয় ও সঞ্চিত হয়, তখন এই পদার্থগুলি জৈব পদার্থে পরিণত হয় এবং জৈব আধার বা জৈব পর্যায়ের আধারে সঞ্চিত হয়।

নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়ে উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর জৈব উপাদানগুলি নির্গত হয়। যথা—

(A) **বিয়োজকের (প্রধানত ব্যাকটিরিয়া) দ্বারা গাছের পাতা, কাণ্ড ও অন্যান্য অংশ, মৃত পশুপাখির দেহাবশেষ প্রভৃতি বিয়োজনের মাধ্যমে** (চিত্র 3)—Litter layer বা পত্রময় স্তরে স্যাপ্রোফাইটের (যে সব প্রাণী মৃত গাছপালা বা প্রাণীদেহ থেকে উৎপন্ন জৈব-যৌগ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে বাঁচে) মাধ্যমে মৃত জৈব পদার্থগুলির (DOM=Dead Organic Matter) ক্রমিকক্ষয় চিত্রে দেখানো হয়েছে। এই জৈব পদার্থগুলি বিয়োজন বা পচনের মাধ্যমে অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত হয় এবং আবার মাটিতে গিয়ে মেশে।

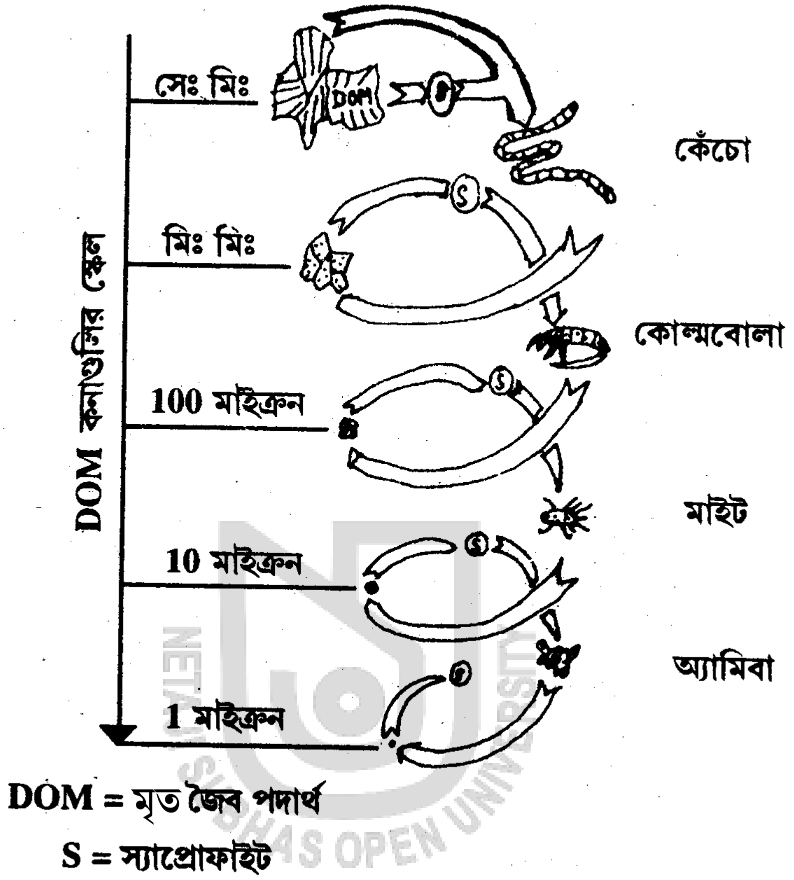

চিত্র 3 ঃ স্যাপ্রোফাইট দারা মৃত জৈব পদার্থের ক্রমিক অবনমন (আই. ডি. সিমনস, 1980)

(B) **বজ্রবিদ্যুৎ, দুর্ঘটনাজনিত দাবানল অথবা মানুষের ইচ্ছাকৃত অগ্নিসংযোগের ফলে অরণ্য দহনের মাধ্যমে**—পুড়ে যাবার ফলে জৈব পদার্থের অংশগুলি বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয় এবং অধঃক্ষেপনের প্রভবে ভূভাগে পতিত হয় এবং পুনরায় দ্রবণীয় অজৈব পদার্থে পরিণত হয়ে মাটির আধার বা Soil Storage এ মিলিত হয়।

(C) **বিভিন্ন জীবের পরিত্যক্ত বা বর্জ্য পদার্থগুলি** (গোবর, মূত্র ইত্যাদি) বিয়োজক (decomposer) ও জীবাণু (microbe) দ্বারা বিশ্লেষিত হয় এবং পুনরায় অজৈব উপাদানে রূপান্তরিত হয়। এই অজৈব উপাদানগুলি আবার দ্রবণীয় অবস্থায় Soil Storage বা মাটির আধারে সঞ্চিত হয় (চিত্র 4)।

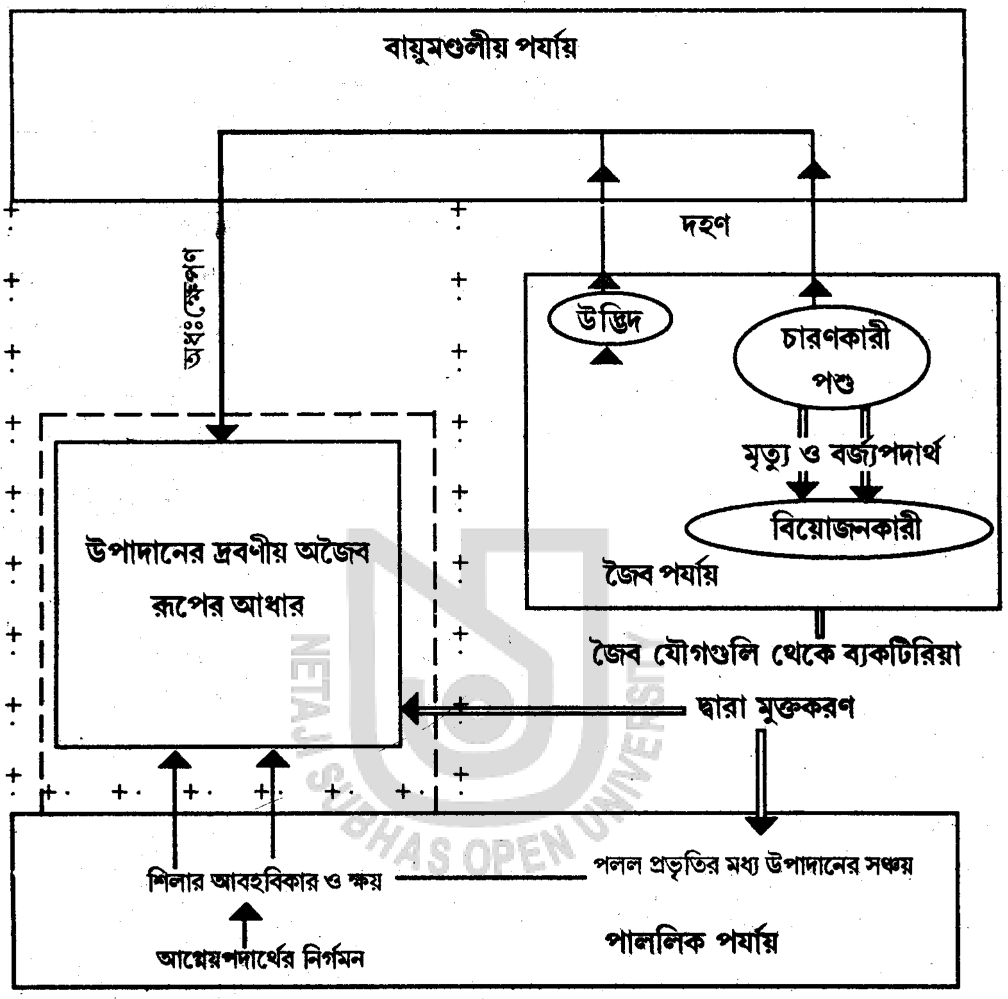

চিত্র 4 ঃ জৈব-ভূরাসায়নিক চক্রের নক্‌শা
(ডব্লু. বি. ক্ল্যাপহাস (১৯৭৩) এর মতানুসারে)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দ্রবণীয় অজৈব পদার্থের (রাসায়নিক পুষ্টিমৌল) চলন ও আবর্তন ভূরাসায়নিক চক্রের অপরিহার্য অঙ্গ। অজৈব এই পদার্থগুলি পাললিক ও বায়বীয় পর্যায় থেকে পাওয়া যায়, যা সজীব উপাদানগুলির জৈবপর্যায়ের মাধ্যমে অবশেষে অজৈব অবস্থায় ফিরে আসে। দুটি ভিন্ন উপায়ে ও মাত্রায় ভূরাসায়নিক চক্র আলোচিত হতে পারে। যথা (i) একসাথে সমস্ত উপাদানগুলির ক্রোকার আবর্তন ও (ii) স্বতন্ত্র উপাদানগুলির চক্রাকার আবর্তন—যেমন হাইড্রোজেন চক্র, কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র প্রভৃতি। এছাড়া উদক চক্র, পলল চক্র ও ধাতব চক্রগুলি বিস্তারিতভাবে ভূরাসায়নিক চক্রের মধ্যে আলোচিত হয়ে থাকে।

10.4 জৈব ভূরাসায়নিক চক্রের গুরুত্ব

কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P), ক্যালসিয়াম (Ca), সালফার (S) প্রভৃতি মৌলগুলি জীবদেহকোষের তথা প্রাটোপ্লাজমের প্রাথমিক উপাদান। এসব মৌলগুলির অভাব জীবকোষকে ভালোভাবে গঠিত হতে দেয় না। ফলে জীবদেহ গঠনের জন্য এই মৌলগুলির জীবদেহে আমরণ যোগানের প্রয়োজন আছে। জীব পরিবেশ থেকে এই সংগ্রহ করে। গাছ শিকড়ের সাহায্যে রস শোষণের মাধ্যমে মাটি থেকে মৌলগুলিকে খনিজ লবণের আকারে গ্রহণ করে। আমরা উক্ত উদ্ভিদ খাদ্য মৌলগুলিকে জল, দুধ ও লবণের মাধ্যমে আমাদের দেহে খাদ্য ও পানীয়রূপে গ্রহণ করি। তৃণভোজী প্রাণীগুলি গাছকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণের মাধ্যমে এবং মাংসাশী প্রাণীগুলি তৃণভোজী প্রাণীগুলিকে খেয়ে তাদের দেহে খাদ্য বা পুষ্টি মৌলগুলির যোগান অব্যাহত রাখে। সুতরাং জীবেরা যদি কেবলমাত্র পুষ্টিমৌল উপাদানগুলিকে পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করে যেত এবং অন্যদিকে পরিত্যাগ না করতো বা পরিবেশে ফিরিয়ে না দিত, তাহলে এমন এক সময় আসতো যে, পরিবেশের মধ্যে উক্ত উপাদানগুলিকে আর পাওয়া যেত না, অর্থাৎ এগুলি নিঃশেষিত হয়ে যেত। ফলে জীবের জীবনচক্র (Life Cycle) হয়তো প্রভাবিত হত এবং একসময় হয়তো পৃথিবীতে কোনো জীব আর বেঁচে থাকতে পারতো না; এসব রাসায়নিক উপাদানগুলির মধ্যে ভারসাম্যের অভাব দেখা দিলে পৃথিবীতে জীবেরধ্বংস অনিবার্য হত।

সুতরাং বলা যায় যে, 'জৈব-ভূরাসায়নিক চক্র' কোনো একটি বিশেষ পরিবেশে জীবের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এই চক্রের মাধ্যমেই পরিবেশে ও প্রকৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ মৌলগুলির স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য বজায় থাকে।

10.5 জৈব-ভূরাসায়নিক চক্রের শ্রেণিবিভাগ

সাধারণত জৈব-ভূরাসায়নিক চক্র হয় তিন শ্রেণির। যথা—

(1) জলচক্র বা উদকচক্র (Hydrological Cycle)

(2) গ্যাসীয় পুষ্টিচক্র (Gaseous Nutrient Cycles)

(3) পলল প্রকৃতির পুষ্টিচক্র (Sedimentary Nutrient Cycle)

অধিকাংশ জীবের জীবন নির্ভর করে জল, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের প্রতিনিয়ত গ্যাসীয় আবর্তনের উপর। এই চক্রগুলির মধ্যে একটি গ্যাসীয় পর্যায় আছে এবং একটি স্বাভাবিক গ্রহণকারী ও ত্যাগকারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগুলি পরিচালিত। সাধারণত এই চক্রগুলি প্রকৃতিতে ভারসাম্য বজায় রাখে এবং একটি পথ দিয়ে কোনো একটি উপাদান বৃদ্ধি পেলে অন্য একটি পথ দিয়ে উপাদানটির ক্ষয় হয় এবং এভাবে

উপাদানটির ভারসাম্য বজায় থাকে। অবশ্য মানুষের বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ এই ভারসাম্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে অর্থাৎ ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেমন জীবমণ্ডলে কীটনাশক ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহার নাইট্রোজেন চক্রে ভারসাম্যের ক্ষতি করে। বায়ুমণ্ডলে কলকারখানা ও গাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়া (যেমন কার্বন) কার্বন চক্রের ভারসাম্য নষ্ট করে। পলল প্রকৃতির চক্রের ক্ষেত্রে জীবমণ্ডল থেকে মৌল উপাদানগুলির প্রতিটি পরিত্যক্ত হয় এবং সমুদ্রে সঞ্চিত হয়। কিন্তু সমুদ্র থেকে স্থলভাগে এগুলি খুব ধীরে ধীরে আবার ফিরে আসে। জৈবিক পরিবহনের মাধ্যমে (যেমন সামুদ্রিক পাখিদের মলমূত্র ত্যাগের ফলে) শিলার আবহবিকারের মাধ্যমে এবং আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা নির্গমনের মাধ্যমে মৌল উপাদানগুলি সমুদ্র থেকে স্থলভাগে ফিরে আসে।)

গাছ বায়ুমণ্ডল থেকে শ্বসনের উদ্দেশ্যে CO_2 গ্রহণ করে এবং মানুষ ও পশুপাখি শ্বসনের জন্য বায়ু থেকে অক্সিজেন O_2 গ্রহণ করে। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রায় 77% নাইট্রোজেন থাকা সত্ত্বে জীবজন্তু ও উদ্ভিদ তা সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। উদ্ভিদ পরোক্ষভাবে মাটি থেকে নাইট্রেট, নাইট্রাইট ও অ্যামেনিয়াম ঘটিত লবণরূপে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন পশুপাখি উদ্ভিদদেহ থেকে এই নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণী বায়ুমণ্ডল থেকে সবসময় কার্বন ডাই-অক্সাইড (0.03%) অক্সিজেন (21%) ও নাইট্রোজেন (77%) ব্যবহার করলেও বায়ুমণ্ডলে বা মাটিতে এদের ঘাটতি হয় না। প্রকৃতি জৈব-ভূরাসায়নিক চক্রগুলির মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই এই ভারসাম্য রক্ষা করে।

→

10.5.1 জলচক্র বা উদকচক্র

জল হল প্রকৃতির একটি অতি অমূল্য দান এবং বাস্তবিদ্যাসংক্রান্ত উপাদানগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জীবেরা বিভিন্ন কারণে জলের প্রয়োজন অনুভব করে, যদিও কোনো বিশেষ শ্রেণির জীবের ক্ষেত্রে জলের পরিমাণ ও মান অন্যান্য জীবের চেয়ে আলাদা।

অধঃক্ষেপনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি যেমন, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি, গুঁড়ি বৃষ্টি প্রভৃতির মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল থেকে ভূপৃষ্ঠে জল পতিত হয়। বিভিন্ন নদনদীর মাধ্যমে এই জল হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতি সুবিশাল জলভাগগুলিতে পরিবাহিত হয় ও সঞ্চিত হয়। আবার সূর্যের তাপে ওই সঞ্চিত জল বাষ্পীভূত হয়ে ঊর্ধ্বাকাশে জলাভাগগুলিতে পরিবাহিত হয় ও সঞ্চিত হয়। আবার সূর্যের তাপে ওই সঞ্চিত জল বাষ্পীভূত হয়ে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে পড়ে। মাটির অসংখ্য ছিদ্রের মধ্যে এবং এমনকি গাছপালার দেহের ছিদ্রগুলির মধ্যে জল সঞ্চিত হয়ে থাকে। গাছের দেহ থেকে সূর্যতাপে যে জল মোচন হয় তা 'বাষ্পমোচন' নামে পরিচিত। জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ঊর্ধ্বাকাশে মেঘের সৃষ্টি হয় এবং একসময় বৃষ্টিপাত, তুষারপাত প্রভৃতি অধঃক্ষেপণকারী প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। চক্রের আকারে ভূপৃষ্ঠে অবস্থানকারী জলের বাষ্পীভবন ও ঊর্ধ্বগমন এবং ঊর্ধ্বাকাশ থেকে জলীয় বাষ্পের তরলীভবনের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে আগমন এককথায় জলচক্র বা উদকচক্র নামে পরিচিত।

যে কোনো উদ্ভিদ বা জীবজন্তুর জীবনধারণের ক্ষেত্রে উদকচক্র বা জলচক্র একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক। জীবনচক্রের (Life Cycle) প্রয়োজনে ভূপৃষ্ঠে জল খুব কম পরিমাণে অবস্থান করে। জলচক্রের বিভিন্ন ক্রিয়াগুলির মাধ্যমে জল জীবদেহের কাজে লাগে। প্রকৃতপক্ষে এই জলচক্র সৌর বিকিরণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যার প্রভাবে নদী, হ্রদ, সমুদ্র ও সজীব উপাদানগুলির দেহ থেকে জলবাষ্পীভূত হয়। ভূপৃষ্ঠে সমস্ত অধঃক্ষেপিত জলের উৎস হল বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প। বায়ুমণ্ডল থেকে জল বা তুষার অধঃক্ষেপিত হয়ে ভূপৃষ্ঠের জীবমণ্ডলে ব্যবহৃত হয়। ভূপৃষ্ঠে বা ভূগর্ভের জল বাষ্পীভবনের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং জলচক্রটি পুনরায় কাজ করে। জলচক্রের ক্ষেত্রে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে আচ্ছাদনকারী বস্তুগুলি অতিরিক্ত বাষ্পীভবনকে বাধা দেয় এবং উদ্ভিদ ও জীবজন্তুকে আর্দ্রতার স্বাভাবিক প্রয়োজনের তুলনায় কম আর্দ্রতাযুক্ত অবস্থায় বাঁচতে সাহায্য করে।

নিম্নলিখিত উপায়ে জলের সম্পূর্ণ আবর্তন (যা পরিবেশে জলের সংরক্ষণকে প্রভাবিত করে) কাজ করে।

যথা— (i) বৃষ্টিপাত ও তুষারপাতরূপে অধঃক্ষেপণ,

(ii) বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে অতি দ্রুত জলের পুনরাগমন,

(iii) নদী, হ্রদ ও সমুদ্র থেকে বাষ্পীভবন।

(iv) উদ্ভিদদেহ থেকে বাষ্পমোচন,

(v) জীবদেহ থেকে বাষ্পীভবন,

(vi) নদী ও ভৌমজল থেকে জলনিকাশ।

নীচের চিত্রটিতে (চিত্রর) জলচক্র কয়েকটি পর্যায় দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে কোন্ কোন্ অঞ্চল থেকে জল বাষ্পীভূত হয়ে উর্ধ্বাকাশে ওঠে, কীভাবে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি হয় এবং মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত রূপে জল কীভাবে মাটিতে নেমে আসে। ভূপৃষ্ঠে পতিত জল নদীনালার মাধ্যমে সমুদ্রে বা হ্রদে এসে সঞ্চিত হয় এবং এই জলের কিছু অংশ চুঁইয়ে মাটিতে থাকা অসংখ্য ছিদ্র দিয়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করে এবং মাটির ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে অবশেষে হ্রদ, সমুদ্র বা অন্য কোনো জলভাগে গিয়ে মেশে। তাই দেখা যায় যে, সূর্যালোক ও অভিকর্ষ—এই দুটি উপাদান জলচক্রের ক্ষেত্রে শক্তি যোগায়। কারণ সূর্যালোক জলকে উত্তপ্ত করে এবং বাষ্পীভবনের শক্তি যোগায়, আর অভিকর্ষ জলবিন্দুগুলিকে ভূপৃষ্ঠ টেনে আনে এবং মাটির নীচে চুঁইয়ে যেতে সাহায্য করে।

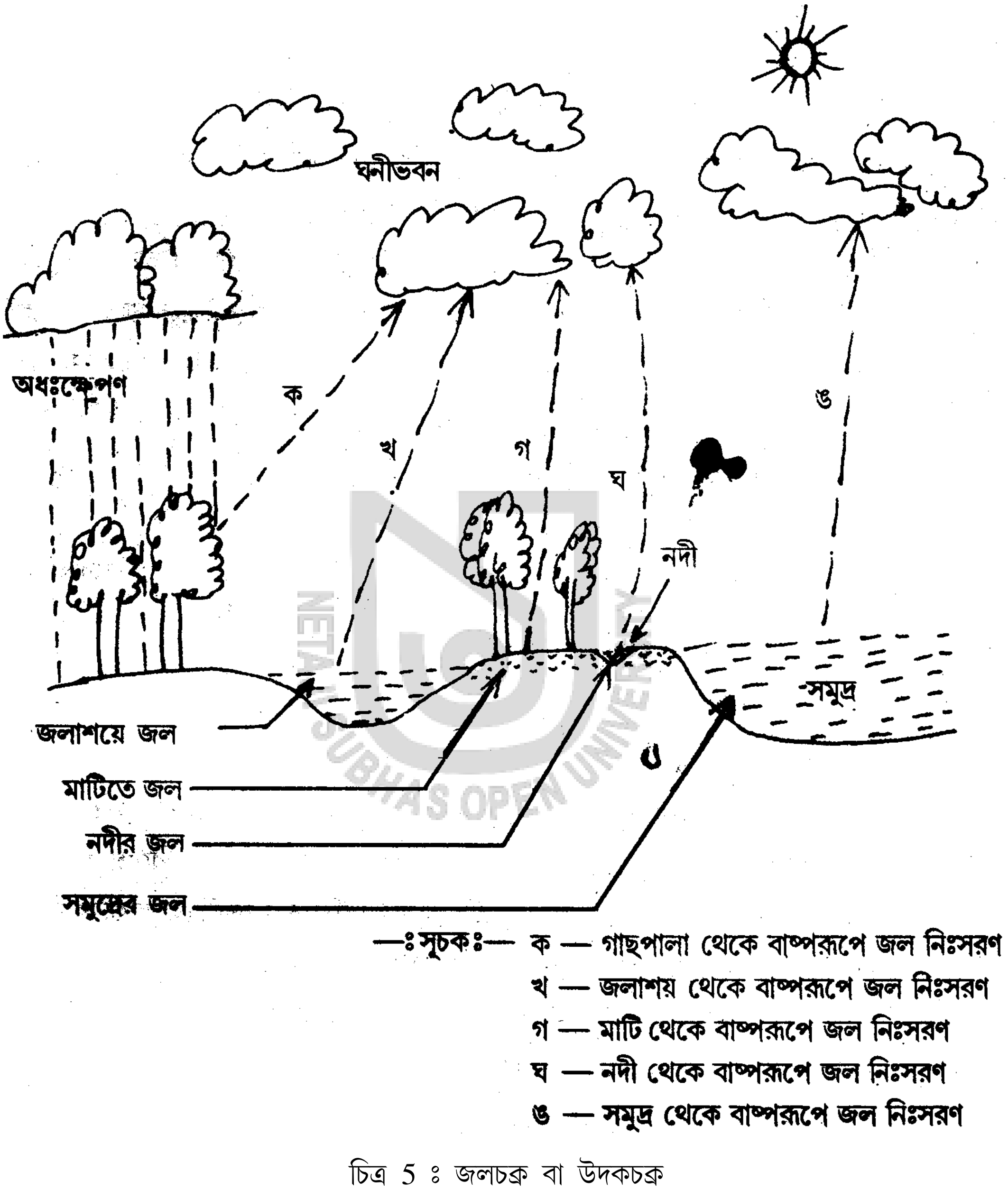

চিত্র 5 ঃ জলচক্র বা উদকচক্র

10.5.2 গ্যাসীয় পুষ্টিচক্র

বায়ুমণ্ডল হল গ্যাসীয় রূপে অবস্থানকারী উপাদানগুলির প্রধান আধার। বিভিন্ন পদার্থের বন্টন ও পরিমাণের ক্ষেত্রে গ্যাসীয় চক্রগুলি খুবই কম স্থায়ী পরিবর্তন ঘটায় বা প্রায় কোনো পরিবর্তন

ঘটায় না। নাইট্রোজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি চক্রগুলি গ্যাসীয় পুষ্টিচক্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

অক্সিজেন গ্যাসটি সালোকসংশ্লেষের উপজাত দ্রব্য (By Product) । জীবেরা তাদের পরিবেশ (বায়ু ও জল) থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। শ্বাসকার্যের সময় জীবিত কোষগুলিতে খাদ্যের জারণে অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। জল (H_2O) কার্বন ডাই-অক্সাইড (O_2) ও শক্তি (energy) উৎপাদনে অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। ফলে শ্বসনের সময় যে অক্সিজেন জীবদেহে গৃহীত হয়, তা বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড রূপে ফিরে আসে। শর্করা (Carbohydrate) উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল হিসাবে সবুজ গাছের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া চলার সময় অক্সিজেন মুক্ত হয়। ফলে শ্বসনের মাধ্যমে ও পত্ররন্ধ্রের সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে অক্সিজেন জীবদেহে প্রবেশ করে। উদকচক্রও পরোক্ষভাবে কার্বনচক্রের সাথেও অক্সিজেন সম্পর্কিত। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাই অনেকক্ষেত্রে এই গ্যাসীয় উপাদানগুলিকে একটি বিষয়ের অধীনে (কার্বন-হাইড্রোজেন-অক্সিজেন চক্র) পাঠ করা হয়ে থাকে।

এবার গ্যাসীয় চক্রের অন্তর্গত কার্বণ চক্র, নাইট্রোজেন চক্র ও অক্সিজেন চক্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যাক।

10.5.2.1 কার্বন চক্র

বিভিন্ন রাসায়নিক পুষ্টিচক্রের মধ্যে কার্বন চক্রই হল সবচেয়ে সহজ ও সরল। যে পদ্ধতিতে প্রকৃতির মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে আবর্তিত হয় এবং পরিবেশে কার্বনের সমতা বজায় রাখে তাকে কার্বনচক্র বলে। (চিত্র 6)। প্রকৃতিতে কার্বনের মূল উৎস হল বায়ুমণ্ডলে থাকা কার্বন ডাই-অক্সাইড (0.03%)। প্রকৃতির মোট কার্বনের বেশির ভাগ অংশেরই আধার হল সমুদ্র বা জলভাগ। এই সমুদ্রে প্রধানত এই কার্বনের যৌগরূপে কার্বন দ্রবীভূত অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। যদিও বায়ুমণ্ডলের মোট কার্বনের প্রায় 50 গুণ বেশি কার্বণ সমুদ্রের মধ্যে থাকে এবং সমুদ্রের এই কার্বনের ভাণ্ডার বায়ুমণ্ডলে থাকা কার্বনের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে, তবুও কার্বন চক্রটি জীব ও বায়ুমণ্ডলে থাকা কার্বনের মধ্যেই আবর্তিত হয়।

বাস্তুতন্ত্রে (Ecosystem) কার্বন চক্রের প্রবাহ নিম্নলিখিত উপায়ে ঘটে থাকে—বায়ুমণ্ডলের কার্বন (CO_2) উৎপাদক উদ্ভিদ বা স্বভোজীদের (autotroph) দ্বারা শোষিত হয়। উৎপাদক থেকে প্রথম স্তরের খাদক, প্রথম স্তরের খাদক থেকে দ্বিতীয় স্তরের খাদক, দ্বিতীয় স্তরের খাদক থেকে বিয়োজক জীব এবং বিয়োজক জীব থেকে আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায় এবং চক্রটি এভাবে সম্পূর্ণ হয়। হিসেব করে দেখা গেছে যে, উৎপাদক বা সবুজ গাছ সালোকসংশ্লেষের জন্যে $4.9 x 10^{13}$ কি: গ্রা: কার্বন ডাই-অক্সাইড সংবন্ধন করে

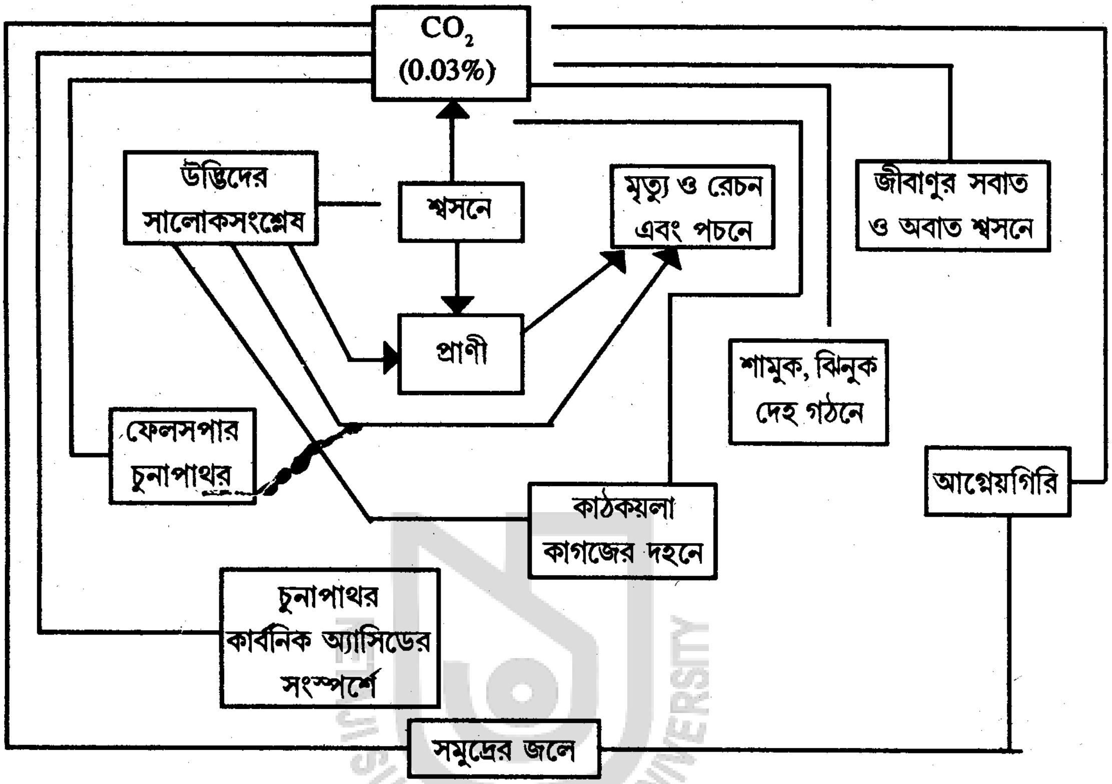

চিত্র 6 ঃ কার্বন চক্র

(fixation)। জৈব উপায়ে সংস্থাপিত (fixed) কার্বনের একটি অংশ CO_2 রূপে উৎপাদক ও খাদকের শ্বসনপদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। আবার বিভিন্ন পুষ্টিস্তরের (Trophic levels) বিয়োজকদের দ্বারা কার্বনে বেশির ভাগ অংশ বায়ুতে গিয়ে মেশে।

জীবমণ্ডলে বিভিন্ন পথে চলনশীল কার্বনের সঞ্চয় ও চলনের ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায় আছে। যথা (i) গ্যাসীয় পর্যায়— যে পর্যায়ে কার্বন বায়ুমণ্ডলে গ্যাসরূপে অবস্থান করে,(ii) পর্যায়—যে পর্যায়ে কার্বন পললের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানিতে ও জৈব পদার্থে অবস্থান করেও (iii) তরল পর্যায়—যে পর্যায়ে জলের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। কঠিন ও তরল রূপে কার্বনের চলন এবং গ্যাসীয় রূপে কার্বন ডাই-অক্সাইড চলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলি প্রায় 50 শতাংশ জৈব পদার্থ (শুষ্ক ওজন অনুসারে) তৈরি করে এবং জীবমণ্ডলে এদের চলন শক্তিপ্রবাহের (Energy flow) দ্বারা ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ (P.A. Fureley & W.W Newey. 1982)।

কার্বন চক্রের (যা প্রকৃতপক্ষে জীবমণ্ডলে কার্বনের আবর্তন সম্পর্কিত) মধ্যে দুটি পথ বা চক্র রয়েছে। যথা, (a) গ্যাসীয় পথ বা চক্র—যার মধ্যে CO_2 রূপে কার্বনের চলন দেখা যায় এই CO_2 মুক্ত কার্বনের

চলন দেখা যায়। এই CO_2 মুক্ত গ্যাসরূপে বায়ুমণ্ডলে দেখা যায় এবং সমুদ্রজলে বা স্থলভাগের জলে দ্রবীভূত গ্যাসরূপে দেখা যায়। (b) অগ্যাসীয় বা অজৈব পথ বা চক্র—এর মধ্যে কার্বনের কঠিন পর্যায় আছে, যে পর্যায়ে জৈব পদার্থের মধ্যে শর্করা-অনুরূপে (CH_2O) কার্বন অবস্থান করে, ভূত্বকের শিলার মধ্যে হাইড্রোজেন যৌগরূপে থাকে এবং খনিজ কার্বনেট যৌগরূপে ($CaCO_3$) থাকে।

হিসাব করে দেখা গেছে যে, বছরে প্রায় ৪ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুতে প্রবেশ করে। এই ৪ বিলিয়ন টনের মধ্যে 6 বিলিয়ন টন জ্বালানি থেকে ও আকস্মিক দহনের ফলে এবং বাকি 2 বিলিয়ন টন কৃষিকাজের ফলে উৎপন্ন হয়। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশির ভাগ অংশ সমুদ্রের জলে শোষিত হয়ে বাই কার্বনেট রূপে জমা হয়। বায়ু ও সমুদ্রের জলের কার্বন ডাই-অক্সাইডের আদান-প্রদান ক্রিয়া চলে এবং বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের দিকে তা প্রবাহিত হয়। অধঃক্ষেপ (Percipitation) পদ্ধতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের জলজ পর্যায় সম্পন্ন হয়। এক লিটার জলে 0.3 সি: সি: কার্বন ডাই-অক্সাইড বাস্তুতন্ত্রের জলের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3) উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়া সবসময় বিপরীতমুখী হয়। কার্বনিক অ্যাসিড এই বিপরীতমুখী বিক্রিয়ায় H^+ এবং HCO_3 —আয়নে ভেঙে যায়। বিক্রিয়ার সমীকরণটি হল—বায়ুস্থিত কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)

দ্রবীভূত $CO_2 + H_2O \quad H_2CO_3 - H^+ + HCO_3$

$HCO_3 - H^+ + CO_3$

জীবদেহের কোষ গঠনের জন্য ও গাছের সালোকসংশ্লেষের জন্য কার্বনের প্রয়োজন হয়। সবুজ গাছেরাই কেবলমাত্র বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি CO_2 শোষণ করতে পারে। সালোকসংশ্লেষের সময় গাছ বায়ুর CO_2 থেকে কার্বনের আত্তীকরণ (assimilation) ঘটায়, ফলে গাছের দেহে কার্বন সমন্বিত যৌগ [প্রথমে ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (PGA) এবং পরে শর্করা বা $C_6H_{12}O_6$] উৎপন্ন হয়। প্রাণীরা গাছের তৈরি উক্ত কার্বন সমন্বিত যৌগকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। জীবদেহে দহনক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন যৌগ (Glucose) থেকে আবার CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়ে পরিবেশ বা প্রকৃতিতে ফিরে যায়। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের মৃত্যুর পর জীবাণু দ্বারা বিয়োজিত হয়ে পরিবেশের মধ্যে কার্বন মুক্ত হয়। সুতরাং পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে CO_2 গ্যাসরূপে আবর্তন চলতে থাকে।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের উৎস—

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রধান প্রধান উৎসগুলি হল—(i) জীবের শ্বসন প্রক্রিয়ার সময় উৎপন্ন CO_2, (ii) বিভিন্ন রকমের জৈব পদার্থের (কাঠ, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, কেরোসিন, রবার প্রভৃতি) দহনের ফলে উৎপন্ন CO_2, (iii) মৃত জীবদেহ ও অন্যান্য জৈব বস্তুর পচনের ফলে উৎপন্ন CO_2 ।

কয়েক রকমের জীবাণুর শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(i) আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের সময় উৎপন্ন CO_2।

সমুদ্রে বা জলভাগে কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রধান প্রধান উৎপন্নগুলি হল—(i) বায়ুমণ্ডল থেকে সমুদ্রে জলে দ্রবীভূত CO_2।

(ii) চুনজাতীয় পদার্থের আস্তর (Lime deposits) থেকে উৎপন্ন CO_2 – CO_2 মিশ্রিত জল যে কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3) উৎপন্ন করে, তা চুনাপাথরকে ক্ষয় করে। চুনাপাথর ($CaCO_3$) অ্যাসিডের সংস্পর্শে এলে CO_2 উৎপন্ন হয়। ফেলসাপার পাথর বায়ু থেকে CO_2 শুষে নিয়ে ধাতব কার্বনেট গঠন করে এবং তা আবার ক্ষয়ীভূত হয়ে CO_2 উৎপন্ন হয়।

(iii) উষ্ম প্রস্রবণ থেকে ভূপৃষ্ঠে নির্গত CO_2।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমতা বা ভারসাম্য—

প্রকৃতিতে বা পরিবেশে নিম্নলিখিত উপায়ে CO_2-এর সমতা বা ভারসাম্য বজায় থাকে। যথা—

(i) স্থলজ সবুজ গাছ বায়ুমণ্ডল থেকে এবং জলজ সবুজ গাছ জলভাগ থেকে CO_2 গ্রহণ করে এবং সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় গাছ নিজ দেহে কার্বন সমন্বিত যৌগ গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। বিভিন্নপ্রাণী আবার ওই কার্বন যৌগিক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং বৃদ্ধি পায়।

(ii) উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বসনে দেহের কার্বন সমন্বিত যৌগ গ্লুকোজ জারিত হয়, ফলে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়ে প্রকৃতিতে ফিরে যায়।

(iii) উদ্ভিদজাত বিভিন্ন পদার্থ যেমন কাঠ, কয়লা, কাগজ ইত্যাদি এবং কিছু প্রাণীজাত জ্বালানি যেমন, পেট্রোলিয়াম, কেরোসিন, ডিজেল প্রভৃতির দহনে কার্বন যৌগ ভেঙে CO_2 উৎপন্ন হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়।

(iv) উদ্ভিদ ও প্রাণীদের রেচন পদার্থ এবং মৃতদের জীবাণু বা বিয়োজকদের দ্বারা বিয়োজিত হয়ে যে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়, তা বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়।

(v) মাটিতে থাকা বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি জীবণুদের অবাত ও সবাত শ্বসনে যে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয় তা বায়ুমণ্ডলে মেশে।

(vi) আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের সময় লাভা, ভস্ম, ধোঁয়া বাষ্প প্রভৃতির সাথে CO_2 নির্গত হয় ও বায়ুতে মেশে।

(vii) উষ্ম প্রস্রবণের সাথেও অনেক সময় CO_2 নির্গত হয় ও বায়ুতে মিশে যায়।

(viii) জলজ খোলসজাতীয় প্রাণী যেমন শামুক, ঝিনুক প্রভৃতির দেহের খোলসে কার্বনেট থাকে এবং প্রাণীগুলির মৃত্যুর পর অথবা এদের দহনের সময় নানারকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়ে জলে মিশে যায়। এভাবে জলে CO_2 এর পরিমাণ ঠিক থাকে।

(ix) ফেলসপার, চুনাপাথর প্রভৃতি বায়ুমণ্ডল থেকে যে CO_2 শোষণ করে এবং ধাতব কার্বনেট তৈরি করে, তা আবার অ্যাসিডের সংস্পর্শে বিক্রিয়ার মাধ্যমে CO_2তে পরিণত হয় এবং পরিবেশে বা বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হয়।

(x) বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর পরিমাণ বেশি থাকলে CO_2 ও CO_2 সমুদ্রের জলে মেশে, আবার বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর পরিমাণ কম থাকলে সমুদ্রজলের CO_2 বায়ুমণ্ডলের সাথে যুক্ত হয়।

সুতরাং উপরিউক্ত বিভিন্ন উপায়ে প্রকৃতিতে বা পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইডের যোগানের প্রবাহ বজায় থাকে। প্রধানত জীবের শ্বসন ও খনিজের দহনের ফলে প্রকৃতিতে CO_2 -এর ভাণ্ডার গড়ে ওঠে। আবার প্রধানত সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে উদ্ভিদ দেহে যে CO_2 শোষিত হয় তার মাধ্যমে প্রকৃতিতে CO_2 -এর ভারসাম্য বা সমতা বজায় থাকে।

কার্বন চক্রের তাৎপর্য

কার্বন চক্রের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশে কার্বনের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং প্রকৃতিতে কার্বনের ভাণ্ডার কখনো শূন্য হয় না। ফলে বিশ্বে জীবকুলের অস্তিত্ব ভালোভাবে বজায় থাকে।

নিম্নলিখিত দুটি কার্বন চক্র সম্পন্ন হয়। যথা —

(i) পরিবেশ থেকে জীবদেহে কার্বনের প্রবেশ—(a) জলজ ও স্থলজ গাছগুলি সালোকসংশ্লেষের জন্য বায়ুমণ্ডলের CO_2 শোষণ করে। (b) শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি প্রাণীরা যে CO_2 শোষণ করে, তা কার্বনেটে রূপান্তরিত করে দেহ গঠনের জন্য ব্যবহার করে। (c) ফেলসপার, চুনাপাথর প্রভৃতি বায়ুর CO_2 শোষণ করে বিভিন্ন ধাতব কার্বনেট গঠন করে।

(ii) জীবদেহ ও অন্যান্য স্থান থেকে কার্বনের পরিবেশে ফিরে আসার পদ্ধতি— (a) উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর শ্বসনের সময় উৎপন্ন CO_2 পরিবেশে ফিরে আসে। (b) বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থের দহনের ফলে উৎপন্ন CO_2 পরিবেশে ফিরে আসে। (c) উদ্ভিদ ও জীবজন্তু মৃত্যুর পর বিয়োজক দ্বারা বিয়োজিত হয়ে জৈব কার্বন CO_2 রূপে পরিবেশে ফিরে আসে (d) আগ্নেয়গিরি ও উষ্ম প্রস্রবণ থেকে নির্গত CO_2 বায়ুতে ফিরে আসে।

কার্বন চক্রের ভারসাম্য রক্ষিত না হলে জীবকুলের অস্তিত্ব বিপর্যস্ত হওয়া সম্ভব। কার্বনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকলে গাছের সালোকসংশ্লেষ বিঘ্নিত হতে পারে। আবার বায়ুতে অত্যধিক কার্বন গ্যাস থাকলে বায়ুদূষণের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন ফুসফুসজনিত বা অন্যান্য রোগ ব্যাধি হতে পারে, ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়তে পারে ও ফলে মেরুপ্রদেশের বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রের জলের উচ্চতা বাড়তে পারে এবং বহু স্থান প্লাবিত হতে পারে । তাপমাত্রা বাড়ার ফলে বাষ্পীভবন বা বাষ্পমোচন বেড়ে গিয়ে জীবের জন্ম, বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রভাবিত হতে পারে।

10.5.2.2 নাইট্রোজেন চক্র (NITROGEN CYCLE)

প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের একটি অপরিহার্য উপাদান হল প্রোটিন। নাইট্রোজেন প্রোটিনের একটি প্রধান উপাদান। প্রোটিন দিয়ে জীবদেহ গঠিত হয় বলে জীবের দেহকোষ গঠনের জন্য নাইট্রোজেনের (N_2) একান্ত প্রয়োজন। নাইট্রোজেনজাত পদার্থের জন্যে প্রাণীজগৎ সম্পূর্ণভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন প্রাণী উদ্ভিদ প্রোটিন আহার্যরূপে গ্রহণ করে প্রাণীজ প্রোটিনে রূপান্তরিত করে। প্রকৃতপক্ষে প্রোটিন সৃষ্টিকারী অ্যামাইনো অ্যাসিডের অন্যতম অংশ হল নাইট্রোজেন এবং তাই সমস্ত জীবের দৈহিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম উপাদান।

গ্যাসীয় চক্রে নাইট্রোজেন জীবমণ্ডলের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করে এবং এক্ষেত্রে প্রায় 78.1% নাইট্রোজেন নিয়ে গঠিত বায়ুমণ্ডল জীবের কাছে একটি সুবিশাল সঞ্চয়ে আধার হিসাবে কাজ করে (A. N. Strahler & A. H. Strahlar 1976) বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন সাধারণত সাতটি উপায়ে অবস্থান করে। যথা—আনবিক নাইট্রোজেন (N_2), নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (যেমন, নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), নাইট্রিক অ্যাসিড (No) ও নাইট্রোজেন পারক্সাইড (NO_2) এবং হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন যৌগসমূহ (যেমন, অ্যামাইনো = NH, অ্যামোনিয়া = NH_3 ও নাইট্রাস অ্যাসিড HNO_2) ।

যদিও বায়ুমণ্ডলে সব গ্যাসগুলির মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে, কিন্তু গাছ সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না। নাইট্রোজেন একটি অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় মৌল এবং তাই যদিও প্রাণীরা শ্বসনের সময় বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন সরাসরি গ্রহণ করে, তবুও জীবদেহের অন্য কোনো মৌলের সাথে তার মিলন ঘটিয়ে নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ পরিণত করতে পারে না। গাছ অ্যামানিয়াম লবণরূপে ও নাইট্রেটরূপে মাটি থেকে শিকড়ের মাধ্যমে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। উর্বর জমিতে থাকা দ্রাব্য নাইট্রেট থেকে গাছ নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে এবং তা প্রোটিনে রূপান্তরিত করে। আবার শিম্বিগোত্রীয় কিছু গাছ তাদের শিকড়ে থাকা কিছু মিথোজীবী ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে মাটিতে থাকা নাইট্রোজেন গ্রহণ করে।

কয়েকটি বিশেষ উপায়ে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন আবার মাটিতে মিশে যায়। মাটিতে N_2 থাকে নাইট্রেট নামে এক ধরনের যৌগরূপে মাটিতে নাইট্রোজেন পরিমাণ হল শতকরা 0.1-0.5 ভাগ। গাছ মাটি থেকে N_2 গ্রহণ করে নিজে দেহে প্রোটিন তৈরি করে। বিভিন্ন প্রাণী মলমূত্র ত্যাগের মাধ্যমে এবং মৃত্যুর পর দেহাবশেষের মাধ্যমে নাইট্রোজেনকে আবার মাটিতেই ফিরিয়ে দেয়। মাটির নাইট্রেট যৌগ কয়েকরকম জীবাণুর সাহায্যে রূপান্তরিত হয়ে আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। এভাবে বায়ুর নাইট্রোজেন মাটিতে এবং মাটির নাইট্রোজেন বায়ুতে সবসময় আর্বতাকার ঘুরছে। অর্থাৎ নাইট্রোজেন চক্রে বায়ুমণ্ডলের মাইট্রোজেন সংবন্ধনের (fixation) মাধ্যমে জীবের ব্যবহারের উপযুক্ত বিভিন্ন যৌগে পরিণত হয়, মাটি থেকে শিকড়ের মাধ্যমে নাইট্রোজেন পরিবহণ হয় এবং ডিনাইট্রিফিকেশান প্রক্রিয়ার গ্যাসরূপে নাইট্রোজেন মুক্ত হয় এবং অবশেষে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন সঞ্চয় আধারে নাইট্রোজেন গ্যাসরূপে ফিরে আসে। যে চক্রাকার পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন মাটিতে প্রবেশ করে এবং মাটির

নাইট্রোজেন বায়ুণ্ডলে আবর্তিত হয়ে পরিবেশে নাইট্রোজেনের সমতা বা ভারসাম্য বজায় রাখে তাকে 'নাইট্রোজেন চক্র' বলে। (চিত্র 7)

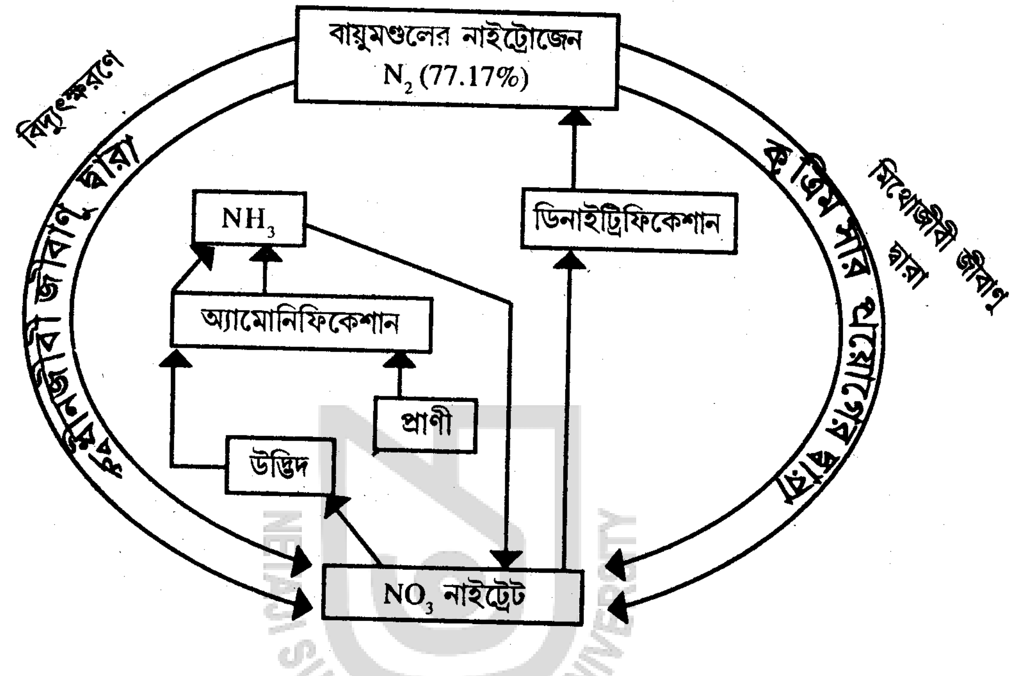

চিত্র 7 ঃ নাইট্রোজেন চক্র

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

নাইট্রোজেন উৎস—

পরিবেশ বা প্রকৃতিতে নাইট্রোজেনের উৎস হল বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ও মাটির নাইট্রেট যৌগ।

(i) বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন— বায়ুর নাইট্রোজনের উৎস হল মাটির নাইট্রেট যৌগ। মাটির নাইট্রেট যৌগ কয়েক ধরনের নাইট্রোজেন মোচনকারী বা ডিনাইট্রিফায়িং ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়ে নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হয় এবং ওই মুক্ত নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের ভাণ্ডার গড়ে তোলে।

(ii) মাটির নাইট্রোজেন—মাটির নাইট্রোজেনের প্রধান উৎসগুলি হল—(i) বিদ্যুৎক্ষরণের সময় বায়ুর নাইট্রোজেন বিভিন্ন যৌগের মাধ্যমে মাটিতে এসে মেশে। (ii) মাটিতে বসবাসকারী কয়েক ধরনের নাইট্রোজেন স্থিতিকারী ব্যাকটিরিয়া (nitrogen fixing bacteria) ও নীলাভ সবুজ শৈবাল বায়ুর নাইট্রোজেনকে সরাসরি শোষণ করে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। (iii) বিভিন্ন জীবজন্তুর মলমূত্র এবং মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ মাটিতে মিশে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। (iv) মাটিতে নাইট্রোজেনঘটিত জৈব সার প্রয়োগ করার ফলে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ে।

প্রকৃতি বা পরিবেশে নাইট্রোজেনের সমতা—

পরিবেশ বা প্রকৃতিতে নাইট্রোজেনের সমতাবজায় থাকে দুটি পদ্ধতিতে। যথা— (i) বায়ুমণ্ডলের

নাইট্রোজেন মাটিতে যুক্ত হবার ফলে অর্থাৎ নাইট্রোজেন সংবন্ধন বা সংযোজনের মাধ্যমে ও (Nitrogen fixation) (ii) মাটির নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাবার মাধ্যমে অর্থাৎ ডিনাইট্রিফায়িং ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে নাইট্রোজেন মোচনের মাধ্যমে (Denitrification) ।

(i) নাইট্রোজেন সংযোজন বা সংবন্ধনের মাধ্যমে—

বিভিন্ন উপায়ে বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগে পরিণত হয়ে মাটিতে সঞ্চিত হয়। যথা— (a) বিদ্যুৎক্ষরণ ও বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে—আকাশে যখন বজ্রপাতের সময় বিদ্যুৎক্ষরণ হয়, তখন বায়ুমণ্ডলের আণবিক নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে নাইটিক অক্সাইডে (N_2+O_2=$2NO_2$) রূপান্তরিত হয়। নাইট্রিক অ্যাসিড আবার অক্সিজেনের মাধ্যমে জারিত (Oxidized) হয়ে নাইট্রোজেন পারঅক্সাইডে ($2NO$+O_2=$2NO_2$) পরিণত হয়। এই নাইট্রোজেন পারঅক্সাইড বৃষ্টির জলের সাথে মিশে নাইট্রাস ও নাইট্রিক অ্যাসিডে [$2NO_2$+H_2O=HNO_2+HNO_3 (নাইট্রিক অ্যাসিড)] পরিণত হয়ে মাটিতে জমে। এগুলি আবার বৃষ্টির জলের সাথে বিভিন্ন খনিজ লবণের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের নাইট্রেট যৌগে ($CaNO_3$, KNO_3 প্রভৃতি) পরিণত হয় এবং মাটিতে আবদ্ধ হয়। হিসাব করে দেখা গেছে যে, নাইট্রোজেন সংযোজনকারী প্রক্রিয়া মাত্র 24 ঘন্টার মধ্যে প্রায় 2,50,000 টন অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

(b) **নাইট্রোজেন স্থিতিকারী জীবাণুদের মাধ্যমে** — জীবাণুদের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা নাইট্রোজেন সংবন্ধনের অন্যান্য প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলি অনুষ্ঠিত হয়। নাইট্রোজেন চক্রের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আণবিক নাইট্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া বা নাইট্রেট পরিবর্তন এবং নাইট্রোজেন অজৈব রূপের অন্যান্য রাসায়নিক রূপান্তর হয় কেবলমাত্র ব্যাকটিরিয়া ও নীল সবুজ অ্যালগিদের দ্বারা (D. B. Botkin E.A. Keller, 1982) । নাইট্রোজেন সংযোজনকারী জীবগুলিকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা— (i) মুক্ত বসবাসকারী জীব—প্রধানত ব্যাকটিরিয়া ও অ্যালগি এবং (ii) যে সব সাজুয্য সৃষ্টিকারী গাছ ও ব্যাকটিরিয়া একসাথে অবস্থান করে। মুক্ত বসবাসকারী জীবগুলি প্রধানত স্বভোজী হয় (যেমন নীল-সবুজ অ্যালগি ও সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটিরিয়া)। অনেক মিথোজীবী ব্যাকটিরিয়া (Symbiotic Bacteria) যারা শিম্বিগোত্রীয় গাছের মূলে বসবাস করে, সেগুলি নাইট্রোজেন সংযোজনে সাহায্য করে।

(i) **মুক্ত বসবাসকারী জীব বা স্বাধীনজীবী জীবাণুদের দ্বারা**— মাটির অ্যাজোটোব্যাকটর, ক্লসট্রিডিয়াম প্রভৃতি ব্যাকটিরিয়া এবং নীল-সবুজ শৈবাল (অ্যানাবিনা, নস্টক ইত্যাদি) বায়ু থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করে এবং নিজেদের দেহে নাইট্রোজেনের যৌগ গঠন করে। উক্ত শৈবাল ও ব্যাকটিরিয়ার মৃত্যুর পর নাইট্রোজেন যৌগগুলি মাটিতে মুক্ত হয়। এভাবে প্রতি বছর জমিতে একর প্রতি প্রায় 10 থেকে 20 কেজি: নাইট্রোজেন মাটিতে মেশে।

(ii) **সাজুয্যকারী জীব বা মিথোজীবী জীবাণুদের মাধ্যমে** — বিভিন্ন শিম্বিগোত্রীয় গাছের (সয়াবিন, ছোলা, মটর, মুসুর ডাল, ধঞ্চে প্রভৃতি) শিকড়ের গুটিতে (nodule) অবস্থিত রাইজোবিয়াম ব্যাকটিরিয়া বাস করে। এরা বায়ু থেকে নাইট্রোজেন সরাসরি শোষণ করে এবং কিছু পরিমাণ নিজ দেহে নাইট্রোজেন

যৌগ গঠনের জন্য ও কিছু পরিমাণ আশ্রয়দাতা গাছকে যোগান দেয়। এভাবে প্রতি বছর হেক্টর প্রতি জমিতে প্রায় 45 কেজি থেকে 110 কেজি নাইট্রোজেন জমে। এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ব্যাকটিরিয়া ও গাছ খুব ঘনিষ্ঠভাবে বাস করে যেখানে গাছগুলি ব্যাকটিরিয়াগুলিকে মৌলমেইল ও জৈবযৌগ সরবরাহ করে এবং তার বিনিময়ে ব্যাকটিরিয়া গাছকে অ্যামেনিয়াম রূপে বা অ্যামাইনা অ্যাসিডরূপে নাইট্রোজেনের যোগান দেয়। ব্যাকটিরিয়াগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে মাটিতে পরিবহন করে এবং নাইট্রোজেনকে গাছের ব্যবহারযোগ্য করে তোলে। Non symbiotic জীব অর্থাৎ ব্যাকটিরিয়া ও নীল সবুজ অ্যালগি সমুদ্রে নাইট্রোজেন সংবন্ধনে ভূমিকা নেয়।

(c) **সার প্রয়োগের মাধ্যমে**—মাটিতে নাইট্রোজেনের অভাব দেখা দিলে উর্বরতা শক্তি বাড়ানোর জন্যে অ্যামোনিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম সিনেমাইড, নাইট্রেট প্রভৃতি নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ানো যায়।

(d) **মাটি থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে নাইট্রোজেনের স্থানান্তরকরণ অ্যামোনিফিকেশান, নাইট্রিফিকেশানঃ**

অ্যামোনিফিকেশন ও নাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়া দুটির মাধ্যমে মাটিতে এমনভাবে নাইট্রোজেনের স্থানান্তকরণ হয় যে সেগুলিকে গাছ সহজেই গ্রহণ করতে পারে। গাছ মাটি থেকে নাইট্রেট লবণ শোষণ করে জটিল জৈব যৌগ (যেমন প্রোটিন) গঠন করে এবং নিজদেহের চাহিদা মেটায়। প্রাণীরা আবার নিজের প্রয়োজন মেটায় গাছকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে (ট্রাফিক স্তর 2) এবং নিজ দেহে নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটায় অর্থাৎ দেহে প্রোটিন গঠন করে। প্রাণীদের রেচন পদার্থ এবং গাছ ও জীবজন্তুর মৃত্যুর পরে বিভিন্ন নাইট্রোজেনঘটিত পচনশীল জৈব পদার্থগুলি ব্যাকটিরিয়া দ্বারা বিয়োজিত হয়ে প্রথমে অ্যামোনিয়া ও পরে নাইট্রাইট ও নাইট্রেটে পরিণত হয়। কিছু নাইট্রেট (NH_3) আবার বায়ুমণ্ডলে গিয়ে মেশে। ব্যাসিলাস, মাইক্রোকক্কাস প্রভৃতি কিছু ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতিতে নাইট্রোজেন যৌগের অ্যামোনিয়াতে পরিণত হওয়াকে অ্যামোনিফিকেশান বলে। অ্যামোনিয়া আবার নাইট্রোসোমেনাস ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতিতে নাইট্রেটে পরিণত হয় এবং নাইট্রোব্যাকটর ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতিতে নাইট্রোইট ক্রমে নাইট্রেটে পরিণত হয়। যে প্রক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া নাইট্রেটে পরিণত হয় তাকে নাইট্রিফিকেশান বলে। কিছু ব্যাকটিরিয়া নাইট্রিফিকেশান প্রক্রিয়ার সাহায্য করে বলে তাদের নাট্রিফয়িং ব্যাকটিরিয়া বলে। শাকাশী প্রাণীদেহগুলিতে (ট্রফিক স্তর 2) গাছের দেহ থেকে নাইট্রোজেনের স্থানান্তর ও উদ্ভিদ প্রোটিনের প্রাণী প্রোটিনে রূপান্তর হবার পরবর্তী পর্যায়ে প্রাণী-প্রোটিনরূপে 3 নং ও 4 নং ট্রফিক স্তরে মাংসাশী প্রাণীদেহে নাইট্রোজেন স্থানান্তরিত হয়। জীবদেহে এই প্রাটিন ভেঙে গিয়ে বা বিভাজিত হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড, ইউরিয়া প্রভৃতি রূপান্তরিত হয়।

(ii) **ডিনাইট্রিফিকেশান বা নাইট্রোজেন মোচনের মাধ্যমে**—এই পদ্ধতিতে মাটির নাইট্রেট ও নাইট্রাইট যৌগ নাইট্রোজেনে পরিণত হয় এবং বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। এই প্রক্রিয়াটি নাট্রিফিকেশানের বিপরীত প্রক্রিয়া। নাইট্রেট ও নাইট্রাইট যৌগগুলি থিওব্যাসিলাস, সিউডোমোনাস প্রভৃতি ডিনাইট্রিফায়িং বা নাইট্রোজেন মোচনকারী ব্যাকটিরিয়ার মাধ্যমে বিয়োজিত হয় এবং আণবিক নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত

হয় এবং বায়ুমণ্ডলের সঞ্চয় আধারে ফিরে গিয়ে নাইট্রোজেন চক্র সমাপন করে। যে প্রক্রিয়ায় নাইট্রেট ও নাইট্রাইট থেকে নাইট্রোজেন যুক্ত হয় তাকে ডিনাইট্রিফিকেশান বলে। কিছু নাইট্রেট ভৌমজলে গিয়ে মেশে এবং কিছু নদনদীর মাধ্যমে ক্ষয়িত ও বাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মেশে। ব্যাকটিরিয়া দ্বারা জীবদেহের বিয়োজন বায়ুমণ্ডলে অ্যামোনিয়া মুক্ত করে, যা বৃষ্টির জলে ধুয়ে অ্যামোনিয়াম সালফেট ও অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটরূপে স্থলভাগে ও সমুদ্রে ফিরে যায়। একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ যে জীব নাইট্রোজেন চক্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক কারণ ব্যাকটিরিয়া নাইট্রোজেন সংবন্ধন/সংযোজন করে এবং একদিকে যেমন নাইট্রিফিকেশান ভূমিকা পালন করে, তেমনি ডিনাইট্রিফিকেশানে অংশগ্রহণ করে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের অপসারণ ও সংযোজন প্রাথমিকভাবে ব্যাকটিরিয়াসমূহের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় (Botkin and Keller, 1982)।

উপরিউক্ত উপায়গুলির মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে বায়ুমণ্ডলে আদাপ্রদানের মাধ্যমে পরিবেশে নাইট্রোজেনের সমতা বা ভারসাম্য বজায় থাকে। দেহকোষের গঠন ও বৃদ্ধির জন্যে জীবদেহে যে নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয়, তা নাইট্রোজেন চক্রের মাধ্যমেই জীবদেহে পরিবাহিত হয়। ফলে যুগযুগান্তর ধরে জীবের জন্ম, বৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব বজায় থাকে।

নীচে ছকের সাহায্যে নাইট্রোজেন চক্র উল্লেখ করা হল—

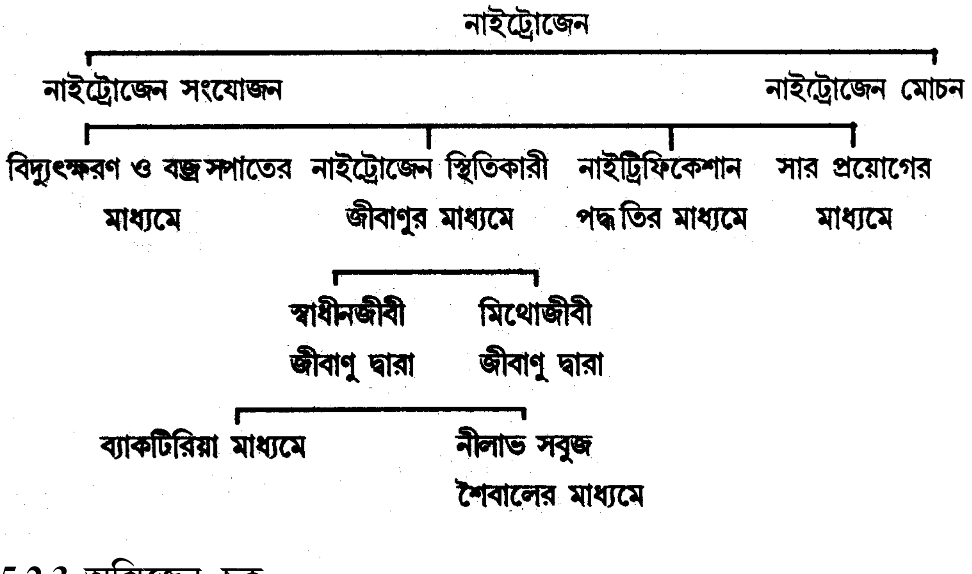

10.5.2.3 অক্সিজেন চক্র

জীবমণ্ডলে অক্সিজেন গ্যাসটি অতি গুরুত্তবপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম উপাদান কারণ শ্বসন ক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন যেমন জীবের প্রাণধারণে সহায়তা করে, তেমনি আবার জীবদেহ থেকে এর উৎপত্তি হয়। তাছাড়া অক্সিজেনের আবর্তন

জীবমণ্ডলে অন্যান্য উপাদানগুলির আবর্তনে সাহায্য করে। রাসায়নিক দিক থেকে অক্সিজেন অত্যন্ত ক্রিয়াশীল গ্যাস কারণ জীবমণ্ডলের অধিকাংশ উপাদানগুলিকে অক্সিজেন একত্রিত করে। জীবিত পদার্থগুলির প্রায় 70 শতাংশ অণু তৈরি করে এই অক্সিজেন এবং এই গ্যাসটি শর্করা, স্নেহজাতীয় পদার্থ ও প্রোটিন তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর শ্বসনে এবং গাছের সালোকসংশ্লেষে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। জীবমণ্ডলে অক্সিজেন চক্রটি খুব জটিল কারণ এতে অক্সিজেনের অনেকগুলি রাসায়নিক রূপ রয়েছে, যেমন, আণবিক অক্সিজেন (CO_2), কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), অক্সাইডরূপে বিভিন্ন অজৈব যৌগ (লৌহের অক্সাইড = Fe_2O_3), কার্বনেট(ক্যালসিয়াম কার্বনেট = $CaCO_3$) প্রভৃতি। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের মোট পরিমাণ থাকে 20.6 শতাংশ এবং জলে থাকে 0.7 শতাংশ।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কোনো মুক্ত অক্সিজেন ছিল না। সালোকসংশ্লেষকারী জীবের জন্মের পর গাছের কোষের মাধ্যমে জলের অণুগুলির ভাঙনের ফলে হয়তো আণবিক অক্সিজেনের সৃষ্টি হয়। গাছের কোষের মাধ্যমে জল বিভাজিত হয় এবং প্রতি 2 মিলিয়ন বছরে পুনর্গঠিত হয় এবং আবার প্রায় 2000 বছর পর পুনরায় আবর্তিত হয়। উৎপত্তির সময় থেকে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন জমতে থাকে এবং বর্তমানে বায়ুমণ্ডলের মোট গ্যাসীয় উপাদানের শতকরা প্রায় 21% দখল করে আছে এই অক্সিজেন গ্যাস। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে অক্সিজেন আণবিক অক্সিজেনরূপে খুব কম সময় জুড়ে অবস্থান করে কারণ এই গ্যাসটি দ্রুত CO_2 বা H_2O বা কোনো অক্সাইডের সাথে যুক্ত হয়।

যে কোনো ধরনের জারণের (Oxidation) জন্যে ও দাহ্যবস্তুর দহনের (Combustion) জন্যে অক্সিজেনের উপস্থিতি একান্ত দরকার। লৌহ আকর ও কম পরিমাণে অক্সিজেন শোষণ করে। কিন্তু এদের পরিবর্তে বায়ুমণ্ডল প্রধানত একটি মাত্র উৎসের বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই অক্সিজেন লাভ করে, যা হল স্বভোজী সবুজ গাছের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া। তাছাড়া বিভিন্ন খনিজ অক্সাইডের কিছু পরিমাণ হ্রাস ও বায়ুমণ্ডলে কিছু অক্সিজেনের যোগান দেয়। আবার সমুদ্র উপকূলের ওজোন(O_3)গ্যাস বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে অতিবেগুনি রশ্মির বিকিরণের ফলে অক্সিজেনকে মুক্ত করে।

অক্সিজেন চক্র প্রকৃতপক্ষে কার্বনচক্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে কোনো রকমের দহনের জন্যে অক্সিজেনের প্রয়োজন এবং প্রাণী ও গাছের দেহে এই দহন শ্বাস কাজের সময় দেখা যায়। শ্বাস কাজের সময় সালোকসংশ্লেষের ঠিক বিপরীত রাসায়নিক সমীকরণ দেখা যায়। যথা—

$C_6H_{12}O_66O_2 \rightarrow 6CO_2+6H_2O$ শক্তি অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষের সময় যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গাছের দেহে শর্করা তৈরি করে, শ্বসনের সময় অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সেই শর্করার দহনে আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে। গাছ ও প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রেই এই দহন হচ্ছে এবং আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে কার্বন চক্র ও অক্সিজেন চক্র একে অন্যের পরিপূরক এবং সমসময় পারস্পরিক সমতা বজায় রেখে এরা জীবমণ্ডলের ভারসাম্য রক্ষা করে।

জীবকুল শ্বাসকাজের জন্য পরিবেশ বা প্রকৃতি থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে, ফলে পরিবেশের অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা যায়। জৈব ও অজৈব বস্তুর দহনের সময় অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং পরিবেশে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। আবার সালোকসংশ্লেষের সময় সবুজ গাছেরা যে অক্সিজেন গ্যাস সরবরাহ করে, তা থেকে পরিবেশে অক্সিজেন ঘাটতি পূরণ হয়। ফলে পরিবেশে অক্সিজেনের ভারসাম্য বজায় থাকে। যে চক্রাকার পদ্ধতিতে পরিবেশের অক্সিজেন দহনে ও শ্বসনে ব্যবহৃত হয় এবং সালোকসংশ্লেষের সময় অক্সিজেন উৎপন্ন হয়ে পরিবেশে অক্সিজেনের পরিমাণে সমতা বজায় রাখে, তাকে অক্সিজেন চক্র বলে (চিত্র ৪)।

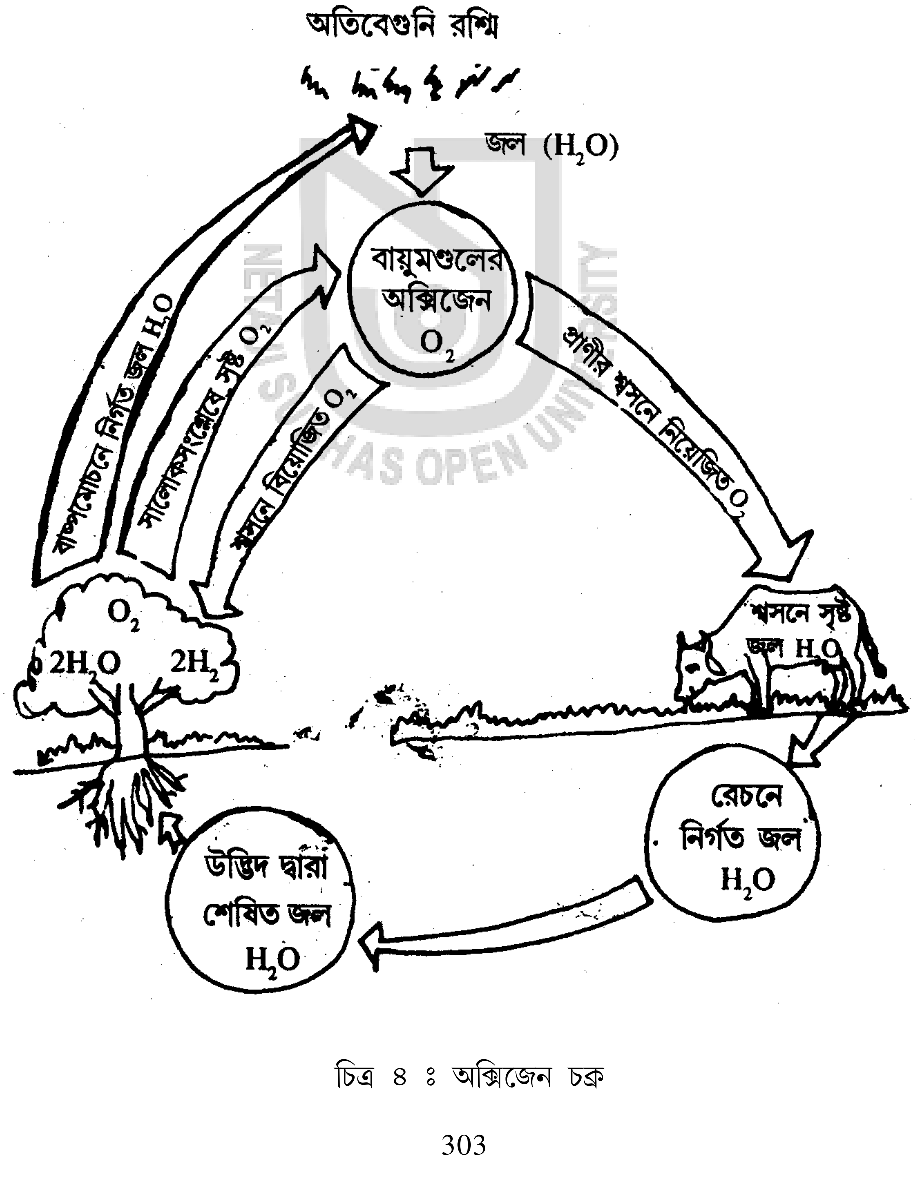

চিত্র ৪ ঃ অক্সিজেন চক্র

অক্সিজেনের উৎস—

পরিবেশে বা বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের উৎসগুলি হল—

(i) সবুজ গাছের পাতায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া চলার সময় গাছের মাধ্যমে গ্রহণ করা জল (H_2O) উত্তেজিত সবুজকণা বা ক্লোরোফিলগুলি দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) ও হাইড্রক্সিল আয়নে (OH^+) পরিণত হয়। ক্লোরোফিলগুলি সূর্যালোকের ফোটন কণা (Poton) শোষণ করে ও তেজোময় হয়। হাইড্রক্সিল আয়ন (OH^+) হাইড্রক্সিল মূলকে (radicl) পরিণত হবার পর তা থেকে জল ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। এই অক্সিজেন আবার বায়ুমণ্ডলের ফিরে যায়। যথা—

$$H_2O - H^+ + OH^-$$

$$4OH \rightarrow 2H_2O+O_2$$

(ii) বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের (O_3) স্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 25 কি.মি. উচ্চতায় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে অবস্থিত এবং এই স্তর থেকে O_3 ভেঙে গিয়ে (O_2+O) অক্সিজেন উৎপন্ন হতে পারে।

(iii) সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রে উদ্ভিদপ্লাংকটনের দেহে সালোকসংশ্লেষের ফলেও সামান্য অক্সিজেন তৈরি হয়।

(iv) বিভিন্ন খনিজ অক্সাইডের হ্রাসকরণের ফলেও কিছু অক্সিজেনের সৃষ্টি হয়।

(v) প্রতি বছর CO_2 ও H_2O রূপে আগ্নেয় পদার্থের নির্গমনের ফলেও কিছু পরিমাণ অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হয়।

পরিবেশে বা প্রকৃতিতে অক্সিজেনের সমতা—

নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপায়ে পরিবেশে অক্সিজেনের সমতা বজায় থাকে। যথা—

(i) সবাত শ্বসনকারী জীব শ্বাসকাজ চালানোর জন্যে পরিবেশে অক্সিজেন গ্রহণ করে, ফলে পরিবেশে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়।

(ii) দাহ্য বস্তুর (কয়লা, কাঠ, পেট্রোল। ডিজেল, কেরোসিন, কাগজ ইত্যাদি) দহনের সময় পরিবেশের অক্সিজেন শোষিত হয় এবং অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়।

(iii) অগ্ন্যুৎপাতের সময় বা উত্তপ্ত আগ্নেয় পদার্থ নির্গমনের সময় পরিবেশের অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে শোষিত হয়।

(iv) নানা ধরনের খনিজ যেমন, তামা, লোহা সিসা প্রভৃতির অক্সাইড গঠনের সময় পরিবেশের অক্সিজেন শোষিত হয়।

(v) সবুজ গাছের সালোকসংশ্লেষের সময় অক্সিজেন উৎপন্ন হয় ও পরিবেশে ফিরে যায়। ফলে প্রকৃতিতে অক্সিজেনের ভাণ্ডার গড়ে ওঠে।

(vi) বিদ্যুৎস্ফূরণের সময় জলীয় বাষ্প বা জল বিশ্লিষ্ট হয়ে অক্সিজেন উৎপন্ন করে ও পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়।

(vii) সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি (V Vray) ওজোন (O_3) গ্যাসের স্তরকে বিশ্লিষ্ট করে অক্সিজেন (O_2) উৎপন্ন করে ও পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। সমুদ্রের উপকূলে UV রশ্মির বিকিরণের ফলে O_3 গ্যাস বায়ুমণ্ডলে O_2 গ্যাসকে মুক্ত করে।

সুতরাং প্রধানত জীব কুলের শ্বসন ও খনিজ পদার্থর দহনের ফলে পরিবেশে অক্সিজেনের যে ঘাটতি হয়, সবুজ গাছের সালোকসংশ্লেষের ফলে অক্সিজেন উৎপন্ন হবার ফলে ও পরিবেশে মুক্ত হবার ফলে, তা পূরণ হয়। ফলে পরিবেশে/প্রকৃতিতে O_2 গ্যাসের সমতা বজায় থাকে।

অক্সিজেন চক্রের তাৎপর্য/গুরুত্ব—

সম্প্রতি সারা পৃথিবীতে উদ্ভিদের আবরণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে এবং শিল্প ও জনবসতি ক্রমে প্রসারলাভ করে চলেছে। ফলে অক্সিজেনের শোষণ ও পুনরায় উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য বা সমতার অভাব বর্তমানে মনুষ্য সমাজের কাছে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নীচে অক্সিজেন চক্রের তাৎপর্য বা গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হল। যথা—

(i) জীবের দেহে বিপাক-ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্যে যে অফুরন্ত শক্তির প্রয়োজন তা প্রধানত শ্বসন ক্রিয়ার ফলেই তৈরি হয়। শ্বসনের জন্য প্রতিটি জীবদেহ কোষ আমরণ অক্সিজেনের সরবরাহ হওয়া দরকার। বিভিন্ন জীবের দ্বারা সবসময় অক্সিজেন গ্রহণের ফলে পরিবেশে কোনো এক সময় অক্সিজেন গ্যাস নিঃশেষিত হবার কথা ছিল, কিন্তু অক্সিজেন চক্রের মাধ্যমে পরিবেশে অক্সিজেনের ভাণ্ডার কখনো শূন্য হয় না। ফলে পরিবেশে অক্সিজেনের ভারসাম্য বজায় রাখার দিক থেকে এই চক্রের বিশেষ তাৎপর্য আছে।

(ii) অক্সিজেন চক্র পরোক্ষভাবে কার্বনচক্রের ভারসাম্য বজায় রাখে। জৈব বস্তুর দহন ও জারণের জন্যে অক্সিজেনের উপস্থিতি দরকার। অক্সিজেন জৈব পদার্থকে জারিত করে ও কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি করে। ফলে পরিবেশে অক্সিজেন চক্র থাকা একান্ত দরকার।

(iii) বিভিন্ন ভৌত ও জীবজ ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন অক্সিজেনের কিছু অংশ ওজোন (O_3) গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোন স্তরের সৃষ্টি করে, যা ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মি ও সূর্যের অতিবেগুমি রশ্মিকে শোষণ করে এবং জীবকুলকে চর্মরোগ, চক্ষুরোগ প্রভৃতি রোগের হাত থেকে রক্ষা করে।

সুতরাং প্রধানত জীবদেহের শ্বসন ও দাহ্য বস্তুর দহন প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় এবং প্রধানত সবুজ গাছের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় গ্যাস উৎপন্ন হয়ে বায়ুতে অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ করার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন গ্যাসের সমতা বজায় থাকে।

10.5.3 পলল প্রকৃতির পুষ্টিচক্র

এই বিভাগটির মধ্যে রয়েছে ফসফরাস চক্র, সালফার চক্র ও ক্যালসিয়াম চক্র (এম.পি.অরোরা,১৯৯৭) । প্রথম দুটি চক্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বাস্তুবিজ্ঞানীদের কাছে এই দুটি উপাদান (ফসফরাস ও সালফার) বিশেষ গুরুত্ব পায়। এই চক্রগুলির আধার (reservoir) ভূত্বকে অবস্থিত, বায়ুমণ্ডলে নয়।

এখানে আমরা ফরফরাস চক্র ও সালফার চক্র সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

10.5.3.1 ফসফরাস চক্র

ফসফরাস হল জীবমণ্ডলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (জল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ), যা জীবের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয় কারণ জীবমণ্ডলীয় বাস্তুতন্ত্রে ফসফরাস উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফসফরাসের যোগান খুবই কম, কারণ বিশ্বের খুব কম অংশেই ফসফেট শিলা পাওয়া যায়। ফসফরাস এমন একটি রাসায়নিক (খনিজ) উপাদান, জৈব ভূরাসায়নিক চক্র যার খুব কম গ্যাসীয় পর্যায় আছে এবং একটি প্রধান পাললিক পর্যায় আছে। বায়ুমণ্ডলে খুব কম পরিমাণে ধুলো ও লবণরূপে ফসফরাস অস্থায়ী ভাবে অবস্থান করে। সমুদ্র থেকে বায়ু দ্বারা অন্যত্র বাহিত হয় এবং ফসফেটের সঞ্চয় থেকে ও খনি থেকে ধুলোর আকারে বাহিত হয়।

ফসফরাস প্রোটোপ্লাজমের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ফসফরাস যে অনুপাতে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, তার চেয়ে জৈব পদার্থ ফসফরাসের অনুপাত অনেক বেশি। বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান (regulating element) হিসেবে ফসফরাসের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ফসফরাস চক্রটি (চিত্র 9) খুবই সরল তবে এই চক্রটি খুবই ধীর ওক্রমান্বয়িক (gradual)। ফসফরাস ভূপৃষ্ঠপ্রবাহ ও নদীর মাধ্যমে স্থলভাগ থেকে সমুদ্রে ধীরে প্রবেশ করে এবং খুব সামান্য পরিমাণ ফসফেট সমুদ্র থেকে স্থলভাগে ফিরে আসে। অধিকাংশ ফসফরাস ফসফেট শিলারূপে পাললিক শিলার মধ্যে অবস্থান করে। এই শিলাগুলির আবহবিকারের ও ক্ষয়ের ফলে ফসফরাস মৃত্তিকার সঞ্চয়আধারে (soil storage pool) পরিবাহিত হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, মাটিতে ফসফরাস

খনিজরূপে অবস্থান করে, যার মধ্যে যুক্ত থাকে ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগিনেসিয়াম, লৌহ ইত্যাদি।মাটি ও শিলাতে থাকা সমস্ত ফসফরাস এই চক্রে অংশগ্রহণ করে না, মাত্র 10 শতাংশ ফসফরাস এই চক্রের পথগুলিতে অংশ নেয়, কারণ ফসফরাস জলে অপেক্ষাকৃত অদ্রবণীয়। ফসফরাস ভূমিক্ষয় পদ্ধতিতে ফসফেটরূপে বাস্তুতন্ত্রে পরিবাহিত হয় এবং বেশির ভাগ ফসফেট সমুদ্রে সঞ্চিত হয়। সামুদ্রিক প্রাণীর বিষ্ঠা (guano) ও সামুদ্রিক মাছ কিছু পরিমাণ ফসফরাস চক্রটিতে ফিরিয়ে দেয়।

গাছ মাটি থেকে শিকড়ের মাধ্যমে অভিস্রাবণক (root osmosis) প্রক্রিয়ার অজৈব ফসফেটে রূপে (আর্থোসিলিকেট ফসফেট আয়ন) ফসফরাস গ্রহণ করে। অজৈব ফসফেটগুলি গাছের দেহে জৈব অবস্থায় পরিবর্তিত হয় যা ট্রফিক স্তরের বিভিন্ন অংশে তৃণভোজী থেকে মাংসাশী ও সর্বভুক প্রাণীতে পরিবাহিত হয়। মৃত গাছপালা ও জীবজন্তু এবং তাদের বর্জ্য পদার্থগুলি বিয়োজিত হবার ফলে (বিয়োজক জীবাণু দ্বারা) এবং ফসফেটের জৈব রূপের খনিজায়নের (mineralization) ফলে ফসফেট মাটিতে ফিরে আসে। মৃত্যুর পরে গাছ ও প্রাণীর প্রোটোপ্লাজম ফসফেটাইজিং ব্যাকটিরিয়া দ্বারা বিয়োজিত হলে দ্রবীভূত ফসফেট রূপে একে পাওয়া যায়। প্রাণীর রেচন পদার্থ থেকেও সামান্য পরিমাণ ফসফরাস চক্রটিতে ফিরে আসে। ফসফেটের কিছু অংশ ধৌত হয় সমুদ্রে যায় এবং কিছু অংশকে জৈব যৌগরূপে (যেমন হাড়) থাকতে দেখা যায়, যা ফসফেট জাতীয় পদার্থগুলিকে দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চয় করে রাখে। এগুলি মাটিতে ফিরে আসে যখন এগুলি আবার খনিজ আকারে পরিবর্তিত হয় কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি সমাধা হতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। গাছের দ্বারা গৃহীত ফসফেটের একটি বড়ো অংশ গাছের দেহে অজৈব অবস্থায় থাকে এবং ফসফেটের এই অজৈব রূপ বিয়োজনের পরে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে খনিজে পরিণত হয়।

সমুদ্র থেকে স্থলভাগে ফসফরাসের পুনরাগমন নিয়মিত ভাবে হয় না এবং ধীরগতিতে মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। সমুদ্রে বাহিত বেশির ভাগ ফসফরাস গভীর পললের মধ্যে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র সমুদ্র তলদেশের উত্থানের ফলে ফসফরাস পাওয়া যেতে পারে। ফসফরাস গাছের অতি প্রয়োজনীয় একটি উপাদান বলে প্রয়োজনে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার মাটিতে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

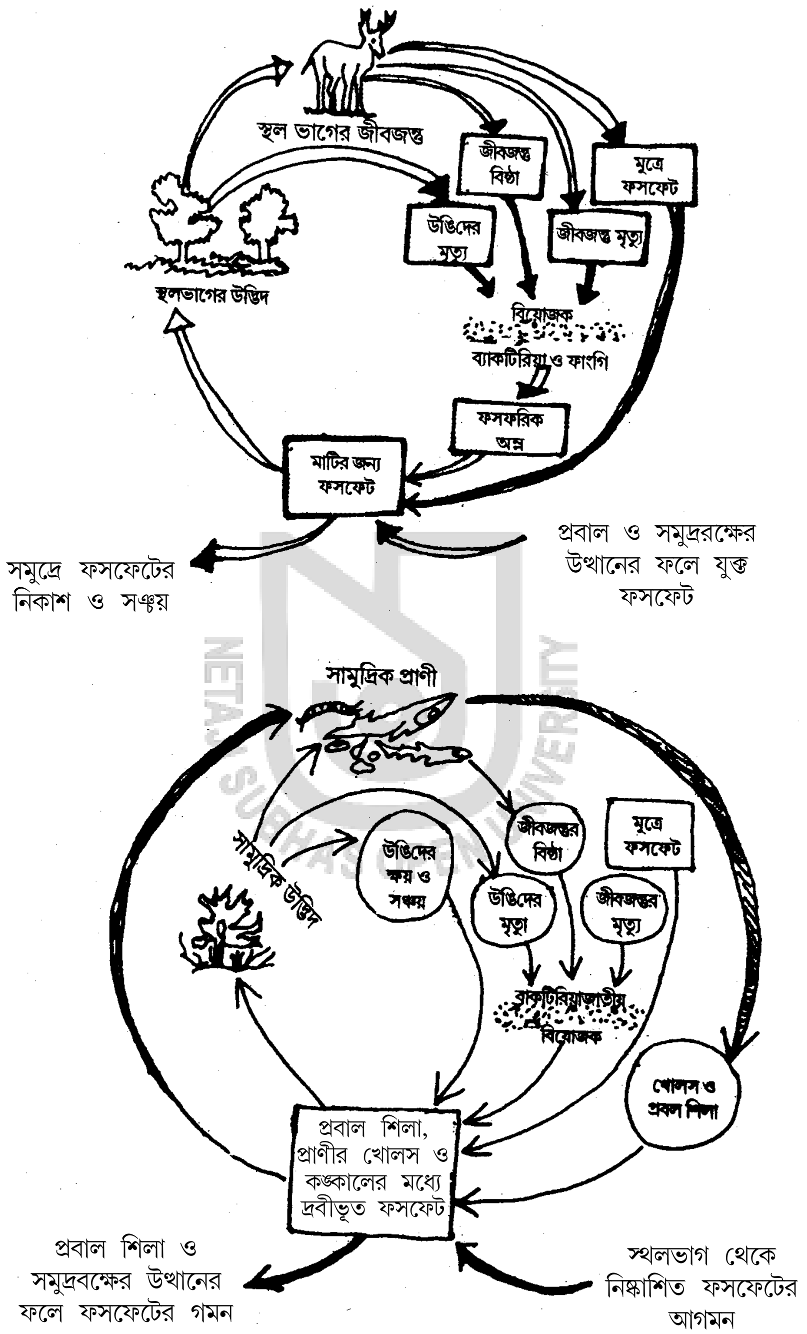

চিত্র 9 ঃ (ক) স্থলভাগে ফসফরাস চক্র

(খ) সমুদ্রে ফসফরাস চক্র

10.5.3.2 সালফার চক্র

অজৈব সালফেট থেকে সজীব বস্তু তার প্রয়োজীয় সালফার গ্রহণ করে (চিত্র10) সালফার প্রোটোপ্লাজমের একটি প্রধান উপাদান। মাটি ও পাললিক শিলা প্রকৃতপক্ষে সালফারের আধার হিসাবে কাজ করে, তবে সালফেটরূপে তা সঞ্চিত থাকে। জ্বালানির দহনে সামান্য পরিমাণ সালফার বায়ুতে মিশে যায়। পাললিক শিলায় অবাত অবস্থায় আয়রন সারফাইড (FeS) হিসেবে সালফার জমা থাকে।

ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক ও নানা জীবাণুর দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়ে সালফার প্রকৃতিতে মুক্ত হয় এবং জীবের দ্বারা জৈবিক ক্রিয়াকলাপের জন্য গৃহীত হয় বাস্তুতন্ত্রে সালফার অজৈব সালফেট (SO_4) রূপে অবস্থান করে। অবাত পদ্ধতিতে ও ইশ্চোরিশিয়া ও অ্যারোব্যাক্টর নামের ব্যাকটিরিয়া দ্বারা বিজারিত হয়ে সালফার হিসাবে (Elementary Sulphur) অথবা হাইড্রোজেন সাফাইডে (H_2S) পরিবর্তিত হয়। বেগিয়াটোয়া নামের ব্যাকটিরিয়া দ্বারা H_2S জারিত হয়ে সালফার (elementary sulphur) উৎপন্ন হয়।

সালফার চক্রের কেন্দ্র কয়েকটি ব্যাকটিরিয়ার কাজকে আবর্তন করে। এই ব্যাকটিরিয়াগুলি রিলে (Relay) প্রক্রিয়ায় জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া সম্পাদন করার মাধ্যমে সালফার চক্রটিকে সম্পূর্ণ করে।

পাললিক পুষ্টিচক্রের এই অন্যতম চক্রটির ক্ষেত্রে সালফারের প্রধান উৎস হল সমুদ্র। কেবলমাত্র কয়েকটি জীব তাদের সালফারের প্রয়োজন মেটায় অ্যামাইনো অ্যাসিড রূপে। জীবের প্রয়োজনীয় সালফার প্রধান উৎস অজৈব সালফার। স্বভোজী গাছগুলি সালফার হ্রাস করে যার মধ্যে প্রোটিন যুক্ত। এই স্বভোজীগুলি পরভোজীদের দ্বারা খাদিত হয় এবং গাছপালা ও জীবজন্তুদের মৃত্যুর পর সেগুলি পরভোজী জীবাণু দ্বারা বিয়োজিত হয় এবং হাইড্রোজেন সাফাইড (H_2S) মুক্ত হয়। H_2S এর কিছু অংশ সূক্ষ্ম জীবাণুদের দ্বারা (থিয়োব্যাসিলাস দ্বার) সালফেটে রূপান্তরিত হয়। বাকি H_2S গভীর পলল সঞ্চয়ের আধারে প্রবেশ করে। বর্ণহীন প্রজাতির ব্যাকটিরিয়া (বেগিয়াটোয়া) H_2S কে জারিত করে সালফারে পরিণত করে যা আবার জারিত হয়ে সালফেটে পরিণত হয় (থিয়োব্যাসিলাসের মাধ্যমে)।

কিছু জৈব সালফার সালফার ডাই অক্সাইড' রূপে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে প্রধানত কয়লার মতো জীবাশ্ম জ্বালানির অপূর্ণ দহনের ফলে। বায়ুমণ্ডলের এই উপাদন বৃষ্টির জলের সাথে ভূপৃষ্ঠে ও পরিশেষে সমুদ্রে সালফেটরূপে আনীত হয়।

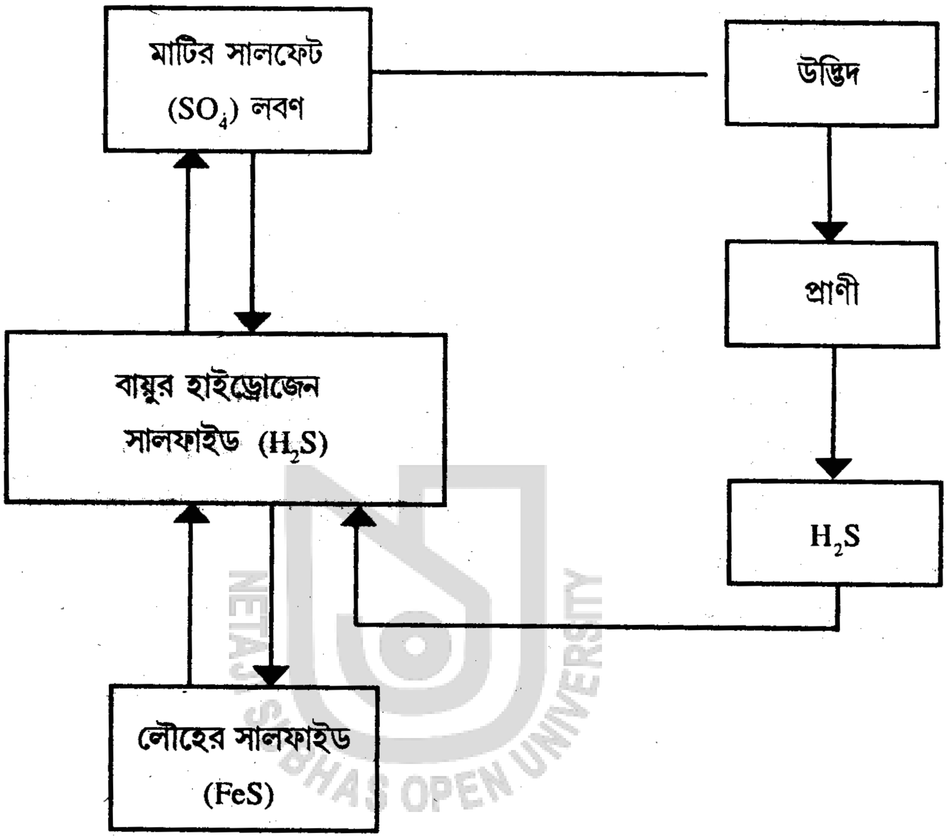

চিত্র 10 ঃ সালফার চক্র

10.6 জীব সংরক্ষণ (Bio conservation)

আমাদের এই পৃথিবী জীব সম্পদের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এই জীবসম্পদের মধ্যে রয়েছে স্থল, জল ও বায়ুমণ্ডলে অবস্থানকারী বিভিন্ন পশুপাখি ও মানুষ অর্থাৎ প্রাণীজগৎ এবং স্থল ও জলে অবস্থানকারী বিভিন্ন উদ্ভিদ অর্থাৎ উদ্ভিদজগৎ। বর্তমানে অদূরদর্শিতা ও অবিবেচনাপ্রসূত ক্রিয়াকলাপ এবং অন্যায় লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ জীবজগতের যথেচ্ছ অপব্যবহার করে চলেছে এবং ফলে সভ্য জগৎ সম্প্রতি বিভিন্ন বাস্তুতান্ত্রিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

বিজ্ঞানী ওডাম (1972) সংরক্ষণ সম্পর্কে একটি কার্যকরী সংজ্ঞা দেন। যথা —"যে পদ্ধতিতে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক ব্যবহার, রক্ষণ ও পরিচালন এবং ক্ষতিকারক প্রভাব ধ্বংস,

অপব্যবহার, আগুনের হাত থেকে ওই সম্পদের সুরক্ষা করা সেই পদ্ধতিকে সংরক্ষণ বলে।”

অথবা, “যে সুষ্ঠু পরিকল্পিত পরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদকে যথেচ্ছ অপব্যবহার ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়, তাকে সংরক্ষণ বলে।”

সংরক্ষণ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল ‘বিশেষ উদ্দেশ্যে বা বিশেষ প্রকার রক্ষণ।’ তবে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সংরক্ষণের ধারণা সম্পর্কে মতভেদ আছে। যেমন, অনেকে সংরক্ষণ বলতে অপচয় নিবারণকে বুঝিয়েছেন। অপচয় কমিয়ে কোনো একটি জিনিসের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো হয়। এতে উৎপাদ-ব্যয় কমে যায়, ফলে জিনিসের মূল্যও কমে যায়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে কম সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয়ও কম হয়। চাহিদা বাড়লে স্বাভাবিক ভাবে সম্পদের যোগান বাড়বে অর্থাৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্পদের মিতব্যয়িতার মাধ্যমে সংরক্ষণ সম্ভব।

‘সংরক্ষণ’ ও ‘মিতব্যয়িতা’ শব্দ দুটি সমার্থক নয়। সংরক্ষণ বলতে বোঝায় কম ব্যবহার, যার ফলে নির্দিষ্ট সময়ের শেষে যে পরিমাণ সম্পদ সংরক্ষিত থাকার কথা, তার চেয়ে বেশি সম্পদ সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু মিতব্যয়িতা হল অপচয় রোধ অর্থাৎ উৎপাদনের অর্থনৈতিক উপাদানের উন্নতি সাধন। এই শ্রেণির সংরক্ষণকে বলে মিতব্যয়িতাজনিত সংরক্ষণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপচয়রোধ ও মিতব্যয়িতার ফলে উৎপাদন ও ভোগ বাড়ে, সেক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার ফলে সংরক্ষণ হয় না। আবার মিতব্যয়িতা বলতে কেবলমাত্র অপচয় নিবারণ বা উৎপাদনে মিতব্যয়িতাকে বোঝায় না, ব্যবহার বা ভোগে মিতব্যয়িতাকেও বোঝায়। বিচার বিবেচনার সাথে ব্যবহার হল ব্যবহারে মিতব্যয়িতা এবং এই উপায়েই কেবলমাত্র মিতব্যয়িতাজনিত সংরক্ষণ হতে পারে। মিতব্যয়িতার ফলে সম্পদের উৎপাদন বা ভোগ বৃদ্ধি পেলে সম্পদের সংরক্ষণ সম্ভব নয়। অন্যদিকে যে সংস্থা সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসার অধিকারী সে ক্ষেত্রে সম্পদের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হলে মিতব্যয়িতার ফলে সংরক্ষণ সম্ভব হয়। তাই বলা যায় যে, মিতব্যয়িতা থেকে সম্পদের সংরক্ষণ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।

সংরক্ষণ বলতে কম উৎপাদন ও কম ব্যবহারকে বোঝায়। অর্থাৎ ব্যবহার সংযম বা ভবিষ্যতের মানুষের সুবিধার জন্য বর্তমানে ত্যাগ স্বীকার করা। অধ্যাপক ক্রেইগ ডানকানের মতে, সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করা দরকার যাতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের চাহিদা সর্বাধিক পরিমাণে মিটতে পারে । কিন্তু তা করতে গেলে গচ্ছিত সম্পদগুলির ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংযমের প্রয়োজন।

বিশিষ্ট পণ্ডিত অধ্যাপক জিমারম্যান এর মতে, সংরক্ষণ হল ভাবী প্রজন্মের মঙ্গলের জন্য বর্তমানে প্রজন্মের ভোগ-বিলাস-এর নিয়ন্ত্রণ।

সম্পদের উৎপাদন ও ব্যবহার কম করাকে সম্পদ সংরক্ষণ বলে। ফলে ভবিষ্যতে সম্পদের যোগান অব্যাহত থাকতে পারে। সঠিকভাবে সম্পদের সংরক্ষণ করার জন্য অন্যতম দরকার হল— (i) সম্পদের উৎপাদন ও ব্যবহার কম করা (ii) মিতব্যয়িতা (iii) সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার কমানো

(iv) বিচার বিবেচনার সাথে সম্পদের ব্যবহার (v) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্পদের উৎপাদন ও (vi) সম্পদের অপচয় নিবারণ।

সংরক্ষণের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য—যেমন পূর্বপুরুষেরা আমাদের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করে গেছেন তেমনি ভাবী প্রজন্মের জন্য সম্পদের যোগন অক্ষুণ্ণ রাখতে আমাদেরও ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এটি হল সম্পদ সংরক্ষণের তাৎপর্য বা লক্ষ্য। আবার কারো কারো মতে, পরিবেশের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রেখে এবং সম্পদের ব্যবহার বা সৃষ্টির মধ্যে সমতা এনে উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও বিভিন্ন পদার্থের যোগান স্বাভাবিক রাখা হল সম্পদ সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। সংরক্ষণের উদ্দেশ্য তিনটি যথা— (a) প্রথমত প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে তাদের নিজস্ব পরিবেশে রক্ষা করা ও তাদের স্বাভাবিক বিকাশ অব্যাহত রাখা (b) পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা ও (c) পরিকল্পিতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম ব্যবহার।

10.7 বিভিন্ন শ্রেণির জীব সংরক্ষণ (Type of conservation)

জীব-সংরক্ষণ বা Bioconservation বলতে বোঝায়—

(i) বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং

(ii) মৎস্য ও সামুদ্রিক উদ্ভিদ সংরক্ষণ

(iii) বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ—

বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের মধ্যে রয়েছে (a) বনের উদ্ভিদ সংরক্ষণ (b) বনের প্রাণী সংরক্ষণ।

(A) **বনের উদ্ভিদ সংরক্ষণ** (Forest Conservation)—জনসংখ্যার চাপে এবং মানুষের অবিবেচনাপ্রসূত ও অবৈজ্ঞানিক বনজ সম্পদ নষ্ট করার ফলে বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হচ্ছে, উর্বর জমি অনুর্বর মরুতে রূপান্তরিত এবং তার কুফল সমস্ত মানবজাতিকে ভোগ করতে হচ্ছে। বন সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া প্রয়োজন। যথা—

(i) আইন করে পরিণত গাছ বা ক্ষতিগ্রস্ত গাছ কাটার ব্যবস্থা করা।

(ii) অপরিণত ও কচি চারাগাছ কাটলে আইন অনুযায়ী শাস্তির বিধান করা অবশ্য প্রয়োজন।

(iii) পতিত ও অকৃষিযোগ্য জমিতে নূতন অরণ্য সৃষ্টি করা।

(iv) যে জায়গা থেকে পরিণত গাছ কাটা হবে, সেই একই জায়গায় চারা গাছ রোপন করা।

(v) স্থায়ী অরণ্যে যথেচ্ছ পশুচারণ আইন করে বন্ধ করতে হবে। অঙ্কুরিত চারাগাছগুলিকে বিনষ্ট হবার হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

(vi) বনে যাতে আগুন না লাগতে পারে (দাবানল) তার ব্যবস্থা করা। হঠাৎ আগুন লাগলে যত শীঘ্র সম্ভব আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করা এবং পুড়ে যাওয়া গাছের জায়গায় নতুন চারা লাগানোর ব্যবস্থা করা।

(vii) রোগপোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করা ও কীটনাশক প্রয়োগ করা।

(viii) কাঠ ও অন্যান্য অরণ্য সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারে অপচয় নিবারণ করা।

(ix) অরণ্যের যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(x) রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি প্রাচারমাধ্যমের দ্বারা বন ধ্বংসের কুফল সম্পর্কে ও বনের উপযোগিতা সম্পর্কে দেশের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

(xi) সমুদ্রজলে অপরিশোধিত খনিজ তেল মিশ্রিত হলে বিষাক্ত জল বিশ্বের অনেক উপকূলবর্তী ম্যানগ্রোভ অরণ্যের ব্যাপক ক্ষতি করে চলেছে। তাই এই ধরনের বিষাক্ত জলের হাত থেকে মূল্যবান ম্যানগ্রোভ অরণ্যগুলিকে রক্ষা করা দরকার।

(xii) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দ্বারা 'সংরক্ষণ আইন' প্রণয়ন এবং জাতীয় বনভূমি ও সংরক্ষিত অরণ্য স্থাপন করা।

(B) **বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ**— বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বাসস্থল হল বন বা অরণ্য। কিন্তু আধুনিক মানুষ শহর বা নগরের প্রসারের উদ্দেশ্যে এবং কৃষির উপযোগী জমি বাড়ানোর জন্য অপরিকল্পিতভাবে বৃক্ষচ্ছেদন দ্বারা অরণ্যকে বন্যপ্রাণী বসবাসের অনুপযোগী করে তুলেছে। বর্তমানে অসংখ্য বন ও তৃণভূমি কেটে শস্যক্ষেত্র, রাস্তাঘাট, কলকারখান প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। এর ফলে একদিকে যেমন বন্য পশুপাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে, তেমনি গৃহপালিত পশুপাখির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে সমস্ত বন্যপ্রাণী অবাধে বনে ঘুরে বেড়াতো, তারা আজ লুপ্তপ্রায়। এক ধরনের মানুষ বন্যপ্রাণীদের যথেচ্ছভাবে হত্যা করে চলেছে। তাছাড়া একধরনের লুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীদের হত্যা করে কিছু লোভী মানুষ বন্য প্রাণীর অবলুপ্তি ঘটিয়ে চলেছে। এতে জীব-বৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা, কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে একাধিক বন্যপ্রাণী লুপ্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি সিংহ, বাঘ, চিতা, গণ্ডার, বন্য গাধা, নানা প্রজাতির হরিণ প্রভৃতি লুপ্ত হবার সম্মুখীন হয়েছে। মানুষের এই সমস্ত কাজে শুধু যে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে তাই নয়, প্রাকৃতিক ভারসাম্যও বিঘ্নিত হচ্ছে। কেবলমাত্র বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। ভারতেও দেখা যাচ্ছে যে, গত 50-63 বছরে শিকারযোগ্য প্রাণীর সংখ্যা বেশ কমে গেছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে একসময় যে একশৃঙ্গ গণ্ডার ও বন্য মহিষ ছিল, তার কোনো অস্তিত্বই এখন আর নেই। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জঙ্গল থেকে কৃষ্ণসার হরিণ, নীলগাই প্রভৃতিও বিলুপ্ত হয়েছে। লুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীর মধ্যে চিতার নামও উল্লেখযোগ্য।

একসময় ভারতের বিভিন্ন বনে অসংখ্য সিংহ ছিল, কিন্তু বর্তমানে গুজরাটের গির অরণ্য ছাড়া সিংহ প্রায় নেই বললেই চলে। গত 50 বছরে ভারতে বাঘের সংখ্যা 40,000 থেকে কমে গিয়ে 2000 এর চেয়েও কম হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে আলোচিত কয়েকটি ছাড়া সিন্ধু গাভী, সোনা, বিড়াল, বন্য গাধা, নেকড়ে, কস্তুরী হরিণ, তুষার চিতা, বন্য মহিষ প্রভৃতি, সরীসৃপদের মধ্যে কুমির, কচ্ছপ, মেছোকুমির বা ঘড়িয়াল প্রভৃতি এবং পাখিদের মধ্যে রাজধনেশ, বড়োবাজ, ময়ূর শ্বেতচঞ্চুযুক্ত সিন্ধু ঈগল, লুকনা প্রভৃতি হয় সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে, না হয় লুপ্ত হবার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য যেসব ব্যবস্থাগুলি নেওয়া যেতে পারে সেগুলি হল—

(i) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত স্থানে অভয়ারণ্য তৈরি করা যেতে পারে।

(ii) অভয়ারণ্য ছাড়া ও কোনো একটি নির্দিষ্ট বনভূমিকে ‘জাতীয় বনভূমি’ বা ‘সংরক্ষিত অরণ্য’ হিসাবেও সংরক্ষিত করা যায়।

(iii) পাখিদের জন্য পক্ষীরালয় (Bird Sanctuary) তৈরি করা প্রয়োজন।

(iv) বাঘ ও গণ্ডার সংরক্ষণের জন্য অনুকূল স্থানগুলিতে ‘ব্যাঘ্র প্রকল্প’ (Tiger Project) ও ‘গণ্ডার প্রকল্প’ (Rhino Project) প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

(v) হরিণ সংরক্ষণের জন্য ‘মৃগ উদ্যান’ (Deer Park) করা যায়।

(vi) কুমির সংরক্ষণের জন্য ‘কুমির’ সংরক্ষণ গবেষণা প্রকল্প’ স্থাপনা করা সম্ভব।

(vii) বর্তমানে প্রায় সব দেশেই বিভিন্ন শহরে পশু উদ্যানগুলিতে (Zoological garden) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সাথে সাথে গবেষণাও চালানো হচ্ছে।

(viii) বন্য পশুপাখি শিকার করার বিষয়ে প্রতিটি দেশে কড়া আইন-প্রণয়ন ও আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রয়োজন।

(ix) বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন দরকার।

(x) বনাঞ্চলগুলিতে বা তার পার্শ্ববর্তী বাজারগুলিতে বন্য পশুপাখির মাংসের ক্রয়বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া দরকার।

(xi) সংরক্ষিত অরণ্য ও অভয়ারণ্যের মধ্য দিয়ে মানুষের যথেচ্ছ যাতায়াত বন্ধ হওয়া দরকার। এতে একদিকে যেমন পশুপাখির জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, তেমনি চোরাশিকারও বেড়ে যায়।

(xii) বনের মধ্যে মধ্যে প্রাণীদের সুবিধার জন্য জলাশয় তৈরি করা দরকার।

(xiii) সংরক্ষিত বন্য বা অন্যান্য বনগুলির মধ্যে আরও বেশি সংখ্যক গাছপালা রোপণ করা প্রয়োজন।

(xiv) বনগুলির কাছাকাছি কলকারখানা ও জনপথ স্থাপন বন্ধ রাখতে হবে। এমনকি পাকা রাস্তাঘাট নির্মাণও যতদূর সম্ভব কম হওয়া দরকার।

(xv) প্রয়োজনে উন্নত কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নত প্রজাতির বন্য প্রাণীর সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন।

(xvi) অতি সতর্কভাবে প্রাণীগুলির জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যায় ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে।

(xvii) বনভূমিতে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামুলক হওয়া দরকার। তাছাড়া আগ্নেয়াস্ত্রসহ বনভূমিতে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

মৎস্য ও সামুদ্রিক উদ্ভিদ সংরক্ষণ— এই বিভাগের মধ্যে রয়েছে (a) মৎস্য ও সামুদ্রিক প্রাণী সংরক্ষণ ও (b) সামুদ্রিক উদ্ভিদ সংরক্ষণ।

(a) **মৎস্য ও সামুদ্রিক প্রাণী সংরক্ষণ—** ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তনের প্রায় 70 শতাংশ জলভাগ দিয়ে ঢাকা। এর মধ্যে প্রায় 60 শতাংশ অধিকার করে রেখেছে সাগর, মহাসাগর ও উপসাগর, আর প্রায় 10 শতাংশ জুড়ে আছে বিভিন্ন হ্রদ, খালবিল, পুকুর ও নদনদী। এখন বিশ্বে প্রতি বছর যত পরিমাণ মাছ সংগ্রহ করা হয়, তার প্রায় 75 শতাংশ হল সামুদ্রিক মাছ। অন্যান্য জলভাগ থেকে বাকি 25 শতাংশ মাছ ধরা হয়। সুলভ প্রোটিন খাদ্য হিসাবে সারা বিশ্বে মাছের চাহিদা এত দ্রুত বাড়ছে যে, মাছ ধরার পরিমাণও খুব বেড়ে গেছে এবং মাছের অপচয়ও বেড়েছে। মাছের জন্ম ও মাছের মোট শিকারের পরিমাণের মধ্যে সমতা বা ভারসাম্য না থাকলে কিছুদিনের মধ্যে বিশ্বে মাছের ঘাটতি দেখা দেবে এবং চাহিদামতো মাছ পাওয়া যাবে না। ইতিমধ্যে কয়েকটি অঞ্চলে বিশেষ কয়েক ধরনের মাছের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যেমন, আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ও জাপানের উপকূলে সার্ডিন মাছ, আলাস্কা উপকূলে সিল মাছ, নরওয়ে ও সুইডেন উপকূলে কড ও হেরিং মাছ এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পাশে হেরিং ও পিলচার্ড মাছের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।

যেসব কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে মাছের সংখ্যা দ্রুতগতিতে কমে যাচ্ছে সেগুলি হল—

(i) মাছের চাহিদা বৃদ্ধি,

(ii) মাছ শিকারের আধুনিক কালাকৌশলের আবিষ্কার,

(iii) যথেচ্ছভাবে মাছের শিকার,

(iv) উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রজলে তৈলক্ষেত্রের প্রভাব,

(v) দূষিত বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ বাড়ার ফলে জল দূষিত হওয়া,

(vi) সম্পদ হিসাবে মাছ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব,

(vii) পলি জমে জলাধার ও নদীগর্ভ ভরাট হবার ফলে বা নদী মজে যাবার ফলে জলের স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ হচ্ছে ও মাছের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

(viii) বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিকের মিশ্রণের ফলে অগভীর সমুদ্রে মাছের খাদ্য প্ল্যাংকটনের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে বলে মাছের সংখ্যাও ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে।

(ix) নদনদী, খালবিল ও পুকুর থেকে অতিরিক্ত চারাপোনা ও ছোটো মাছ ধরার ফলে মাছের সংখ্যা তাড়াতাড়ি কমে চলেছে।

মাছের মতো গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি প্রোটিন খাদ্যের উৎস যাতে আরও বিনষ্ট না হয়, উৎপাদন যাতে বৃদ্ধি পায় এবং ভবিষ্যতে মাছের যোগান যাতে নিরচ্ছিন্ন থাকে তার জন্য আর সময় নষ্ট না করে নিম্নলিখিত কিছু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন—

(i) **নির্বিচারে মাছ শিকার বন্ধ করা—** ছোটো মাছ (চারামাছ) ও ডিম সমেত মাছ ধরলে মাছ সম্পদ দ্রুত নষ্ট হয়। এর ফলে জৈব উৎপাদনের ধারা বিনষ্ট হয় এবং একসময় মাছের পরিমাণ কমে যায়। ডিম প্রসবের সময় কয়েক মাস মাছ শিকার বন্ধ রাখা দরকার এবং পরিণত মাছগুলি ধরা দরকার। মাছ ধরার পর বেছে বেছে ছোটো চারা মাছগুলিকে জলে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

(ii) **কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা—** মাছের গুণগত মান ও সংখ্যা বাড়াবার জন্য বিজ্ঞানসম্মত কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। এর ফলে দ্রুত বৃদ্ধিশীল নানা সংকর প্রজাতির মাছের উৎপত্তি হয় এবং সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বাড়ে।

(iii) **অত্যধিক সংগৃহীত মৎস্যক্ষেত্রে নতুনভাবে মাছের প্রতিস্থাপন—** অতিরিক্ত মাছ ধরার ফলে যেসব অঞ্চলের সমুদ্রজলে মাছ প্রায় নিঃশেষিত, সেসব অঞ্চলে মাছের ডিম ও চারা ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন মাছ ধরা বন্ধ রেখে দিলে আবার মাছের যোগান বাড়বে।

(iv) **জল-দূষণ প্রতিরোধ—** বিভিন্ন কারখানা থেকে বিষাক্ত আবর্জনা ও দূষক-মিশ্রিত জল নদী ও সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং ফলে প্লাংকটনের ও মাছের বিশেষ ক্ষতি করে. খনিজ তেলবাহী বড়ো বড়ো জাহাজের ট্যাঙ্কার থেকে অথবা সমুদ্রের মধ্যেকার তেলের খনিগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণ তেল সমুদ্রে মিশে যায় এবং মাছকে মেরে ফেলে বা রোগগ্রস্ত করে। পারমাণবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তায় সামুদ্রিক মাছের বিশেষ ক্ষতি হয়। কৃষিক্ষেত্রের রাসায়নিক সার ও কীটনাশক নদীনালা, পুকুর ও সমুদ্রে মিশে জল দূষণ ঘটায় এবং মাছের ক্ষতি করে। তবে সমুদ্রদূষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল তেলবাহী জাহাজডুবি বা ট্যাংকার দুর্ঘটানা। অপরিশোধিত তেল থেকে সিসা, নিকেল, পারদ, ক্রোমিয়াম, ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন প্রভৃতি জলে মিশে মাছের ব্যাপক ক্ষতি করে। প্রায় 19000 প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণীর (অধিকাংশই মাছ) খাদ্যের জন্য অতি প্রয়োজনীয় প্লাংকটনের উৎপাদন ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। প্রয়োজনে জল-দূষণ রোধ করার জন্য উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

(v) **মাছসম্পর্কে গবেষণা বাড়ানো—** মাছ সম্পদের পরিমাণ বাড়ানো ও মাছের প্রজাতিগত উন্নয়ন ঘটানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মাছের গতিবিধি, খাদ্যাভ্যাস, আয়ু, প্রজননের সময়, জীবন ইতিহাস ও খাদ্যপ্রাণ

সম্পর্কে নতুন গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন এবং পুরাতন গবেষণা কেন্দ্রের আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। এখন গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক আবহবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা চলছে। এই ধরনের গবেষণা আরও বাড়লে মাছ-সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আর সুবিধা হতে পারে।

(vi) **মাছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক চুক্তি**— মাছ সবসময় কোনো দেশের নির্দিষ্ট জলসীমার মধ্যে ঘোরাফেরা করে না। তাই মাছ শিকার ও মাছ সংরক্ষণ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রয়োজন, যা মাছশিকারি সব দেশগুলিই মেনে চলতে বাধ্য। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, তিমি ও সিল মাছ শিকারের উপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

(vii) **হিমাগার স্থাপন ও দ্রুত বাজারে প্রেরণ**— ধৃত মাছ যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্যে হিমাগার স্থাপন করে মাছকে খাওয়ার উপযোগী রাখা দরকার। তাছাড়া পচনশীল সামগ্রী বলে ধৃত মাছগুলিকে দ্রুত বাজারে প্রেরণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করা দরকার।

(viii) **অন্যান্য**— মাছ ধরার সময় অন্যান্য মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণীর যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকা এবং মাছ শিকারের জন্য উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন।

সামুদ্রিক প্রাণী সংরক্ষণ—

(i) **দূষণ রোধ**— সমুদ্রে যে 19000 এর বেশি প্রজাতির প্রাণী বাস করে তাদের বেশির ভাগই হল মাছ। তবে সিল, সিন্ধুঘোটক, হাঙর, তিমি প্রভৃতি বিভিন্ন অতিকায় প্রাণীও সমুদ্রে বাস করে। সমুদ্রে মিশ্রিত অপরিশোধিত তেল এইসব প্রাণীদের দেহকোষে সঞ্চিত হয় এবং তাদের প্রাণঘাতী হয়। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় সমুদ্রে মিশ্রিত তেলের মাধ্যমে অসংখ্য প্রাণীকে মৃত অবস্থায় অথবা মৃতপ্রায় পঙ্গু অবস্থায় পাওয়া গেছে। হাইড্রোকার্বন (খনিজ তেল) সামুদ্রিক প্রাণীদের মেরুদণ্ডের মজ্জাকে শুকিয়ে দেয় এবং পলিনিউক্লিয়ার অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (PNAH) প্রাণীদের দেহকোষে জমে ক্যানসার সহ অনেক মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে। তাই তেল মিশ্রণের ফলে যে সামুদ্রিক দূষণ হয় তা বন্ধ করে সামুদ্রিক প্রাণী সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া ডি.ডি.টি., এনড্রিন, ডিএলড্রিন প্রভৃতি কীটনাশক কৃষিজমি থেকে ধৌত হয়ে সমুদ্রে মিশলে জল খুব দূষিত হয়ে বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীদের পক্ষে প্রাণঘাতী হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় সিল, পেঙ্গুইন প্রভৃতি প্রাণীর দেহে বেশি মাত্রায় ডি.ডি.টি. এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

প্রায় সমস্ত ধরনের সামুদ্রিক দূষণ রোধ করার জন্য স্থলভাগে বসবাসকারী মানুষের অবিবেচনাপ্রসূত কাজগুলিই দায়ী। তদাই দূষণ রোধের জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা, আইনানুগ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্রুত প্রয়োগ দরকার।

(ii) **অন্যায়ভাবে সামুদ্রিক প্রাণী শিকার রোধ**— বিভিন্ন বৃহদাকার সামুদ্রিক প্রাণীদের শিকারের বিষয়ে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা ও নিয়মকানুন আছে. সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থানগত ভারসাম্য বা সমতা বজায়

রাখার উদ্দেশ্যেই এসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বেআইনি সামুদ্রিক প্রাণী শিকারিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। বৃহদাকার সামুদ্রিক প্রাণীগুলি গভীর সমুদ্র থেকে মাঝে মাঝে উপকূলের কাছে এসে পড়লে সেগুলিকে শিকার না করে আবার গভীর সমুদ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(B) **সামুদ্রিক উদ্ভিদ সংরক্ষণ—** সমুদ্রে দু ধরনের উদ্ভিদ পাওয়া যায়। যথা—

(i) **বিভিন্ন ধরনের শৈবাল, ছত্রাক প্রভৃতি—** সমুদ্রের নীচে বহু ধরনের এককোষী ও বহুকোষী শৈবালে (বিভিন্ন রঙের) বা সামুদ্রিক অ্যালগি এবং সামুদ্রিক ছত্রাক বা ফাংগি দেখা যায়। কেবলমাত্র হলুদ শৈবালগুলি জলে ভেসে থাকে। এই শৈবাল ও ছত্রাকগুলি মাছের খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এগুলি যাতে বিষাক্ত রাসায়নিকের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হতে পারে তার জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সমুদ্রের ফাইটোপ্লাংকটন যার উপর প্রায় 19000 এর বেশি প্রজাতির, সামুদ্রিক প্রাণী নির্ভরশীল, তার উৎপাদন ভীষণভাবে ব্যাহত হয় সমুদ্রজলে মিশ্রিত অপরিশোধিত তেলের মধ্যমে। হাইড্রোকার্বন সবুজ শ্যাওলা বা ফাইটোপ্লাংকটনের ক্লোরোফিলের সংখ্যা কমায় এবং অনেক সবুজ শ্যাওলার মৃত্যু হয়।

(ii) **নানা আকৃতির সামুদ্রিক গাছপালা—** সমুদ্রে নানা সপুষ্পক ও সবীজ প্রজাতির গাছপালাও পাওয়া যায়, যাকে সামুদ্রিক আগাছা (Sea weed) বলে। এখনই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সি-উইড' থেকে ভিটামিন সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য, পশুখাদ্য প্রভৃতি উৎপাদিত হয়। চীন, জাপান, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, নরওয়ে, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ইতিমধ্যে সামুদ্রিক আগাছা থেকে তৈরি খাদ্য যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। তাই এসব দেশে ও কেবলমাত্র 'সি-উইড' চাষ করাও চলছে। তাই আগামী দিনে কম দামে ও সহজে পুষ্টিকর খাদ্য পেতে এখন থেকেই সামুদ্রিক গাছপালাগুলির সুষ্ঠু সংরক্ষণ প্রয়োজন।

10.8 সারাংশ

এককটিতে জৈব-ভূ-রাসায়নিক চক্র সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে যেখানে জীবমণ্ডলের মৌল উপাদানগুলি পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। এই চক্রগুলির মধ্যে জীবকুলের জীবনধারণের জন্যে উদকচক্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গ্যাসীয় পুষ্টিচক্রগুলির মধ্যে কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন চক্র অন্যতম। বায়ুমণ্ডলে খুব কম পরিমাণে থাকলেও সালোকসংশ্লেষের ক্ষেত্রে এবং সামান্য বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশে নাইট্রোজেন সংযোজনের মাধ্যমে এবং মাটির নাইট্রোজেন বায়ুতে ফিরে যাওয়া বা নাইট্রোজেন মোচনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন জীবদেহে এবং জীবদেহথেকে বায়ুমণ্ডলের আদান-প্রদান হয়। আবার জীবের শ্বসনে, জৈব পদার্থের দহন প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ব্যবহৃত হয় এবং সালোকসংশ্লেষের সময় অক্সিজেন উৎপন্ন হয়ে বায়ুতে মিশ্রিত হয়। তাছাড়া মাটির

মধ্যে থাকা সালফার, ফসফরাস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি জীবদেহে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মাটিতে ফিরে আসে।

এই দুটি পুষ্টিচক্র 'পলল প্রকৃতির পুষ্টিচক্র' নামে পরিচিত।

এই এককটিতে অন্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়টি হল জীব সংরক্ষণ। বর্তমানে অত্যধিক পরিবেশ দূষণ ও জীবের ধ্বংসজনিত সমস্যার সমাধানে জীবসংরক্ষণের গুরুত্ব খুবই বেড়ে গেছে। বাস্তুসংস্থানজনিত ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায়ে অরণ্যের উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংরক্ষণ করা এবং সামুদ্রিক মাছ, প্রাণী ও উদ্ভিদের সংরক্ষণ করা আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

10.9. সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

আলোচিত এককটি থেকে কিছু প্রশ্ন ও তাদের উত্তরের সূত্র দেওয়া হল। অংশগুলি পড়ে উত্তরগুলি বার করে নিন।

1. জৈব ভূরাসায়নিক চক্র কাকে বলে?
2. জৈব ভূরাসায়নিক চক্রের শ্রেণিবিভাগ করুন।
3. উদকচক্রে জলের সম্পূর্ণ আবর্তনের পর্যায়গুলি কী কী?
4. কার্বন চক্রে CO_2 এর উৎসগুলি কী কী?
5. নাইট্রোজেন চক্রে N_2 এর উৎসগুলি কী কী?
6. 'ডিনাইট্রিফিকেশান' বা 'নাইট্রোজেন মোচন' কী?
7. অক্সিজেন চক্রের তাৎপর্য বা গুরুত্ব উল্লেখ করুন।
8. বিজ্ঞানী ওডাম (Odum) 'সংরক্ষণ'-এর কী সংজ্ঞা দেন?
9. বিভিন্ন প্রকারের 'জীব-সংরক্ষণ' উল্লেখ করুন।
10. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?
11. সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষণের উপায়গুলি কী কী?

10.10. উত্তরমালা

1. 10.3. এককের প্রথম অনুচ্ছেদ দেখুন.
2. 10.5. একক দেখুন।
3. 10.5.1.একক দেখুন।
4. 10.5.2.1. একক দেখুন।
5. 10.5.2.2. একক দেখুন।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

6. 10.5.2.2. একক দেখুন।
7. 10.5.2.3. একক দেখুন।
8. **জীবসংরক্ষণ** এর প্রথম দিকটি দেখুন।
9. 10.7. এর প্রথম দিকটি দেখুন।
10. 10.7 অংশের 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ' এর শেষ অংশটি দেখুন।
11. 10.7.2 এককের শেষ অংশটি দেখুন।

10.11. গ্রন্থপঞ্জি

Arora, M.P. 1997 : ECOLOGY; Himalaya Pub, House, Mumbai, Delhi.

গুহ, দাশগুপ্ত ও সাঁতরা 1997 : জীববিদ্যা, মৌলিক লাইব্রেরি, কলিকাতা।

মিত্র, গুহ, চৌধুরী ও দত্ত1996 : উদ্ভিদবিজ্ঞান (২য় খণ্ড); মৌলিক লাইব্রেরি, কলিকাতা

Odum, E.P. 1997 : Fundamentals of Ecology, Natraj Publishers, Dehra Dun.

রায়, মোহিত ও চক্রবর্তী, ভূপতি, 1998 : পরিবেশ; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা।

রায়, রাহুল 1999 : পরিবেশ ও প্রতিবেশ, রিয়া পাবলিশার্স, কলিকাতা।

সান্যাল, ভূপেন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়, অসীমকুমার1997 : জীববিদ্যা(প্রথম খণ্ড);ওরিয়েন্টাল বুক কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা।

Sharma, P.D. 1984 : Elements of Ecology, Rastogi Publishers, Meerut.

Singh, S. 1991 : Environmental Geography; Prayag Pustak Bhawan, Allahabad.

NOTES